জরাসন্ধ

বাক্‌-সাহিত্য
৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯

শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

এই লেখকের অন্যান্য বই

লৌহকপাট ১ম পর্ব	(১৪শ মুদ্রণ)	৪·০০
লৌহকপাট ২য় পর্ব	(১১শ মুদ্রণ)	৩·৫০
লৌহকপাট ৩য় পর্ব	(৭ম মুদ্রণ)	৫·০০
তামসী	(৮ম মুদ্রণ)	৫·৫০
তামসী	(হিন্দী অনুবাদ)	৫·০০
ন্যায়দণ্ড	(৫ম মুদ্রণ)	৬·৫০
পাড়ি	(৫ম মুদ্রণ)	৩·৫০
আবরণ	(৩য় মুদ্রণ)	৩·৫০
আশ্রয়	(৩য় মুদ্রণ)	৩·৫০
একুশ বছর	(২য় মুদ্রণ)	৩·৭৫
এ বাড়ি ওবাড়ি	(নাটক)	২·০০

কিশোর সাহিত্য

রং চং	(২য় মুদ্রণ)	১·০০
গল্প লেখা হল না	(২য় মুদ্রণ)	১·৫০
জরাসন্ধের ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প	(২য় মুদ্রণ)	২·০০
জরাসন্ধের ছোটদের প্রিয় গল্প		২·০০

STATE CENTRAL LIBRARY
WEST BENGAL
CALCUTTA

—এক—

ভোরের দিকে বেশ খানিক ঘাম দিয়ে জ্বরটা ছেড়ে গেল। রেখে গেল সর্বাঙ্গ-জোড়া অবসাদ। নির্মলার মনে হল, শুধু দেহ নয়, তার মনের জোড়গুলোও যেন সব খুলে গেছে। সমস্ত রাত ধরে তন্দ্রা ও জাগরণের ফাঁকে ফাঁকে যে অন্তহীন ভাবনার ঘোর তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, এই মুহূর্তে সব যেন এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। দুটো কথাকেও এক জায়গায় গুছিয়ে তোলা যাচ্ছে না।

জ্বরের একটা নিজস্ব উত্তেজনা আছে। দেহের উত্তাপ মন এবং মস্তিষ্ককেও তাতিয়ে তোলে, অবাধ কল্পনার রাশ খুলে দেয়। নির্মলার জ্বরতপ্ত মুহূর্তগুলো নানা রঙে রঙীন হয়ে উঠেছিল। অতীতকে ভুলিয়ে দিয়ে, বর্তমানকে অগ্রাহ্য করে এমন একটা স্বপ্নলোকে নিয়ে গিয়েছিল তাকে, সুস্থ দেহে যেখানে সে কখনো পৌঁছতে পারত না। সেই দুর্লভ ক্ষণটিতে মনে হয়েছিল, জীবনে একটার পর একটা যত ঝড় এসেছে, সব মিথ্যা; এই যে খোলার ঘরের স্যাঁতসেঁতে মেঝের উপর নোংরা বিছানায় পড়ে সে ছটফট করছে, ঘুমন্ত কচি ছেলেটা আদুল গায়ে গুটিশুটি হয়ে পড়ে আছে এক পাশে, পাঁজরের হাড়গুলো গোনা যায়, পেটটা মিশে গেছে পিঠের সঙ্গে, এ সমস্তই মায়া। এক দিন সব কোথায় মিলিয়ে যাবে। খোকা বড় হতে যে-কটা দিন বাকী। তারপর একে একে সব হবে, সেই কুমারী-জীবন থেকে যা ছিল তার স্বপ্ন। ভদ্র পরিবেশে ছোট্ট সুন্দর পরিচ্ছন্ন একখানা বাড়ি। খোকার একটা ভাল চাকরি···একটি ফুটফুটে বউ। যে সাধ, আকাঙ্ক্ষা স্বামীকে দিয়ে মেটেনি, ছেলে তা পূরণ করে দেবে।

জ্বর চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেই ছবিটাও কোথায় হারিয়ে গেল। স্বল্পপরিসর জীর্ণ ঘরখানার চারদিকটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে

নির্মলার মনে হল মনটা যেন অসাড় হয়ে পড়েছে। ছেলেটা গড়িয়ে গড়িয়ে মাটিতে চলে গেছে। টেনে এনে ছেঁড়া কাঁথাখানা গায়ে তুলে দেবে, হাতের সে জোরটুকুও নেই। অথচ এমন করে পড়ে থাকাও চলে না। পর পর চারদিন বেরোতে পারেনি। কাজটুকু আছে কিনা, কে জানে? না যদি থাকে, তাদের দোষ দেওয়া যায় না। বড় লোকের বড় সংসার। ঘর ধোয়া বাসন মাজা কাপড় কাচা— কাজ তো কম নয়। বেশি কমের কথা বাদ দিলেও এসব তাদের অভ্যাস নেই। একটা বেলা হয়তো কোন রকমে চালিয়ে নিতে পারে, কিন্তু চার চার দিন! যেমন করে হোক, আজ একবার যেতেই হবে। উঠতে গিয়ে মাথাটা ঘুরে উঠল। তিনদিন পেটে কিছু পড়েনি। অনেকখানি পথ। যেতে যেতে যদি ভিরমি লাগে, কে সামলাবে? রাস্তায় পড়ে মরে থাকলেও কেউ জানতে পারবে না। একবার ভাবল, খোকাকে সঙ্গে করে গেলে কেমন হয়। পরক্ষণেই মনে মনে মাথা নেড়ে বলল, তা হয় না। মা তার পরের বাড়ির ঝি, কলতলায় বসে বাসন মাজে, খোকা এখনো জানে না। সে জানে, মা ওদের বাড়িতে মেয়েদের সেলাই শেখায়। মা ও ছেলের মাঝখানে এই মিথ্যার আবরণটুকু যেমন করে হোক বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এটা যদি উঠে যায় ছেলের মুখের দিকে সে তাকাবে কেমন করে? মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, এটা তার দুর্বলতা, মিথ্যা মর্যাদার অসঙ্গত মোহ। মা হয়ে ছেলের সঙ্গে এই লুকোচুরি শুধু অশোভন নয়, অন্যায়। তবু পারেনি। সংসারে সকলের কাছে সে ছোট হতে পারে, কিন্তু খোকার কাছে পারে না। শুধু তাই নয়। মায়ের এই সত্য পরিচয়ের রূঢ় আঘাত ঐ শিশুমন সইবে কেমন করে? মুখে হয়তো কিছু বলবে না। কিন্তু ঐ সরল স্বচ্ছ চোখদুটিতে যে নির্মম প্রশ্ন ফুটে উঠবে, তার কী উত্তর দেবে নির্মলা? তার চেয়ে থাক না এই অসত্যের অন্তরাল। খোকার জন্যে সে সব পারে; ত্যাগ করতে পারে সত্যকেও।

জানালার ফাঁক দিয়ে আরব্ধ দিনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। তার সঙ্গে চারদিক থেকে নিত্য পরিচিত সাড়াশব্দ—বস্তি-মানুষের জীবন-সংগ্রামের প্রস্তুতি। বাতাসে ধোঁয়ার গন্ধ। রান্না-পর্বের আয়োজন চলছে ওদিকের কোন্ ঘরে। কলের গোড়ায় হাঁড়ি কলসির ঠুনঠুন, বালতির

হাতলের ঝনাৎকার। সে সব ছাপিয়ে কানে আসছে বেসুরো ভাঙ্গা গলার একটানা 'জয় সিয়ারাম'। একখানি জীর্ণ গামছা সম্বল করে কলের তলায় সশব্দে স্নানে নেমেছে ভগলু কাহার। মেয়েরা বাধ্য হয়ে সরে গেছে। কিন্তু বেশীক্ষণ সরে থাকবে, তার উপায় কি? ঐ লৌহযন্ত্রের ক্ষীণজলধারার সঙ্গে সকলের প্রাণের যোগ। ওকে কেন্দ্র করেই শুরু হবে এতগুলো মানুষের জীবিকা-যাত্রা। ওরই অগ্রাধিকার নিয়ে কাড়াকাড়ি মারামারি। শুধু বেঁচে থাকবার দুরন্ত তাগিদ। তার কাছে হার মানে রুচি, মাথা নোয়ায় শালীনতা, খুলে পড়ে ভব্যতার আবরণ। তাই অর্ধোলঙ্গ, অশিষ্ট ভগলু কাহারের পাশে দাঁড়িয়ে কোমরে কাপড় জড়িয়ে অমার্জিত ভাষায় কলহ বাধায় সম্ভ্রান্ত ভদ্রবংশের একদা-অন্তঃপুরিকা মাধবী সেন কিংবা নির্মলা ভট্টাচার্য।

নির্মলা মাথা তুলে ঘরের কোণে দাঁড়-করানো বালতিটার দিকে তাকিয়ে দেখল: খটখটে শুকনো। খাবার জলের মাটির কলসিটাও প্রায় তাই। দুটোকেই ভরে আনতে হবে। আজ আর সে শক্তি তার নেই। অথচ দেরি হলে আর-একটা নিরম্বু দিন, অন্ততঃ একটা বেলা তো বটেই। ও বেলার ভরসাও অনিশ্চিত। তাই খোকাকেই যেতে হবে। কাজটা যে কত কঠিন, বিশেষ করে ঐ লাজুক, ভীরু, দুর্বল ছেলেটার পক্ষে, সবই সে জানে। তবু উপায় নেই। ক্ষীণ-কণ্ঠে যতটা সম্ভব জোর দিয়ে ডাকল নির্মলা, খোকা, খোকারে। একবার ওঠ, বাবা।

কার্তিকের শেষ। কাঁথাখানা জড়িয়ে দেবার পর আরাম পেয়ে খোকা অঘোরে ঘুমুচ্ছিল। দু-এক ডাকে ভোরের ঘুম ভাঙবার কথা নয়। নির্মলা সরে এসে একটু নাড়া দিতেই ঘুমের ঘোরে কী সব বলে অস্ফুট প্রতিবাদ জানাল। নির্মলা ঝুঁকে পড়ে ছেলের মুখে সস্নেহে হাত বুলিয়ে বলল, বেলা হয়েছে ওঠ।

খোকা চোখ মেলে তাকাল। এদিক-ওদিক চেয়ে বিরক্তির সুরে বলল, কোথায় বেলা হয়েছে? কত অন্ধকার!

—অন্ধকার কিরে! ভালো করে তাকিয়ে ছ্যাখ। এখনি রোদ উঠবে।

খোকা কপাল কুঞ্চিত করে উঠে বসল। তারপর মায়ের হাতখানা

ধরে খুশী গলায় চেঁচিয়ে উঠল, মা, তোমার জ্বর সেরে গেছে। হাতটা কেমন ঠাণ্ডা, ছাখ।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ ; ছাখনা ?

আরেকটা হাতে ছেলের কপালের উপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে নির্মলা বলল, আচ্ছা, এবার চট করে এক বালতি জল নিয়ে আয় দিকিন।

খোকার মুখখানা সঙ্গে সঙ্গে অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। অন্যদিন হলে হয়তো খানিকটা আপত্তি জানাত। আজ আর কোনো কথা বলল না। ঘরের কোণ থেকে বালতিটা নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। নির্মলাকেও উঠতে হল। তিনদিন পেটে প্রায় কিছুই পড়েনি। এ অবস্থায় অতখানি পথ যাওয়া অসম্ভব। একবার ভাবল, ছুটো ভাতেভাত ফুটিয়ে খেয়ে তারপর বেরোবে। কিন্তু এমনিতেই যা দেরি হয়ে গেছে, তারপর আর অতটা সময় নষ্ট করা চলে না। তাছাড়া, আজই সবে জ্বর ছাড়ল, ভাত খাওয়া হয়তো ঠিক হবে না। টিনে মুড়ি আছে, তাই ছুটো চিবিয়ে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি হোক বেরিয়ে পড়া। খোকা এলে তাকেও ছুটো দিতে হবে। এ কদিন বিনুর মা ডেকে নিয়ে খেতে দিয়েছেন ছেলেটাকে ; ওর জন্যেও বার্লি করে পাঠিয়েছেন। আজ সে ফিরে এসে নিজেই রাঁধবে। পরের উপর আর কতদিন নির্ভর করা চলে। ওঁরা অবশ্য লোক খুব ভাল। আপদে বিপদে বরাবর দেখাশুনা করে আসছেন। তবু টানাটানির সংসার। ওঁদের উপর আর চাপ দেওয়া যায় না। যদিও বিনুকে ডেকে নির্মলাও ছু-একদিন রান্না করে খাইয়েছে খোকার পাশে বসিয়ে। বিনুর বাবা ওর হাতের রান্নার খুব তারিফ করেন শুনে, মাঝে মাঝে ঝোলটা শুকতোটা পাঠিয়ে দিয়েছে তাঁর নাম করে। তাঁরাও পাঠিয়েছেন এটা-সেটা। তবু সে আর এ আলাদা জিনিস। সে দেওয়া-নেওয়ায় ছিল অপ্রয়োজনের আনন্দ, আর এতে রয়েছে প্রয়োজনের গ্লানি। যার হাত থেকেই হোক, বাধ্য হয়ে যে নেওয়া, তার মধ্যে ভিক্ষার দীনতা জড়িত থাকে।

এতক্ষণ যা কিছু করছিল সব মনের জোরে। রাস্তায় বেরিয়েই

বুঝতে পারল নির্মলা, তার একটা সীমা আছে। সে জোর আর যাই পারুক, এই অশক্ত দুর্বল দেহটাকে টেনে নিয়ে মনিবের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে পারবে না। কিন্তু না গিয়েও তো উপায় নেই। ঠিক সময় বুঝে একটা খালি রিক্স যাচ্ছিল তার পাশ দিয়ে। তার মিষ্টি ঘণ্টার আবেদনটুকু কানে যেতেই হাঁটুদুটো যেন আরো অবশ হয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে হাতে ঠেকল আঁচলে বাঁধা ছোট্ট একটি গাঁট—এক টুকরা নোট আর তার পাশে কয়েক আনা রেজগি। এই তার সম্বল, তার চলমান ধনভাণ্ডার। এর একটা অংশ যখন বেরিয়ে যাবে রিক্স-বিলাসের দক্ষিণার রূপ ধরে, এই গ্রন্থিটি তখন কী রূপ নেবে, মনে মনে একবার ভেবে দেখল। সঙ্গে সঙ্গে এরই মত মনটাও তার চুপসে গেল। তবু নিতান্ত বেপরোয়াভাবেই রিক্সটাতে উঠে পড়ল। চলতে চলতে ঠোঁটের কোণে জেগে উঠল কী এক ধরনের কৌতুক-হাসির কুঞ্চন। গাড়ি করে ঝি চলেছে পরের বাড়ি বাসন মাজতে! আশেপাশের লোকগুলো যদি বুঝতে পারত, দৃশ্যটা উপভোগ করত নিশ্চয়ই।

ইচ্ছা ছিল, দু-এক বাড়ি আগেই নেমে পড়বে। কিন্তু থামাতে থামাতে রিক্সটা একেবারে মনিবের দরজায় এসে পড়ল। চাকর সঙ্গে করে বাবু যাচ্ছিলেন বাজার করতে। নামবার আগেই তাদের সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেল। একবার তাকিয়েই নির্মলা মাথা নোয়াল। কী ছিল মনিব এবং তাঁর ভৃত্যের চোখে? শুধু বিস্ময় না তার সঙ্গে মেশানো কিঞ্চিৎ কৌতুক!

ভেতরে ঢুকে প্রথমেই নজর পড়ল কলতলায়। সেই চেনা বাসনের স্তূপ, তার পাশে কাজ করছে নতুন মানুষ। বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠল একবার। তার পরেই ভাবল নিশ্চয়ই ঠিকা লোক; কাজ তো চালিয়ে নিতেই হবে। গৃহিণী সামনেই ছিলেন। অপ্রসন্ন মুখে বললেন কোথায় ছিলে অ্যাদ্দিন?

—জ্বরে পড়েছিলাম কদিন।

—তা একটা খবর তো দিতে হয়। হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই, এ রকম কামাই করলে গেরস্তের চলে কি করে?

—খবর আর কাকে দিয়ে দেবো, মা? কে আছে আমার?

—কেন, তোমার ছেলেকেও তো একবার পাঠাতে পারতে।

নির্মলা চুপ করে রইল। ছেলেকে যে এখানে পাঠানো চলে না, সে কথা এঁদের বলবে কেমন করে?

গৃহিণী বললেন, মাইনেটা ও মাসের গোড়াতে এসে নিয়ে যেও।

নির্মলা চমকে উঠল। শুষ্ক কণ্ঠে বলল, মাইনে নিতে আসিনি মা। কাল থেকে কাজে আসব, তাই বলতে এলাম। বলেন তো আজ থেকেও—

—আমরা লোক রেখে নিয়েছি।

—বরাবরের মত?

—হ্যাঁ। তোমার আশায় আর কদ্দিন বসে থাকব, বল?

গৃহিণী আর দাঁড়ালেন না। একটু ব্যস্ত হয়েই রান্না ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। নির্মলার চোখের সামনে সমস্ত বাড়িটা দুলে উঠল। তাড়াতাড়ি সিঁড়ির উপর বসে পড়ে দুহাতে মেঝেটা চেপে ধরল। একটু সামলে নিয়েই মনে পড়ল, আর বসে থেকে লাভ নেই, রোদ চড়বার আগেই বেরিয়ে পড়া দরকার।

কিছুক্ষণ পরেই বাবু বাজার করে ফিরলেন।

একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে গৃহিণীকে উদ্দেশ করে বললেন, তোমার পুরনো ঝিটিকে দেখলাম যেন?

—হ্যাঁ; এসেছিলেন দয়া করে, ভ্রু কুঞ্চিত করে বললেন গৃহিণী, তোমার সঙ্গে দেখা হল কোথায়?

—এইখানেই, দোরের সামনে।

—এখনো দাঁড়িয়ে আছে নাকি? আমি যে বললাম চলে যেতে।

—না, এখন নয়। সেই যখন বাজারে যাচ্ছিলাম, দেখলাম আসছে।

চাকরটির পেটের মধ্যে তখন থেকেই অদম্য কৌতুকরস উথলে উঠছিল। আর চেপে রাখতে পারল না। বাবুর কথার পৃষ্ঠে যোগ করল, রিক্স করে আসছিল, মা।

রিক্স করে! বাজার গোছাতে গোছাতে হঠাৎ গভীর বিস্ময়ে মুখ তুললেন গৃহিণী। বারান্দার ওধারে দাঁড়িয়ে বুরুশ হাতে দাঁত মাজছিল

মেয়ে। বছর পনের বয়স, ইস্কুলে উঁচু ক্লাসের ছাত্রী। বলে উঠল, এতে আর অবাক হবার কি আছে? অসুখ করলে এতটা পথ হেঁটে আসবে কি করে?

—তুই থাম, ধমকে উঠলেন গৃহিণী, অসুখ না হাতি। নিশ্চয়ই অন্য কোথাও কাজ করছে। ওদের কি? একটা টাকা বেশি পেলেই ছুটবে সেখানে।

—কাজ পেলে আর আসবে কেন পয়সা খরচ করে?

কর্তার মুখে মৃদু প্রতিবাদ শোনা গেল।

—মাইনে নিতে হবে না? ঝাঁঝিয়ে উঠলেন গৃহিণী।

—মাইনে চাইছিল নাকি?

—চাইবার আগেই সে পথ মেরে দিলাম। আমার সঙ্গে চালাকি? বললাম, মাস কাবারে এসো।

—সামান্য কটা টাকা; দিয়ে দিলেই পারতে।

—কেন, আমাদের এত গরজ কিসের যে সেধে টাকা দিতে যাবো?

—না; গরজটা আমাদের নয়, ওর।

—আর, তোমার বোধ হয় তার চেয়েও বেশী, শ্লেষ-তিক্ত কণ্ঠে বিষ মিশিয়ে বললেন গৃহিণী, বেশ তো তোমার অফিসে দাও না একটা চাকরি করে? কলতলা থেকে একেবারে চেয়ার টেবিলে গিয়ে বসুক।

কর্তা চলে যাচ্ছিলেন, ফিরে দাঁড়ালেন। গিন্নীর কথার মধ্যে যে হুল ছিল, সেটা যেন লক্ষ্যই করেননি, এমনিভাবে সহজ সুরে বললেন, ততটা লেখাপড়া ওর জানা থাকলে চেষ্টা করতাম বৈকি? একটি ভদ্রঘরের দুঃস্থ বিধবা পেটের দায়ে আমাদের বাড়িতে বাসন মাজছে, এটা আমাদের পক্ষেও গৌরবের কথা নয়।

গৃহিণী জবাব দিলেন না, গুম হয়ে বসে রইলেন। ঠাকুর এসে একটা কি জিজ্ঞাসা করতেই সঙ্গে সঙ্গে ফেটে পড়লেন, জানিনে, যাও। একটা কাজও কি নিজে বুদ্ধি খাটিয়ে করতে পার না? সব আমাকে বলে দিতে হবে?

কার্তিকের কড়া রোদ। শুধু কড়া নয়, তার মধ্যে এমন কিছু আছে, যা গায়ে লাগলে সুস্থ লোকের শরীরেও কেমন একটা জ্বর-জ্বর

ভাব জেগে ওঠে। ডান হাতখানা অজ্ঞাতসারে চলে যায় বাঁ হাতের কব্জিতে। নাড়ির গতিটা কি একটু চঞ্চল? হাতের কাছে থার্মোমিটার থাকলে কেউ কেউ বগলে লাগিয়ে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পারার রেখাটা পরীক্ষা করেন। একটু যেন পেরিয়ে গেছে 'নর্মাল'-লাইন।

নির্মলা পথ চলতে চলতে বারবার কপালে হাতের উল্টো পিঠটা ঠেকিয়ে দেখছিল। আবার যদি জ্বর আসে ছেলেটাকে নিয়ে নির্জলা উপবাস ছাড়া অন্য পথ নেই। নতুন কাজ কতদিনে জুটবে কে জানে? জুটবে কিনা তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়?

একটানা পথ চলতে গিয়ে পা দুটো আর উঠতে চাইছে না। মাঝে মাঝে মাথাটা এমন ঘুরে উঠছে, যে কোন সময়ে টলে পড়ে যেতে পারে। তবু হাঁটতে হবে। রিক্সর পিছনে কয়েক আনা পয়সা দণ্ড দিয়ে নিজের উপর নিজেরই ভীষণ রাগ হচ্ছিল। এই কি তার গাড়ি চড়বার সময়? একটি পয়সাও যে তার কাছে আজ বহুমূল্য।

বস্তি-অঞ্চল। রাস্তায় কোথাও ছায়া নেই। মাথা উঁচু করে নেই বড় বড় বাড়ি, যার ধার ঘেঁষে চলতে গেলে রোদের হাত থেকে মাথাটা বাঁচান যায়। মাঝে মাঝে দুটো একটা গাছ। তারই কোলে একটুখানি ছায়া। খানিকটা করে বসে, একটু করে জিরিয়ে নিয়ে, ধীরে ধীরে বহু কষ্টে ভেঙ্গে পড়া শরীরটাকে টানতে টানতে যখন সে বাড়ির কাছে এসে পৌঁছল, তখন বেলা গড়িয়ে গেছে। ছেলেটা এতক্ষণ কী করছে কে জানে? সেই কোন্ সকালে দুটো মুড়ি হাতে ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। ক্ষিধেয় ছটফট করছে নিশ্চয়ই। কোন রকমে গিয়ে পৌঁছতে পারলেই সব কাজ ফেলে আগে দুটো চাল ফুটিয়ে দেবে। কিন্তু পথ যেন আর শেষ হতে জানে না।

বাড়ির কাছে আসতেই একটা চেঁচামেচির আওয়াজ কানে এল। এ কি! এ যে তারই ঘরের সামনে! অজানা আশঙ্কায় নির্মলার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। জটলাটা নেহাৎ ছোট নয়। তার মধ্যে হারুর মার গলাটাই সবার উপরে। একটা কিছু উপলক্ষ করে পাড়া কাঁপিয়ে তুলতে এই স্ত্রীলোকটির জোড়া নেই। একটা ছেলে আছে, খোকার চেয়ে বেশ কিছুটা বড়, কিন্তু দেখতে সমবয়সী; এরই মধ্যে রীতিমত বখাটে

হয়ে উঠেছে। তাকে নিয়েই বেশী ভয়। দলে পড়ে ছেলেটা না বিগড়ে যায়। বস্তি-জীবনের সবচেয়ে বড় বিপদ তো সেইখানেই। চারদিকের এই নোংরা ছোঁয়াচ থেকে একটি কচি ছেলেকে কি করে বাঁচিয়ে রাখা যায়।

নির্মলাকে দেখতে পাওয়ামাত্র রণরঙ্গিণী মূর্তিতে এগিয়ে এল হারুর মা। গলাটা সপ্তমে চড়িয়ে বলল, বলি, তোমাদের জন্যে কি পাড়া ছেড়ে চলে যেতে হবে? এদিকে তো শুনি ভদ্দরনোক। তা ভদ্দরনোকের ঘরে এ রকম ডাকাত জন্মায় বাবার বয়সেও শুনিনি।

—কী হয়েছে? কোনো রকমে দম নিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল নির্মলা।

—কী হয়েছে, নিজের চোখেই ছাখ, আমি বলতে গেলে বলবে বানিয়ে বলছি। বলে, প্রায় ছুটে গিয়ে ভিড়ের ভিতর থেকে হারুর হাত ধরে টানতে টানতে এনে দাঁড় করিয়ে দিল নির্মলার সামনে। কপালের উপরে খানিকটা জায়গা একটু ফুলে উঠেছে। কেটেও গেছে একটুখানি, তার পাশে রক্তের দাগ।

নির্মলা সেদিকে একবার তাকিয়ে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে হারুকে প্রশ্ন করল কেমন করে লাগল?

উত্তর দিল তার মা, 'কেমন করে, জিজ্ঞেস কর তোমার সোনার চাঁদ ছেলেকে।'

—খোকা লাগিয়ে দিয়েছে?

'লাগিয়ে দেবে কেন?' ওপাশ থেকে বলে উঠল কে একজন, 'খেলতে খেলতে লেগে গেছে। ছেলেপিলের কাণ্ড! ও রকম একটু-আধটু লেগেই থাকে।'

'এর নাম একটু-আধটু!' হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বক্তার দিকে বাক্যবাণ চালাল হারুর মা, 'আর একটু হলে যে একটা চোখই উড়ে যেত।'

'ঈস! তাই তো', এগিয়ে এসে হারুর চিবুক ধরে মুখটা তুলে ধরল কোনো দরদী প্রতিবেশিনী, 'অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে চোখটা। কী খুনে ছেলেরে বাবা!'

নির্মলার মাথায় আগুন চড়ে গেল। রোগ, অনাহার, এই রৌদ্রদগ্ধ দীর্ঘ পথের ক্লান্তি, শূন্য ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা—একসঙ্গে জড়ো হয়ে জ্বালিয়ে

তুলল দাবানল এবং তার সবগুলো শিখা ধাওয়া করল একটি অসহায় শিশুর দিকে।

'কোথায় সে বাঁদর?' জ্বলন্ত চোখদুটো চারদিকে ঘুরিয়ে হিংস্র কণ্ঠে বলল নির্মলা।

'থাক, এই ভর দুপুরবেলা আর রাগারাগি করতে হবে না। চল ঘরে চল।' বলতে বলতে একটি বর্ষিয়সী মহিলা এসে নির্মলার হাত ধরলেন, 'পরে এক সময়ে বকে-টকে দিস। তোমরা এখন বাড়ি যাও। ছেলের মাথায় একটু জলপটি দাও গে, হারুর মা। হঠাৎ লেগে গেছে, এখন আর কী করা যাবে।'

—না, আপনি ছাড়ুন, মাসিমা। ওটাকে শেষ না করে আমার শান্তি নেই। কোথায় গেল হারামজাদা?

'ঘরের মধ্যে লুকিয়ে বসে আছে', হারুই হদিস দিল।

নির্মলা ছুটল ঘরের দিকে। বিছানাপত্র তোলা থাকে যে কোণটায়, তার আড়াল থেকে চুলের মুঠি ধরে ছেলেকে বারান্দায় এনে দাঁড় করিয়ে দিল। ঝাঁকানি দিয়ে বলল, 'কেন মেরেছিস হারুকে?'

—আমি মারিনি।

—খালি খালি কেটে গেছে, না?

—গুলি লেগে কেটেছে।

—গুলি লেগে!

মজা দেখতে এগিয়ে এসে ভিড় করেছিল যে-সব ছেলের পাল, তার ভিতর থেকে একজন বলে উঠল, ড্যাঙ-গুলি খেলছিল ওরা।

নির্মলা গর্জে উঠল, 'আবার ডাঙগুলি? মানা করে দিয়েছি না ঐ চাষাড়ে খেলা খেলতে?'

'আমি যেতে চাইনি', দুহাতে চোখ রগড়াতে রগড়াতে কান্নার সুরে বলল খোকা, 'ও এসে জোর করে—'

'জোর করে!' গালের উপর ঠাস করে চড় বসিয়ে দিল নির্মলা। সরু সরু আঙ্গুলগুলো যেন কেটে বসে গেল কচি মাংসের উপর। মায়ের হাতে মার খাওয়া খোকার অভ্যাস নেই। মায়ের এই হিংস্র মূর্তি কখনো দেখেনি। তাই কাঁদতে ভুলে গিয়ে ফ্যালফ্যাল করে শুধু

তাকিয়ে রইল। নির্মলার মাথায় তখন খুন চেপে গেছে। 'যা মানা করবো, তাই তুই করবি ?' বলে আরেকবার ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল। মেয়েদের মধ্যে দু-একজন উঠে এসে বাধা দিল, 'আহা! মেরে ফেলবে নাকি ছেলেটাকে ?'

'ও আপদ মরলে তো আমি বাঁচি, আমার হাড় জুড়োয়'—বলে হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়ল। বেদনার্ত ক্লান্ত কণ্ঠে বলল, একশবার বলেছি, মিশবি না ওদের সঙ্গে। একটা কথা শোনে না আমার! কী হবে ঐ ছেলে দিয়ে ? যা ; তুই আমার চোখের সামনে থেকে সরে যা। মুখ দেখতে চাই না তোর!

মায়ের হাতের কঠিন আঘাত, তা সে যতই নির্মম হোক, খোকা মুখ বুজে সয়ে নিয়েছিল। কিন্তু মায়ের মুখের এত বড় আঘাতটা সইতে পারল না। মা তার মুখ দেখবে না! এই কথাটাই তীরের ফলার মত বিঁধল গিয়ে তার শিশুমনের মাঝখানে। এতক্ষণে তার দুচোখ ফেটে ছল ছল করে জলের ধারা ছুটে এল। কণ্ঠ চেপে ধরল দুর্জয় অভিমান। মায়ের মুখের দিকে একটিবার চোখ তুলে তাকিয়েই ছুটে বেরিয়ে গেল। বিনুর মা এসে পড়েছিলেন। পিছন থেকে ডাকলেন 'কোথায় যাস ? ও খোকা, শোন, শোন।'

ততক্ষণে সে রাস্তায় গিয়ে পড়েছে।

—দুই—

একচাপে গায়ে গায়ে জড়ানো কতগুলো টালি ও খোলার ঘর। সামনে নর্দমা, তার পাশে রাস্তা, রাস্তার ধারে একদিকে একটা ঝাঁকড়া আমগাছ, আরেকদিকে কল। এইটুকু নিয়েই খোকার জগৎ। রাস্তাটা এগিয়ে গিয়ে মাঠের উপর দিয়ে চলে গেছে। কোথায়, কোন দেশে সে জানে না। মাকে জিজ্ঞাসা করে এইটুকু শুধু জেনেছে, সে দেশের নাম কোলকাতা। বলার সঙ্গে সঙ্গে মা সাবধান করে দিয়েছে 'ওদিকে যেন যাসনে। মস্ত বড় শহর, অনেক গাড়ি-ঘোড়া। পথ হারিয়ে যাবে আর বাড়ি ফিরতে পারবি না।' কোলকাতার সম্বন্ধে খোকার তাই বড় ভয়। বস্তির ছেলেরা, তার বয়সী কিংবা তার চেয়ে একটু যারা বড়, অনেকেই কোলকাতা দেখে এসেছে। দু'একজন, বিশেষ করে হারু ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার প্রস্তাবও করেছে। কিন্তু খোকা যায়নি। শান্ত, নিরীহ, নম্র স্বভাবের ছেলে। মা যা বলবে, তার একচুল এদিক-ওদিক করে না। বয়সের তুলনায় একটু বেশী সরল, হয়তো একটু বোকা। কিন্তু লেখাপড়ায় প্রখর বুদ্ধি। একবার পড়লেই মনে থাকে। একবার বুঝিয়ে দিলে সে অঙ্ক কখনো ভোলে না। বস্তির মধ্যে একটা ছোট্ট ইস্কুল আছে। রোজ সকালে সেখানে পড়তে যায়। মাইনে দিতে হয় না। দুজন মাস্টার। তার মধ্যে যিনি বড়, তিনি ওর বাবাকে চিনতেন। তাঁর মুখেই শুনেছে খোকা। বাবাকে ওর মনে পড়বার কথা নয়। তিনি যখন মারা যান, তখন ও অনেক ছোট, কথা বলতেও শেখেনি। মার কাছে শুনেছে, কোন্ অফিসে নাকি চাকরি করতেন। অনেক লেখাপড়া শিখেছিলেন, শুধু নিজের চেষ্টায়। তখন ওরা এর চেয়ে ভালো বাড়িতে থাকত, ভালো খেত, ভালো জামা-কাপড় পরত। মা বলে, সে সব আবার হবে। তার আগে ওকেও অনেক লেখাপড়া শিখে মানুষ হতে হবে।

মাস্টারমশাইকে ওর খুব ভালো লাগে। তিনিও ওকে স্নেহ

করেন, মাঝে মাঝে কাগজ-পেন্সিল কিনে দেন। এখানে থাকেন না। ঐ রাস্তা দিয়ে সাইকেল করে আসেন কোলকাতার দিক থেকে। ছুটির পরে চলে যান। পরনে ধুতি আর পাঞ্জাবী। সাইকেলে উঠবার সময় মাথায় একটা টুপি চাপান, সোলার টুপি, যার নাক হ্যাট, সাহেবরা পরে। ছেলেরা আড়ালে হাসাহাসি করে। খোকার কিন্তু বড্ড ইচ্ছা, ঐ রকম একটা টুপি পরে। একদিন মায়ের কাছে বলেও ফেলেছিল মনের কথাটা। মা তো হেসেই আকুল। টুপি পরবি কিরে? তুই কি সায়েব?

—বারে, তবে মাস্টারমশাই পরেন কেন?

—ওঁকে কতদূর থেকে সাইকেল করে আসতে হয়। মাথায় রোদ লাগে বলে পরেন।

—আমার বুঝি রোদ লাগে না?

—আচ্ছা, আচ্ছা, আরো বড় হ। তখন কিনে দেবো একটা টুপি।

এসব কয়েক বছর আগেকার কথা। এখন আর টুপির জন্য বায়না ধরে না। একদিন করেছিল বলে মনে মনে লজ্জা পায়। এখন সে বড় হয়েছে।

মায়ের নিষেধ ব'লে যেখানে সে কোনোদিন পা দেয়নি, আজ সেই অচেনা পথ ধরেই ছুটে চলল খোকা। গাড়িঘোড়ার ভয়? বেশ, গাড়ি চাপা পড়েই সে মরবে। হারিয়ে যাবে যেখানে খুশি। আর কোনোদিন ফিরবে না। পীচের রাস্তা। দুপুর রোদে তেতে উঠেছে। কোথাও কোথাও গলতে শুরু করেছে। খালি পায়ে চলতে কষ্ট হয়। তবু তারই উপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে এগিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ ছুটবার পর পা আর চলে না। শুধু যে সর্বাঙ্গ দিয়ে আগুন ছুটছে তা নয়, তার চেয়েও দাউ দাউ করে জ্বলছে পেটের আগুন। সেই ভোরবেলা দুমুঠো মুড়ি; কখন জল হয়ে গেছে। তারপর আর পেটে কিছু পড়েনি। সামনে রাস্তার ওপাশে একটা গাছ দেখে, তারই ছায়ায় বসে পড়ল। চারদিকটা মনে হল অন্ধকার।

কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেবার পর মাথাটা যখন একটু ঠাণ্ডা হয়েছে, মনের কোণে ছুঁয়ে গেল বাড়ি ফিরবার কথা। কতদূর এসে পড়েছে।

মা নিশ্চয়ই ভাবছে। সঙ্গে সঙ্গে মনটা আবার শক্ত হয়ে উঠল। না, আর সে বাড়ি যাবে না, কখখনো না। মা নেই, কেউ নেই তার ; কেউ তাকে ভালবাসে না। মিনিট কয়েক না যেতেই বুকের ভিতরটা আবার নরম হয়ে উঠল, ঘুরেফিরে মায়ের সেই রোগশীর্ণ মুখখানা চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে চোখ ছুটোও জলে ভরে গেল। তাড়াতাড়ি মুছে ফেলে কাঠ হয়ে বসে রইল সেই গাছের তলায়।

তারপর কখন একসময় ক্ষুধার্ত ক্লান্ত দেহখানা এলিয়ে পড়ল ঘাসের উপর। তুচোখ ভেঙ্গে নেমে এল ঘুম।

গাছটা ঠিক রাস্তার উপরে নয়, তার থেকে নেমে খানিকটা মাঠ পেরিয়ে ছোট একটা ডোবার ধারে। এদিকটায় কোনো লোকজন নেই। বিবর্ণ মাঠ, তুচারটা ছাগল চরছে, কিছু গরু-বাছুরও ঘুরছে এদিক-ওদিক। তুজন লোক রাস্তার দিক থেকে কথা বলতে বলতে এসে দাঁড়াল, খোকা যেখানে শুয়ে আছে, তার উল্টোদিকে। পরনে লুঙ্গি, তার উপরে একজনের একটা রংচটা ময়লা গেঞ্জি, আরেকজনের ওরই মধ্যে একটু ফর্সা ফতুয়া। ওদের মধ্যে যে বয়সে বড়, তার গলায় ঝুলছে কালো সুতোয় বাঁধা রূপোর চাকতি, তুহাতে উলকি, কানে গোঁজা বিড়ির টুকরো। একমাথা বড় বড় চুল, বাবরির ছাঁদে ছাঁটা। আরেকজন অনেকট ছোকরা মত, চোখ-বসে-যাওয়া শুকনো চেহারা, কামানো ঘাড়, সামনের চুলে বাগানো টেরি। বয়স্ক লোকটি ফতুয়ার পকেট থেকে দেশলাই বের করে কানে গোঁজা বিড়িটা ধরাল এবং এক মুখ ধোয়া ছেড়ে বলল, চলে গ্যাছে পুলিশটা ?

—কই ? গিয়ে আবার ফিরে এল।

—শালারা টের পেয়েছে।

—আমারো তাই মনে হয়। ফিরে ফিরে দেখছিল আমার দিকে।

—নিচ্চই কোনো শালা থানায় খবর দিয়েছে।

—'দেবারই কথা। সাত দিনে সাতটা মাল তো আমরাই সরিয়েছি।' মৃত্যু হেসে বলল ছোকরা।

—হুঁ ; তাই পাহারা বসিয়েছে। চ', এখানে আর সুবিধে হবে না।

বিড়িটা ছুড়ে ফেলে পা বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ খোকার দিকে নজর পড়তেই 'ফতুয়া' বলে উঠল, আরে, ওটা কে?

'গেঞ্জি' এগিয়ে এসে উঁকি দিয়ে খুশির সুরে বলল, বাঃ, বেশ বাচ্চাটা তো। ভদ্দরনোকের ছেলে। ওরে দিয়ে হয় না? কেউ সন্দে' করবে না।

'দাঁড়া,' বলে, ঘুরে এসে মাথার কাছে দাঁড়িয়ে 'ফতুয়া' হাঁক দিল, 'ও খোকা.........

খোকার ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলে লোকটার চেহারা দেখেই ভয় পেয়ে উঠে বসল। 'ফতুয়া' যতদূর সম্ভব মোলায়েম সুরে প্রশ্ন করল, কোথায় থাক তুমি?

—বস্তিতে।

—কোন্ বস্তিতে?

—ঐ ওদিকে, হাত তুলে রাস্তার দিকটা দেখিয়ে দিল।

—এখানে কী করছ?

—কিছু না।

খোকার চোখের কোলে জলের দাগ তখনো লেগে আছে। সেদিকে চেয়ে মৃদু হেসে সস্নেহে বলল লোকটি—মা বকেছে বুঝি?

মায়ের নাম করতেই খোকার চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। তাড়াতাড়ি আরেক দিকে মুখ ফেরাল, জবাব দিল না।

—তোমার নাম কি?

—শ্রীদিলীপকুমার ভট্টাচার্য।

—বাঃ, বেশ নামটি তো। খাওয়া হয়েছে?

খোকা এ প্রশ্নেরও কোন উত্তর দিল না। 'ফতুয়া' আবার প্রশ্ন করল, খিদে পেয়েছে?

'না', বলে, উঠে দাঁড়াল দিলীপ।

—কোথায় যাচ্ছ?

—বাড়ি।

চলতে শুরু করতেই 'ফতুয়া' ডেকে ফেরাল, শোন শোন, একটা কাজ করতে পারবে?

—কী কাজ ?

—ঐ যে ছাগলগুলো চরে বেড়াচ্ছে, ওর থেকে একটাকে ধরে আনতে পার ?

'না', বলে, দিলীপ আবার যাবার জন্যে পা বাড়াল।

—আট আনা পয়সা দেবো। ঐ দোকান থেকে পেটভরে মিষ্টি খেয়ে বাড়ি চলে যেও।

খাবার নাম শুনে, দিলীপের পেটের ভিতর আবার নতুন করে জ্বালা শুরু হল। পা দুটো আগে থেকেই কাঁপছিল, এবার অবশ হয়ে এল। বুকের ভিতর থেকে ঠেলে উঠল কান্না।

লোকটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল খোকার এই ভাবান্তর। কাছে এসে তার একটা হাত ধরে বলল, বসো, বসো। বড্ড খিদে পেয়েছে, না ? দাঁড়াও, খাবার আনিয়ে দিচ্ছি।

খোকা কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে দৃঢ়স্বরে বলল, না। আমি বাড়ি যাবো।

—বেশতো। তার আগে দুটো মিষ্টি খেতে দোষ কি ? যাতো রসিদ, খোকার জন্যে চট করে কিছু খাবার নিয়ে আয়।

ফতুয়ার পকেট থেকে পয়সা দিতেই ছোকরামত লোকটি ছুটে বেরিয়ে গেল। খোকার মাথায় পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে লোকটা আবার জিজ্ঞাসা করল, তোমার বাবা কী করেন ?

—বাবা নেই।

'—নেই ? আহা !' মুখে একটা সংবেদনসূচক শব্দ করে বলল, তোমরা কটি ভাইবোন ?

—কেউ নেই।

—শুধু, তুমি আর তোমার মা ?

—হ্যাঁ, বলতে গিয়ে খোকার গলাটা ধরে এল।

রসিদ খাবার নিয়ে এসে পড়ল, কিন্তু খোকা কিছুতেই ঠোঙাটা নেবে না। দুজনে অনেক করে বলে-কয়ে শেষ পর্যন্ত রাজী করাল। খাবারটুকু পেটে পড়তে এতক্ষণে যেন ধড়ে প্রাণ এল খোকার। মুখে কিছু বলতে পারল না। গুছিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাবার বয়স তার নয়।

খাওয়া হলে খুশিভরা লাজুক লাজুক দৃষ্টি তুলে ঐ বাবরি-ওয়ালা রুক্ষ চেহারার লোকটার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল এবং তারপরেই চোখ নামিয়ে নিল।

মাঠের প্রায় সবটুকু জুড়ে এরই মধ্যে নেমে এসেছে কার্তিকের পড়ন্ত বেলার ছায়া। সেইদিকে চেয়েই দিলীপ আবার বাড়ি যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল। ফতুয়া-পরা লোকটি তার মনের কথা বুঝতে পেরে বলল, একলা বাড়ি যেতে পারবে ?

খোকা ঘাড় নেড়ে জানাল পারবে।

—এবার তাহলে আমাদের সেই কাজটা করে দিয়ে যাও।

—কোন্ কাজ ?

—ঐ যে বললাম, একটা ছাগল ধরে আনা।

—যাদের ছাগল তারা যদি বকে ?

—কে বকবে ? ও তো সব আমাদের ছাগল।

—তোমাদের !

'হ্যাঁ, সব আমাদের,' বলে, হাসতে লাগল 'ফতুয়া'।

খোকা বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে। রসিদ বলল, মাঠের ও পাশেই আমাদের বাড়ি। ওখান থেকে রোজ চরতে আসে।

—তোমরা ধরতে পার না ?

—'ছাগলগুলো ভারী পাজী।' জবাব দিল ফতুয়া, 'বড়রা ধরতে গেলেই ছুটে পালায়, ছোটদের হাতে ফস করে ধরা দেয়।'

—'তাই নাকি !' ভারী কৌতুক বোধ করল খোকা।

—তোমার মত আমার একটা ছেলে আছে। সে-ই রোজ আসে। আজ তার শরীরটা ভালো নেই ; তাইতো মুস্কিলে পড়ে গেছি।

খোকা ভাবতে লাগল। কিছুক্ষণ মাঠের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, অতগুলো আমি একা ধরবো কি করে ?

—অতগুলো কে ধরতে বলছে তোমাকে ? খালি একটা ধরবে। একটাকে পাকড়াও করতে পারলেই বাকীগুলো সব সুড় সুড় করে পেছন পেছন চলে আসবে।

খোকা হেসে উঠল, ভারী মজা তো ?

—তবে আর বলছি কেন? যাও, আর দেরি করো না। তোমাকে আবার বাড়ি যেতে হবে তো? ধরতে পারলেই আট আনা, —বলে পকেটের ভিতর থেকে আধুলিটা তুলে দেখাল।

খোকা সেদিকে না তাকিয়েই মহা উৎসাহে লাফ দিয়ে মাঠে নেমে পড়ল। লোকটি ডেকে বলল, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও; এই গামছাটা নিয়ে যাও। গলায় একটা প্যাঁচ দিয়ে নিয়ে আসবে।' ঐখানে থেকেই গামছাটাকে বল্-এর মত করে ছুঁড়ে দিল খোকার দিকে। খোকা সেটাকে কুড়িয়ে নিয়ে ছুটে চলে গেল

কাজটা যত সোজা মনে করেছিল দিলীপ, আসলে দেখা গেল মোটেই তা নয়। জানোয়ারগুলো ভয়ানক চালাক। কাছাকাছি যেতে না যেতেই চট করে সরে যায়। তাড়া করলে এমন ছোটে, কার সাধ্য ধরে? কোনো কোনোটা আবার শিং বাগিয়ে তেড়ে আসে। মাঠময় ছুটোছুটি করে সারা গায় ঘাম ছুটে গেল, একটাকেও ধরা গেল না। খোকার মাথায় তখন রোখ চেপে গেছে। যেমন করে হোক, ধরতেই হবে। তা নাহলে ওদের কাছে মুখ দেখাবে কেমন করে? হঠাৎ চোখে পড়ল, একটা মোটা গোছের পাঁঠা পেছনের একটা পা একটু টেনে টেনে চলছে। সবগুলোকে ফেলে এবার ঐ খোঁড়ার পিছনেই ধাওয়া করল, এবং বেশ খানিকক্ষণ ছুটবার পর কোনোরকমে তার গলায় গামছা জড়িয়ে ফেলল।

সন্ধ্যা হতে আর দেরি নেই। খোঁড়া ছাগলটাকে টানতে টানতে প্রাণপণে বটগাছের দিকে যখন এগিয়ে চলেছে, পেছন থেকে একটা হাঁক শুনে থমকে দাঁড়াল। সর্বনাশ! এ যে পুলিশ! হনহন করে ওর দিকে আসছে এবং হাতের বেঁটে লাঠিখানা উঁচু করে থামবার ইঙ্গিত করছে। খোকার পা দুটো কে যেন মাটির সঙ্গে এঁটে বসিয়ে দিল! পা থেকে মাথা পর্যন্ত দরদর করে বেরিয়ে এল ঘাম।

বস্তিজীবনের সঙ্গে পুলিশ নামক বস্তুটির সম্পর্ক অতি নিবিড়। এখানকার ছেলেমেয়েরা লালপাগড়ি দেখে লাল রঙ চিনতে শেখে, এবং মায়েরা সিপাই-এর ভয় দেখিয়ে বাচ্চাকে ঘুম পাড়ায়। কত বিচিত্র মানুষের বাস এই খাপরা-ঢাকা ঘরগুলোয়, কত বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশ!

এই গলিগুলো যেমন দিনের বেলাতেও অন্ধকার, সেখানে যাদের আনাগোনা সেই মানুষগুলোর অনেকেই তেমনি অন্ধকারের জীব। জীবনের একটা দিক কালো পরদায় ঢাকা। চিরদিন ঢাকা থাকে না। পুলিশের সন্ধানী দৃষ্টির সার্চলাইট আচমকা একদিন পরদা ভেদ করে আসল মানুষটাকে টেনে বার করে।

গলির মোড় থেকে তিনখানা ঘর বাদ দিয়ে পাকা দেয়াল-ঘেরা টিনের চালায় বছরখানেক ধরে বাস করছেন যে-ব্যক্তিটি, শুদ্ধাচারী স্বপাক-ভোজী সদালাপী ব্রাহ্মণ, প্রতিদিন সশব্দে মন্ত্রপাঠ করতে করতে নামাবলী জড়িয়ে ফিরছেন গঙ্গাস্নান থেকে, সন্ধ্যাবেলায় ফোঁটা তিলক কেটে স্মিতমুখে প্রতিবেশীদের কুশল সংবাদ নিয়ে ধীরে ধীরে চলেছেন কোনোদিন দেবালয়ে কোনোদিন শিষ্য-গৃহে. হঠাৎ এক ভোরবেলায় তাঁর দরজা ভেঙ্গে হানা দিল লালপাগড়ি, লক্ষ্মীর ঝাঁপির ভিতর থেকে বের করল সেরখানেক গাঁজা, দেয়ালের ইঁট খসিয়ে আবিষ্কার করল কয়েক বাণ্ডিল নোট। তারপর ভোজপুরী সিপাই-এর গোটা কয়েক রামগাট্টা খেয়ে নামাবলীর খোলস ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল জেল-ফেরত ভজা গুণ্ডা, কোমরে দড়ি এবং হাতে হাতকড়া পরে চলে গেল থানায়।

নতুন বিয়ের পর সিঁথি-জোড়া সিন্দুর পরে স্বামীর সঙ্গে ঘর করতে এল মাধুরী। অল্প আয়, বেশী ভাড়ার বাড়ি নেবে সাধ্য কি? তাই, বাধ্য হয়ে উঠতে হল বস্তিতে, নির্মলার পাশের ঘরে সংসার পাতল। মাধুরী তো মাধুরী ; নামের সঙ্গে রূপের কি আশ্চর্য মিল, আর তেমনি মিল স্বভাবেরও। এমনভাবে মিশে গেল যেন মায়ের পেটের বোন নির্মলার। দিদি বলতে অজ্ঞান। স্বামীর সঙ্গে যখনই বেরোয়, খোকার জন্যে একটা কিছু হাতে করে ফেরে—কোনদিন এক বাক্স চকোলেট, কোনদিন একটা স্প্রিং-এ চলা মোটরগাড়ি। নির্মলা অনুযোগ করলে হেসে উড়িয়ে দেয়, গলা জড়িয়ে অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, তাহলে তোমার সঙ্গে আড়ি; আর কখখনো আসবো না তোমার ঘরে।

ছেলেটি কিন্তু বড় একটা বেরোয় না ঘর থেকে। করে কী? কী করে চলে ওদের? কেমন যেন সন্দেহ হল নির্মলার মনে। আশে-

পাশের ঘরে যারা থাকে, তাদের মুখেও একই ছায়া, কথায়-বার্তায় একই সুর। নবদম্পতির চাল-চলনটাও কেমন যেন বদলে গেছে। প্রথম প্রথম যাকে মনে হত খুনসুড়ি, তারই মধ্যে এখন চাপা কলহের আওয়াজ বেরিয়ে পড়ে। বেশিদিন আর চাপা রইল না। গভীর রাত্রে মাধুরীর চিৎকারে নির্মলার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

ছুটে গিয়ে দেখে গলায় হাত দিয়ে হাঁপাচ্ছে। চোখদুটো যেন আগুনের গোলা ; ঠিকরে বেরিয়ে আসবে এখনই।

—কী হয়েছে! তোমার বর কোথায়? জানতে চাইল নির্মলা।

—কিসের বর! বিয়ে হয়নি আমার।

—বল কি!

—বিয়ে করবে বলে ভুলিয়ে এনেছে। একটা একটা করে গয়নাগুলো সব খুইয়ে আজ এসেছিল এই হারটা নিতে। দিইনি বলে গলা টিপে ধরেছিল। মেরে ফেলত আর একটু হলে।

বলতে বলতে নির্মলাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে তার বুকে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

নারীকণ্ঠের চীৎকার শুনে এ-পাশ ও-পাশ থেকে ছুটে এসেছিল যে-সব স্ত্রী-পুরুষের দল, মজার গন্ধ পেয়ে তারা আর যেতে চায় না। ভিড় বেড়ে চলল। দু'চারজন অতি-উৎসাহী যুবক ছুটে বেরিয়ে পড়ল অন্ধকারে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বামীটিকে এনে হাজির করল জনতার দরবারে। টিপ্‌পনি, টিটকারি তো চললই, তার সঙ্গে চড়-চাপড়, গলাধাক্কাও বাদ পড়ল না। তার তরফেও বলবার ছিল অনেক কিছু এবং তারস্বরে সেই মুখরোচক বিবৃতির সঙ্গে হাজির করল একগাদা প্রেমপত্র। নাট্যরস যখন বেশ জমে উঠেছে, এমন সময় নিতান্ত বেরসিকের মত পুলিশের আবির্ভাব।

নায়কের হাতে পড়ল হাতকড়া। সে চলে গেল। নায়িকাকেও যেতে হবে। কোথায়? আপাততঃ কোনো উদ্ধারাশ্রম। এইটুকুই বলতে পারলেন থানা-অফিসার। এর বেশী আর কিছু তাঁর জানা নেই। নির্মলাই বা কতটুকু জানে? তাই যাবার আগে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিয়ে শেষবারের মত যখন জানতে চাইল মাধুরী, 'আমার কী

হবে, দিদি? আমি কোথায় যাবো?'—নির্মলা রইল নিরুত্তর। ছেলেটার তবু একটা আশ্রয় জুটবে। আর কোথায় না হলেও, জেলখানায়। সে আর কদিন? তারপর নির্বাধ নতুন জীবন। একদা কোথায় কী ঘটেছিল, প্রথম যৌবনের নেশার ঘোরে জড়িয়ে পড়েছিল কার সঙ্গে, সে প্রশ্ন কেউ তুলবে না। হয়তো তারই জন্যে একদিন কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে অনূঢ়া কন্যার পিতৃমহলে। নতুন নারী আসবে তার জীবনে, নতুন প্রেমের আস্বাদ। আর ঐ মেয়েটা? তার জন্যে রইল ক্ষমাহীন মানুষের সদাজাগ্রত প্রখর দৃষ্টি, যার সামনে সে শুধু তিল তিল করে তলিয়ে যাবে, একটা ভেলাও কেউ এগিয়ে দেবে না।

এই সব দৃশ্য চোখ ফোটার পর থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে দিলীপ। তার সঙ্গে ঐ লালপাগড়ি নামক ভয়াবহ বস্তুটির অপ্রতিহত প্রচণ্ড প্রতাপ তার কচি মনে দাগ কেটে বসে গেছে। তারই একজনকে লাঠি উঁচিয়ে এগিয়ে আসতে দেখে তার প্রাণে আর জল রইল না। সিপাইটি হেঁকে উঠল, কিস্‌কা ছাগল হ্যয়? তোমারা?

—না। শুষ্কস্বরে কোনো রকমে উচ্চারণ করল খোকা।

—তব্?

'ঐ ওদের; ওরা আমাকে ধরতে বলেছিল।' আঙুল দিয়ে গাছের দিকটা দেখিয়ে দিল।

সিপাইটি তাকিয়ে দেখে বলল, কৌন্? কিসিকো তো নেহি দেখ্‌তা হ্যয়।

খোকাও দেখল, সত্যিই কেউ নেই। গাছের তলাটা একদম ফাঁকা। ধারে কাছেও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে উঠল। কী উত্তর দেবে ভেবে পেল না।

—সব ঝুট বাত্, ধমকে উঠল সিপাই।

ধমকের ঝাঁকানি খেয়ে খোকার সমস্ত শরীরটা আবার কেঁপে উঠল, গলা দিয়ে স্বর ফুটল না।

সিপাইটি এবার সুর চড়াল, তুম্ চোর হ্যয়, ছাগল চোরি করকে ভাগতা রহা।

'—না, আমি চুরি করিনি,' বলতে বলতে কেঁদে ফেলল দিলীপ,

'সত্যি বলছি। দুজন লোক বললে, তাদের ছাগল; ধরে আনতে পারলে আট আনা পয়সা দেবে।'

এবার হা হা করে হেসে উঠল পুলিশের লোক। অর্থাৎ এরকম আজগুবি কাহিনী চোর মাত্রেই রচনা করে থাকে। হাসি থামলে খোকার বাঁ হাতটা চেপে ধরে বলল, ঠিক হ্যয় ; চলো।

—আমি বাড়ি যাবো।

—হাঁ, হাঁ, বাড়ি যাবে, বড়িয়া বাড়ি, একদম রাজবাড়ি।

থানার নাম অনেকবার শুনেছিল দিলীপ, কিন্তু সেখানে কখনো আসতে হবে, কোনোদিন ভাবতে পারেনি। একটা ছোট ঘরে ঢুকিয়ে, বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে ছাগলটা নিয়ে সিপাই চলে গেল। মেঝেটা কারা যেন নোংরা করে রেখে গেছে। খোকা জানালার ধারে শিকগুলো ধরে দাঁড়িয়ে রইল, যদিও পা দুটো আর তাকে ধরে রাখতে পারছিল না। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ঘরে আলো নেই, আর কোনো লোকও নেই। আশে-পাশে লোকজনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল। তবু প্রথমটা কেমন ভয় করতে লাগল। বেশীক্ষণ নয়। তার পরেই তার সমস্ত মন, সমস্ত চেতনা জুড়ে বসল মা। কী করছে মা? আবার জ্বর এসেছে কি? তাকে না খাইয়ে মা কোনোদিন খায় না। আজও নিশ্চয়ই খাওয়া হয়নি। ঘরের দাওয়ায় সেই থামটা হেলান দিয়ে পথের দিকে চেয়ে বসে আছে; ইস্কুল থেকে কিংবা খেলার মাঠ থেকে ফিরতে একটু দেরি হলে যেমন করে বসে থাকে মা। সেই বিশেষ ভঙ্গীটি, মায়ের সেই উদ্বেগাকুল মুখখানা মনে পড়তেই খোকার বুকের ভিতরটা হু হু করে উঠল। চোখ দুটো আবার জলে ভরে গেল।

তারপরেই আবার মনে হল, মা কি আজ আর চুপ করে বসে থাকতে পারে? নিশ্চয়ই চারদিকে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে, যাকে পাচ্ছে, জিজ্ঞাসা করছে আমার খোকাকে দেখেছ? কেউ বলতে পারছে না। কেমন করে বলবে? তারা তো কেউ জানে না। কেন মরতে আসতে গেল এতদূর? হঠাৎ কী যে রোখ চাপল মাথায়—ভাবতে গিয়ে নিজেকে তার ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছা হল। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল মনের আর একটা কোণ—তার দোষ কি? মা তাকে মারল কেন? সে তো

ইচ্ছা করে লাগিয়ে দেয়নি হারুকে। বেশ করেছে চলে এসেছে। ক্ষণকাল এই অভিমানটুকু আশ্রয় করে এরই উপরে দাঁড়াতে চাইল দিলীপ। কিন্তু এ টিঁকল না, তার শিশুমনের সবটুকু জুড়ে যে বেদনার ভার, তারই চাপে কোথায় তলিয়ে গেল। মা-ই যে তার সব।

অনেকক্ষণ পরে আরেক জন সিপাই এসে তালা খুলে তাকে অফিসারের ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। একজন খাকী পোশাক-পরা ভদ্রলোক তাকে বেশ মোলায়েম সুরে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন এবং মাঝে মাঝে থেমে একটা কাগজে কি সব লিখতে লাগলেন।

—সেই লোকটা কি রকম দেখতে, বলতো খোকা?

—বিচ্ছিরি।

'বিচ্ছিরি!' হাসলেন ভদ্রলোক। 'তবে তার কথা শুনতে গেলে কেন?'

খোকা কি জবাব দেবে ভেবে পেল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

—আট আনা পয়সা দেবে বলেছিল বলে?

খোকা মাথা নীচু করে পা দিয়ে মেঝেটা খুঁটতে লাগল।

—ছিঃ ছিঃ আট আনা পয়সার জন্যে তুমি একটা ছাগল চুরি করলে?

'আমি চুরি করিনি,' মাথা তুলে বলল খোকা। তার কণ্ঠে এবং বলবার ভঙ্গীতে দৃঢ়তার আভাস পেয়ে থানা-অফিসার কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। পাশের টেবিল থেকে আর একজন বললেন, 'আহা, চুরি বলছেন কেন? ওটা ওর মজুরি।' বলে হেসে উঠলেন। থানা-অফিসার সে হাসিতে যোগ দিলেন না, খোকাকে প্রশ্ন করলেন, তোমার সেই 'বিচ্ছিরি' লোকটা কী পরেছিল বলতো?

—লুঙ্গি।

-- আর?

—আর একটা ফতুয়া। মাথায় বাবরি চুল।

'কসাইগুলো রাস্তা বদলেছে, দেখলেন তো?' সহকারীর দিকে চেয়ে বললেন থানা-অফিসার, 'নিজেরা পেছনে থেকে এই সব বাচ্চা ছেলে দিয়ে কাজ হাঁসিল করছে।'

—অসুবিধা তো কিছু নেই, উত্তর দিলেন সহকারী, দুচার আনা পয়সা দিলেই এইসব স্ট্রে চাইলড্ পাওয়া যায়।

—কিন্তু একে দেখে ঠিক স্ট্রে চাইলড্ বলে মনে হয় না।

খোকার দিকে ফিরে বললেন, তোমার বাবা মারা গেছেন কতদিন ?

—আমি জানি না।

—মা কী করেন ?

—একজনদের বাড়িতে সেলাই শেখান।

—কোন বস্তিতে থাক তোমরা ?

—উই ওদিকে।

—ওদিকে কোথায় ? বেলেঘাটায় ?

—হ্যাঁ।

—রাস্তার নাম-টাম কিছু বলতে পার ?

খোকা মাথা নাড়ল। তারপর, যেন মস্তবড় একটা দরকারী খবর দিচ্ছে এমনিভাবে চোখ বড় বড় করে বলল, সেই যে বড় আমগাছটা ? তার পাশে কল ? সেইখানে।

—'বুঝুন এবার !' হেসে উঠলেন সহকারী। অফিসার একজন সিপাইকে ডেকে বললেন, ওকে নিয়ে যাও।

খোকা বলে উঠল, আমি বাড়ি যাব।

—রাত্তিরে যাবে কেমন করে ? আজ এখানে থাকো। কাল পাঠিয়ে দেবো।

থানা-অফিসার উঠে বারান্দায় পড়তেই একজন লোক নত হয়ে নমস্কার করল।

—কী চাই ?

—আজ্ঞে, ছাগলটা আমার, বড়বাবু।

—প্রমাণ কি ?

—আজ্ঞে একটা পা খোঁড়া।

—সে তো কত ছাগলেরই থাকতে পারে।

—তা পারে। তবে ওটা আমাকেই দিয়ে দিন বড়বাবু। তার জন্যে—

'কেন? তোমাকে কেন দেবে হামার ছাগল?' অন্ধকারের ভিতর থেকে যেন গর্জে উঠল একটি স্ত্রীমূর্তি।

—ও আবার কে? বিস্ময়ের সুরে যেন আপন মনে বললেন দারোগা।

—ও একটা পাগল।

'পাগল! পাগল আছিস তুই, পাগল আছে তোর বাবা', রণরঙ্গিণীরূপে এগিয়ে এল মূর্তিটি, 'আপনি দশজনকে পুছে ছাখেন বড়াবাবু, দোমাস আগে উ ছাগল আমাকে বেচে দেয়নি? ছে টাকা বারো আনা হামার দুধের দাম থেকে কেটে লেয়নি? থোঁড়া বলে বারো আনা পয়সা ছেড়ে দিতে কতো কৌসিস কোরলাম। বোললে, তা হোবে না।

– সব বাজে কথা, স্যর।

—'কেয়া? বাজে কথা বলছি হামি! তব্ চল বস্তিমে, সাক্ষী লিয়ে আসি।'···বলেই, প্রতিপক্ষকে সাবধান হবার কোনো সুযোগ না দিয়ে খপ্ করে তার একটা হাত ধরে ফেলল। স্ত্রীলোকের আচ্‌মকা আক্রমণে লোকটা প্রথমে একটু হতভম্ব হলেও সঙ্গে সঙ্গে 'ছাড় ছাড়' বলে রীতিমত পৌরুষ প্রকাশ করতে লাগল। কিন্তু বোঝা গেল, ভগবান তাকে যার কবলে ফেলেছেন, সে ব্যক্তিটি জাতে অবলা হলেও দেহে ওর চেয়ে অনেক বেশী বল ধরে। নারীপক্ষেই জয়ের সম্ভাবনা দেখা দিল। আরো দুঃখের কথা, আশে-পাশে দাঁড়িয়ে যারা দৃশ্যটা উপভোগ করছিল, তারা সকলেই পুরুষ; কিন্তু স্বজাতি-উদ্ধারে কেউ এগিয়ে এল না। দেখতে না দেখতে লোকটির তর্জনের পরদা নেমে এল আবেদনের খাদে। বিজয়িনী যখন তাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, বিজিতের গলা থেকে বেরিয়ে এল নাকী স্বর—দেখলেন বড়বাবু, মাগীর কাণ্ডটা একবার দেখলেন? আপনার চোখের ওপরেই······

বাকীটুকু আর শোনা গেল না।

—তিন—

নির্মলার রান্নাঘরে সেদিন আর আগুন জ্বলল না। 'এই আসে, এই আসে' করে বেলা গড়িয়ে গেল। রাস্তার পাশে ঝাঁকড়া আম গাছটার ছায়া দীর্ঘতর হল, আস্তে আস্তে ছেয়ে গেল মাঠের কোল। তারই সঙ্গে একরাশ ভয় ও দুর্ভাবনার কালো ছায়া তার মনটাকেও আচ্ছন্ন করে ফেলল। এর মধ্যে দু'তিনবার বিনুর মার কাছে ঘুরে এসেছে। ভিতরে ভিতরে উদ্বেগ বোধ করলেও বাইরে তিনি বারবার আশ্বাস দিয়েছেন, কোথায় আর যাবে? এখখনি এসে পড়বে। তুই বাড়ি যা। অসুখ শরীরে আর ঘোরাঘুরি করিসনে। না হয় এখানেই একটু গড়িয়ে নে।

—না দিদি, আমি যাই। যদি এসে পড়ে, আমাকে না দেখলে ভয় পাবে। যে রকম ভয়কাতুরে ছেলে।

সন্ধ্যার পর নির্মলা আর স্থির থাকতে পারল না। ও বাড়িতে গিয়ে কেঁদে ফেলল, আমার মন বলছে নিশ্চয়ই কোন বিপদ ঘটেছে। খোকা আর ফিরবে না।

—'বালাই ষাট! মা হয়ে এ রকম 'কু'ডাক ডাকতে আছে? ছিঃ।'

—আমার যে ভাঙা কপাল দিদি। 'কু'টাই আগে মনে আসে। আর তাই যদি না হবে আমার মাথাটা হঠাৎ এমন খারাপ হতে যাবে কেন? কোত্থেকে এল এই চণ্ডাল রাগ? গায়ে হাত তোলা দূরে থাক, কোনোদিন একটা কড়া কথাও তো বলিনি ছেলেটাকে। দুবেলা দুমুঠো খেতে দিতে পারি না। তার ওপর আবার রাগ করবো কোন্ মুখে?

এমনি কত কথা বলতে লাগল নির্মলা। কত দিনের কত তুচ্ছ ঘটনা। সেই কবে, বড় বেশী জ্বালাতন করছিল বলে গালটা একটু টেনে দিয়েছিল। তখন সে কতটুকু! সবে কথা বলতে শুরু করেছে প্রথমে পা ছড়িয়ে বসে খুব খানিকটা কাঁদল। মা কোলে করতে গেলে ছিটকে পালিয়ে গেল। তারপর নিজের গালে নিজেই হাত বুলোতে

বুলোতে গোল গোল চোখ করে বিজ্ঞের মত বলল, কী রকম ভাঙা ভাঙা গলায়, 'কচি গাল, মারলে লাগে না বুঝি?' 'কচি-গাল' কথাটা সবে শিখেছে তখন; হয়তো মায়ের মুখ থেকেই শোনা। সেই থেকে, ছেলেকে আর কখ্খনো মারবে না, প্রতিজ্ঞা করেছিল নির্মলা। আজ সেটা কেমন করে ভুলল?

বিনুর মাও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাঁর স্বামী বড়বাজারে এক মাড়োয়ারীর দোকানে কাজ করেন। ফিরতে রাত হয়। তার আগে কাকেই বা বলা যায়? বস্তিতে বিশেষ কারো সঙ্গেই ওঁদের জানাশুনো নেই। যে যার নিজের ধাঁধায় ঘোরে। তাছাড়া বেশীর ভাগই মিস্ত্রী, মজুর, ফেরিওয়ালা শ্রেণীর লোক। তারা আর কী পরামর্শ দেবে? ওরই মধ্যে একটি ছেলে মাঝে মাঝে ওঁদেব ফাইফরমাস খাটে। কোন কারখানায় যেন কাজ করে। বিনুকে দিয়ে তাকেই ডেকে পাঠালেন। খবর পেয়েই এল এবং সব শুনবার পর গম্ভীরভাবে বলল, বড়ই ভাবনার কথা। একদল ছেলেধরা বেরিয়েছে আজকাল। ছোট ছেলে পেলেই কী একটা শুঁখিয়ে অজ্ঞান করে নিয়ে যায়।

—কোথায় নেয়? ভীত, শুষ্ক কণ্ঠে বলল নির্মলা।

—নিয়ে যায় ওদের আড্ডায়, তারপর চালান করে দেয় কোথায় কোথায় তার কিছু ঠিক আছে? এই তো—

'না, না; ওসব বাজে কথা', তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলে উঠলেন বিনুর মা। ভাল লোককেই ডেকে এনেছেন বিপদে সাহায্য করতে। ছেলেটি মোটেই দমবার পাত্র নয়। দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাতে যাচ্ছিল, সে যা বলেছে, একেবারে খাঁটি সত্য। তিনি আর সে সুযোগ দিলেন না, মাঝপথেই বলে বসলেন, আচ্ছা, তাহলে তুমি এখন এসো, হারাধন। দেখি, রাত্তিরে যদি না ফেরে কাল আবার ডাকবো তোমাকে। একটু খুঁজে টুজে দেখতে হবে বাবা, কোথায় গেল ছেলেটা।

—তা দেখবো বই কি মাসিমা, একশবার দেখবো। তাছাড়া ছেলে হারিয়ে যাওয়া আমাদের বস্তিরও দুর্নাম। কি বলিস সতে?

'সতে' বলে যে বন্ধুটি না ডাকতেই এসেছিল এবং পাশে দাঁড়িয়ে

শুনছিল সব কথা, পরম বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বলল, এক কাজ করলে হয় না?

'কী?' বেশ খাতির করার ভাব নিয়ে জানতে চাইল হারাধন।

—চল, ভিখিরীদের পাড়াটা একবার দেখে আসি। ও শালারা বড় বদমাস। রাস্তাঘাটে ছোট ছেলে একলা দেখলে মুখে কাপড় গুঁজে নিয়ে যায়। কানা খোঁড়া বানিয়ে ভিক্ষে করায় তাদের দিয়ে।

'অ্যাঁ'! আঁতকে উঠল নির্মলা। হারাধন সেসব ভ্রূক্ষেপ করল না। 'ঠিক বলেছিস, চল্।' বলে, একটা লাফ দিয়ে বারান্দা থেকে নেমে পড়ল গলির মধ্যে এবং বন্ধুর হাত ধরে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিনুর বাবা সেদিন আরো রাত করে ফিরলেন, এবং স্ত্রীর মুখে সব শুনে নিরাশাব সুরে বললেন, এত রাত্তিরে কোথায় খুঁজবো। সকাল হোক। তারপর—

—তা বললে মায়ের মন শুনবে কেন? তোমার ভরসায় বসে আছে সেই সকাল থেকে। এই মাত্তর একরকম ঠেলে বাড়ি পাঠালাম। আহা! ঐটিই ওর শিবরাত্রির সলতে। যদি সত্যিই কিছু হয়ে থাকে,—

পরিণামটা মনে মনে কল্পনা করেই শিউরে উঠলেন বিনুর মা, মুখ ফুটে আর বলতে পারলেন না।

ভদ্রলোক আর আপত্তি করলেন না। কোনো রকমে দুটো ভাত মুখে দিয়ে লাঠি ও লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন, যদিও জানতেন, এ রকম খোঁজার কোনো অর্থ নেই।

নির্মলার ঘরে সেদিন সন্ধ্যা প্রদীপ পড়ল না, দুয়ারে পড়ল না জলের ছিটে। গলায় আঁচল জড়িয়ে সিন্দুর-মাখা লক্ষ্মী মূর্তির পায়ের তলায় প্রতি সন্ধ্যায় পৌঁছে দেয় যে আনত প্রণামখানি, তাও বাদ পড়ে গেল। গৃহস্থের অকল্যাণ হবে, সে ভয় আর মনে এল না। এর চেয়ে বড় অকল্যাণ আর কী হতে পারে? চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছিল। প্রতি পলে পলে যে উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা, তাও যেন শেষ হয়ে গেছে। অন্ধকারের মধ্যে শূন্য আয়ত দৃষ্টি মেলে বারান্দার সেই খুঁটিটায় হেলান দিয়ে অসাড়ের মত বসে রইল। কুমোরের হাতে ঘা খেয়ে খেয়ে একটা

কাদার তাল যেমন শক্ত নিরেট হয়ে ওঠে, একটার পর একটা অদৃষ্টের আঘাত ওর হৃদয়টাকেও তেমনি কঠিন করে তুলেছিল। শুধু কঠিন নয়, অনেকটা যেন জড়ীভূত, অনড়, বেদনা-বোধ-হীন।

বড়দের মুখে সে বরাবর শুনে এসেছে, মানুষ অদৃষ্টের হাতের খেলনা, এ জীবন শুধু ভাগ্যের খেলা। বেশ, তাই হল। কিন্তু তার যিনি ভাগ্যদেবতা তিনি কি আর কোনো খেলা জানেন না? তার এই তিরিশ বছরের জীবনটা নিয়ে কেবল ছিনিমিনি খেলে গেলেন? মনে পড়ছে কবে কোন্ একটা বইতে যেন একবার পড়েছিল, জীবন নদী-প্রবাহের মত, সেই স্রোতের টানে আমরা ভেসে চলেছি। কথাটা হয়তো ঠিক, কিন্তু পুরোপুরি ঠিক নয়। স্রোত যেমন আছে, তার সঙ্গে আছে আবর্ত, আছে তরঙ্গভঙ্গ। নির্মলার নিজের জীবনে সেই দুটোই বেশী প্রত্যক্ষ। স্বচ্ছন্দে ভেসে-চলা কেমন বস্তু সে কোনদিন জানেনি, জেনেছে শুধু একটা ঢেউ-এর কবল থেকে আর একটা ঢেউ-এর মুখে আছড়ে-পড়া।

ছেলেবেলার কটা বছর ওরই মধ্যে একটুখানি আলাদা। কিন্তু সে আর কতটুকু! প্রখর রৌদ্রের তাড়নায় মিলিয়ে যাওয়া কুয়াশার মত কৈশোর দিগন্তের কোন কোণে কবে হারিয়ে গেছে। তবু মন ফিরে ফিরে চায়, মধ্যাহ্নের তাপদগ্ধ পথিক ছায়াহীন মাঠের বুকে দাঁড়িয়ে যেমন পিছন ফিরে তাকায় দূর গ্রামোপান্তে ফেলে-আসা প্রভাতের পানে, যেখান থেকে তার যাত্রা শুরু।

তিন মেয়ের মধ্যে নির্মলাই সবচেয়ে ছোট; অর্থাৎ বাপের আদরের সবচেয়ে বড় অংশীদার। কিন্তু মেয়ের জীবনে পিতৃস্নেহের চাইতে যেটা বড় প্রয়োজন—পিতৃধন, দিদিদের বিদায় করতেই সেখানে ঘাটতি দেখা দিল, তার অংশে আর কিছু রইল না। বাপ ছিলেন মহকুমা আদালতের উকিল, তাও ঠিক প্রথম লাইনের নন। মক্কেলের হাত থেকে দিনান্তে যা আসত, সবটাই চলে যেত সংসারের মুখে, সঞ্চয়ের খাতে এক কণাও পৌঁছত না। তবু বড় এবং মেজো মেয়ের বিয়েতে কোনোদিকে টানাটানি করেননি।

ছেলে দুটি ভালোই পেয়েছিলেন। বড়টি ডাক্তার তার সঙ্গে সরকারী চাকুরে, অর্থাৎ মাস-মাইনের উপর উপরি হিসাবে কিঞ্চিৎ প্রাইভেট প্রাকটিস্। মেজোটি কোনো সুবিধাজনক রেল-অফিসের মেজো কিংবা সেজোবাবু। তারও একটা "প্রাইভেট প্রাকটিস্" ছিল, এবং সেখানকার রোজগারটা মাইনের অঙ্ককে অনায়াসে ছাড়িয়ে যেত। স্বামীর এই 'উপরি'টাই ছিল মেজো মেয়ের গর্বের বস্তু। তাকে "প্রাইভেট' রাখা দূরে থাক, একটু ফলাও করে প্রচার করার দিকেই তার ঝোঁক ছিল বেশী। 'উপরি'র উপর দিয়ে বড়কে সে যে হারিয়ে দিয়েছে, একথা প্রকারান্তরে প্রকাশ করতেও দ্বিধা করত না। তাছাড়া তার নিত্য নতুন বেশভূষা এবং প্রসাধনের বাহুল্য এই 'উপরি'র মহিমাই সদম্ভে প্রচার করত। এরই জন্যে তার বিশেষ খাতির। ঝি, চাকর আর পড়শী মহলেই শুধু নয়, বাপ মায়ের কাছেও। সমবয়সী সখীরা, যাদের বিয়ে হয়ে গেছে কিন্তু স্বামীর এই বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী নয়, সামনে ওর গয়নার পালিশ ও শাড়ির জলুস নিয়ে পঞ্চমুখে প্রশংসা করত, পেছন ফিরতেই দুচোখ থেকে ফেটে পড়ত ঈর্ষার জ্বালা। দিদিও যে প্রায় সেই দলে, মেজোর অজানা ছিল না। তারজন্যে রাগ করত না, বরং একটু করুণার চোখে দেখত বেচারাকে।

নির্মলা তখন ছোট। বড়দিকে খুব ভালবাসত, কিন্তু রীতিমত সমীহ করত মেজদিকে। 'উপরি' নামক বস্তুটি সম্বন্ধে তার স্পষ্ট কোনো ধারণা তখনো জন্মায়নি। তবু একটা অদ্ভুত মোহ ছিল এর উপর। মনে মনে কামনা করত, বড় হলে তার যখন বর আসবে, তার রূপ একটু কম হলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু মেজদির বরের মত যেন 'উপরি' থাকে।

নির্মলার দোষ নেই। সে একা নয়। এদেশের ঘরে ঘরে ছোট থেকে বড় সকলের চোখেই 'উপরি'র তৃষা। রাজ্যপাট উঠেছে, পড়েছে, এক রাজার পর আর এক রাজা এসেছে, এক বংশের পর আর এক বংশ। সেই ভাঙাগড়ার ভিতর দিয়ে এ দেশের মানুষ করেছে শুধু চাকরি। এক সরকারের দরবার থেকে আনুগত্যের সেলাম চালান করেছে অন্য সরকারে। শাসক গোষ্ঠী ও তার চারদিক ঘিরে যে সীমাহীন ভোগ-বিলাস, তার প্রয়োজন মিটিয়ে 'তলব' বলে এই চাকরিজীবীদের

পকেটে যা এসেছে তা যৎসামান্য, তাতে অভাব মেটে না। টাকায় আট সের চাল, তবু লেগে থাকে দুর্ভিক্ষ। তাঁতীর ঘরে বস্ত্রের পাহাড়, এদিকে গৃহস্থের অন্তঃপুরে একবস্ত্রা নারী স্নান করে নিজের দেহেই শুকিয়ে নেয় তার স্বল্প আচ্ছাদন! তাই নিছক প্রাণধারণের প্রয়োজনে দেখা দিয়েছে অন্য পন্থা! ডান হাতের সঙ্গে যোগ দিয়েছে বাঁ হাত, প্রকাশ্য রাজপথের আড়ালে গোপন সুড়ঙ্গ পথ, 'তলব'এর উপর কিঞ্চিৎ 'উপরি'! রাজার আশেপাশে যাদের আনাগোনা সেই সব আমীর ওমরাহ্ অমাত্য পরিষদ থেকে শুরু করে শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে আছে যে চাপরাশী বা চৌকিদার, সকলেই ঐ একই পথের পথিক। উপর থেকে নিচে পর্যন্ত একটা শিকলে বাঁধা।

হাজার হাজার বছর ধরে এই ব্যবস্থাই দেখে এসেছে এদেশের সাধারণ মানুষ। দেখেছে, 'দ্বারী হস্তে মুদ্রা দুই চারি' না দিলে রাজদর্শন হয় না, রাজার অনুগ্রহ লাভ তো দূরের কথা। নজরানার ব্যবস্থা না করলে প্রার্থিত ব্যক্তির নজরে পড়া যায় না, প্রার্থনা অপূর্ণ থাকে। ভেট না দিলে কারো সঙ্গেই ভেট হয় না। তাই কারো চাকরি হয়েছে শুনলে আজও তারা অকপটে প্রশ্ন করে 'মাইনে কত?' 'এত'। 'উপরি?' উত্তরে 'নেই' বললে অবিশ্বাস করে কিংবা মনে করে লোকটা নেহাত অপদার্থ।

নির্মলা বড় হয়ে উঠল। বাড়ন্ত গড়ন; বয়স যা, তার চেয়ে দেখায় বেশী। মা আবার আসলের চেয়েও দু'বছর কমিয়ে বলেন। যাদের কাছে বলেন, পাড়ার বর্ষীয়সী মহিলারা, নিজেদের মধ্যে গা টেপাটেপি করেন। লোকের কাছে যাই বলুন নিজের চোখকে তো ফাঁকি দেওয়া যায় না। মেয়ের দিকে তাকিয়ে গলা দিয়ে ভাত নামতে চায় না। উঠতে বসতে কর্তাকে তাগাদা করেন। তাঁর মুখে সেই এক উত্তর 'চেষ্টা তো করছি। এখন, না জুটলে কি করি? প্রজাপতির নির্বন্ধ।' গৃহিণী রেগে ওঠেন, 'প্রজাপতি কি তোমার মেয়ের সম্বন্ধ বাড়ি বয়ে পৌঁছে দেবে? হাত পা কোলে করে বসে আছ কোন ভরসায়?'

—বেশ তো, বসে না থেকে না হয় বেরোলাম। ঘোরাঘুরি করে একটা যোগাড়ও করা গেল। তারপর? কার ভরসায় এগুই? জানতো সবই।

সে কথা মিথ্যা নয়। সবই তাঁর জানা। ঋণ করে তুটিকে পার করতে হয়েছে, পৈতৃক ভদ্রাসন বাঁধা পড়েছে। সুদূরভবিষ্যতে ছাড়ানো যাবে, এমন কোনো উপায়ও চোখে পড়ে না। একটি ছেলে নেই যে পিছনে এসে দাঁড়াবে। একহাতের রোজগার। তাও আগেকার সে জোর নেই, বয়স বাড়ছে, অল্পেতেই হাঁপিয়ে পড়েন। তার উপর সত্যিই আর চাপ দেওয়া যায় না।

কোনো উত্তর না দিয়ে গৃহিণী নিঃশ্বাস ফেলে অন্যত্র চলে যান। কর্তা বৈঠকখানায় গিয়ে বসেন। সেখানেও আগের মত মক্কেলের ভিড় নেই। নতুন নতুন এমন সব আইন হচ্ছে, যার ফলে দিনদিন মামলার সংখ্যা কমে যাচ্ছে। ঋণ-সালিসী বোর্ড হবার পর খতের মোকর্দমা নেই বললেই হয়। মহাজন আর গাঁটের পয়সা খরচ করে খাতকের বিরুদ্ধে লড়তে চায় না। কোনো লাভ নেই। সুদ তো দূরের কথা, আসল টাকাও সারা জীবনে আদায় হবে না। লম্বা লম্বা কিস্তি বেঁধে দিয়ে ধার আর যাতে শোধ দিতে না হয়, সেই ব্যবস্থাই করে দিচ্ছেন আদালত। সরকারও এখন খাতকের পক্ষে। তাই মহাজন আজ নিতান্তই অভাজন।

ছোট ছোট জমিদারদের অবস্থা আরো শোচনীয়। খাজনার মামলায় 'ডিগ্রী' পাওয়া তুরূহ ব্যাপার। পেলেও সেই দীর্ঘমেয়াদী কিস্তি। কে যায় ঐসব ঝামেলায়? তাই মামলা এড়াতে পারলে এর মধ্যে আর কেউ মাথা দিতে চায় না। প্রজারা দয়া করে যা দেয়, তাই নিয়েই খুশী।

বড় বড় শহরে জমি কেনা-বেচা কিংবা কিছু বাড়ি-ভাড়া সংক্রান্ত মামলা আছে। একদল উকিলের সেইটাই অবলম্বন। মফস্বলে ওসব কেস্ হাতে গোনা যায়। তু'চারটা যা আসে, বেশীর ভাগই জুনিয়রদের হাতে। তাদেরও সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে, দিন দিন বাড়ছে। সব দিক থেকেই উকিলের আজ তুর্দিন।

শূন্য বৈঠকখানায় বসে এই সব কথাই বোধহয় ভাবছিলেন জগদীশবাবু। নির্মলা ঘরে ঢুকে ডাকল, বাবা।

—কি মা?

—কাছারির বেলা হল ; উঠবে না ?

—'ও, হ্যাঁ।' বলে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। বাড়ির ভিতরে যাবার পথে একবার তাকালেন মেয়ের দিকে। মনে হল, অনেক দিন যেন তাকে দেখেননি। চোখের আড়ালে হঠাৎ কখন ঝাড়া দিয়ে বেড়ে উঠেছে, টের পাননি। শুধু মাথায় বাড়েনি সেই সঙ্গে বেড়েছে শ্রী। একটি স্নিগ্ধ লাবণ্যের স্পর্শ লেগেছে মুখখানায়। অমলা বিমলার মত ওরও এবার পরের ঘরে যাবার সময় হল। একটি নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসছিল, বুকের ভিতর থেকে, চেপে গেলেন। কাছে এসে সস্নেহে তার মাথায় হাত রেখে বললেন, ইস্কুলে যাসনি আজ ?

'না, বাবা,' তেমনি নত মুখেই বলল নির্মলা।

—কেন ?

আরো নুইয়ে পড়ল মাথাটা। আঁচলের কোণটা আঙুলে জড়াতে জড়াতে বলল, এখন থেকে বাড়িতেই পড়বো।

কারণটা আর জানতে চাইলেন না জগদীশ। বুঝলেন এটা ওর মায়ের ব্যবস্থা। বইয়ের বদলে এবার ওর হাতে উঠবে হাতা-বেড়ি। তারই আয়োজন চলছে। কিংবা রাস্তাঘাটে লোকের নজর এবং তার চেয়েও বেশী, উঠতে বসতে দরদী প্রতিবেশিনীর বাক্যবাণ যতটা সম্ভব এড়াবার জন্যে মেয়েকে ঘরের আড়ালে বন্ধ রাখবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তাছাড়া, সংসারের যা অবস্থা, ইস্কুলের মাইনে, বইখাতা, কাগজ-পেন্সিল, বাইরে বেরোবার মত পরিচ্ছন্ন জামাকাপড় ইত্যাদি নানা বাবদে মাস মাস যে টাকাটা যাচ্ছে, তাকেও সামান্য বলা চলে না। সেটুকুও যদি বাঁচানো যায় অদূর ভবিষ্যতে ওরই কাজে লাগবে। কী হবে আর পড়াশুনো করে ? যে-রকম ঘরে যাবে, তাতো বোঝাই যাচ্ছে। সেখানে এইটুকু লেখাপড়াই হয়তো অবাঞ্ছিত বিলাস বলে গণ্য হবে। ঠিকই করেছেন গৃহিণী। কিন্তু মেয়েও যে এই বয়সে সব বুঝে এই নতুন ব্যবস্থা নিঃশব্দে মেনে নিয়েছে, এতেই তাঁর বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। তার বাপ যে কত অক্ষম, ঐটুকু মেয়েরও আজ আর তা অজানা নেই। ওর কাছেও যেন তিনি ধরা পড়ে গেছেন।

এবার সত্যিই উঠে-পড়ে লাগলেন। দু'চার জায়গা থেকে পর পর কয়েকটি দল এসে কনে দেখে গেল। কিন্তু আসল জায়গায় গিয়েই সব আটকে যায়। বেশীর ভাগ পাত্রের খাঁই মেটানো ওঁর সঙ্গতির বাইরে। আর একটু নিচের স্তরে নামতে হবে। সে রকম চাকরি-বাকরি নাই বা থাকল, নাই বা হল পাশটাশ, ঘরে যদি মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান থাকে, তাহলেই চলবে। মেয়ের কপালে সুখ থাকলে নিতান্ত সাদাসিদে অবস্থার মধ্যেও সে সুখী হতে পারবে।

তেমন একটি সম্বন্ধই এবার পাওয়া গেল। ছেলেটির বয়স একটু বেশী, তাহলেও দোজবরে নয়। দেখতে-শুনতে মোটামুটি। ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেছিল, তার পরে আর পড়তে পারেনি। গ্রামের মাঠেই কয়েকবিঘা জমি-জমা রেখে গেছেন বাপ। জন লাগিয়ে সেগুলো চাষ-আবাদের ব্যবস্থা তাকেই করতে হয়। তার সঙ্গে একটা ছোটমত চাকরিও আছে—পাশের গ্রামে মাইনর ইস্কুলের থার্ড মাস্টারি। ঘরে এক মা। বোনেদের সব বিয়ে হয়ে গেছে। অবস্থা একেবারে সচ্ছল নয়। ছেলে বিয়ে করবে না বলেই মনে মনে ঠিক করেছিল। কিন্তু মায়ের শরীর ভেঙে পড়ছে। তাঁর দেখাশুনা এবং সংসারের কাজকর্ম করবার জন্যে ঘরে একজন কাউকে না হলে আর চলছে না। ভগিনীপতি এসেছিলেন মেয়ে দেখতে। নির্মলাকে পছন্দ হয়েছে। ঐরকম বড়সড় বৌ-ই তাদের দরকার। দাবি-দাওয়া কিছু নেই। সাধ্যমত যা এঁরা দেবেন, তাতেই খুশী।

বাপের মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল। তাঁর এত আদরের নির্মলা। কলকাতায় না হোক, অন্ততঃ তাঁদের এই কাটোয়ার মত কোনো শহরে একটি ভাল লেখাপড়া-জানা চাকরে ছেলের হাতে পড়বে, একান্ত মনে এইটাই আশা করেছিলেন। তার কোনোটাই হবে না। গাঁয়ের ইস্কুলের মাস্টার—ওকি একটা চাকরি? তাছাড়া, গ্রামে, মাটির বাড়িতে থাকা তো মেয়ের অভ্যাস নেই। পুজোর ছুটিতে যতবার 'দেশে' গেছে, তিনচার দিনের বেশী মন লাগিয়ে থাকতে পারেনি। সেই রকম ঘরে সারাজীবন সে কাটাবে কী করে? তারপর বলতে গেলে চাষী গৃহস্থের ঘর। ধান পাট কলাই সর্ষে নিয়ে সংসার। সে সবই বা সামলাবে,

কেমন করে? ছেলেটির স্বভাবচরিত্র অবশ্য ভালো। নম্র, নিরীহ, শান্ত মেজাজের মানুষ। শরীর স্বাস্থ্যও বেশ! বয়স একটু বেশী হলেও নির্মলার সঙ্গে বেমানান হবে না। তবু ছেলেটিকে সব দিক দিয়ে ওর মনে ধরবে কি?

এসব প্রশ্ন মায়ের মনেও দু'একবার দোলা দিয়েছিল। কিন্তু তিনি জোর করে সব ঠেলে ফেলে দিয়েছিলেন। স্বামীর চেয়ে তাঁর বাস্তববুদ্ধি বরাবরই প্রখর। তিনি বুঝেছিলেন, এক্ষেত্রে তাঁদের ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষার মূল্য কানাকড়িও নেই, আসল কথা হল সামর্থ্য। সে দিক থেকে বিচার করলে, এর চেয়ে উপরের স্তরে হাত বাড়াতে যাওয়া তাদের পক্ষে ধৃষ্টতা। বরং অপেক্ষা করলে আরো নেমে আসতে হবে। যে দিন আসছে, তার চেহারা আরো ভয়ঙ্কর। পড়ন্ত বেলার দীর্ঘায়ত ছায়ার দিকে তাকিয়ে ভাঙা নৌকার মাঝি যেমন তার দাঁড়ের বেগ প্রাণপণে বাড়িয়ে দেয়, আসন্ন রাত্রির দিকে চেয়ে মাও তেমনি তাঁর জীর্ণ সংসারটিকে যেমন করে যত দ্রুত হোক ঠেলে নিয়ে এগিয়ে যাবার জন্যেই অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। মেয়েটাকে যাহোক করে পার করা। সেদিকে যত দেরি হবে, পথ তত দুর্গম। স্বামী যখন ইতস্ততঃ করছেন, তিনি তখন মনস্থির করে ফেললেন। সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সোজা গিয়ে বললেন, পণ্ডিতমশাইকে ডেকে পাঠিয়ে আসছে মাসের প্রথম দিকেই দিন-তারিখ ঠিক করে ফেল।

জগদীশের মুখে তখনো একটা ছোট্ট 'কিন্তু' এসে পড়েছিল, কিন্তু গৃহিণীর মুখের দিকে চেয়ে তাকে আর বাইরে আসতে দেননি। বিষণ্ণ চোখ দুটি তুলে শুধু বলেছিলেন, বেশ।

নির্মলার কাছে কেউ কিছু জানতে চায়নি। মাও না, বাবাও না। দিদিরা তখন শ্বশুরবাড়ি। জানতে চাইলেই বা কী হত? মুখ ফুটে বলতে পারত কি, 'না, এ বিয়েতে আমার মত নেই, এ ঘর-বর আমার মনের মত হয়নি, এর চেয়ে অনেক বেশী আমার আশা?' ছিঃ ছিঃ একথা কি কখনো বলা যায়? তাছাড়া বাবার অবস্থা সে তো জানে। তাঁর মনের কথাটাও অজানা নয়। কত বড় অনিচ্ছায়, নিতান্ত বাধ্য হয়েই যে তিনি এরকম ঘর-বরে মেয়ে দিতে রাজী হয়েছেন, এটা তো তার

কাছে গোপন নেই। সব দিক ভেবে মাও যে কেন আর দেরি করতে চাইছেন না, তাও সে বোঝে। সুতরাং যা এল তাকেই গ্রহণ করতে হবে। দিদিদের, বিশেষ করে মেজদির ভাগ্য নিয়ে সে আসেনি। তাই নিজের ভাগ্যের কাছে নতি-স্বীকার করে ভিতরে ভিতরে নিজেকে তৈরি করে ফেলল। মনে মনে যে স্বপ্ন ছিল, সাধ ছিল, বাইরে তা ফলল না বলে হা-হুতাশ করে লাভ নেই। সংসার বড় কঠিন, জীবন বড় নির্মম, এ শিক্ষা সে ছোট থেকেই পেতে শুরু করেছিল।

কিন্তু প্রতি মানুষের মধ্যে আর একটা সর্বনেশে মানুষ বাস করে। সে যখন জেগে ওঠে, কোনো শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা তাকে এঁটে উঠতে পারে না। যুক্তির বন্ধন খসে পড়ে, বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে যায়। একদিন নির্মলার জীবনেও দেখা দিল সেই অশুভক্ষণ, তার শান্ত সংসারের নিস্তরঙ্গ ধারায় নিয়ে এল প্রলয়ের বান। তাকে এক মুহূর্ত দাঁড়াতে দিল না, একটিবার সামনে পেছনে তাকাতে দিল না, তীর-বেগে ভাসিয়ে নিয়ে গেল অতলের পথে। সে যদি একা হত, হয়তো তত দুঃখ ছিল না। নিজের সর্বনাশ নিজেই ডেকে এনেছে, এই বলে খানিকটা সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করত। কিন্তু সে যে স্বামীকে সুদ্ধ জড়িয়ে ফেলেছিল নিজের সঙ্গে। তার অমন স্বামী। প্রশান্ত, সরল, নির্বিরোধ; একদিনের তরেও স্ত্রীকে এতটুকু দুঃখ দেননি, তার অসঙ্গত খেয়ালের একটিবার প্রতিবাদ করেননি, সমস্ত জীবন ধরে তাকে শুধু সুখী করতে চেয়েছেন। শুধু একটি কথাই ছিল তার মুখে, বেশ, তুমি যা বলছ, তাই হবে।

আজ মনে হচ্ছে, এর আগেও কতদিন হয়েছে, অত ভাল, অত নরম না হয়ে একটু যদি কঠোর হতেন স্বামী, একটু শক্ত, বলিষ্ঠ, তাহলে হয়তো এইখানে এসে তাকে দাঁড়াতে হত না।

সেই দিনগুলো ভিড় করে আসছে মনের মধ্যে। কত ছোট বড় বিচ্ছিন্ন ঘটনা। তখন কে ভেবেছিল, ঐগুলো জড়ো হয়েই একদিন প্রলয় ঘটাবে?

তিন বোনের মধ্যে মেজদিই সব চেয়ে দেখতে ভাল। মা প্রায়ই বলতেন, 'বিম্‌লিটাকে নিয়ে আমার ভাবনা নেই যে দেখবে লুফে

নিয়ে যাবে।' অবশ্য লুফে ঠিক নেয়নি, বেশ কিছু দিয়েই গছাতে হয়েছিল। যাই হোক, বিমলা জানত এবং আশেপাশে সকলকে জানিয়ে দিত যে, তার রূপ আছে। বিয়ের পর রূপের সঙ্গে পেল রূপো। তখন গর্বে তার মাটিতে পা পড়ে না। নির্মলাকে সে ভালবাসত। তার মধ্যে অনেকখানি ছিল করুণা, খানিকটা ছিল তাচ্ছিল্য। ছোট বোনের বিয়েটা যে আশানুরূপ হয়নি, বড়দির মনে সে জন্য হয়তো কিছু ক্ষোভ ছিল, কিন্তু বাইরে সেটা কখনো প্রকাশ করত না। কথায়-বার্তায় আচরণে দেখাবার চেষ্টা করত, তাদের তুলনায় অনেক দিক দিয়ে নিরু বরং ভাল ঘরেই পড়েছে। ছোট্ট সংসার, একগাদা পুষ্যি নেই, বলতে গেলে ছুটি মানুষ। শাশুড়ী আর ক'দিন ? তবু যদ্দিন আছে, মাথার উপরে কত বড় একটা আশ্রয়। বুড়ী বড় ভালোমানুষ, একেবারে বৌ-অন্তপ্রাণ। এই বয়সেও সংসারের সব ঝক্কি-ঝামেলা নিজের ঘাড়ে। নতুন বৌকে নড়ে বসতে দেয় না।

নির্মলার শ্বশুরবাড়ির প্রসঙ্গ উঠলে অমলা এই দিকটার উপরেই জোর দিত। বিমলা ঠিক উলটো। নিরু মনোমত ঘরে পড়েনি—এই অপ্রিয় সত্যটা চেপে রাখবার দিকে তার কোনোরকম ইচ্ছা ছিল না।' এ বিষয়ে তার মনের যে ক্ষোভ, সেটা সে সকলের সামনেই প্রকাশ করত। নির্মলা কী ভাববে, তা নিয়ে তার মাথাব্যথা ছিল না।

বিয়ে এবং তার আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান মিটে যাবার পর নির্মলা ক'দিনের জন্যে মায়ের কাছে এসেছে। দিদিরা তখনো আছে। ভিতরের বারান্দায় গল্পের আসর বসেছে। একথা ওকথার পর কোন একটা প্রসঙ্গে অমলা বলল, চালের দাম যে রকম বাড়ছে, কিছুদিন পরে আমাদের বোধহয় উপোস করে মরতে হবে। সেদিকে নিরু একেবারে নির্ভাবনা। উঠোনে ধানের গোলা, ঘরের পাশে ঢেঁকি। ইচ্ছেমত পাড়ো, ভানো, খাও।

'কী দরকার বাপু অত সব হ্যাঙ্গাম করে?' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল বিমলা, 'তার চেয়ে মুদীর দোকানে বলে পাঠাও, সঙ্গে সঙ্গে পছন্দমত মাল হাজির।'

—তার সঙ্গে চড়া দামের বিল।

—হলই বা? টাকা থাকলে দামের ভাবনা কিসের? চড়ুক না কত চড়বে?

—তোর না হয় ভাবনা নেই, সবাই তো আর তোর মত বড়লোক নয়। আমাদের বাপু একটা টাকা বাড়লেই গায়ে লাগে।

দিদির মন্তব্যের মধ্যে কিছুটা শ্লেষ থাকলেও বিমলা মনে মনে খুশী হল। 'বড়লোক' কথাটা তার সম্বন্ধে যে যেমন করেই বলুক সে খুব উপভোগ করে।

পাড়ার দু' একটি মেয়েও ছিল দলের মধ্যে। তার ভিতর থেকে একজন, তার শ্বশুরবাড়ি কলকাতায়, বলে উঠল, দাম দিয়েও কি ভাল চাল পাবার উপায় আছে আজকাল? হয় একগাদা কাঁকর, নয়তো গন্ধ। কোনো কোনোটা আবার—

—সে সব ঐ র‍্যাশনের চাল, বাধা দিয়ে বলল বিমলা। না নিলেই হয়। দু'চারটাকা বেশী দিলে ব্ল্যাকে অনেক ভালো জিনিস পাওয়া যায়। আমরা তো তাই কিনি। কে বসে বসে কাঁকর বাছে, বাবা? তাছাড়া, আমি আবার খুব মিহি চাল না হলে একেবারেই খেতে পারি না। ও-ও তাই। ভাতটা একটু গায়ে ভারী হলেই বলবে, ভাত না খেয়ে গাবের বিচি খেলেই তো হয়।—বলে খিলখিল করে হেসে উঠল। সে হাসিতে বিশেষ কেউ যোগ দিল না।

একটি বর্ষিয়সী মহিলা বসে ছিলেন কোণের দিকে। বললেন, তা যাই বল মা, নিজের ঘরের জিনিস গাবের বীচি হলেও 'অমর্ত'। তার কাছে কি আর কিছু দাঁড়াতে পারে? কথায় বলে ধানই হল ধন। গোলাভরা ধান যার ঘরে, তার আর কী চাই? লক্ষ্মী সেখানে বাঁধা।

বিমলা মুরব্বিয়ানা সুরে প্রতিবাদ করল, সেদিন আর নেই মাসিমা। একগাদা ধান থাকলেই আজকের সমাজে মান নেই, তাকে কেউ আমল দেয় না। সবাই জানতে চায়, মানুষটা করে কী? রোজগার কত?

নিজের শ্বশুরবাড়ির কথা উঠতেই নির্মলা সেখান থেকে উঠে গিয়েছিল। তার সেই শূন্য স্থানটার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে

বিমলা ঈষৎ চাপা গলায় যোগ করল, এই আমাদের নিরুর কথাই ধরুন। যে-ঘরে গেল, দুবেলা দুমুঠো খাবার হয়তো জুটবে। কিন্তু যার হাতে পড়ল, তার পরিচয়টা কী? লোকে যখন জিজ্ঞেস করে, কী করেন তোমার ভগ্নীপতি, আমার তো লজ্জায় মাথা কাটা যায়। চাষবাস করে, একথা বলি কেমন করে?

—শুধু চাষবাস কেন, তার সঙ্গে একটা চাকরিও তো করে, উত্তর দিল অমলা।

চাকরি! মানে, ঐ পনর টাকা মাইনের মাস্টারি!—বলে অট্টহাসির ঝড় তুলল বিমলা। হঠাৎ থেমে গিয়ে করুণ সুরে অনেকটা যেন নিজের মনে বলল, সত্যি, নিরুটার জন্যে ভারী দুঃখ হয়। পেটভরে দুটো খেতে পেলেই মেয়েমানুষের সব হল? আর কোনো সাধ আহ্লাদ নেই? দুদিনের জন্যে একটু কোথাও যাওয়া, দুখানা ভালো কাপড়, দুটো গয়না—এ সব না হলে চলে? কিন্তু আসবে কোত্থেকে? সব চেয়ে বড় কথা—কার বৌ বলে নিজের পরিচয় দেবো।

পাশের ঘরে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে সব কথাই নির্মলার কানে গিয়েছিল। শুধু কানে যাওয়া নয়, মনের সঙ্গেও একসুরে মিলে গিয়েছিল। ঠিকই বলেছে মেজদি। অন্য সকলে তাকে শুধু ঠকিয়েছে, মিথ্যা প্রবোধ আর আশার স্তোক দিয়ে ভোলাতে চেয়েছে। মেজদি তাকে সত্যিই ভালোবাসে। তাই রূঢ় সত্যের নিরাবরণ রূপ ছোট বোনের সামনে তুলে ধরতে কুণ্ঠাবোধ করেনি।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত নির্মলার চোখে ঘুম আসেনি। কী করবে সে? ঐ মাটির দেওয়ালে ঘেরা খড়ো ঘরের মধ্যে ঢেঁকি, কুলো আর হাতা-বেড়ি নিয়েই কাটাবে তারা সারা জীবন! একটু সাজ একটু প্রসাধন, কোলকাতায় নিয়ে গাড়ি করে একটু বেড়ানো, রেঁস্তোরা কিংবা মিষ্টির দোকানে বসে দুদিন মুখ বদলানো, মাঝে মাঝে সিনেমায় ঢুকে দু একটা ছবি দেখা—এসব না হলে মানুষ বাঁচে কি করে? কিন্তু তার জন্যে যে টাকা চাই, তা তাদের নেই। জমি থেকে যা আসে তার থেকে খাওয়াটা কোনো রকমে চলে, মাইনে থেকে এতদিন আসত তেল নুন মসলা, প্রয়োজনমত মা ও ছেলের মোটা মিলের ধুতি! নতুন বৌ

আসবার পর কয়েকটা নতুন দফাও জুড়তে হয়েছে ঐ সঙ্গে—শাড়ি, শেমিজ, তু' একখানা সাবান, একটু মাথার তেল, তুটো চুলের ফিতে।' এই চাপটুকু এরই মধ্যে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুখ ফুটে না বললেও, স্বামীর মুখে তার স্পষ্ট চিহ্ন নির্মলার চোখ এড়ায়নি। শাশুড়ীর কথাবার্তায় তার আভাস পাওয়া গেছে। সে নিজেও বোঝে। এই টানাটানি দিন দিন বেড়ে চলবে। এদিকে সামান্য কয়েক বিঘা জমির ফসল, তার উপরে গোনাগুনতি কটা টাকা; তুটোই একেবারে বাঁধা, হঠাৎ কোনদিক থেকে বাড়তি কিছু এসে পড়বে, এমন কোনো সম্ভাবনা নেই। ওদিকে প্রয়োজনগুলো বাড়ের মুখে। এ তুয়ের সমন্বয় ঘটবে কেমন করে নির্মলা কিছুতেই ভেবে পেল না।

মেজদি চলে যাবে। জামাইবাবুর ছুটি নেই, ছোট ভাইকে পাঠিয়েছেন বৌদিকে নিয়ে যেতে। ভারী আমুদে ছেলে। বি, এ পড়ে। মেজদি বলছিল, পাস করলেই সঙ্গে সঙ্গে রেলের আফিসে ঢুকবে। দাদাই সে সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

একসময়ে এই প্রিয়দর্শন, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, শিক্ষিত ছেলেটির দিকে জগদীশবাবুর লোলুপ দৃষ্টি পড়েছিল। মেজো মেয়ের কাছে একটু গোপন আভাস দিয়েছিলেন, 'নিরুর সঙ্গে বেশ মানায়, কী বলিস?' বিমলা আমল দেয়নি। বলেছিল, মায়ের পেটের বোন হবে জা, এ যেন কেমন বিচ্ছিরি লাগছে, বাবা।

বাবা তবুও হাল ছাড়েননি, "তাতে আর কী হয়েছে? এ রকম তো কত হয়।" বলে তু-একটা দৃষ্টান্তও দিয়েছিলেন। তখন মোক্ষম জায়গায় ঘা দিয়েছিল মেয়ে, "ওদের খাঁই মেটানো আমাদের সাধ্যে কুলোবে না। ঐ ছেলেকে দিয়ে নগদে, গয়নায়, দান-সামগ্রী মিলিয়ে দশটি হাজার টাকা ঘরে তুলবে বলে বসে আছে আমার শাশুড়ী। পারবে তুমি?

কথাটা কানে গিয়েছিল নির্মলার এবং বাবার সেই আশাহত ম্লান মুখখানাও চোখে পড়েছিল। তার আগে এইখানেই বিজনকে ও তু-তিনবার দেখেছে। সেও ওর সম্বন্ধে উদাসীন ছিল না। বৌদির ছোট বোন হিসেবে সান্নিধ্যেই শুধু আসেনি, ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টাও করেছে।

নির্মলা আপত্তি করেনি, একটু প্রশ্রয়ই বরং দিয়েছিল। বাবার মনের সেই আশার রঙ হয়তো ওর কুমারী হৃদয়ের নিভৃত কোণে একটুখানি রঙীন স্বপ্ন ফুটিয়ে তুলেছিল। তাই একদিন সদ্য বর্ষণমুক্ত আষাঢ় সন্ধ্যায় নির্জন ছাতে পাশাপাশি বেড়াতে বেড়াতে বিজন যখন ওর বাঁ হাতখানা দু'হাতে তুলে নিয়ে উজ্জ্বল চোখদুটি ওর আনত মুখের উপর রেখে অস্ফুট কণ্ঠে বলেছিল, "তোমাকে আমার খুউব ভালো লাগে জানো নির্মলা!' নির্মলা হাত ছাড়িয়ে নেয়নি, দূরেও সরে যায়নি। সেই প্রগাঢ় স্পর্শ, গভীর সুরে বলা সেই 'ভালো লাগা' তার সমস্ত দেহমন যেন কোন্ মোহাবেশে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। সেই ক্ষণটিতে বিজন যদি তার সবল বাহু দুটি বাড়িয়ে তাকে বুকের উপর টেনে নিত, নির্মলা বোধ হয় বাধা দিতে পারত না, নিজেকে হয়তো নির্বিচারে সঁপে দিত সেই 'ভালো লাগা'র মধুর স্রোতে। তার অন্তর জুড়েও যে সেদিন 'ভালো লাগা'র বাঁশির সুর বেজে উঠেছিল।

তেমন কিছুই ঘটেনি। কে জানে ঘটত কিনা? কিন্তু তার আগেই ছাতের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে ওর হাত ছেড়ে দিয়ে সরে গিয়েছিল বিজন। নির্মলা তখনো যেন সম্বিত ফিরে পায়নি। কেমন আচ্ছন্নের মত দাঁড়িয়েছিল। তারপর হঠাৎ চমকে উঠেছিল মায়ের ডাক শুনে। সাড়া দেবার আগেই মা উপরে উঠে এসেছিলেন এবং বিজনকে দেখতে পেয়ে বলেছিলেন, 'এই যে বাবা, তুমি এখানে? চা দেওয়া হয়েছে, এসো।' নির্মলার দিকে ফিরে তিরস্কারের সুরে বলেছিলেন, তোকে না বললাম, বিজুকে ডেকে দে? সব ভুলে বসে আছ? সেই কখন দুটো ভাত খেয়ে উঠেছে, তারপর এক ফোঁটা চা-ও পায়নি ছেলেটা। এত বড় মেয়ে! কোনোদিকে যদি হুঁস থাকে?

বিজন বলেছিল, ওর কোন দোষ নেই, মাঐমা। তখন থেকে তাড়া দিচ্ছে। খিদে নেই বলে আমিই দেরী করেছি। ওবেলা বড্ড বেশী খাওয়া হয়ে গেছে।

—বেশী কী হল বাবা, কিছুই করতে পারিনি। এ্যাদ্দিন পরে এলে; সাধ তো যায় এটা-ওটা করে দিই! কিন্তু—যাক আর দেরি করোনা, সামান্য কিছু মুখে দেবে চল। নিরু তোর বিজনদাকে নিয়ে

আয়……বলে মা তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেলেন। নির্মলাও সঙ্গে সঙ্গে তার অনুসরণ করল।

সেই পরম মুহূর্তটি কেটে যেতেই কোথা থেকে এক রাশ লজ্জা এসে তাকে ছেয়ে ফেলেছিল, মাথা নুইয়ে দিয়েছিল মাটির দিকে। বিজনের মুখের পানে চোখ তুলে তাকাবে, এমন শক্তি ছিল না।

বর্ষার নবীন মেঘে ঘনায়মান, নিরালা ছাতের সেই বিশেষ সন্ধ্যাটিকে আশ্রয় করে একটি সুখনীড় কখন যে অন্তর-গহনে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল, নির্মলা নিজেই জানতে পারেনি। জানল সেইদিন, যেদিন মেজদির মুখের সেই কঠোর সত্যের রূঢ় আঘাতে সে নীড় ভেঙে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। তারপরেও একবার কী একটা উপলক্ষ্য করে বিজন এসেছিল, তাকে কাছে পাবার চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু নির্মলা আর ধরা দেয়নি। নিজের সীমারেখা সম্বন্ধে সে তখন যথেষ্ট সচেতন। অসম্ভব আশার ছলনায় তাকে লঙ্ঘন করলে মেয়েমানুষের কপালে ঘরে-বাইরে উপহাস ছাড়া আর কিছুই যে জোটে না, একথা জেনেই নিজেকে সে কঠিন বর্মের আচ্ছাদনে ঢেকে ফেলেছিল।

এবার অনেকদিন পরে আবার বিজনের সঙ্গে দেখা। সেদিনকার মনে আশা-নিরাশার দোলা লেগেছিল যা নিয়ে, তার সব কিছু আজ শেষ হয়ে গেছে। বর্মের কোনো কথাই এখন ওঠে না। তবু ওকে দেখেই বুকের ভিতরটা যেন মুচড়ে উঠল। নিজেকে বারংবার চোখ রাঙিয়েও স্বচ্ছন্দভাবে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারল না, সহজ সুরে দুটো মামুলি কুশল প্রশ্ন করতে গিয়ে গলাটা, মনে হল, আটকে যাচ্ছে।

বাপের বাড়িতে মেজদি চিরদিনই বিশেষ স্থান পেয়ে এসেছে। তার একখানা আলাদা ঘর আছে। যখনই আসে, একা অথবা জোড়ে, ঐখানেই তার শোবার ব্যবস্থা। যখন থাকবে না, তখন অন্য সকলের কাজে লাগলেও নামে ওটা বিমলার ঘর।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। কী একটা কাজে নির্মলা ঐ ঘরে ঢুকেই অন্ধকার দেখে ফিরে যাচ্ছিল আলো আনতে। হঠাৎ কানে গেল মৃদু গম্ভীর স্বর—'শোনো'। চমকে উঠে দেখল জানালায় দাঁড়িয়ে বিজন।

সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতরটা দুলে উঠল। তৎক্ষণাৎ নিজেকে সংযত করে বলল, দাঁড়ান আলো নিয়ে আসি।

—থাক না? আলো কী হবে? বলে কাছে সরে এল। ক্ষণকাল ওর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, এটা কী মাস, বলত?

—আষাঢ় মাস। মাথা নীচু করেই বলল নির্মলা।

—কী আশ্চর্য! সেদিনটাও ছিল আষাঢ় মাস। ঠিক এমনি সন্ধ্যেবেলা। মেঘ ছিল, বৃষ্টি ছিলনা। মনে পড়ে?

মনে পড়ে বৈকি? পড়লেও মুখ ফুটে বলা যায় না। নির্মলা নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একবার ভাবল এভাবে এখানে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়। দেখে ফেললে কেউ কিছু মনে করতে পারে। কিন্তু পা বাড়াতে গিয়ে কেন যেন থেমে গেল।

বিজন উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করল না। হয়তো জানত, এ কথার উত্তর নেই; থাকলেও এখন আর পাবার উপায় নেই। অন্য কথা পাড়ল, একটু যেন অভিমানের সুর, 'বিয়ের সময় একটা খবরও দিতে নেই?'

এবার মাথা তুলল নির্মলা। মৃদু প্রতিবাদের সুরে বলল, কেন বাবা তো আপনাদের সবাইকে নেমন্তন্ন করেছিলেন।

—তুমি তো ডাকনি?

—আমি!

—হ্যাঁ; নেমন্তন্ন নয়, শুধু একটা খবর। সময় থাকতে একবার জানানো। তাহলে আর এতবড় সর্বনাশ ঘটতে পারত না।

—এসব কী বলছেন আপনি? রূঢ় কণ্ঠে তীব্র প্রতিবাদ করল নির্মলা।

—না, কিছুই বলছি না। বলবার কিছু নেই। বড্ড নিশ্চিন্ত ছিলাম। যখন জানতে পেলাম, তখন আর সময় নেই।

নির্মলা কোনো উত্তর না দিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই বিজন ঘুরে এসে সহসা তার পথ রোধ করে দাঁড়াল, অনুতপ্ত কণ্ঠে বলল, আমাকে তুমি বিশ্বাস করো, নির্মলা, বন্ধু বলে, আপন জন বলে মেনে নাও। বলো, তোমার জন্যে আমি কী করতে পারি?

—পথ ছাড়ুন।

—না ; আগে আমার কথার উত্তর দাও।

—আমার জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না।

—না ভেবে যে পারি না। কেমন করে ভুলি, সব কিছুর জন্যে আমিই দায়ী ? শুধু একটা মারাত্মক ভুল। যার ফলে আমিও তোমাকে হারালাম, তুমিও সুখী হতে পারলে না।

—কে বললে, আমি সুখী হতে পারিনি ?

—কে আর বলবে ? আমি নিজেই তো বুঝতে পারছি।

—মিথ্যা কথা ! ভুল বুঝেছেন আপনি।

বলেই আর দাঁড়াল না। বিজন কি বলবে বা কখন পথ ছেড়ে দেবে, তার জন্যে অপেক্ষা না করে পাশ কাটিয়ে দ্রুত বেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

নির্মলা মনে করেছিল, এর পরে বিজন নিশ্চয়ই চলে যেতে চাইবে। কিন্তু আশ্চর্য, দু-তিন দিন কেটে গেল, তার নড়বার লক্ষণ দেখা গেল না। দিব্যি হাসি-গল্প-ঠাট্টা-পরিহাস করে, আর মজার মজার গল্প বলে সবাইকে মাতিয়ে রাখে ! নির্মলারই হল মহা মুশকিল। সে সব ঠাট্টা-তামাশায় যোগ দিতেও পারে না, চুপ করে থাকলে বা উঠে চলে গেলেও দৃষ্টিকটু লাগে। যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলা। তার মধ্যেও কয়েকবার ওকে নির্জনে পাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু নির্মলা কিছুতেই সেটা ঘটতে দেয়নি।

সকাল বেলা বিজন রাস্তার ধারের বারান্দায় বসে কাগজ পড়ছে, পিয়ন একটা খামের চিঠি দিয়ে গেল। সেটা হাতে করে ভিতরে এসে বিমলাকে ডেকে বলল, এই নাও বৌদি, তোমার মহাভারত।

—মহাভারত মানে ?

—ওজন থেকে যা বুঝছি, অষ্টাদশ পর্ব না হলেও অন্ততঃ চতুর্দশ পর্ব অর্থাৎ চৌদ্দ পাতা তো হবেই।

—'আচ্ছা, হয়েছে হয়েছে,' এক ঝটকায় চিঠিখানা ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বলল মেজদি, আমিও দেখে নেবো।

—কী দেখবে ?

মহাশয় কত পর্ব ছাড়েন, অষ্টাদশ না অষ্ট-আশি।

—তা না হয় দেখো ; আপাততঃ গরিবের বখশিসটা—

—কিসের বখশিস ?

—বাঃ, সক্কাল বেলা এমন একটি জিনিস বয়ে এনে দিলাম।

—সেই তো সবচেয়ে বড় পুরস্কার। ধন্য হয়ে গেলে। তার ওপরে আবার কী চাই ?

—কাজ নেই আমার ধন্য হয়ে। ফাঁকা পুরস্কারে পেট ভরে না। ধরা-ছোঁয়া যায়, এমন কিছু ফেল।

—এই নাও।

একটা ধার ছিঁড়ে চিঠিটা বের করে নিয়ে খামখানা এগিয়ে ধরল দেওরের দিকে।

—ওটা কী হল ?

—ভাগ দিচ্ছি।

—ও তো খোসা।

—শাঁস কি এত সোজা ? তার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়। হবে, হবে। সবুরে মেওয়া ফলে।

এগিয়ে এসে আশ্বাসের ভঙ্গিতে ওর পিঠ চাপড়ে দিল। বিজন হাত উলটে নিরাশ সুরে বলল, আপাততঃ মেওয়া না হোক, এক প্যাকেট সিগারেটও ফলল না।

—আচ্ছা, দাঁড়াও। বলে, বিমলা চিঠিখানা ব্লাউজের ভিতর রেখে ঘরে গিয়ে ঢুকল এবং সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে একখানা পাঁচটাকার নোট দেওরের হাতে দিয়ে বলল, হল তো ?

বিজন মহা উৎসাহে বৌদির হাতে গোটাকয়েক ঝাঁকানি দিয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল, থ্যাঙ্ক্ ইউ, থ্যাঙ্ক্ ইউ, বৌদি।

—উঃ কী দস্যি ছেলেরে বাবা !

ঐখান দিয়ে নির্মলা যাচ্ছিল কী কাজে। বিজন তার দিকে ফিরে বলল, তোমার মহাভারত কবে আসে, নিরু ?

—'মহাভারত !' ব্যাপারটা বুঝলেও ভ্রুকুঞ্চিত করে বিস্ময়ের ভান করল নির্মলা।

—হ্যাঁ; বৌদির তারিখ বাঁধা আছে—মঙ্গল আর শনি। তোমার ?

নির্মলা কিছু বলবার আগেই মেজদি বলে উঠল, তাতে তোমার স্বার্থটা কি শুনি ?

—চিনির বলদের যে স্বার্থ। বয়েই সুখ। তাছাড়া এমনি আর একটা বখশিস যদি জোটানো যায়।

—বড্ড লোভ দেখছি। কিন্তু সবাইকে তো তোমার দাদার মত কাব্যি রোগে ধরেনি যে রাত জেগে জেগে মহাভারত রচনা করবে ?

—মহাভারত না হোক, অন্ততঃ রামায়ণ ?

—না গো না। বলে, যেন ভগ্নীপতির হয়ে কৈফিয়ৎ দিচ্ছে, এমনিভাবে যোগ করল, আহা, বেচারা কাজের মানুষ, তায় ইস্কুল-মাস্টার। তোমাদের মত অত রস টস নেই।

স্বামীর কথাটা এবার স্পষ্টভাবে এসে পড়তেই নির্মলা আর দাঁড়াল না, পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল। সেখান থেকেই শুনল, দেওরের কাছে সরে এসে চাপা গলায় বলছে মেজদি, ওর সামনে এসব কথা পাড়তে গেলে কেন ? এতে শুধু ওর দুঃখ বাড়ে, তা বোঝ না ?

বিজনও তেমনি স্বর নামিয়ে বলল, চিঠিপত্তর একেবারেই লেখে না ভদ্রলোক ?

—কই, দেখি না তো।

বিজন আর কিছু বলল না। মাথা নিচু করে ধীরে ধীরে বাইরে চলে গেল।

কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। বাপের বাড়ি এসেছে দিন পনর হল, তার মধ্যে স্বামীর হাতের একখানা মাত্র চিঠিই সে পেয়েছে। তাও নেহাৎ কাজের চিঠি—মায়ের অসুখ তেমনি চলছে, চাকরটা এখনো বাড়ি থেকে ফেরেনি, তেঁতুলতলার জমিটায় চাষ দেওয়া হচ্ছেনা, এমনি দু'চারটা দরকারী খবর, তারপরেই 'ইতি'। মাত্র কদিন আগে তার বিয়ে হয়েছে, এখনো গায়ে নতুন বৌ-এর গন্ধ, তবু সংসারের প্রতিটি ব্যাপারে তার উপরে স্বামীর এই আস্থা ও নির্ভরতা, এর মধ্যে একটা গৌরব আছে। নির্মলার মনকে তা স্পর্শ করেনি এমন নয়। কিন্তু একটি সদ্যপরিণীতা

তরুণীর মন শুধু এইটুকু নিয়েই কি তৃপ্ত হতে পারে? স্বামীর কাছ থেকে তার আর কোনো প্রত্যাশা নেই?

নতুন বিয়ের পর বাপের বাড়ি এসে যে বস্তুটির জন্যে মেয়েরা ডাকপিয়নের পথ চেয়ে বসে থাকে, তার বর্ণ-পরিচয় নির্মলার বিয়ের আগেই হয়ে গেছে। সখীরা যখন আসত, বুকের ভিতর লুকিয়ে আনত মোটা মোটা রঙিন খাম। দুপুরবেলা আশেপাশে গুরুজনের সাড়া-শব্দ যখন বন্ধ হয়ে গেছে, কোণের ঘরের মেঝের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে উচ্ছ্বাসভরা গুঞ্জনে পড়ে যেত পাতার পর পাতা। তার মধ্যে কাজের কথা থাকত যদি একআনা, বাকী পনরআনা ভরতি শুধু বাজে কথা। তবু শুনতে শুনতে যেন নেশা ধরে যেত। মাঝে মাঝে কান দুটো লাল হয়ে উঠত। ছিঃ ছিঃ, এ সব কথা লিখলে কেমন করে! ভারী অসভ্য তো ভদ্রলোক! সখীকে ধমকে উঠত, 'থাম্, আর পড়তে হবে না।' সে শুধু মুখের ধমক। মন পড়ে থাকত তার হাতের ঐ কাগজগুলোর দিকে, ঐ অর্থহীন নির্লজ্জ প্রলাপ এবং তার মধ্যে জড়িয়ে আছে যে মাদক রস। মনে মনে ভাবত, এই চিঠি একদিন তার কাছেও আসবে। তার জীবনের সেই নতুন মানুষটি হয়তো এর চেয়েও সুন্দর ভাষায় নতুন ভঙ্গিতে শোনাবে তার মনের কথা। ভাবতে ভাবতে এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ হত নির্মলার দেহ মনে।

আজ তার জীবনেও এসেছে সেই পথ চেয়ে বসে থাকবার দিন। সখীদের মত দুটি বেলা ডাকপিয়নের প্রতীক্ষা। কি জানি কী লিখবে নরেন? সেই সব কথা, তারা যা তন্ময় হয়ে শোনাত তার কানে? কিন্তু এ মানুষটা যে বড্ড লাজুক আর মুখচোরা। মুখ ফুটে দুটো কথা বলতে গেলে তিনবার ঢোক গেলে। তা হোক। চিঠির কথা তো মুখ ফুটে বলতে হয় না। সে মুখের কথা নয়; মনের কথা, হাত দিয়ে বলা। চিঠি হল মানুষের মানস-লিপি। বাইরেটা যাই হোক, মনটা যে ওর সত্যিই সুন্দর। চিঠির মধ্যে থাকবে তার প্রতিচ্ছায়া।

চিঠি যখন এল নির্মলার সমস্ত প্রত্যাশা যেন তাকে ব্যঙ্গ করে উঠল। এই তার প্রথম প্রেমপত্র! ইচ্ছা হল তখনই ছিঁড়ে ফেলে। তারপর কেমন মায়া হল মানুষটার উপর। লেখার মধ্যে আগাগোড়া

কেমন একটি অসহায় সুর। 'সব কথা তোমাকে জানালাম, বল এবার কি করবো'—এমনি একটা নির্ভরতা! মনের একটা দিক ক্ষোভে অভিমানে ভরে উঠলেও আর একদিকে রইল এই করুণা। তার সঙ্গে একটুখানি গর্ব—স্বামী তাকে আর কিছু না দিক, দিয়েছে মান, দিয়েছে গৃহিণীর মর্যাদা।

যদিও গৃহিণী হবার মত বয়স তার নয় তবু এই সান্ত্বনা দিয়েই মনকে সে বোঝাতে চেয়েছিল। কিন্তু মেজদি ও বিজনের চাপাগলার দুটি কথা সব ওলট-পালট করে দিয়ে গেল। 'বেচারা কাজের মানুষ তায় ইস্কুল-মাস্টার!' এর ভিতরে যে সুস্পষ্ট অবজ্ঞা ছিল তারই আঘাতে সে স্বামীর উপর রুষ্ট হয়ে উঠল। তারপর ধিক্কার দিল নিজের অদৃষ্টকে। কেন এমন হয়? কাজের মানুষ কি সংসারে ঐ একটিই? ইস্কুল-মাস্টার কি আর নেই? সদ্য পরিণীতা স্ত্রীর কাছে এমনি চিঠিই কি তারা লিখে থাকে?

অনেক দিন পরে, মনের রঙ যখন ফিকে হয়ে গেছে, ক্ষোভ প্রকাশের জন্যে নয়, এমনি কী একটা কথাচ্ছলে স্বামীর কাছে এই চিঠির প্রসঙ্গ তুলেছিল নির্মলা। পরিহাস-তরল সুরে বলেছিল, নতুন বৌএর কাছে ঐ রকম চিঠি লেখে নাকি কেউ! কী ফ্যাসাদেই না পড়েছিলাম সেদিন! বন্ধুরা বলছে, ঝগড়া হয়েছে নাকি তোদের?

'কেন?' বিস্ময় প্রকাশ করেছিল নরেন, 'ঝগড়ার কথা তো ছিল না ওতে। যদ্দুর মনে পড়ে কাজের কথাই লিখেছিলাম।'

এমন লোককে কেমন করে বোঝানো যায়, স্বামী-স্ত্রীর যে জগৎ তার সবখানিই কাজের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা নয়, তার বাইরে আছে 'অ-কাজ' বা 'অ-দরকার' এর অন্তহীন সীমানা। সেটা নিছক 'বাজে কথা'র রাজ্য, তারই থলে বয়ে আনে চিঠি। সে তো প্রয়োজনের পেয়াদা নয়, অ-প্রয়োজনের দূত।

বিজন কদিন থেকেই 'যাবো' 'যাবো' করছিল। সংকল্পটা যতখানি মৌখিক ততটা বোধহয় আন্তরিক নয়। ভিতরে তেমন জোর ছিল না। তাই এ তরফ থেকে মৃদু আপত্তির হাওয়া উঠতে না উঠতেই

ভেঙ্গে যাচ্ছিল। এবারে ওর বাড়ির দিক থেকেও রীতিমত তাগিদ এসে গেল। আর দেরি করা চলে না। কাল সকালের গাড়িতেই যাওয়া স্থির। আজ তাই একটু বিশেষ রকম রান্না-বান্নার আয়োজন হয়েছিল। নির্মলা এবং তার মা সকাল থেকেই সে সব নিয়ে ব্যস্ত। বিমলাকে এ জাতীয় ব্যাপারে কেউ ডাকে না। এদিকে তার আগ্রহও নেই। বিয়ের আগে মায়ের কাছে একটু-আধটু যা শিখেছিল, শ্বশুরবাড়ি গিয়ে সে সব ঝালাবার দরকার হয়নি। ঠাকুর যা করে। দেখাশুনো যেটুকু দরকার তার জন্যে তো শাশুড়ীই রয়েছেন।

রান্নার খানিকটা দেরি দেখে সে তার নিজের ঘরে শুয়ে ভিজে চুলের গোছা খাটের পাশ দিয়ে নামিয়ে দিয়ে একখানা হালকা ধরনের নভেল নিয়ে পাতা ওলটাচ্ছিল। বিজন ছ'চারবার নির্মলাকে একটু আড়ালে পাবার বৃথা চেষ্টা করে অগত্যা বৈঠকখানায় গিয়ে খবরের কাগজে মন দিয়েছিল। সেখানে কেউ নেই। জগদীশবাবু খানিকক্ষণ আগে কাছারি চলে গেছেন।

একটি লোক এসে সামনের খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল। পরনে মোটা ধুতি ; কোঁচাটা ঝোলানো নয়, উল্টে নিয়ে নিচের দিকটা কোমরের সামনে গোঁজা, পল্লীঅঞ্চলে বয়স্ক লোকেরা যে রকম পরে থাকে। গায়ে হাতেকাচা টুইলের শার্ট, ইস্ত্রি করা নয় বলে এখানে-ওখানে কুঁচকে রয়েছে। গলার বোতাম লাগানো। কলার বেশ এঁটে বসেছে। বুকের উপর ছুটি বোতাম নেই। জামার হাতছুটোও ছোট হয়ে গেছে। বোতামের বদলে সুতো দিয়ে বাঁধা। পায়ে সাদা ক্যামবিসের জুতো। হাতে বাঁশের ডাঁটওয়ালা ছাতা, পুরনো কালো কাপড়ের উপর নতুন সাদা ছাউনি।

লোকটি চৌকাট পেরোতেই বিজন একপলক তাকিয়ে নিয়ে বলল, বাবু নেই ; কোর্টে গেছেন।

এর পরেও চলে না গিয়ে ইতস্তত: করছে দেখে যোগ করল, চারটের পর এলে দেখা হবে।

সেই মুহূর্তে 'তোমার খাবার দেওয়া হয়েছে, ঠাকুরপো' বলতে বলতে পেছন দিকের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল বিমলা। আগন্তুকের

দিকে নজর পড়তেই বলে উঠল, এ কি! নরেন যে? কখন এলে তুমি?

সকুণ্ঠ উত্তর এল, এই আসছি।

বিজন তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ের স্বরে বলল, নরেন! মানে, আমাদের নরেনদা, অর্থাৎ নির্মলার—

—হ্যাঁ গো। তুমি বুঝি চিনতে পারনি? চিনবে কি করে? ছাখইনি তো কোনোদিন।

—সর্বনাশ! আর আমি ওঁকে মক্কেল মনে করে সোজা বিদেয় করে দিয়েছিলাম।

—তাই নাকি?—বলে, হেসে গড়িয়ে গেল বিমলা।

—ঈস্, ভাগ্যিস তুমি এসে পড়েছিল বৌদি। তা নৈলে আরো কী করে বসতাম কে জানে?

"তা, তোমার কোনো দোষ নেই," বলে নরেনের দিকে ফিরে কৌতুকের স্বরে যোগ করল বিমলা, কিছু মনে করো না ভাই, তোমাকে দেখে শ্বশুরবাড়ি এসেছ মোটেই মনে হয় না, ঠিক মনে হচ্ছে, গাঁ থেকে কেউ মামলা করতে এল। চল ভেতরে চল। বাড়ির খবর সব ভালো?

—আজ্ঞে, হাঁ।

ছাতাটা দুহাতে ধরে সঙ্কুচিত ভঙ্গিতে নরেন বিমলার পিছন পিছন বাড়ির মধ্যে ঢুকল। বিজনও গেল তার সঙ্গে।

ভিতরে গিয়েও নরেনকে আর এক দফা হাসি-ঠাট্টার পাল্লায় পড়তে হল। বিমলা ব্যাপারটাকে বেশ খানিকটা রঙ চড়িয়ে হাজির করল সকলের সামনে। কলকণ্ঠে চারদিক মুখর করে বলল, আমার গুণধর দেওরের কাণ্ড শোনো তোমরা। বেচারা নতুন জামাই; এসেছে শ্বশুরবাড়ি, আর উনি তাকে খালি গলাধাক্কাটা দিতে বাকি রেখেছেন। কী অপরাধ? না, সাজ-পোশাক আর চেহারাটা নাকি বাবার গেঁয়ো মক্কেলগুলোর মত।

বলতে বলতে অট্টহাসির লহর তুলে বারান্দার উপরেই ধপাস করে বসে পড়ল। আশে-পাশে সকলের মুখে ফুটে উঠল সে হাসির ঝলক। ঝি-চাকর এমনকি গৃহিণীও একটু মুখ টিপে হাসলেন।

রান্নাঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে সকলের অলক্ষ্যে শুধু একজনের মুখে নেমে এল থমথমে অন্ধকার। স্বামীর মুখের দিকে একবার তাকিয়েই নির্মলার চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল। কী রকম মানুষ! পরিহাসের নামে এত লাঞ্ছনাতেও কোনো বিকার নেই। সকলের সঙ্গে সেও যেন এটা উপভোগ করছে! এর চেয়ে মর্মান্তিক আর কী হতে পারে! তার সব আক্রোশ গিয়ে পড়ল ঐ নিরীহ লোকটার উপর।

মা বুঝতে পারলেন না। নির্মলার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, একেবারে ধোঁয়ার মুখটাতে দাঁড়িয়ে আছিস? বাইরে গিয়ে দাঁড়া। এবার আমি একাই সামলাতে পারবো। তুই বরং ওদিকটা ছাখ। নোংরা কাপড়টা ছেড়ে একখানা ভালো শাড়ি বের করে পর। মুখ-টুখগুলো পরিষ্কার করে নে।

খাওয়া-দাওয়া মিটে গেলে স্বামীর সঙ্গে যখন একান্তে দেখা হল, এতক্ষণের সেই জ্বালাই বেরিয়ে এল নির্মলার মুখ থেকে, 'দেশে কি ধোবার আকাল পড়েছে? জামা-কাপড়টাও কাচিয়ে নেওয়া যায় না?'

নরেন নিজের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে সলজ্জ মৃদু হাসির সঙ্গে বলল, ময়লা দেখাচ্ছে নাকি? কালই-তো সাবান দিয়ে কেচে নিলাম।

—সাবান-কাচা জামা পরে কেউ বাইরে বেরোয়?

—ইস্কুলে তো এই পরেই যাই রোজ।

—ওগুলো পরে ঐ গাঁয়ের ইস্কুলেই যাওয়া যায়, এখানে আসা চলে না।

নরেন জবাব দিল না। নির্মলা আবার বলল, আর ঐ বিশ্রী ছাতাটা না আনলে হত না?

—রোদের মধ্যে অনেকটা পথ—

—তাই বলে, ঐ সাদা কাপড়ের তালি-দেওয়া বুড়োটে ছাতা? ও জিনিস কোনো ভদ্দরলোক ব্যবহার করে?

—অনেক দিনের পুরনো ছাতা। কয়েকটা জায়গায় ফুটো হয়ে গিয়েছিল। তাই ভাবলাম—

'ফুটো হয়ে গেলে তাকে ফেলে দিতে হয়', কথার মাঝখানেই ঝাঁঝিয়ে উঠল নির্মলা।

নরেন আর কথা বাড়াল না, বিমর্ষ মুখে বসে রইল। নির্মলার ক্ষোভ তখনো পড়েনি ; রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে জলের আভাস ফুটে উঠল—কী দরকার ছিল সাত তাড়াতাড়ি ছুটে আসবার ? একটা দিন পরে এলেও ঐ ছেলেটার সামনে এমন করে আমার মাথা কাটা যেত না। ছিঃ ছিঃ, কী ভাবল ও !

'ভাবা'টা যদি শুধু নীরবে হত তাহলেও তেমন ভাবনা ছিল না। কিন্তু যা ভাবে, তাকে সরবে শোরগোল তুলে প্রকাশ করাই বিজনের স্বভাব। তারই আর একপ্রস্থ পরিচয় পাওয়া গেল বিকালে জলখাবার-এর বৈঠকে।

বারান্দায় পাশাপাশি আসন পেতে দুই কুটুম্বকে খাবার দিয়েছেন গৃহিণী। কাঁসার ডিশে লুচি, পটল-ভাজা, তার সঙ্গে কয়েক রকমের মিষ্টি। নরেন এসে বসেছে, বিজনের তখনো দেখা নেই। কয়েকবার ডাকাডাকির পর পাশের ঘর থেকে যখন বেরোল, সেদিকে তাকিয়েই বিমলা এবং পাড়ার একদল মেয়ে (নতুন জামাই এসেছে খবর পেয়ে যারা আগে থেকেই এসে জড়ো হয়েছিল), খিলখিল করে হেসে উঠল। বিজনের মাথায় সেই সাদা তালি দেওয়া ছাতাটা। বিমলা বলল, ওকি ! বিষ্টি হচ্ছে নাকি ঠাকুরপো ?

—না, দেখছিলাম, দাদার ছাতাটা কোন্ যুগের। প্রথমে মনে হয়েছিল মোঘল আমলের। এখন দেখছি তারও অনেক আগে। সম্রাট অশোক কিংবা বিম্বিসার বোধহয় দান করে গিয়েছিলেন দাদাকে।

সঙ্গে সঙ্গে আর এক দফা হাসি।

বিজন হাসল না। তেমনি গবেষকসুলভ বিজ্ঞের মত বলল, তা, এক কাজ করুন দাদা। আপনি এবার এটা ক্যালকাটা মিউজিয়ামে দান করে দিন। বলেন তো আমি পৌঁছে দিতে পারি। এরকম একটা ঐতিহাসিক সম্পদ ওরা দেখা মাত্র লুফে নেবে।

বলবার ভঙ্গিটা এমন গম্ভীর অথচ রসাল যে, সকলের সঙ্গে নরেনও সেই হাসির পালায় যোগ দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার দু-একটি রেখা মুখের উপর ফুটে উঠতেই সহসা মিলিয়ে গেল। বোধহয় কিছুক্ষণ আগেকার দাম্পত্য দৃশ্যটা মনে পড়ে গিয়েছিল। আড় চোখে একবার

দরজার দিকটায় তাকিয়েই সঙ্গে সঙ্গে নজর দিল খাবারের ডিশে। কপাটের আড়ালে একখানি চেনা আঁচলের আভাস।

মেয়েদের ভিতর থেকে কে একজন বলে উঠল, আচ্ছা ছেলে, বাবা। আরেকজন তরুণীকে বলতে শোনা গেল, সুন্দর হাসাতে পারেন ভদ্দরলোক। মার মুখেও সুখ্যাতি—বিজন আমার ভারী আমুদে ছেলে। এই কটা দিন সমস্ত বাড়িখানাকে যেন মাতিয়ে রেখেছিল। এবার তুমি বসো বাবা। চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

নিজের আসনে বসে পড়ে পাশের দিকে চেয়ে বলে উঠল, কই, দাদাকে চা দিলেন না?

গৃহিণী বললেন, ও চা খায় না।

—সে কি! কোন্ দেশী লোক আপনি! চা খান না কেন?

নরেন বলল, অভ্যাস নেই।

—কি মুশকিল, না খেলে অভ্যাস হবে কি করে? না, না সে হবে না। দিন মাঐমা, ওঁকে চা এনে দিন।

—কখনো খাইনি, ওটা ঠিক সহ্য হবে না।

—এই দেখুন, আপনি নিজের কথায় নিজেই হেরে যাচ্ছেন। কখনো যা খাননি, সহ্য হবে কি হবে না, বুঝলেন কি করে? খেয়ে দেখুন না? আলবত সহ্য হবে। না হয় একটা হজমিগুলি খেয়ে নেবেন।

নরেনের চোখদুটো অজ্ঞাতসারেই বোধহয় চলে গেল পাশের ঘরের দরজার দিকে। বিজন লক্ষ্য করেই বলে উঠল, কী দেখছেন? ও, অনারেবল হাইকোর্টের হুকুম চাই? যাও তো বৌদি, হুকুমটা নিয়ে এসো। জজসাহেবকে যদি সশরীরে হাজির করতে পার, আরো ভালো হয়। রায়টা সবাই শুনতে পারে।

বিমলা সেখানে বসেই হাঁক দিল, কইগো, জজসাহেব, একবার কাছারিতে এসো।

কারো কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। একজন বর্ষিয়সী বলে উঠলেন, আহা! সে কখনো আসতে পারে এই আড্ডায়? এমনিতেই নিরু কিরকম লাজুক।

‘আচ্ছা, তার হয়ে হুকুমটা না হয় আমিই দিলাম,’ হুকুমের ভঙ্গিতেই বলল, বিমলা।

—ব্যস্। মিটে গেল তাহলে। এবার ব্যবস্থা করুন মাঐমা।

—ও যখন বলছে, ওর অভ্যেস নেই······

‘থাক, তোমাকে আর জামাই-এর হয়ে সাফাই গাইতে হবে না। আমি দেখছি’···বলতে বলতে বিমলা লুটিয়েপড়া আঁচল কুড়িয়ে নিয়ে একরকম ছুটে গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল।

নিতান্ত অনিচ্ছায় কিন্তু সকলের চাপে পড়ে ধূমায়িত চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিল নরেন। গরমের পরিমাণটা আন্দাজ করতে পারেনি। একটা চুমুক দিয়েই চমকে উঠল এবং বিকৃত মুখে তাড়াতাড়ি নামিয়ে রাখল। সমবেত হাসির রোল তুলে দৃশ্যটা সকলেই উপভোগ করল। বিমলা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল। ‘চুক’ ‘চুক’ করে মুখে একটা ছদ্ম সহানুভূতির আওয়াজ তুলে বলল, আহা! জিবটা পুড়ে গেল! দাঁড়াও আমি ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি।

প্লেটে ঢেলে খানিকটা ঠাণ্ডা হবার পর ‘এইবার নাও’ বলে সেটা যখন তুলে ধরল, নরেন হাত বাড়াতে ইতস্ততঃ করছিল। বিমলা তার জন্যে অপেক্ষা করল না। প্লেটখানা সোজা নিয়ে ঢেলে দিল মুখের মধ্যে। এ রকম একটা কাণ্ডের জন্যে নরেন মোটেই প্রস্তুত ছিল না। ফলে, খানিকটা মুখে গেলেও, বাকী তরল পদার্থটুকু কশ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল জাম-কাপড়ে। চারদিকে আবার হাসির রোল।

এই ঘটনার অনেকদিন পরে নিজের জীবনের দৃশ্যপটগুলো পাতা উলটে দেখতে গিয়ে নির্মলার মনে হয়েছে, এই সব ব্যাপারগুলোকে অন্য সকলের মত সেও তো সেদিন উপভোগ করতে পারত। ততটা যদি নাও পেরে থাকে, ঠাট্টার সম্পর্কীয় আত্মীয়জনের সাধারণ পরিহাস বলে গ্রহণ করতে কোন বাধা ছিল না। কিন্তু এ দিকটায় দৃষ্টি দেবার মত মনের অবস্থা সেদিন তার ছিল না। একটা কথাই কেবল মনে হয়েছিল, এ পরিহাস নয়, উপহাস এবং তার চেয়েও বেশী, অবজ্ঞা, লাঞ্ছনা ; একজন সামান্য লেখাপড়া-জানা গেঁয়ো গরীব চাষীর যা প্রাপ্য : তার জন্যে মেজদি বা বিজনকে সে কোনো দোষ দেয়নি। সমস্ত অন্তর বিরূপ

হয়ে উঠেছিল এই অবজ্ঞার যে লক্ষ্যস্থল, সেই মানুষটার উপর। এরা যে তাকে কী চোখে দেখছে, সেটুকু বুঝবার মত বুদ্ধিও যার নেই, কিংবা সে বোধ থাকলেও অপমানে জ্বলে উঠবার মত আত্মসম্মান-বোধ নেই, তেমন স্বামীকে সে ক্ষমা করে কেমন করে? সেই নিরীহ নির্জীব, অতিশীতল লোকটার উপর করুণা নয়, তীব্র আঘাত দিয়ে তাকে সচেতন করে তুলবার জন্যেই সেদিন সে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল।

শ্বশুরবাড়ি এসে নতুন জামাতা একটা বেলা কাটিয়েই ফিরে যেতে চাইবে, রাত্রিবাস পর্যন্ত করবে না, কোন শ্বশুর-শাশুড়ীই তা ধারণা করতে পারেন না। জগদীশবাবু কাছারি থেকে ফিরে নরেনের মুখে তার তখনই চলে যাবার প্রস্তাব শুনে রীতিমত বিস্মিত হলেন। গৃহিণীও আমল দিতে চাইলেন না। বললেন, তাই কখনো হয়? দুপুর রোদ্দুরে তেতে পুড়ে এলে, কী খেলে না খেলে দেখতেও পেলাম না। আজ তো কিছুতেই যাওয়া হতে পারে না। কালকের দিনটা থেকে পরশু যেও।

নরেনের যে খুব বেশী আপত্তি ছিল, হাব-ভাবে তা মনে হল না। দুটো একটা দিন থাকবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছে, এইটাই স্বাভাবিক। তবু মৃদু স্বরে জানাল আজ্ঞে, মা একা আছেন। তাঁর শরীরটাও তেমন ভালো নেই।

—বেয়ান কি তোমাকে আজই ফিরতে বলে দিয়েছেন?

—না, তা বলেননি।

—তবে আর কি? তেমন কিছু অসুখ তো নয়। একটা দিন উনি একাই থাকতে পারবেন।

ভিতরে আসতেই নির্মলা সোজা বলে বসল, না, মা। তুমি বাধা দিও না। শাশুড়ীর অসুখ, যেতে চাইছে, যাক।

মা বেশ খানিকটা আশ্চর্য হলেন। সেদিন বিয়ে হয়েছে মেয়ের। তার মুখে পুরনো পাকা গিন্নীর মত এ ধরনের মতামত একেবারেই আশা করেননি। তারপরেই মনে করলেন, এটা অভিমানের কথা। হয়তো কোনো কিছু নিয়ে ঝগড়া হয়েছে দুজনের। সস্নেহে মেয়ের মুখে কপালে হাত বুলিয়ে বললেন, আচ্ছা কুঁদুলী তো? আসতে না আসতেই বুঝি শুরু করেছিস?

মেয়ের মুখে লজ্জার রঙীন আভা ফুটে উঠবে, তার সঙ্গে এক ঝলক মৃদু হাসি, এইটাই আশা করেছিলেন। কিন্তু নির্মলা গম্ভীর মুখে তেমনি গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দেখে মায়ের মনে বিস্ময়ের সঙ্গে কিঞ্চিৎ আশঙ্কাও যুক্ত হল। তারই আভাস পাওয়া গেল যখন জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে রে?

—হবে আবার কী?

—ওর যাওয়া নিয়ে তুই এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিস কেন?

—যাওয়াই উচিত। তা না হলে শাশুড়ী হয়তো রাগ করবেন।

মায়ের মুখ অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। বলতে পারতেন, 'সে ভাবনা তোমার চেয়ে তাঁর ছেলেরই বেশী হবার কথা। সে তো তা নিয়ে ভাবছে না।' কিন্তু এ নিয়ে বোধহয় আর কথা বাড়াতে চাইলেন না। ক্ষুণ্ণমনে নিজের কাজে চলে গেলেন। যেতে যেতে বললেন, তাই যদি বোঝ, আমার আর কী বলবার আছে। কর তোমাদের যা ইচ্ছে!

মা ও মেয়ের কথাবার্তা নরেনের কানে গিয়ে থাকবে। সে আর দেরি না করে তখনই রওনা হয়ে পড়েছিল।

সেদিন সন্ধ্যার মুখে অনেকদিন পরে নির্মলা ছাদে গিয়ে উঠল। বিজন ঘুরতে বেরিয়েছে। বিমলাও গেছে পাড়া বেড়াতে। মা রান্নাঘরে। বাবা মক্কেল নিয়ে ব্যস্ত। হাতে কাজ নেই, মনটাও ঠিক সুস্থ নয়। আলসের উপর ঝুঁকে পড়ে দূরে গাছপালার দিকে তাকিয়ে ছিল। পিছনে পায়ের শব্দ শুনে ফিরে দেখল বিজন। হঠাৎ খেয়াল হল, বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেছে, চারদিকে গাঢ় হয়ে উঠেছে সন্ধ্যার অন্ধকার। তখনই নেমে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে আবার থেমে গেল। বড় দৃষ্টি-কটু দেখায়। বিশেষ করে, কাল সকালেই যখন ও চলে যাচ্ছে।

বিজন কাছে এগিয়ে এসে একটু ভারী গলায় বলল, আমার ওপর তুমি রাগ করেছ, নির্মল?

নির্মলাকে সে সকলের সামনে বলে নিরু বা নির্মলা, এমনি নির্জন সান্নিধ্যে যখন দেখা হয়, তখন আলাদা সুরে বেরিয়ে আসে এই আবেগভরা আকারহীন ডাক—'নির্মল'। নির্মলার বুকের ভিতরটা একটু

যেন নড়ে উঠল। বাইরে তার কোন আভাস পাওয়া গেল না। শুষ্ক নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল, কেন, রাগ করতে যাবো কিসের জন্যে?

—নরেনদাকে নিয়ে ওবেলা একটু ঠাট্টা-তামাশা করছিলাম।

—তাতে আর কী হয়েছে? গরীবদের নিয়ে বড়লোকেরা চিরদিনই ঠাট্টা করে থাকে।

—কী বললে! হঠাৎ যেন চমকে উঠল বিজন।

নির্মলা কোনো উত্তর না দিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়াল। বিজন বলল, দাঁড়াও।

—বলুন, নিচে আমার কাজ আছে।

—এই সামান্য সাদা ব্যাপারটাকে এমন কুৎসিত করে দেখলে তুমি! নরেনদাও কি—

—না, তার সে বিদ্যে কোথায়? আপনার ঐ উঁচুদরের তামাশাগুলো বোধহয় বুঝতেই পারেনি। একে গেঁয়ো মানুষ, তায় লেখাপড়া জানে না।

'ঠিক তাই', তিক্ত কণ্ঠে বলল বিজন, 'আমারই ভুল হয়েছে। যে যা তাকে সেইভাবেই দেখা উচিত ছিল।'

নির্মলা চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। জ্বলন্ত চোখদুটি তুলে বক্তার মুখের দিকে তাকাল। কোনো উত্তর না দিয়ে পরমুহূর্তেই দ্রুত পায়ে নেমে গেল।

শ্বশুরবাড়ি যাবার পর স্বামীর সঙ্গে অন্য কোনো কথাবার্তা হবার আগেই নির্মলা বলে উঠল, তোমাকে পড়তে হবে।

নরেন বুঝতে পারল না। একটু বিস্ময়ের সুরে বলল, কী পড়বো!

—ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর লোকে যা পড়ে, আই-এ বা আই-এস-সি?

—বলকি! এখন, এই বয়সে—

—লেখাপড়ার আবার বয়স আছে নাকি?

—সব যে ভুলে মেরে বসে আছি। তাছাড়া, কোথায় পড়বো? এখানে তো কলেজ নেই।

—কলেজ কি হবে? বাড়িতে পড়বে, প্রাইভেট পরীক্ষা দেবে। যারা মাস্টারি করে তাদের বেলায় এ সুবিধে আছে। আমি খবর নিয়েছি।

নরেন বুঝল, নির্মলা কথাটা নিছক খেয়ালের ঝোঁকে বলেনি। ভেবে চিন্তে, খোঁজ খবর নিয়ে, মনে মনে কোনো একটা উদ্দেশ্য স্থির করে তারপর এসেছে তার কাছে। স্ত্রীকে সে মনে মনে ভয় করত। প্রস্তাবটা যতই কঠিন বা অবাস্তব হোক, সরাসরি উড়িয়ে দিতে পারল না। দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলল, কিন্তু, কেন বল দেখি? এতদিন পরে হঠাৎ লেখাপড়া করবার দরকার পড়ল কিসে?

—লেখাপড়া না করলে, তোমার যা বিদ্যে তাতে চাকরি হয় না। তার চেয়ে বড় কথা, অন্ততঃ গোটা তিনেক পাশ না দিলে লোকে মুখ্যু বলে, আমল দেয় না, ঠাট্টার নামে তাচ্ছিল্য করে……

বলতে বলতে তার চোখ দুটো নিশ্চয়ই জ্বলে উঠেছিল। নরেন অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। বুঝতে পারেনি, কিসের সে জ্বালা। সে কেমন করে জানবে? কিন্তু আর কথা বাড়াতে সাহস করেনি। বলেছিল, আচ্ছা তাই হবে। তুমি কিছু ভেবোনা।

'তাই হবে' বলে তখনকার মত এড়িয়ে গেলেও, কি করে কি হবে কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিল না। নির্মলা ব্যাপারটাকে চাপা পড়তে দেয়নি। কয়েকদিন পরে আবার তুলতেই নরেন বলল, পাশ করা কি সোজা কথা? পড়বার অভ্যেস চলে গেছে। তাছাড়া—

—কিছুদিন চেষ্টা করলে অভ্যেস আবার ফিরে আসবে। ম্যাট্রিক তো ভালভাবেই পাশ করেছিলে, শুনেছি।

—তা অবিশ্যি করেছিলাম।

—তবে?

বাবার কাছে শোনা একটা দৃষ্টান্তও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করল নির্মলা। কে একজন লোক সরকারী চাকরি থেকে পেন্‌সন নেবার পর প্রায় ষাট বছর বয়সে নতুন ল' কলেজে ভর্তি হয় এবং পাশ করে ওকালতি শুরু করে। শুধু একটা নয়, এ রকম ঘটনা আরও রয়েছে। খবরের কাগজে বেরিয়েছিল, কোথায় কে এক মহিলা, পঁয়তাল্লিশ

বছর বয়সে এম-এ পাশ করেছিলেন। তখন সাত ছেলের মা। বিয়ে হয়েছিল ষোল বছরে; ম্যাট্রিকটাও পাশ করেননি। একজন মেয়েমানুষের পক্ষে যা সম্ভব নরেন যদি তার কাছাকাছিও যেতে না পারে তবে সে কেমনধারা পুরুষ?

এর উত্তরে নরেন আর কোনো যুক্তি খুঁজে পায়নি। তবু আমতা আমতা করে বলছিল, সকালটা মাঠে বেরোতে হয়, দুপুরে ইস্কুল, কখন যে পড়ি?

—কেন, অত বড় রাতটা আছে কি জন্যে?

—মার শরীরটাও—

—সে সব আমি দেখবো।

—কলেজে না গেলেও, বইপত্তর, খাতা, পেন্সিল···খরচ নেহাৎ কম নয়।

'—সেজন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। এই নাও···' বলে হাত থেকে একগাছা চুড়ি খুলে দিয়েছিল, 'পরে আরো দেবো।'

—না, না; গয়না কী হবে? ও তুমি তুলে রাখো। দেখি অন্য কোথাও—

—আর কোথাও তোমাকে যেতে হবে না। তুমি মানুষ হলে অনেক গয়না হবে আমার। এটা তুমি নাও।

স্বামীর হাতে চুড়িটা গুঁজে দিয়ে বলেছিল, তোমাব পায়ে পড়ি লক্ষ্মীটি, আর দেরি করো না। বুঝতে পারছ না, আমি কতখানি অস্থির হয়ে উঠেছি?

বলতে বলতে চোখদুটো এবার জলে ভরে গিয়েছিল।

স্বামী আর একটি কথাও বলেননি। দিন তিনেকের মধ্যেই কিছু বই এবং খাতা কাগজ সংগ্রহ করে নিয়মমত পড়াশুনো শুরু করেছিলেন।

সেইদিনগুলো নির্মলার চোখের উপর ভাসছে। কী পরিশ্রমটাই না করতে হত নরেনকে! ভোরে উঠেই মাঠে বেবিয়ে যাওয়া, তেতে-পুড়ে ফিরে এসেই স্নান সেরে নাকে-মুখে দুটো গুঁজে দু'মাইল পথ ভেঙ্গে ইস্কুলে ছোটা, বিকাল বেলা নামমাত্র বিশ্রাম করে বই নিয়ে বসা।

ঘুমকাতুরে মানুষ, রাত জাগতে পারত না, তবু এগারটার আগে কোনোদিন পড়া ছেড়ে উঠত না। পল্লীগ্রামে তখন নিশুতি রাত।

নির্মলাও জেগে বসে থাকত স্বামীর সঙ্গে। কোনো কোনোদিন নরেন বলত, তুমি শুয়ে পড়গে। মিছিমিছি রাত জেগে কী লাভ?

—যাচ্ছি, তুমি যা করছিলে করনা?

নরেন হেসে বলত, ভয় নেই, আমি ঘুমবো না।

—বিশ্বাস কি? যা ফাঁকিবাজ!

ছদ্ম গাম্ভীর্যের আবরণ ভেদ করে একটি চাপা হাসির রেখা ফুটে উঠত নির্মলার চোখে মুখে। নরেন তৃষিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। সে চোখের ভাষা নির্মলার কাছে অস্পষ্ট ছিল না! মাত্র কয়েক হাত দূরে ঐ যে বলিষ্ঠ হাতখানা একটা পেন্সিল দিয়ে নাড়াচাড়া করছে এই মুহূর্তে সে কী চায়, কোন্ বিশেষ বাসনার দুর্দম চাঞ্চল্য জেগে উঠেছে তার প্রতিটি শিরায়, তাও সে তীব্রভাবে অনুভব করত। তারও কি সে ইচ্ছা হত না, ছুটে গিয়ে ঐ উন্মুখ বাহুর নিবিড় বেষ্টনে ধরা দেয়? ধরা দেবারই তো বয়স তখন। কিন্তু কঠোর সংযমের দৃঢ় বন্ধন সে কিছুতেই শিথিল হতে দিত না। নিঃশব্দে নিঃশ্বাস চেপে উঠে চলে যেত। নিঃসঙ্গ শয্যায় ছটফট করে কেটে যেত দীর্ঘ প্রহর। তারপর কখন এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ত।

ভোরে ঘুম ভাঙতেই কোনো কোনো দিন দেখত বিছানার আর একটা ধার যেমন ছিল তেমনি নিটোল রয়ে গেছে, বালিশে কারো মাথার চিহ্ন পড়েনি। ছুটে যেত পাশের ঘরে। পড়ার মাদুরে হাতের উপর মাথা রেখে ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন স্বামী। পাশে বসে কাঁধের উপর হাত রাখতেই চমকে উঠে অতৃপ্ত নিদ্রাকাতর রক্তাভ চক্ষু মেলে বলতেন, সকাল হয়ে গেছে?

ছেলের এই নতুন করে ছাত্র-জীবন শুরু করা মা প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখেননি। দেখবার কথাও নয়। বৌ-এর তাড়নাই যে এর মূলে কাজ করছে, তাও তিনি জানতেন। মাঝে মাঝে ছেলেকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করেছেন। সে হাঁ না বলে এড়িয়ে গেছে। তখন বৌকে ডেকে বলতে শুরু করলেন, এসব কী পাগলামো হচ্ছে, বৌমা? ছেলেটার দিকে যে

তাকানো যায় না। কণ্ঠার হাড় ঠেলে বেরিয়েছে, চোখ বসে গেছে একটা শক্ত অসুখ বাধিয়ে বসলে, তখন?

নির্মলা মাথা নিচু করে শুনত, জবাব দিত না। আরও কড়া নজর দিত স্বামীর খাওয়া-দাওয়ার দিকে। ঘরের গরুর দুধ। কিন্তু বেশ কিছু দিন হল গাভিন হয়েছে গাইটা। একবেলা করে দুইতে হয়। যা পাওয়া যায় সকলের পাতে দেওয়া চলে না। নিজে সে দুধ খেত না। শাশুড়ী বিধবা মানুষ, তার উপরে অসুস্থ। তাঁর বরাদ্দটুকু বজায় রাখতে হবে। ও পাড়ায় একটি বাউরীদের মেয়ে দুধ বিক্রি করত। কিনতে গেলে ওঁরা বাধা দেবেন আর দুধ কিনবার মত বাড়তি পয়সাও নেই। মেয়েটিকে গোপনে ডাকিয়ে এনে বাবার দেওয়া একজোড়া কাপড় খয়রাত দিয়ে তার সঙ্গে বন্দোবস্ত হল যে, এখন সে রোজ একপোয়া করে দুধ যুগিয়ে যাবে এবং এদের গরু যখন বাচ্চা দেবে তখন ঠিক ঐ ভাবেই সেটা শোধ করা হবে। ঐ দুধটুকু থেকে কখনো দই কখনো ছানা করে সে স্বামীর বিকালের জলখাবারের সঙ্গে ধরে দিত। নরেন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাত, কিন্তু মুখ ফুটে কোনো প্রশ্ন করত না। লাভ নেই বলেই বোধহয় করত না। নিজেকে সে সম্পূর্ণভাবে স্ত্রীর হাতে ছেড়ে দিয়েছিল।

পাড়াগাঁয়ে এক বাড়ির খবর দশ বাড়ি ছড়িয়ে পড়তে দশ মিনিটও লাগে না। নরেন যে অনেক রাত পর্যন্ত দরজায় খিল এঁটে বৌ-এর কাছে বসে পড়ে, এই অত্যন্ত রুচিকর সংবাদটি নানা রসে পুষ্ট হয়ে মুখে মুখে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ঠাট্টার এলাকা যাদের অর্থাৎ গ্রাম্য সম্পর্কে দিদিমা, দাদামশাই, ননদ ভগ্নীপতির দল দুজনকে লক্ষ্য করে এমন সব স্থূল রসিকতার বাণ ছুড়তে শুরু করলেন যা কানে গেলে শুধু কান নয় মাথাও গরম হয়ে ওঠে।

নরেন স্বভাব-বৈষ্ণব, তার ধৈর্যের বাঁধ শক্ত পাথর দিয়ে তৈরি, কোনো অবস্থাতেই ভাঙে না। এই সব মন্তব্য গায়ে লাগলেও গায়ে মাখত না। কখনো হেসে, কখনো হাসবার মত মুখ করে নিজের কাজে চলে যেত।

নির্মলাও প্রাণপণে চেষ্টা করত এই উৎপাতগুলো বিনা উত্তরে এড়িয়ে যেতে। 'কিন্তু বোবার শত্রু নেই', এই প্রচলিত প্রবাদটি আর

যেখানেই চলুক, পল্লীগ্রামে অচল। বোবা সেখানে অভিমন্যু, সপ্তরথীর হাত থেকে পালাবার পথ নেই। এখানে যারা বৌ হয়ে আসে তাদের অবস্থা করাতের সামনে শাঁখের মত। এদিকেও চিরবে, ওদিকেও চিরবে। জবাব দিলে বলবে 'মুখরা', না দিলে বলবে 'দেমাক'! নির্মলা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে চুপ করে সয়ে নিলেও মাঝে মাঝে দু'একটা জবাব দিয়ে বসত। বলাবাহুল্য সেটা শক্ত জবাব এবং তার জের চলত অনেকদিন।

'রাঙাঠানদি' বলে একজন প্রতিবেশিনী কিছুদিন থেকে ঘন ঘন যাতায়াত শুরু করেছিলেন। পঞ্চাশোর্ধ্বা বালবিধবা। সাধারণতঃ এই জাতীয়া পল্লীকন্যাদের কথায়বার্তায় আদিরসের কিঞ্চিৎ প্রাবল্য থাকে। দেহে ও মনে স্বাভাবিকভাবে ঐ রসের আস্বাদন সম্ভব হয়নি বলে বোধহয় ঐ একটিমাত্র পথ ধরে অর্থাৎ বাক্যের ভিতর দিয়েই তার প্রবাহটা একটু অতিরিক্ত এসে পড়ে। রাঙাঠানদি এদিক দিয়ে সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। নির্মলার কানের কাছে মুখ নিয়ে ওদের দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে নানা কৌতূহল যে ভাষায় তিনি প্রকাশ করতেন, কোনো দুঃসাহসিক অভিধানেও তার উল্লেখ নেই। কৌতুকের সুরে বললেও তার মধ্যে কেমন একটা জ্বালা ফুটে উঠত। দূরসম্পর্কীয়া এই মহিলাটির উপর নির্মলার গোড়া থেকেই একটা বিতৃষ্ণা জন্মেছিল।

সম্প্রতি বিষয় পরিবর্তন করে তিনি নরেনের লেখাপড়ার ব্যাপারটা নিয়ে পড়েছিলেন। একদিন একটা কঞ্চির ছড়ি হাতে করে নির্মলার ঘরে গিয়ে বললেন তোর জন্যে নিয়ে এলাম নাতবৌ। নে, তুলে রাখ।

নির্মলা ভ্রুকুঞ্চিত করে তাকাতেই যোগ করলেন, কী দেখছিস! তোর পিঠে পড়বে বলে আনিনি। সে সব ছিল আমাদের কালে। কথায় কথায় বৌ-এর পিঠের চামড়া তুলে নিত সোয়ামীরা। তেমন তেমন মরদ যারা, তারা এখনো নেয়। তোর ঐ ভ্যাবাকান্ত বরটি তো সোয়ামী নয়, তোর ছাত্তর। পড়া না পারলেই বসিয়ে দিবি দুঘা।...বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে লুটিয়ে পড়লেন। নির্মলা কোনো জবাব দিল না। ছড়িখানা তুলে নিয়ে জানালা গলিয়ে ফেলে দিল। রাঙাঠানদি মিনিটখানেক গুম হয়ে বসে থেকে বললেন, অত তেজ ভাল নয়, বুঝলি? যা রয় সয় তাই করিস।

নির্মলা সে কথারও উত্তর দিল না। তিনি গজগজ করতে করতে বেরিয়ে এসে শ্বাশুড়ীর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন! কী বললেন, নির্মলার শোনবার প্রবৃত্তি ছিল না। কিছুক্ষণ যাবৎ বেশ খানিকটা তর্জন-গর্জন কানে এল। আরও কিছুক্ষণ পরে শাশুড়ীর ঘরে যখন গেল, তিনি একা একা নির্জীবের মত শুয়ে ছিলেন। বৌ-এর সাড়া পেয়ে চোখ মেলে বললেন সম্পর্কে উনি তোমার গুরুজন, বৌমা, কথাবার্তাগুলো সেই রকমই বলা উচিত।

নির্মলা বিস্ময়ের সুরে বলল, আমি তো ওঁকে কিছুই বলিনি।

—মুখে না বলে হাব ভাবে বললে সেটা আরো বেশী লাগে।

নির্মলা যা করছিল, করে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

কথাটা পাঁচ কান ঘুরে যথাসময়ে নরেনের কানে গিয়েও পৌঁছল। ততক্ষণে রটনা ঘটনাকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গেছে। নরেন মুখে কিছু না বললেও, ভিতরকার বিরক্তিটা মুখের ভাবেই বোঝা গেল। নির্মলা মনে মনে আহত হল। রাগে ও অভিমানে প্রথমটা মনে হল স্বামীর সঙ্গে এ নিয়ে একটা মুখোমুখি বোঝাপড়া দরকার। অনেক ভেবে নিজেকে নিরস্ত করল। কথা জিনিসটা বাড়ালেই বাড়ে। তার সঙ্গে বাড়ে তিক্ততা ও অশান্তি। কী দরকার? যে ব্রত সে হাতে নিয়েছে, তার দিকে চেয়ে এসব ছোটখাট মান অভিমানকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। স্বামী যদি তার সম্বন্ধে কোনো বিরূপ ধারণা করে থাকেন, সেটা সাময়িক। তাদের ভিতরকার সম্পর্কটা তো এত ঠুনকো নয় যে এই সামান্য মনোমালিন্যের ভার সইবে না।

একটা বিষয়ে নির্মলা মনে মনে আশ্বস্ত বোধ করেছিল,—এত কাণ্ডের পর রাঙাঠানদি নিশ্চয়ই আসবেন না। কিন্তু মহিলাটিকে তখনো সে চিনতে পারেনি। দুষ্টক্ষতের মত এদের বিষাক্ত সংশ্রব থেকে কোনো অবস্থাতেই মুক্তি নেই। কদিন না যেতেই তিনি আবার দেখা দিলেন। আঁচলের আড়াল থেকেই একটা মোটা দড়ি বের করে বললেন, অমন সুন্দর ছড়িটা তোর পছন্দ হল না। টান মেরে ফেলে দিলি। এবার দ্যাখ, কী রকম কাজের জিনিস এনেছি। দামটা দিয়ে দিস।

খাটের উপর চেপে বসলেন ঠানদি। নির্মলা তার রসিকতার

গতিটা তখনো ধরতে পারেনি। তার জন্যে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। তিনিই সেটা পরিষ্কার করে দিলেন—আগে একটু মাঠের দিকে যেত মানুষটা। এখন তো দেখছি তাও বন্ধ করে দিয়েছিস। এবার ইস্কুলের চাকরিটাও ছাড়িয়ে দে। দিয়ে একেবারে রাতদিনের মত ঘরের মধ্যে বেঁধে রাখ। অতবড় ভ্যাড়াটা; আঁচলে কুলোবে কেন? তাই বেশ মোটা দেখে—

—ওটা আপনিই রেখে দিন।

—আমার তো আর কেউ নেই। আমি এটা দিয়ে কী করবো?

—দরকার মত গলায় দিয়ে ঝুলতে পারবেন।

—কী বললি? সিংহীর মত গর্জে উঠলেন রাঙাঠান্‌দি।

নির্মলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে হাসতে লাগল। ঠানদি লাফিয়ে উঠলেন। বাড়ি কাঁপিয়ে বললেন, আমি গলায় দড়ি দেবো কোন দুঃখে। তুই দে। দিয়ে মর।

নির্মলা হাসতে হাসতেই বলল, আমি যদি দিই, দড়িটাও যোগাড় করে নেবো। আপনার কাছে ধার চাইতে যাবো না।

রাঙাঠানদি নাতবৌ-এর মুণ্ডপাত করতে করতে হন হন করে বেরিয়ে গেলেন।

এবারকার ঘটনাটা অন্য আকার নিল। যাঁরা একটু বিজ্ঞ গোছের তাঁরা অবশ্য বলাবলি করতে লাগলেন, নরেনের বৌ-এর ও-কথাটা বলা ঠিক হয়নি। শত হলেও বুড়ো মানুষ, গুরুজন। কিন্তু অন্যান্য মহলে এর ভিতরকার কৌতুকরসটাই উপভোগ করল বেশী।

চারিদিকের এই বিরূপ আবহাওয়া ও প্রতিকূল অবস্থার চাপে মাঝে মাঝে সে হাঁপিয়ে উঠত। এগুলোকে তবু ঠেলে সরিয়ে পথ করা চলে, কিন্তু অভাবের চাপটাই দুর্জয় হয়ে দাঁড়াল। ঠানদি ঠিকই বলেছিলেন। সকালে বেরিয়ে চাষবাসের তদারকটা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কেবল মাত্র রাত্রির ঐ কটি ঘণ্টার উপর নির্ভর করলে চলে না। সকালের তিনচার ঘণ্টাও ঐ সঙ্গে জুড়ে দিতে হয়েছিল। ক্ষেতখামারের ব্যাপারে একমাত্র নির্ভর অনেকদিনের পুরনো চাকর—প্রসন্ন। তার তখন বয়স হয়েছে, ঐ সঙ্গে নিজের ছিটেফোঁটা দু-এক বিঘা যা ছিল তাও করতে

হয়। সব দিক ঠিক সামাল দিয়ে উঠতে পারছিল না। জমির ফলন কমে যাচ্ছে ; অভাব-অনটনের ছায়া আরো গাঢ় হয়ে উঠল। সংসারের তিনটি প্রাণীর মুখেই তার ছাপ পড়ল। কিন্তু একজন আরেকজনকে জানতে দিল না। শাশুড়ী কিছুদিন থেকে সংসারের সব কিছু থেকেই নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। এতগুলো বছর শক্ত হাতে হাল ধরে এসে ভাঙ্গনের মুখে হঠাৎ ছেড়ে দেবার মধ্যে যে দুর্জয় অভিমান ছিল, ছেলে-বৌকে তা স্পর্শ করলেও নিরুপায় দর্শক হয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করবার ছিল না। যে-পথে তারা চলেছিল, তার থেকে ফিরবার আর তখন উপায় নেই।

এই দুঃসময়ে একটি মাত্র মানুষ তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, শুধু দাঁড়ানো নয়, বাধা-সঙ্কুল পথে এগিয়েও দিয়েছিলেন অনেকখানি। নরেনের স্কুলের প্রবীণ হেডমাস্টার হরিশঙ্করবাবু। এই বয়সে পড়াশুনোর জগৎ থেকে বেরিয়ে আসবার এতদিন পরে, তাঁর থার্ডমাস্টারের মধ্যে নতুন করে যাত্রা শুরু করবার উদ্যম দেখে তিনি রীতিমত চমৎকৃত হয়েছিলেন। নিজে অগ্রণী হয়ে তাকে দেখিয়ে-শুনিয়ে দেবার ভার নিয়েছিলেন। প্রথমে সেটা ছিল অনিয়মিত। পরে, রোজ ছুটির পর নিজের বাসায় ডেকে নিয়ে নিয়মিতভাবে পড়াতে শুধু করেছিলেন। সেই সময়ে কথায় কথায় নরেনই একদিন বলে ফেলেছিল নির্মলার কথা। শুনে নিজে থেকেই যেচে দেখা করতে এসেছিলেন। ঐ রকম গাঁয়ে, তখনকার দিনে, তাদের ঘিরে যে আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে করে একজন নব-বিবাহিতা গৃহস্থ-বধূর পক্ষে তার স্বামীর প্রবীণ উপরওয়ালার সামনে বেরোনো মোটেই সহজ ছিল না। কিন্তু নির্মলা এতটুকু দ্বিধা করেনি। পরিচিত আপনজনের মতই কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেলে তিনি বাধা দিয়েছিলেন, না মা। তোমরা ব্রাহ্মণ, বর্ণ-শ্রেষ্ঠ।

নরেন বলেছিল, তাতে দোষ নেই, মাস্টারমশাই। আপনি আমাদের মুরুব্বি, অভিভাবক, সুতরাং গুরুজন।

—তা হোক, নরেন। তাই বলে ব্রাহ্মণ-কন্যার প্রণাম নিতে পারবো না। অতটা আধুনিক হতে পারিনি। তাছাড়া, এতো যে-সে মেয়ে নয়। ওকে আমি রীতিমত শ্রদ্ধা করি।

নির্মলা কুণ্ঠিত হয়ে পড়েছিল অতবড় একজন প্রবীণ বিদ্বানলোকের মুখে এই প্রশস্তি শুনে। হরিশঙ্করবাবু তার আনত মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ মা। সত্যিই তুমি কেবল আমার নও সকলেরই শ্রদ্ধা-ভাজন। ছেলেমানুষ হলেও তুমি আদর্শ-গৃহিণী, কালিদাস যেমন বলেছিলেন, স্বামীব সখী বা সহচরী শুধু নও, সচিব', নরেনের দিকে চেয়ে বলেছিলেন, 'ইংরেজিতে বলব friend, philosopher and guide' বলেই হেসে উঠেছিলেন। সরল সাদা হাসি। আরো অনেক কথা বলেছিলেন হরিশঙ্করবাবু। নরেনের উদ্দেশে বলেছিলেন, আমরা মনে করি, স্ত্রী শুধু ভার। সে যে কতবড় ভুল, বৌমার মত দুটি-একটি মেয়ে যখন দেখি, তখন বোঝা যায়। স্ত্রী ভার নয়, শক্তি, পুরুষের জীবনের প্রেরণা, an inspiring force।

এর পরের বার যেদিন এলেন, খানিকক্ষণ কথাবার্তার পর নির্মলা বলল, আপনি পালাবেন না, কাকাবাবু, আমি এখনি আসছি।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই শ্বেতপাথরের ডিশে কয়েকটি নিজের হাতে তৈরী নারকেলের সন্দেশ এবং সেই সঙ্গে এক কাপ চা এনে ধরে দিল ওঁর সামনে। স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে সেই ধূমায়িত পাত্রটির দিকে চেয়ে হরিশঙ্কর বললেন, এই পরম বস্তুটির ওপর আমার আসক্তি আছে, তুমি কেমন করে জানলে, মা?

নির্মলা উত্তর দিল না, মৃদু হেসে তাকাল নরেনের দিকে। উনিও তার দৃষ্টি অনুসরণ করে বললেন, ও, তুমি বুঝি গোয়েন্দাগিরি করেছ?

চা-এর পাত্রে একটা চুমুক দিয়েই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, আঃ! এ যে অমৃত! এই স্বাদটুকু যে কতকাল পাইনি। ভুলেই গিয়েছিলাম চা কাকে বলে। চা তো সবাই করে, কিন্তু কলকাতার বাইরে এই বিশেষ 'তার'টুকু কেউ আনতে পারে বলে তো জানা ছিল না। এ তুমি কোথায় শিখলে, বৌমা?

—আমার বাবা বড্ড চা ভালবাসেন, কিন্তু ঠিকমত না হলে খান না। আমিই বরাবর তাঁর চা করে দিয়েছি।.........বলতে বলতে শেষের কথাগুলোয় একটা করুণ সুর বেজে উঠল। তারই রেশ যেন শোনা গেল হরিশঙ্করের কণ্ঠে। বললেন তোমার বাবা ভাগ্যবান।

মাস্টারমশাই বিপত্নীক ও নিঃসন্তান।

দুবছরে হল না, তিন বছরের মাথায় নরেন আই-এ পাশ করল। অল্পের জন্যে প্রথম বিভাগটা ফসকে গেল। ততদিনে নির্মলার শ্বশুর ও বাপের বাড়িতে অনেক ওলট-পালট ঘটে গেছে। শ্বাশুড়ী ও বাবা দুজনেই গেছেন। জগদীশের আর্থিক অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছিল। শেষের ক মাস কোর্টেই যেতে পারেননি। ধার-দেনা করেই চলছিল এক রকম। সুদে-আসলে তার পরিমাণ যা দাঁড়িয়েছিল, কাটোয়ার বাড়ি বিক্রি করেও শেষ হয়নি। 'দেশে' ভাগের ভাগ যে ক'বিঘা জমি অবশিষ্ট ছিল তাতেও টান পড়েছিল। সর্বস্বান্ত হবার পর মেজো মেয়ে এসে মাকে তার নিজের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। বাকী জীবনটা সেখানেই কাটিয়ে গেছেন। বাবার শ্রাদ্ধের সময় সেই যে গিয়েছিল নির্মলা, মায়ের সঙ্গে সেই তার শেষ দেখা। সব কিছু মিটে যাবার পর যেদিন চিরকালের তরে কাটোয়া ছেড়ে চলে যান, তখন আর যেতে পারেনি। শাশুড়ীর সে সময়ে একেবারে এখন-তখন অবস্থা।

আজ এতকাল পরে শেষবারের মত দেখা মায়ের সেই সাদা থানপরা নিরাভরণ মলিন রূপটাই চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তার আগের চেহারা যেন ঝাপসা হয়ে গেছে।......

বাবার মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যেই শাশুড়ীও মারা যান। খুব কষ্ট পেয়েছিলেন শেষ দিকটায়। দেহের যন্ত্রণার চেয়ে মানসিক কষ্টটাই বোধ হয় বেশী। জন্ম থেকেই ছেলে ছিল তাঁর ছায়া। বৌ আসবার পর সে যেন কায়া থেকে আলাদা হয়ে পড়েছিল। এই ফাঁকটা সহ্য করতে পারেননি। ছোট্ট সংসারটিকে যে পথে তিনি চালিয়ে এনেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত চালাতে চেয়েছিলেন, ওরা যে তার থেকে একটা নতুন পথ কেটে বার করে নিল, তার সঙ্গে রফা করা সম্ভব হয়নি। জীবনের শেষ কটা বছর তিনিও তাই নিজেকে একেবারে গুটিয়ে এনে রোগশয্যার সঙ্কীর্ণ পরিসরটুকুর মধ্যে ফেলে রেখেছিলেন। তার বাইরে কোন কিছুর সঙ্গে সংযোগ রাখেননি।

মায়ের ওষুধ-পথ্য, পড়াশুনোর খরচ, পরীক্ষার ফি ইত্যাদি

দায়গুলো মেটাতে নির্মলার দুখানা গয়না ছাড়াও দুটো ধানের জমি মহাজনের গদিতে বাঁধা পড়েছিল। তার উপরে অনেক দিন উপযুক্ত দেখাশুনোর অভাবে বাকী জমিগুলোও ঠিকমত ফল দেয়নি। একমাত্র ঐ পরীক্ষার ফল, তার মধ্যে সাফল্যের চমক এবং আনন্দ যতই থাক, সংসারের এই ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে বেশীক্ষণ স্থায়ী হতে পারল না। নরেন যখন ভাবছে, যে নৌকা ডুবতে বসেছে তাকে টেনে তুলবার কাজটা কোনখান থেকে কিভাবে শুরু করা যায়, নির্মলা এসে সোজাসুজি রায় দিয়ে বসল, বি-এ-টা কিন্তু গোড়া থেকেই খেটে পড়তে হবে। সোজা ব্যাপার তো নয়।

নরেন স্ত্রীর মুখের দিকে একবার তাকিয়েই বুঝল, সাংসারিক অভাব, ধার-দেনা, চাষবাসের শৈথিল্য, নির্মলার নিজের কষ্ট অসুবিধা —কোনো যুক্তিই চলবে না। তার সামনে ঐ একটিমাত্র পথই খোলা আছে এবং তার মাঝখানে থামবার উপায় নেই। আরম্ভের পর শেষ অনিবার্য।

অবশিষ্ট জমিতে আর হাত দেওয়া যায় না। হাত পড়ল নির্মলার স্বল্পাবশেষ সোনার টুকরো দু-একখানা যা পড়েছিল, তারই গায়ে। তার থেকেই বই এল। শুরু হল বি-এ পরীক্ষার প্রস্তুতি। হরিশঙ্করবাবু উৎসাহ দিলেন। পড়াশুনোয় সাহায্য করা সম্ভব হল না। তিনি নিজেও এর বেশী এগোননি। তার বদলে আর একটা জিনিস দিলেন, এই দুঃসময়ে অভাব-ক্লিষ্ট দম্পতির কাছে যার প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বড়। 'হায়ার কোয়ালিফিকেশন'-এর যুক্তি দেখিয়ে নরেনের মাইনের অঙ্কটা আরও একটু উপরে তুলবার ব্যবস্থা করে দিলেন। স্কুল-কমিটি অতি কঠিন ঠাঁই। সেখানে যুক্তির জোর পাত্তা পায় না, হেডমাস্টার তা ভালো করেই জানেন। বলতে গেলে একরকম গলার জোরেই প্রস্তাবটা পাশ করিয়ে নিলেন।

আবার তিন বছরের কঠোর সংগ্রাম। এবারে আরো খানিকটা এগিয়ে এল নির্মলা। ক্ষেত-খামারের ঝক্কি, চাকরের সঙ্গে বোঝাপড়া কখন বীজ চাই, কখন কোন্ জমিতে লাঙ্গল দিতে হবে, বৃষ্টি পড়বার আগেই পাট নিড়ানো শেষ করতে কতগুলো 'জন' দরকার, তাদের মজুরি

কোত্থেকে আসবে—সব ব্যাপারটিই সে তুলে নিল নিজের হাতে। ওদের এই 'সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড' দেখে গ্রামে যে প্রতিকূল মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল, এতদিনে সেটাও অনেকখানি নরম হয়ে এসেছিল। পাড়ার দু'একজন মুরুব্বি এবং নরেনের কয়েকটি সমবয়সী ও অনুজস্থানীয় বন্ধুও আপনা থেকে এগিয়ে এসে কাজকর্মের দিক দিয়ে নির্মলাকে সাহায্য করেছে। কুণ্ঠার সঙ্গে তাও সে নিয়েছে, তবু স্বামীর গায়ে আঁচটুকুও লাগতে দেয়নি। নরেনও সব কিছু স্ত্রীর উপর ছেড়ে দিয়ে শুধু পড়া আর পড়ানোর মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিল।

বি, এ পাশের খবর নির্মলাই আগে পায়। নিমাই বলে পাড়ারই একটি ছেলে গিয়েছিল কাটোয়া। সকালের কাগজে পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে দেখে একখানা কিনে ফেলে, এবং নরেনের রোলটা মিলিয়ে নিয়ে পরের ট্রেণেই বাড়ি ফিরে ছুটতে ছুটতে নির্মলার কাছে হাজির—'বৌদি, নরেনদা পাশ করেছে। এই ছ্যাখ।'

নির্মলার বুকের ভিতরটা হঠাৎ কেঁপে উঠেছিল। বারবার করে দেখেছিল মোটা করে পেন্সিলের দাগ দেওয়া সেই অতি পরিচিত নম্বরটা। ভুল দেখছে না তো? না, ঠিকই আছে। সেই মুহূর্তে যেন কোন্ জাদু মন্ত্রবলে সব কিছু লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল তার চোখের সুমুখ থেকে, ভেসে উঠেছিল অনেকদিন আগে দেখা এবং প্রায় ভুলে যাওয়া একখানা মুখ। তার উপরে কেমন একটা বিদ্রূপ মেশানো তাচ্ছিল্যের হাসি। নিজের চোখ দুটো দেখতে না পেলেও স্পষ্ট অনুভব করছিল নির্মলা, তাদের ভিতর থেকে একটা তীব্র জ্বালা ঠিকরে পড়ছে। ইচ্ছা করছিল, এখনই ছুটে গিয়ে এই কাগজখানা সজোরে ছুঁড়ে মারে সেই বি-এ পাশ-গর্বিত বড়লোক কুটুম্বের মুখের উপর।

নিমাই এই আকস্মিক ভাবান্তরের কারণটা ধরতে না পেরে অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল তার মুখের পানে। সেদিকে নজর পড়তেই নির্মলা তাড়াতাড়ি নিজেকে সংযত করে হাসিমুখে বলছিল, একটু মিষ্টিমুখ করবে চল।

ছেলেটির বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটেনি। শুকনোগলায় বলেছিল, কী হয়েছে, বৌদি?

—কী হবে! এতবড় একটা সুখবর নিয়ে এলে, একটু মিষ্টি না খাইয়ে ছাড়তে পারি?

নিমাই, এবার খুশীর সুরে বলে উঠল, শুধু মিষ্টিতে চলবে না, তার সঙ্গে আরেকটা জিনিস দিতে হবে।

—কী জিনিস?

—আগে বল দেবে?

—আমি তো বুঝতে পারছি না, ভাই, কী চাইছ তুমি। ঘরে যদি থাকে, কিংবা—

—আছে আমি জানি। জানি বলেই তো বলছি।

—তাহলে আর ভাবনা কী? এখ্খনি পেয়ে যাবে।

—কাউকে বলতে পারবে না, কিন্তু।

—বেশ তাই হবে।

—নরেনদাকেও নয়।

—না গো না। কাউকে বলবো না। এবার বলে ফেলো দেখি সেই গোপন বস্তুটি কী।

নিমাই আর একটু কাছে সরে এসে চাপা গলায় বলেছিল, এক কাপ চা।

—চা!—কলকণ্ঠে হেসে উঠেছিল নির্মলা।

—এই; আস্তে আস্তে, ত্রস্ত দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকিয়ে বলেছিল ছেলেটি, মা যদি টের পায় আমি চা খেয়েছি, একেবারে আস্ত পুঁতে ফেলবে।

—কেউ টের পাবে না, চল—বলে, রান্নাঘরে বসিয়ে পুরো এক কাপ চা দিয়েছিল নিমাইকে, তার সঙ্গে ঘরের তৈরী নিমকি।

পরীক্ষার পর থেকেই নরেন আবার মাঠের কাজে বেরোতে শুরু করেছিল। সেদিন ফিরতেই নির্মলা এগিয়ে এসে আঁচলের কোণটি গলায় জড়িয়ে স্বামীর পায়ে প্রণাম করল। নরেন কিছুই বুঝতে না পেরে বিস্ময়ের সুরে বলল, কী ব্যাপার? কোনো ব্রত ট্রত নিচ্ছ নাকি?

—'নিচ্ছি' না, যে-ব্রত নিয়েছিলাম, এতদিনে তার উদ্‌যাপন হল। বলে, ভাঁজ করা কাগজখানা তুলে দিল স্বামীর হাতে।

পেন্সিল-চিহ্নিত নম্বরটা চোখে পড়তেই নরেন সোৎসাহে বলে উঠল, উৎরে গেছি তাহলে? উঃ কী ভয়টাই না হয়েছিল!

—আমার কিন্তু একটুও হয়নি।

—তা জানি। তোমার মত বুকের পাটা কজনের?

স্ত্রীর বাহুমূলে হাত দিয়ে একটু আকর্ষণ করতেই নির্মলা হুপা পিছিয়ে গেল। ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, কী হচ্ছে? চারদিকে লোক রয়েছে না?......শোন; ইস্কুল থেকে আসবার সময় মাস্টারমশাইকে নিয়ে এসো। রাত্রে হুটো খাবেন এখানে।

--আজই খাওয়াতে চাও? কিন্তু এত বেলায় আয়োজন করা—

—ওঁকে হুটো খেতে দেবো, তার জন্যে আবার আয়োজন কিসের? সেটুকু আমি করে নেবো।

—বেশ।

সেরাত্রে নির্মলার চোখে এক ফোঁটা ঘুম এল না। স্বামী পাশ ফিরে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। মুখে উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নেই। এতদিন পরীক্ষার ফল সম্বন্ধে মনে মনে যে-আশঙ্কা ছিল, সেটা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যেন সব হুর্ভাবনার অবসান হয়ে গেছে। কিন্তু নির্মলার আবার নতুন ভাবনা শুরু হল। পাশ করলেই তো হবে না। তারপর? যে-জীবনের স্বপ্ন তার হুচোখ ভরে আছে, এই পাশটা তার প্রবেশ দ্বার, কিংবা সেখানে পোঁছবার প্রথম ধাপ। এখনো অনেক ধাপ উঠতে হবে, অনেক সিঁড়ি ভাঙতে হবে। বলতে গেলে, এখন থেকেই সুরু হবে আসল সংগ্রাম। এই কয়েক বিঘা ধানজমি, যাতে সারাবছর ভাল ভাবে পেট চলা ভার, তার সঙ্গে কটা টাকার মাস্টারি—হুয়ে মিলে হুটি প্রাণীর কোনো রকমে হয়তো চলে যায়, কিন্তু এই কি জীবন? এখন না হয় হুজন, এর পর—কথাটা মনে আসতেই এক ঝলক রঙীন লজ্জা বুকের কোণটা ছুঁয়ে গেল—হুটি একটি অতিথি যখন আসবে, কী দিয়ে তাদের মানুষ করবে? সমাজের দশজনের কাছে কী পরিচয় পাবে তারা? ঠিক বলেছিল মেজদি। পরিচয়টাই সব চেয়ে বড় কথা। নরেনকে এবার তারই অর্জনে নামতে হবে।

হেডমাস্টারমশাই ভরসা দিয়েছেন, বছর খানেক পরে আর

কয়েকটা টাকা মাইনে বাড়াবার ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন। তবু তো সেই গ্রাম্য ইস্কুলের মাস্টার। কজন তাকে চেনে? যারা চেনে তারাই বা কী চোখে দেখে? অবজ্ঞা মেশানো করুণা। না; এখানে আর নয়। নরেনকে এবার বাইরে বেরোতে হবে। প্রথম কাজ—কলকাতায় গিয়ে একটি ভদ্রগোছের চাকরি সংগ্রহের চেষ্টা।

গ্রাজুয়েট হবার পর এই স্কুলে পড়ে থাকবার ইচ্ছা নরেনেরও ছিল না। কাটোয়া কিংবা কাছাকাছি কোনো জায়গায় আর একটু বেশী মাইনের মাস্টারি—এর বেশী সে উঠতে পারেনি। দূরে যাওয়া চলবে না। সংসারে পুরুষ বলতে সে একা। একটি ভাইও নেই যে তার অবর্তমানে পৈতৃক ভিটে, বাগান, পুকুর এবং তার সঙ্গে ঐ জমি কখানা রক্ষণাবেক্ষণের ভার নেবে। এগুলোর উপর তার একটা নাড়ির টান ছিল। এই নিস্তরঙ্গ গ্রাম্য জীবনের ছায়াঢাকা কোণটিতে বসে জীবন কাটিয়ে দিতে পারলে আর কিছুই সে চাইত না। এর থেকে নিজেকে উপড়ে নিয়ে শহরে গিয়ে ভাগ্য পরীক্ষার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তার মনে কোনদিন স্থান পায়নি।

নির্মলার প্রস্তাব শুনে বিরস মুখে বলল, কোলকাতায় আমাদের কেউ নেই। গিয়ে উঠবো কোথায়?

--কেন, মেসে।

—তার তো খরচ আছে। চাকরি কদ্দিনে পাওয়া যাবে কে জানে?

—চেষ্টা করলে একটা কিছু জুটবেই। তদ্দিন যা খরচ লাগে আমি দেবো।

—তুমি আর দেবে কোত্থেকে? গয়না কটাও তো প্রায় শেষ। ওতে আর হাত দেওয়া চলবে না।

নির্মলার কণ্ঠে ক্ষুব্ধ অভিমান ফুটে উঠল, দরকারের সময়েই যদি কাজে না এল, ঐ সোনার পিণ্ডি দিয়ে কী হবে আমার?

নরেন আর ওদিক দিয়ে যেতে সাহস করল না, অন্য যুক্তি পাড়ল, তুমি থাকবে কোথায়?

—কোথায় আবার? বাড়িতে?

—একা ?

—একা কেন ? প্রসন্ন রয়েছে অত দিনের লোক। তাছাড়া বাগদী বুড়ির সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে। রোজ রাত্রে এসে শোবে এই ঘরে। নিমাই আছে, মনি ঠাকুরপো আছে, গোপী কাকা আছেন, দেখাশোনা করবেন।

কাছে সরে এসে অন্তরঙ্গ স্বরে বলেছিল, ভয় নেই, পালিয়ে যাবো না। কদিন আর ? চাকরি পেয়ে যখন বাসা করবে—কথাটা শেষ করেনি নির্মলা, বাকীটুকু ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছিল তার সুন্দর চোখদুটো এবং তার উপরে ফুটে ওঠা একটি অর্থপূর্ণ চাপা হাসি।

লেখাপড়া থেকেই চাকরি এবং চাকরি থেকে আসে স্বাচ্ছন্দ্য স্বচ্ছলতা, ভদ্রভাবে বেঁচে থাকবার যা কিছু উপকরণ—সাধারণ মানুষের এই সহজ কথাটাই জানত নির্মলা। বিয়ের আগে তাদের সেই ছোট্ট মহকুমা শহরে যতদিন ছিল এবং বিয়ের পর এই পাড়াগাঁয়ে এসে যা কিছু দেখেছে এবং শুনেছে, সব এই কথারই সমর্থন। নিজের গ্রাম বা শহর ছেড়ে বিদেশে গেলেই তার মূল্য বেড়ে যায়। দু-চারদিনের জন্যে যখন আসে, ছোটবড় সবাই তার দিকে একটা বিশেষ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে। একদিন যাদের কাছে সে তাচ্ছিল্য ও বিদ্রূপ মন্তব্য ছাড়া আর কিছুই পায়নি, তারাই তাকে সমাদর করে বসায়, খুশী করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তার চালচলন, বেশবাস, বলন কথন—সব একবাক্যে সাক্ষ্য দেয়, সে একটি উচ্চস্তরের জীব। অর্থাৎ, সে চাকরি করে।

কিন্তু চাকরি পাবার দুঃখ যে কত বড় এবং যারা পেয়েছে তাদের দুঃখও যে কম নয়, তার কোনো তথ্যই নির্মলার জানা ছিল না। নরেনও কি জানত ? জানল প্রথম কলকাতায় যাবার পর এবং তার কাছ থেকেই আরও পরে জেনেছিল নির্মলা।

বাংলার পল্লীবাসী মধ্যবিত্ত জীবনে তখন ভাঙন ধরতে শুরু করেছে। স্কুল কলেজের দ্রুত প্রসার চলেছে ; তার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে বিদেশী সভ্যতার চমক। মোটা ভাত কাপড়ের সাদামাটা জীবনযাত্রা কাউকে খুশী করতে পারছে না। ছোটখাট জোতদার তালুকদার, তার চেয়েও যারা নিচের স্তরে, পুকুর-বাগানওয়ালা সাধারণ গৃহস্থ, হাট

বাজারের দোকানদার, চালকলা বাঁধা পুরোহিত, চাদর ও চটিধারী সামান্য বেতনের স্কুল মাস্টার—সকলের মুখে এক কথা, ছেলেকে ইংরেজি পড়াও। শহরের হাওয়া যাদের গায়ে লেগেছে,—টিনের চালের নীচে ছ্যাঁচা বাঁশের বেড়ায় ঘেরা 'বাসায়' বসে যারা মক্কেল চরান, অর্থাৎ দিন গেলে দুটি টাকা আয়ের উকিল মোক্তার, তাদের উপর নির্ভরশীল মুহুরি টাউট ; জমিদারী সেরেস্তার নায়েব গোমস্তা তহশিলদার ;—এদের তো কথাই নেই। সকলের বাড়ি থেকেই দলে দলে ছেলে বেরিয়ে বেলা দশটায় স্কুল-কলেজের পথ ধরে। 'পাশ'-এর মান ইচ্ছা করেই নামিয়ে রাখা হয়েছে। ইংরেজ বলেছে, 'তোমাদের শিক্ষার হার এত 'লো', স্বরাজ চাইছ কোন মুখে ?' তাই শিক্ষাবিদরা উঠে পড়ে লেগেছেন 'পারসেন্‌টেজ অব লিটারেসি' বাড়াতে হবে। শিক্ষাকে পৌঁছে দিতে হবে সকল স্তরের সব ঘরে।

পাশ করে যারা বেরোচ্ছে, তারা কেউ গ্রামে ফিরছে না, মহকুমা শহরেও থাকছে না, ধাওয়া করছে কলকাতায় দিকে। চাকরি চাই। কোথায় এত চাকরি ? বিশ্ববিদ্যালয় তার কারখানা বাড়িয়ে চলেছেন। মাল যত বেরোচ্ছে, তার সিকিভাগও কাটছে না। 'সাপ্লাই' প্রচুর 'ডিমাণ্ড' নেই। কোত্থেকে আসবে 'ডিমাণ্ড' ? সেই তো গুটি কয়েক সরকারী আফিসের নড়বড়ে চেয়ার, নয়তো সওদাগরী আফিসের বনাত-ছেঁড়া টেবিল। দুজায়গাতেই মালিক ইংরেজ। গুপ্ত-ব্যানার্জি-ঘোষ-বাগচি দেখলেই দরজা দেখিয়ে বলে 'নো ভেকান্সি', কেউ কেউ আবার জুড়ে দেয়—এখানে এসেছ কেন ? তোমাদের যে-সব জাতভাই বোমা ছুঁড়ছে, তাদের কাছে যাও।

আফিসে আফিসে ধাক্কা খেয়ে গ্র্যাজুয়েটের দল ঊর্ধ্বশ্বাসে ভিড় করছে ল কলেজের দরজায়। গাউনের বাজার ফেঁপে উঠেছে, কিন্তু মক্কেলের বাজারে মন্দা। সতের বছর ঝুড়ি ঝুড়ি ইংরেজি কেতাব গলাধঃকরণ করে বটতলায় বসে দুপয়সার চা-এ গলা ভেজানো। কোনো কোনো নেতা তাই দেখে হুঙ্কার দিচ্ছেন, ভেঙে ফেল দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং উকিল আর চাই না। কী লাভ হচ্ছে বি-এ, এম্-এর ভিড় বাড়িয়ে, কলেজে না ঢুকে, ঢুকে পড় বড়বাজারের গলিতে। দরজায় দরজায়

ফেরি কর কাপড়ের গাঁইট। কিন্তু সেখানেও দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে বিপুলকায় মাড়বার।

চাকরিজগতের এই চিত্রটি নরেনের চোখে পড়েছিল মানিকতলার মেস-এ গিয়ে উঠবার কয়েকদিন পরেই, কিন্তু স্ত্রীকে জানতে দেয়নি। দিয়েছিল অনেকদিন বাদে। তখন নির্মলাও নিজের চোখে দেখতে শিখেছে এবং 'দুঃখ' নামক মানুষের যে পরম শিক্ষক তার কাছেও অনেক পাঠ নেওয়া হয়ে গেছে।

হরিশঙ্করের এক বন্ধু মানিকতলা অঞ্চলে ঐ শস্তা মেসটিতে থেকে কোন এক সওদাগরি অফিসে চাকরি করতেন। মাস্টারমশাইয়ের চিঠি নিয়ে নরেন যেদিন সেখানে গিয়ে উঠল, তিনি হেসে বললেন, হরিটা চিরদিনই পাগলা। আপনি না জানেন, সে তো জানে চাকরি কী চীজ। ভালো করেননি, ভাই। ভাবছি, এই সোনার হরিণের পেছনে ছুটতে গিয়ে আপনার একূল ওকূল দুটোই না যায়।

সরকারী চাকরির বয়স চলে গেছে। একমাত্র গম্যস্থল ঐ 'মার্চেন্ট অফিস' নামক মহাতীর্থ; সে পথ আরো বেশী দুরূহ! মাস্টার-মশাইয়ের বন্ধুটি অনেক আগেই একটু জায়গা পেয়েছিলেন। তখন তার অবস্থা ঠিক মাঝখানের কোনো জংশন স্টেশন থেকে ওঠা রেলওয়ে যাত্রীর মত। ভিতরে ভীষণ ভিড়, বাইরেও অনেক লোক। ঠেলেঠুলে অনুনয় বিনয় করে নিজে কোনোরকমে উঠে পড়লাম। তার পরেই ঝাঁঝিয়ে উঠলাম বাইরের দিকে চেয়ে, আর জায়গা নেই।

একজোড়া দুল বিক্রির সামান্য কটা টাকা নির্মলা স্বামীর হাতে তুলে দিয়েছিল। দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল। এদিকে সমস্ত দিন ঘোরাঘুরিই সার। কারো কাছ থেকে ভরসার লেশমাত্র নেই। মেস-এর পাওনা বাড়ছে। ম্যানেজার অ্যাডভান্স চেয়েছিলেন, না পেয়ে গম্ভীর হয়ে গেছেন। নরেনের লজ্জা করে ভাতের পাতে গিয়ে বসতে। মাঝে মাঝে দু-এক বেলা গা-ঢাকা দেয়। তাতে বিশেষ সুবিধা নেই। 'মিল' না নিলে বাদ পাওয়া যায় সামান্যই। ঠাকুর চাকরেরা অবজ্ঞা দেখাতে শুরু করেছে। অন্যান্য মেম্বরদের চোখে কখনো উপহাস কখনো বিরক্তির ভ্রূকুটি। তবু কোন মুখে টাকা চাইবে নির্মলার কাছে? সে

দেবেই বা কোত্থেকে? এদিকে ক্রমাগত চিঠি আসছে—কোনো সুবিধে হল? শেষ চিঠিখানার উত্তর দেওয়া হয়নি। একই কথা কতবার লেখা যায়? শেষ পর্যন্ত টাকার উল্লেখ না করে পারে না। গয়না আর নেই। সামান্য দু-এক কুচি যা আছে, একেবারে নিঃশেষ করে দেওয়া গৃহস্থের অকল্যাণ। আর একখানা জমি বিক্রী করে টাকা পাঠাতে হল। প্রসন্ন অনেক আপত্তি করল, গোপী কাকাও মত দিতে চাইলেন না। কিন্তু নির্মলা কারো কথা শুনল না। টাকা না হলে বিদেশ বিভূঁয়ে কি করে চলে? একটা কিছু জুটলে জমি উদ্ধার করতে কতক্ষণ? নাই বা যদি করা যায়, তাতেও ক্ষতি নেই। তখন তো আর ঐ জমির উপর নির্ভর করে তারা এই গাঁয়ের বাড়িতে বসে থাকবে না।

কয়েক মাস কাটবার পর সামান্য একটা টুইশানি জুটিয়ে নিয়ে একটুখানি নিশ্বাস ফেলল নরেন। তাতেও পুরো খরচ চলে না। তবু স্থির করে ফেলল, স্ত্রীর কাছে আর টাকা চাইবে না। তার আগেই পরপর আরো দুখানা জমি চলে গেছে। যা আছে তাতে নির্মলার একারই চলা ভার। ওরই মধ্যে একটা মস্ত বড় সুরাহার কথা—জমিগুলো ব্রহ্মোত্তর, খাজনা দিতে হয় না। এ দুর্দিনে এটুকুও কম নয়।

এতদিন নরেন তার নিজের কষ্ট কিংবা চাকরি সন্ধানের দুঃখের ইতিহাস স্ত্রীকে কিছুই জানায়নি, ভরসাই বরং দিয়ে এসেছে বরাবর। নির্মলা যে আশা ও আগ্রহ নিয়ে একটি একটি করে দিন গুনছে, তার চিঠিগুলোর প্রতি ছত্রেই তার পরিচয়। তার উত্তরে নৈরাশ্যের সুর ওষ্ঠপ্রান্তে এসেও আটকে যায়, লেখনীর মুখে বাধে। কিন্তু বছর কাটতে চলল; আর তাকে অন্ধকারে ফেলে রাখা যায় না। এও এক ধরনের প্রতারণা। উদ্দেশ্য যাই হোক মিথ্যা দিয়ে স্ত্রীকে অনির্দিষ্টকাল ভুলিয়ে রাখা অন্যায়। তাছাড়া নির্মলা তো ভেঙে পড়বার মত মেয়ে নয়। যা সত্য, তাই সে জানুক, হলই বা তা কঠোর সত্য।

পরের চিঠিতে সব কিছু খুলে লিখল। তার সঙ্গে জানাল, চাকরির কোন আশা নেই, তার পেছনে অন্ধের মত ছুটে বেড়ানো নিরর্থক। সোনা এবং জমি বিক্রী করে সেই টাকা কলকাতায় মেস

ম্যানেজারের হাতে তুলে দেওয়াও মূর্খতা। গৃহস্থের সামান্য সম্বল ঐ সোনাটুকু ও জমিগুলো খুইয়ে যে ক্ষতি আগেই হয়ে গেছে, তাকে আর বাড়তে দেওয়া যায় না। নির্মলার সম্মতি পেলেই সে বাড়ি ফিরে আসবে বলে স্থির করেছে। তারপর দেশের মধ্যেই একটা কোনো স্কুলের চাকরির সন্ধান করা। এ ছাড়া আর কোনো পথ নেই। সেজন্যে কিছু দেরি হলেও ক্ষতি হবে না। ঘরের ভাত খেয়ে চেষ্টা করা চলবে।

চিঠি পড়ে নির্মলার চোখের সামনেটা হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল। তারপর ধীরে ধীরে দৃষ্টি ফিরে পাবার চেষ্টা করল। একটি মর্মান্তিক হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটের কোণে। ঘরের ভাতও যে নিঃশেষ হয়ে এসেছে, স্বামী এখনো জানতে পারেননি। জানিয়ে লাভও নেই। যে পথে তারা এতোটা এগিয়ে গেছে, তার থেকে আর পিছনে ফিরে আসা যায় না। এগিয়ে যাওয়াই একমাত্র উপায়। শেষপ্রান্তে যাই থাক্, কূল বা অকূল, সে ভাবনার অবসর নেই।

হরিশঙ্কর এলেন দেখা করতে। কিছুদিন থেকে সেক্রেটারীর সঙ্গে তাঁর বিরোধ চলছিল। শরীরটাও ভাল যাচ্ছিল না। অনেকদিন আসতে পারেননি। নির্মলাকে দেখে যেন আঁৎকে উঠলেন, তোমাকে যে চেনা যায় না, বৌমা। অসুখ করেছিল, আমাকে জানাওনি কেন?

—অসুখ কোথায়? আমি তো ভালই আছি, কাকাবাবু।

—না, না, ভালো নেই, মোটেই ভালো নেই, বলে বারবার মাথা নাড়তে লাগলেন। তারপর বললেন, অবিশ্যি ভালো না থাকবার যথেষ্ট কারণ আছে তা জানি। কিন্তু তুমি তো সাধারণ মেয়ে নও যে অযথা চিন্তা করে শরীর মন নষ্ট করবে।

—না, কাকাবাবু, চিন্তাও আমি করি না। আমার এখনো আশা আছে, এ-দিন কেটে যাবে। সেই কথাই তাঁকে বরাবর লিখে থাকি।

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! তাইতো লিখবে। একেই তো বলে সহধর্মিণী। দুঃসময়ে যে পাশে এসে দাঁড়ায়, সাহস দেয়, ভরসা দেয়।

নির্মলার শরীর খারাপের কারণ যে শুধু দুর্ভাবনা নয়, শুধু মানসিক নয়, তার চেয়ে অনেক বেশী শারীরিক, সেকথা কাউকে বলা যায় না। মাস্টারমশাইয়ের কাছেও সে চেপে গেল। কিছুদিন থেকে ভাতের

থালার সামনে বসলেই তার স্বামীর কথা মনে পড়ে। মুখ ফুটে কিছু না বললেও একটু ভালো খাওয়া, দুটি একটি ভালো রান্নার দিকে মানুষটির যে বিশেষ ঝোঁক আছে, নির্মলা ক'দিনের মধ্যেই টের পেয়েছিল। শাশুড়ীও তাকে বলেছেন সেকথা। অসুখে পড়বার পর এইটাই ছিল তাঁর বড় ভাবনা। কী রান্না করেছ? কী দিয়ে খেল নরেন? ও কিন্তু এখনো চেয়ে খেতে জানে না। 'না' বললেও দুটো ভাত ওকে বেশী দিও বৌমা। জেলেপাড়া থেকে মাঝে মাঝে কইমাছ আনিয়ে 'ঝালদে' করে দিও। বড্ড ভালবাসে ও। একগঙ্গা ঝোল দিও না যেন। ও খেতে পারে না—এমনি অনেক কথা তিনি বলতেন শুয়ে শুয়ে। নির্মলা নিজেও দেখেছে, জিজ্ঞাসা না করেও বুঝে নিয়েছে এই মুখচোরা মানুষটির কোন্ কোন্ জিনিসের উপর বিশেষ লোভ। সেইগুলোই বেছে বেছে রান্না করে দিয়েছে। নরেন একটি কথাও বলেনি। সেটা তার স্বভাব নয়। কিন্তু চোখে-মুখে উপচে পড়েছে খুশি। শুধু আনন্দ নয়, কৃতজ্ঞতা। নির্মলার মন তৃপ্তিতে ভরে গেছে।

রান্না করতে গিয়ে, বিশেষ করে নিজে যখন ভাত নিয়ে বসে, তখনই সেই দৃশ্যগুলো মনে পড়ে যায়। হাত মুখে উঠতে চায় না। খাবারগুলো নাড়াচাড়া করে উঠে পড়ে। কোনোদিন আধপেটা কোনোদিন অনাহার। কত কী তুচ্ছ জিনিস রাঁধতে গিয়ে আর হাত সরে না—স্বামী বড় ভালবাসেন। রান্না পড়ে থাকে। দুটো ভাতে ভাত ফুটিয়ে নেয়, কিংবা উনুনে জল ঢেলে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে।

মায়ের একটি ছেলে; অভাবের সংসার হলেও নরেন আদরে মানুষ হয়েছে। বিয়ের পর প্রথম কিছুদিন নির্মলা মনটাকে মানিয়ে নিতে পারেনি। তারপর সেও কোনোদিন স্বামীকে অনাদর করেনি। আজ কোথায় কী দিয়ে খাচ্ছেন, মেস-এর ঠাকুরের রান্না হয়তো মুখে তুলতেও পারছেন না—এই সব কথাই থেকে থেকে মনটাকে তোলপাড় করে তোলে।

দু'চারটে অন্যান্য কথার পর হরিশঙ্কর বললেন, নরেন ফিরে আসতে চায়। ওখানে কোনো সুবিধে হচ্ছে না। তোমাকেও বোধ হয় সেই কথাই লিখেছে!

নির্মলা মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

—ইস্কুলের চাকরিটা খালি আছে কিনা জানাতে লিখেছে। মাস ছয়েক খালিই রেখেছিলাম, তারপর আর ওরা শুনল না। নিজেদের লোকজন আছে তো। তারই একটিকে এনে বসিয়েছে। নরেনের কাছে সে কিছুই নয়। কিন্তু খুঁটোর জোর যখন আছে, তাকে আর হঠায় কে? তাই, ভাবছি কী লিখি। অবিশ্যি কিছুদিন অপেক্ষা করলে হয়তো—

—আপনি লিখে দিন আসবার দরকার নেই। এলে চাকরি পাওয়া যাবে না। তার চেয়ে ওখানেই চেষ্টা চলতে থাক। এতদিনই যখন গেছে দেখা যাক্ আরো কিছুদিন।

—কিন্তু বছর ঘুরে গেল। কোলকাতার শহরে খরচপত্তরও কম হচ্ছে না।

—সে সব যেমন করে চলছিল তেমনি চলবে।

—কী করে তুমি চালাচ্ছ, আমি তো ভেবে পাই না।

—ভগবান চালাচ্ছেন। আপনি আশীর্বাদ করুন, কাকাবাবু, এ-সব যেন সার্থক হয়।

বলতে বলতে নির্মলার গলা ধরে এল। হরিশঙ্কর বললেন, সার্থক হবে বৈকি, মা? তোমার এতবড় ত্যাগ বৃথা যাবে, এ কখনো হতে পারে না।

উঠতে উঠতে বললেন, আমি তাহলে সেই কথাই লিখে দিই।

সংসারে কোনো কিছুই অবিচ্ছিন্ন নয়। একটানা সুখ যেমন মানুষের ভাগ্যে নেই, একটানা দুঃখও তাকে চিরকাল সইতে হয় না। আদিগন্ত মেঘাচ্ছন্ন বর্ষার আকাশেও মাঝে মাঝে সূর্যরশ্মির দেখা মেলে। নরেনের দীর্ঘ পর্যটন একদিন শেষ হল। কোন রকমে একটা চাকরি জুটল জুট কোম্পানীর আফিসে। মাইনে তিরিশ টাকা। সেটা কম কি বেশী সেকথা আর তখন মনে হয়নি। একটা কিছু তো পেলাম, একটা দাঁড়াবার ঠাঁই—এই চিন্তাই মন জুড়ে রইল। খবরটা তখনই জানিয়ে দিল নির্মলাকে। তারপর নিজের অবস্থাটা মনে মনে হিসাব করতে

বসল। এই তিরিশের সঙ্গে টুইশানির পনর যোগ করলে যা দাঁড়াবে তার থেকে কষ্টেস্থষ্টে মেসের খরচ চালিয়ে বাকীটা মাসে মাসে বাড়ি পাঠানো চলবে। স্ত্রীর গয়না এবং পৈতৃক জমিজমা, যা হাতছাড়া হয়ে গেছে তার তো কোনো উপায় নেই, যেগুলো এখনো বন্ধকের কোঠায় আছে, আস্তে আস্তে উদ্ধার করতে হবে। তার আগে নির্মলাকে একবার দেখতে ইচ্ছা করছে, নিজেরও দুটো দিন বিশ্রাম দরকার। চাকরিতে যোগ দেবার প্রস্তুতি হিসাবে সাতদিন সময় দিল কোম্পানী।

মুখোমুখী দেখা যখন হল, দুজনে শুধু তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে। দুজনের চোখেই নীরব অনুযোগ—এই হাল হয়েছে শরীরের আর আমাকে একটা খবরও কি দিতে নেই? মুখে ও-সম্বন্ধে কেউ কিছু বলল না। প্রতিবেশীরা প্রথমে উদ্বেগ পরে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল।

এবারেও হার হল নরেনের। এই শরীরে মেসে কাটাবার প্রস্তাব বলা মাত্র নির্মলা নাকচ করে দিল। স্থির হল, একটা ছোটখাট বাসা ঠিক করে নরেন নিজে আসতে পারে ভাল, নয়ত চিঠি লিখলেই মণি ঠাকুরপোকে সঙ্গে করে ও চলে যাবে। এখানে থাকবেই বা কিসের ভরসায়? হাতে দুগাছা চুড়ি ছাড়া দেহে বা বাক্সে সোনা বলতে কিছু আর তখন পড়ে নেই। দু-একখানা জমি যা আছে, তাতে একজনেরও পেট চলে না। সেগুলোও ছাড়াতে হবে। নতুন বাসা করবার আয়োজন তো আছে একটা। সে খরচ নেহাত ছোট নয়।

মানিকতলা অঞ্চলেই বেশ ভালো বাসা পাওয়া গেল। দুখানা ঘর, রান্নাঘর, তার কোলে একটু উঠোন। ভাড়া দশ টাকা। এর চেয়ে কম ভাড়াতেও একখানা ঘর পাওয়া যেত কোনো গলির মধ্যে। কিন্তু চিরকাল পাড়াগাঁয়ে খোলামেলায় মানুষ; শহরের এই ছটাক মাপা ঘিঞ্জির মধ্যে প্রাণটা হাঁপিয়ে ওঠে। নির্মলাও সেখানে টিঁকতে পারবে না। যে স্ত্রী এত করেছে, তাকে একটা সামান্য স্বাচ্ছন্দ্যও যদি না দিতে পারে তবে কী করল সে? এই কথাটাই মনে হল নরেনের। দরকার হলে আর একটা ছাত্র না হয় জুটিয়ে নেবে কোনোখানে। তাছাড়া মাইনে

তো ওখানেই আটকে থাকবে না। ক্রমশঃ বাড়বে। অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতে অন্য চাকরি পাবার সম্ভাবনাও রইল।

বাসা দেখে নির্মলার খুশি আর ধরে না। বলল, এই উঠোনটুকু আমাদের কত কাজে লাগে দেখো। দুটো কুমড়ো গাছ পুঁতবো ঐখানে, বড় হলে ছাদে উঠে যাবে। ওপাশটায় দেবো ঝিঙ্গে আর এদিকে থাকবে লঙ্কা আর ঢ্যাঁড়শ। তরকারী আমাদের কিনতে হবে না। একখানা কোদাল শুধু এনে দিও আমাকে।

নরেনের মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল। বলল, দেবো। কয়েকদিনের মধ্যেই ছোট্ট সংসারটুকু গুছিয়ে ফেলল নির্মলা। কাজের ফাঁকে ফাঁকে মনে পড়ছিল কাটোয়ার বাড়িতে ফেলে আসা কতকগুলো ছাড়া ছাড়া দৃশ্য। একজনের মুখে শোনা টুকরো টুকরো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-শ্লেষ। ছাদের অন্ধকারে সেই শেষদিনের কটিকথা এখনো কানে বাজছে,—'আমারই ভুল হয়েছিল। যে যা, তাকে সেই ভাবেই দেখা উচিত।' চোখদুটো আবার দপ্ করে জ্বলে উঠল। ইচ্ছা হল সেই দাম্ভিক লোকটাকে ডেকে এনে দেখায় তার আজকের এই জীবনযাত্রা। পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করল, না এখনো সে সময় আসেনি। আরো অনেক উঠতে হবে। তারপর।

সেইদিনই স্বামী অফিস থেকে ফিরলে জিজ্ঞাসা করল, হ্যাঁগো, তোমার মাইনে বলছিলে তিরিশ টাকা। তাই না?

—হ্যাঁ।

—আর?

—আর কী?

—উপরি?

নরেন জলখাবার খেতে খেতে বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে রইল স্ত্রীর মুখের দিকে। বিস্মিত কণ্ঠে বলল, উপরি মানে?

—বাঃ, চাকরিতে উপরি থাকে না?

—ঘুষের কথা বলছ?

—ঘুষ কেন হবে? উপরি। আমার মেজোজামাইবাবু মাইনে যা পায় তার চেয়ে অনেক বেশী পায় উপরি। তারপর, আমার সই শোভনার বর—

—না, আমার কোনো উপরি নেই—কথার মাঝখানেই কেমন গম্ভীর দৃঢ়স্বরে বলে উঠল নরেন।

স্বামীর এই কণ্ঠস্বর নির্মলা এর আগে কোনোদিন শোনেনি।

বহুবছর পরে সেই দিনগুলো স্মরণ করে নির্মলার দুচোখ জলে ভরে উঠছে। ঐ একটি জায়গায় মানুষটি ছিল অনমনীয়। কিন্তু যে লোক এত কোমল, এত দুর্বল, স্ত্রীর ইচ্ছাকে যে চিরাদন নিঃশব্দে মেনে এসেছে, ঐ একটি মাত্র ক্ষেত্রে তার এই দৃঢ়তা যেন একটা অন্যায় জিদ বলে মনে হয়েছিল সেদিন। কী দুর্মতি হয়েছিল নির্মলার! ওটা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি।

পাটের আফিসে 'উপরি'র প্রচলন কম ছিল না। নরেনের সহকর্মীরা তার পুরো সুযোগ নিতে ছাড়ত না। তাদের কেউ কেউ মাঝে মাঝে আসত ওদের বাড়িতে। বেশীরভাগই নরেনের চেয়ে বয়সে ছোট। নির্মলাকে বৌদি বলে ডাকত। কথায় কথায় উপরি আয়ের প্রসঙ্গও কোনো কোনোদিন এসে পড়ত, এবং নরেন যে এ বিষয়ে সব রকম ছোঁয়াচ সযত্নে এড়িয়ে চলে, তা নিয়ে ঠাট্টা তামাসাও করত নির্মলার সামনেই। সকলের কাছে যেটা সহজ ও স্বাভাবিক তার সম্বন্ধে একজন লোকের এই একগুঁয়েমি নিতান্ত অদ্ভুত ছাড়া আর কি? মাঝে মাঝে মনে হত এটা একটা ভীরুতা মাত্র। নরেনের কথার মধ্যেই যেন তার স্বীকৃতি ছিল। ও আমি পারবো না, ওটা আমাকে দিয়ে হবে না—পীড়াপীড়ি করলে এই ছিল তার উত্তর।

বছর দুয়েক পরে নির্মলার কোলে এল খোকা। তার আগে ও পরে কতগুলো বাড়তি খরচের মুখে পড়তে হল, এই সামান্য আয়ে যা কুলায় না। সেই টানাটানিই বাড়তে লাগল দিনদিন। নির্মলা যদি বুঝত, মাইনেটুকুই সম্বল, এরই মধ্যে তাকে সবকিছু কুলিয়ে নিতে হবে, তাহলে হয়তো ততটা অসন্তোষের কারণ ঘটত না। কিন্তু অভাব দূর করবার উপায় যেখানে হাতের মধ্যে, সেখানে শুধু একটা গোঁ কিংবা বোকামির বশে হাত গুটিয়ে বসে থাকা কে সহ্য করতে পারে? এই মনোভাব থেকেই শুরু হল বিরোধ। খোকা পেটে আসবার পর থেকে-উপযুক্ত পুষ্টির অভাবে নির্মলার স্বাস্থ্য আরও ভেঙ্গে পড়েছিল। মেজাজ

বশে রাখতে পারত না। যখন তখন রূঢ় কথা বেরিয়ে আসত, দু'বছর আগেও যা সে মুখে আনা দূরে থাক, মনে মনেও ভাবতে পারত না। প্রথম প্রথম নরেন কোনো জবাব করত না। কিন্তু মানুষের মাথায় যখন রক্ত চড়ে এবং তার থেকে বেরিয়ে আসে কটূক্তি, উত্তর না দিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করা যায় না। রসনার ধর্মই হল, সে যখন বিষ-উদ্গিরণ শুরু করে, সে বিষ মাথা পেতে নিলেই তার স্রোত বন্ধ হয় না। বিনা প্রতিবাদে মাথা পেতে নেওয়াও সহজ নয়। নরেনেরও ধৈর্যের বাঁধ ভাঙতে আরম্ভ করেছিল।

সেই দিনটা অক্ষয় হয়ে আছে নির্মলার জীবনে। যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিনই এমনি থেকে যাবে।

মাস শেষ হতে পুরো এক সপ্তাহ বাকী। নির্মলার হাতে একটি পয়সা নেই। বাজার হয়নি। ঘরে দুটো আলু ছিল। তাই সেদ্ধ করে, শুধু একটু নুন মেখে ভাতের সঙ্গে ধরে দিয়েছিল স্বামীর সামনে। নরেন চোখ তুললে দেখতে পেত থালাটা রাখতে গিয়ে দুচোখ তার জলে ভরে উঠেছিল। স্বামী যদি আধপেটা খেয়ে কিংবা না খেয়ে রাগ করে চলে যেতেন, কিংবা দুটো রূঢ় কথা শুনিয়ে দিতেন তাকে; নির্মলা বোধহয় মনে মনে খুশী হত। মনে করত, এটা তার পাওনা। কিন্তু নরেন কোনোদিকে ফিরে চায়নি, নিঃশব্দে ঘাড় গুঁজে যা পেয়েছে তাই দিয়েই সব ভাত কটি নিঃশেষে খেয়ে নিয়েছিল। সেই দিকে চেয়ে নির্মলার চোখের জল শুকিয়ে গিয়ে দেখা দিল জ্বালা। স্বামী যখন উঠতে যাবেন তিক্তকণ্ঠে বিষ ঢেলে বলল, খুব ভালো লাগছে, না?

নরেন চকিতে একবার চোখ তুলে তাকাল, জবাব দিল না। মুখ ধুয়ে ঘটিটা এনে রাখল বারান্দার কোণে।

—কথা বলছ না যে?

—ছাতাটা দাও।

নির্মলা ছাতা আনতে গেল না। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সেইখানে। এই উত্তর না দেওয়ার মধ্যে যেন একটা সদম্ভ অবজ্ঞা লুকিয়ে আছে। কেন? কিসের এত তাচ্ছিল্য? কিজন্যে এত অহঙ্কার? স্বামী যখন যাবার জন্য পা বাড়ালেন, মনে হল সে শুধু যাওয়া নয়, তাকে দুপায়ে

মাড়িয়ে দিয়ে যাওয়া। নির্মলা সুর চড়িয়ে বলল, চলে যাচ্ছ; খোকার দুধের টাকাটা দিয়ে গেলে না?

—আমার কাছে তো টাকা নেই।

—দুধ আনবো কী দিয়ে?

—দেখি, যদি আসছে মাসের টুইশানের টাকা থেকে কিছুট আগাম পাওয়া যায়।

—আগামের নাম করে ভিক্ষে চাইতে লজ্জা করে না?—প্রশ্ন নয়. প্রশ্নচ্ছলে আরো খানিকটা শ্লেষ-উদ্গিরণ।

নরেন চলে যাচ্ছিল, একবার ফিরে তাকাল। প্রতিবাদের সুরে বলল, ভিক্ষে মানে? নিজের পাওনা চেয়ে নেবো, তার মধ্যে লজ্জারই বা কী আছে?

—ও; আর যে পাওনা চাইতে হয় না, দুনিয়াসুদ্ধ সব লোকে ন্যায্য বলে আদায় করে নেয়, লজ্জা বুঝি শুধু তার বেলায়?

আবার সেই পুরনো প্রসঙ্গ, যা নিয়ে অনেকদিন অনেক কথা-কাটাকাটি হয়ে গেছে, কিন্তু নরেনকে টলানো যায়নি। কিন্তু নির্মলা তা ভুলে থাকতে পারে না। লোকেও ভুলতে দেয় না। কালই ওর এক আফিস-ঠাকুরপো এসে বলে গেছে, নরেন এখন যে জায়গায় গিয়ে পড়েছে, দু'হাতে পয়সা লুঠবার অমন ঘাঁটি আর নেই। ঝক্কি নেই, ঝামেলা নেই, একটু চোখ বুজে থাকলেই পকেট আপনা হতেই ভারী হয়ে ওঠে। ঐ পোষ্টে এর আগে যে ছিল, এরই মধ্যে যাদবপুরে বাড়ি করে ফেলেছে। 'কিন্তু নরেনদা আমাদের গোঁসাই মানুষ, একেবারে ঠাকুর রামকেষ্ট!' বলে হেসে উঠেছিল ভদ্রলোক। হাসি নয়, যেন একতাল কাদা ছুঁড়ে দিয়েছিল সেই অনুপস্থিত অকর্মণ্য লোকটার মুখের উপর। তখন থেকেই সেই কথাগুলো ঝাঁ ঝাঁ করছিল নির্মলার কানের ভিতর। তার উপরে চারদিকের এই হাল। প্রতিমুহূর্তে বুকটা তার জ্বলে যাচ্ছিল। তারই তীব্র ঝাঁজ বেরিয়ে এল, ওর ভাষায় ও ভঙ্গিতে।

নরেন পা বাড়িয়েছিল; থমকে দাঁড়াল। এদিকে না ফিরেই বলল, সব লোকে কি করে না করে তা দিয়ে আমার দরকার নেই। আমি পারবো না। সেকথা তোমাকে অনেক আগেই বলে দিয়েছি।

—তা জানি। পারবার সাহস নেই, সে বুকের পাটা নেই তোমার।

—সাহসের কথা নয়। ওটা অন্যায়। আমার বিবেকে বাধে।

—বিবেক! ঘরে যার হাঁড়ি চড়ে না, কচি বাচ্চার মুখে একফোঁটা দুধ যে যোগাতে পারে না তার আবার বিবেক! ওসব ভড়ং রেখে দাও। আসলে তুমি—

(ফণিনীর মত গর্জে উঠেছিল নির্মলা। মুহূর্তের তরে নরেনও ফিরে তাকিয়েছিল প্রদীপ্ত চক্ষু মেলে।)

—আসলে তুমি ভীরু, অক্ষম, অপদার্থ! জন্ম জন্ম ধরে কত পাপ করেছি, তাই তোমার মত একটা কাপুরুষের হাতে পড়েছিলাম!

বলতে বলতে রুদ্ধকণ্ঠে দুচোখে আঁচল চেপে ধরে সেইখানেই বসে পড়েছিল। নরেন আর দাঁড়ায়নি।

সেইদিনই ঘটে গেল চরম সর্বনাশ।

খানিকটা আগুন বেরিয়ে যাবার পর বুকের ভিতরটা যখন স্বভাবের নিয়মে আপনিই ঠাণ্ডা হয়ে এল, নিজের আচরণের কথা ভেবে নির্মলার লজ্জা যত হল, তার চেয়ে বেশী হল বিস্ময়। মনে মনে বলল, এ কী করলাম! সত্যই তো। এতবড় রূঢ়কথা স্বামীকে সে কোনোদিন বলেনি। মাথাটা কি তার একেবারেই খারাপ হয়ে গিয়েছিল? অথচ, তার চেয়ে কে বেশী জানে, এর কোনোটাই তার মনের কথা নয়। কিন্তু স্বামী কি তা বুঝবেন? এই শিশুপম সরল মানুষটি যে তারই উপরে একান্তনির্ভর। তাঁর সেই অখণ্ড বিশ্বাসের মূলে নিজে হাতে সে চরম আঘাত করে বসল।

সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল। অন্যদিন আফিস থেকে বেরিয়ে টুইশান সেরে এর কিছু আগেই নরেন এসে পড়ে। আজ এত দেরি হচ্ছে কেন? দারুণ দুর্ভাবনায় নির্মলা ক্রমাগত ঘর-বার করতে লাগল।

পাশের বাড়ির বৌটি খোকাকে বড় ভালবাসে। বিকাল হলেই রোজ এসে নিয়ে যায়। কোনো কোনোদিন খাইয়ে-দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে কোলে করে পৌঁছে দেয়। আজও তাই দিতে এল। নির্মলা তখনো ঘরে যায়নি, আলো জ্বালেনি। বৌটি আসতেই উদ্বেগের সুরে বলে উঠল, কী করি বলতো ভাই, এখনো তো উনি এলেন না।

—কোথাও আটকা-টাটকা পড়েছেন হয়তো। এসে পড়বেন এখুনি।

সেই সময়ে একটা রিক্স নিয়ে আফিসের একজন বাবু ঝড়ের মত ঢুকল ওদের গলিতে। ছুটতে ছুটতে এসে বলল, শীগ্‌গির আসুন বৌদি।

—কোথায়?

—হাসপাতালে।

—হাসপাতালে! কেন? উনি কোথায়?

—আসুন, বলছি সব। তাড়াতাড়ি উঠুন।

নির্মলার মুখে আর কথা সরল না। ফ্যালফ্যাল করে তাকাল বৌটির মুখের দিকে! সে বলল, তুমি ঘুরে এসো দিদি, খোকাকে আমি রাখছি। ওর জন্যে কিচ্ছু ভেবো না।

হাসপাতালে গিয়ে যখন পৌঁছল, তার আগেই সব শেষ হয়ে গেছে। হাতে একটা ব্যাণ্ডেজ; হাঁটুর ঠিক নিচে থেকে ডান পাটা কাটা। ঢাকা তুলে মুখের দিকে তাকাল নির্মলা। সবখানি জুড়ে শুধু অপরিসীম ক্লান্তি। সেই ক্লান্তির বোঝা টেনে টেনেই যেন এই কিছুক্ষণ আগে ঘুমিয়ে পড়েছে মানুষটা। নেই, একথা যে বিশ্বাস করাই যায় না।

যারা সেখানে ছিল তাদের কাছেই শোনা গেল, ট্রামে উঠতে গিয়ে হঠাৎ নাকি পড়ে যায়। ডান পাটা চলে গিয়েছিল গাড়ির তলায় এবং তারই উপর দিয়ে ট্রামটা বেরিয়ে গেছে। রাস্তার লোকেরাই ছুটে এসে টেনে তুলেছিল। সুবিধামত যানবাহন পাওয়া যায়নি। অ্যাম্বুলেন্স আসতে আসতে অনেক দেরি হয়ে গেল। ততক্ষণ সমানে চলেছে হেমারেজ। হাসপাতালের এমার্জেন্সিতে যখন নিয়ে যাওয়া হল, সারা দেহে আর তখন রক্ত বলতে কিছু নেই। কেমন করে থাকবে?—মনে মনে বলল নির্মলা। সব রক্ত যে তিনি তারই জন্যে জল করে গেছেন স্ত্রী হয়ে নিজের স্বামীকে সে তিল তিল করে ক্ষয় করেছে।

অ্যাম্বুলেন্স করে যারা পৌঁছে দিয়েছিল তার মধ্যে একজন বলল এমনিতেই শরীরটা বোধহয় খুব দুর্বল ছিল। অ্যাক্সিডেণ্টের পর কথাবার্তা বিশেষ বলতে পারেননি। নিজের নাম আর আফিসের ঠিকানাটা শুধু

কোনোরকমে বুঝতে পেরেছিলাম। খবর দিতেই ওঁরা সব এসে পড়লেন।

আফিসের কজন সহকর্মী কাছেই দাঁড়িয়েছিল। তখন নয়, কদিন পরে তারা এক অদ্ভুত কাহিনী শুনিয়েছিল নির্মলাকে। নরেন ভট্‌চায্যির প্রথম এবং শেষ অধঃপতনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

কয়েকমাস ধরে সে বিলক্লার্কের কাজ করছিল। ধীর, স্থির এবং খাঁটি লোক বলেই বোধহয় কর্তৃপক্ষ অনেককে বাদ দিয়ে এ-দায়িত্ব তার হাতে দিয়েছিলেন। এখানে যারা বসে, বড় বড় বিল প্রতি তাদের একটা বাঁধা পাওনা আফিসের শুরু থেকেই প্রায় 'নিয়ম'এ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। নরেন সে টাকা স্পর্শ করত না। ঐদিন আফিসে এসে অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিল; কোনো কাজে হাত দেয়নি, কারো সঙ্গে কথাও বলেনি। তারপর, একটা পার্টি এসেছিল বিল পাশ করাতে। নতুন লোক। কাজ হয়ে গেলেই একখানা দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়েছিল ফাইলের তলায়। নরেন প্রথমে চমকে উঠলেও খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করে টাকাটা তুলে নিয়ে পকেটে রেখেছিল। পাশের টেবিলে যে কেরাণীটি বসে, পার্টির লোক চলে যেতেই কাছে এসে একগাল হেসে ওর পিঠ চাপড়ে বলেছিল, এতদিনে সুবুদ্ধি হল, দাদা? এবার বুঝতে পারলেন তো কী ভুল করেছেন এ্যাদ্দিন ধরে?

নরেন কোনো সাড়া দেয়নি। শুষ্কমুখে কিছুক্ষণ বসে থেকে হঠাৎ চঞ্চলভাবে আসন ছেড়ে উঠে পড়েছিল।—কোথায় চললেন? পেছন থেকে জিজ্ঞাসা করেছিল ওর সহকর্মী। জবাব দেয়নি। আফিসেও আর ফিরে আসেনি। ছুটির একটু আগে খবর এল, সে হাসপাতালে।

দিন সাতেক পরে নির্মলার নামে একটা চিঠি এসেছিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে—"মৃত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে যখন আউট-ডোর-এ আনা হয়, তাহার পকেটে দশটা টাকা পাওয়া গিয়াছিল। উহা রোগীদের প্রাইভেট ফাণ্ডে জমা আছে। আপনি নিজে অথবা লিখিত অধিকারসহ অন্য কোনো লোক পাঠাইয়া টাকাটা ফেরত লইবার ব্যবস্থা করিবেন।"

চিঠিটা সে তখনই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল।

পরের ইতিহাসটুকু আরও সংক্ষিপ্ত। আফিসের বাবুরা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে সামান্য কিছু টাকা এনে দিয়েছিল ওর হাতে। তার থেকে বাকী বাড়িভাড়া এবং অন্যান্য খুচরো দেনা যা ছিল, শোধ দিয়ে, সামান্য কয়েকখানা নোট সম্বল করে এই বস্তির ঘরে উঠে এসেছিল। খোকা তখন দুবছরের। কটি ভদ্রলোক যা করেছিলেন, তার তুলনা নেই। কিন্তু সবাই ছাপোষা গরিব কেরানী। নির্মলা তাদের বোঝা বাড়াতে চায়নি। পাছে ওকে নিয়ে তারা আরও বিব্রত হয়ে পড়েন, তাই তাদের না জানিয়েই চলে এসেছিল।

* * * *

সমস্ত রাত বারান্দার সেই খুঁটিটায় ঠেসান দিয়ে বসে, কখনো জাগ্রত চিন্তা, কখনো অর্ধ-চেতন জড়তার ভিতর দিয়ে নির্মলা তার পিছনে ফেলে আসা দিনগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল, অনেকদিন আগে পড়া পুরনো বই-এর পাতা যেমন করে লোকে উলটে দেখে। ইচ্ছে করে হয়তো নয়, দুঃসহ ভারে নুইয়ে-পড়া মনের উপর আপনা হতেই সে ছবিগুলো ভেসে ভেসে উঠছিল। তারপর এক সময়ে আর ভাববার শক্তি রইল না। সূক্ষ্ম স্নায়ুজালের রন্ধ্রে রন্ধ্রে নেমে এল গভীর ক্লান্তি। চোখ-দুটো বুজে এল। অবসন্ন দেহখানা লুটিয়ে পড়ল মেঝের উপর। কতক্ষণ তেমন করে পড়েছিল, সে জানতে পারেনি। হঠাৎ যেন মনে হল খোকা এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে, কানের-কাছে মুখ নিয়ে ডাকছে, মা, ওঠো। তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসে চারদিকে চেয়ে দেখল, কেউ কোথাও নেই। দূর আকাশের কোলে অন্ধকারের আবরণ অনেকখানি পাতলা হয়ে গেছে। বস্তির এখানে সেখানে জেগে উঠেছে আরব্ধ জীবন-যাত্রার আভাস।

দেহে মনে এতবড় গভীর অবসাদ নির্মলার জীবনে বোধহয় আর কখনো আসেনি। স্বামী যেদিন গেলেন, সেই নিদারুণ দুর্দিনেও চারদিকটা এমন শূন্য হয়ে যায়নি। তখন তার বুক জুড়ে ছিল খোকা। ঐ একফোঁটা শিশুই যেন তার সব শূন্যতা ভরে দিয়েছিল। আজ সেও চলে গেল। সামনে পিছনে কেউ কোথাও নেই। এই চরম বিপদের কথা কার কাছে গিয়ে জানাবে সে? কে তার খোকার সন্ধান এনে

দেবে? এতদিন পরে মনে হল, আজ যদি মা থাকত। মা নেই, সে খবরটা এখানেই পেয়েছিল, তাঁর মৃত্যুর বেশ কিছুদিন পরে। বস্তির স্কুলের মাষ্টারমশাই বলেছিলেন খোকাকে। কোত্থেকে যেন জানতে পেরে-ছিলেন। শুনে খানিকটা স্তব্ধ হয়ে বসেছিল নির্মলা। খোকার দিকে চেয়ে দাঁত মুখ চেপে কোনরকমে কান্না রোধ করেছিল। কিন্তু নিঃশ্বাস চাপতে পরেনি। সে নিঃশ্বাসে সেদিন শোকের চেয়ে স্বস্তিই বোধহয় ছিল বেশী। মনে মনে বলেছিল, এ ভালই হল। জামাই-এর আশ্রয় ও অন্ন বেশীদিন ভোগ করতে হল না, ছোট মেয়ের এই রাজৈশ্বর্যও দেখে যেতে হল না। আজ কিন্তু মায়ের অভাবটাই মনে পড়ল সকলের আগে। এমন দিনে বোধহয় সকলেরই পড়ে। জীবনের আকাশে যখন রিক্ততার পূর্ণগ্রাস দেখা দেয়, সেই নিঃসীম অন্ধকারে একটি মাত্র আলোর রেখা তখনো বেঁচে থাকে। সেটি মায়ের মুখ। সারাজীবনে যে মাকে ডাকেনি, মায়ের কথা ভাবেনি, মৃত্যুশয্যায় শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে তার মুখ থেকেও একটি মাত্র শব্দ বেরিয়ে আসে – মা।

মায়ের সঙ্গে সঙ্গে দিদিদের কথাও মনে হল নির্মলার। দুজনের কেউ কোলকাতায় নেই। বড়দিরা বদলি হয়ে গেছে সেই কোথায়, কুমিল্লায় না নোয়াখালি। মেজদিও কিছুদিন আগে বেড়াতে বেরিয়েছে জামাইবাবুর সঙ্গে। রেলের লোক, অনেকদিন ধরে অনেক দেশ ঘুরবে। এ-দুটো খবরও জানিয়েছিলেন মাষ্টারমশাই। খোকাকে ডেকে বলেছিলেন একদিন। খোকা ঠিক বুঝতে পারেনি। মাসিদের কথা সে জানত না। ভাসাভাসা যা বলেছিল, তার থেকেই বুঝে নিয়েছিল নির্মলা।

মাষ্টারমশাইয়ের কথা মনে হতেই একটু যেন ভরসা এল নির্মলার প্রাণে। ওঁর কানে গেলে উনি নিশ্চয়ই বসে থাকবেন না। বেলা হলেই যাকে দিয়ে হোক খবর দিয়ে রাখতে হবে, ইস্কুলে আসামাত্র যেন দয়া করে একবার আসেন। ওঁর সামনে আগে কোনোদিন বেরোয়নি। উনিও এদিকে কখনো আসেন না। খোকার মুখেই যা কিছু শোনা। কিন্তু আজ তো আর তার লজ্জা করবার দিন নয়। আজ তাকে বেরোতেই হবে।

বসে থাকবার শক্তি ছিল না। ঐখানে শুয়েই, কখন সকাল হবে, তারই দিকে অধীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

তখনো দিনের আলো স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। রাস্তার বাতিগুলো জ্বলছে। হঠাৎ কতগুলো ভারী ভারী গাড়ীর শব্দ কানে এল এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বস্তিটা যেন আলোড়িত হয়ে উঠল। পুরুষদের চাপা আওয়াজ মেয়েদের কান্না ও শিশুকণ্ঠের আর্ত চীৎকারে চারদিক ভরে গেল। নির্মলা বুঝল—পুলিশ। কিন্তু কোথায় কীভাবে কার উপর দিয়ে আজকের উৎপাত শুরু হবে সেই অজানা আশঙ্কায় বুকের ভিতরটা দুর-দুর করতে লাগল। হঠাৎ তিন-চারজন ইউনিফর্ম-পরা লোক ঢুকে পড়ল তার বাড়ির মধ্যে। একজন অফিসার জাতীয় ভদ্রলোক এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে কে থাকে?

কোনোরকমে উঠে বসে নির্মলা বলল, আমি।

—আর?

—আমার ছেলে।

—কত বড় ছেলে?

—ন' বছরে পড়েছে।

—কোথায় সে?

—কাল দুপুর থেকে বাড়ি নেই।

—কেন?

—রাগ করে চলে গেছে, আর ফেরেনি।

বলতে বলতে নির্মলার স্বর রুদ্ধ হয়ে গেল। এতগুলো অচেনা অজানা পুরুষ মানুষের সামনেও চোখের জল আটকে রাখতে পারল না।

অফিসারটি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ওকে লক্ষ্য করলেন, বারান্দায় উঠে ঘরের ভিতরে একবার উঁকি দিলেন, এদিক ওদিক তাকালেন, তারপর গট-গট করে বেরিয়ে চলে গেলেন। বাকী যারা উঠোনে দাঁড়িয়ে ছিল, তারাও তাঁর অনুসরণ করল। নির্মলা ভাবছিল, ওঁরা তো পুলিশের লোক, ওঁদের কাছে বললে কি ছেলেটাকে খুঁজে এনে দিতে পারেন না? সে সুযোগ আর হল না। বলবার আগেই ওঁরা চলে গেলেন।

ঘণ্টা চারেক ধরে গোটা বস্তিটার মাথার উপর দিয়ে যেন এক

খণ্ডপ্রলয় ঘটে গেল। যেখানেই সন্দেহ হল, কাঁথা-কম্বল উলটে পালটে থালা-ঘটি-বাটি তছনছ করে মহা আড়ম্বরে ছুটে চলল তল্লাশীর ঝড়। তারপর এক সময়ে আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। কার ভাগ্যে কী ঘটল জানবার জন্যে নির্মলা যখন উদ্বেগ বোধ করছে, দুটি ছেলে এসে খবর দিল, মাষ্টারমশাইকে ধরে নিয়ে গেছে।

—কোন্ মাষ্টারমশাই ?

—বড় মাষ্টারমশাই : সাইকেল থেকে নামতেই অ্যারেষ্ট করেছে।

নির্মলার বুকের ভিতরটা যেন ওলট পালট হয়ে গেল। কোন রকমে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বলতে পারল, কেন ?

পুলিশ বলছে, উনি নাকি "স্বদেশী পার্টির" লোক ; নাম ভাঁড়িয়ে বস্তির স্কুলে চাকরি নিয়েছিলেন। ঐ সঙ্গে আরো তিনটি ছেলেকে নিয়ে গেছে।

ছেলে কটির নামও জানালো তারা। নির্মলার কানে সে কথা ঢুকল না। তখন তার সমস্ত চেতনা জুড়ে বসে আছে একটি মাত্র কথা—মাষ্টারমশাইও চলে গেলেন। মনে হল, এও যেন তারই ভাগ্যের খেলা। সংসারের পথে তাকে সকল রকমে নিঃস্ব করে ছেড়ে দেওয়াই বোধহয় বিধাতার অভিপ্রায়। তাই তার এই শেষ ভরসাটুকুও কেড়ে নিয়ে গেলেন।

—চার—

থানার গারদ থেকে কোর্ট বা জেল হাজতে যখন আসামীকে চালান করা হয় তার কোমরে দড়ি এবং হাতে হাতকড়া লাগাবার ব্যবস্থা আছে। ছাগলচুরি মামলার আসামী দিলীপ ভট্‌চাযের বেলায় দ্বিতীয় দফাটা প্রয়োগ করা হল না। তার কারণ এ নয় যে, বয়স কম বলে সিপাইরা তার উপর দয়াপরবশ হয়ে উঠলেন কিংবা থানার কর্তারা বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন বোধ করলেন। তার কারণ, অত ছোট মাপের হাতকড়া থানার মালখানায় পাওয়া গেল না। হয়তো ঐ বস্তুটি যারা তৈরি করে তাদেরই বুদ্ধি-বিবেচনার অভাব। নজর ছিল শুধু বড় বড় ক্রিমিন্যালের মোটা কবজির উপর, এই জাতীয় খুদে ক্রিমিন্যালের কথা ভেবে দেখেনি। তবু জোড়া কয়েক হাতকড়া পরখ করে দেখা হল। তার ঐ অতবড় ফাঁদালো বেড়-এর ভিতর দিয়ে খোকার গোটা হাতটা গলিয়ে দিয়ে উচ্চহাস্য করে উঠলেন পুলিশের কনষ্টেবল। তারপর সেই বেঢপ বস্তুটি সম্বন্ধে এমন একটি রুচিপূর্ণ দেহাতী গালি উচ্চারণ করলেন, যা শুনলে লোহার হাতকড়ারও কান লাল হয়ে ওঠে। সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অগত্যা ভারী দড়িটাকেই শক্ত করে বাঁধলেন। খোকার কোমরটা নুয়ে পড়ল। ধমকের সাহায্যে তাকে যথাসম্ভব সোজা রাখবার ব্যবস্থা করে দড়ির একটা ধার ধরে বীরদর্পে বেরিয়ে পড়লেন কোর্টের দিকে।

দৃশ্যটা থানা অফিসারের নজরে পড়ল। বোধ হয় বলতে গেলেন, অতটুকু একটা ছেলে, হাত চেপে ধরে নিয়ে গেলেই চলে। কী দরকার ছিল ঐ ভারী মোটা দড়িটা ওর কোমরে জড়াবার? বলতে গিয়েই থেমে গেলেন। হুকুমটা বেআইনী; কনেষ্টবল হয়তো শুনবে না। শোনেও যদি এবং তারপর ইচ্ছা করে ছেড়ে দিয়ে ফিরে এসে রিপোর্ট দেয়, আসামী পালিয়ে গেছে, দারোগাবাবুর চাকরি নিয়ে টানাটানি। সাধ করে ওসব ঝক্কি ঘাড়ে নেবার কী দরকার? পুলিশের চাকরিতে হৃদয়বৃত্তির স্থান নেই।

খোকাকে যেখানে নিয়ে যাওয়া হল, চলতি ভাষায় তার নাম ছোকরা-জেল। আসলে সেটা জেল নয়, হাজত; বিচারের আগে কমবয়সী আসামীদের আটক করে রাখবার খোঁয়াড়। ওর মত, এবং বেশীর ভাগ ওর চেয়ে বড়, বিশ বাইশটা ছেলে একটা ঘরের মধ্যে জটলা করছিল। একদিকে বসেছে 'বাঘবন্দী'র আসর। খেলছে বোধ হয় দুজন আর তাদের ঘিরে হল্লা করছে জন দশেক। আর একদিকে দুজনে মিলে লড়াই শুরু হয়েছে। চড়, কীল, ঘুষি চলছে বেপরোয়া। দুতরফেই উৎসাহ দেবার প্রচুর আয়োজন। হঠাৎ সব থেমে গেল। 'বাঘবন্দীর' দল বাঘকে খোলা রেখেই উঠে দাঁড়াল। পুরো লড়াইএর মাঝখানে সহসা দুপক্ষে বিনাসর্তে সন্ধি হয়ে গেল। এত কাণ্ডের মধ্যেও ঘরের একটা কোণ ঘেঁষে যে দুটো ছেলে শুয়ে শুয়ে কী করছিল, তারাও ধড়মড় করে উঠে বসল। সকলেরই দৃষ্টি দরজার দিকে। নতুন আমদানীর গন্ধ পেয়েছে, সব আগ্রহ গিয়ে পড়েছে তারই উপর। এই একখানা ঘরের চার দেওয়ালে ঘেরা যে জগৎ, তার মধ্যে মাঝে মাঝে বাইরে থেকে আসে এক একখানা নতুন মুখ। ঐটুকুই ওদের বৈচিত্র্যের স্বাদ। আপাততঃ সব ফেলে তাকে নিয়েই মেতে উঠবার পালা।

কোমরে জড়ানো ভারী বোঝা; তার উপর রোদের মধ্যে অনেকটা পথ হেঁটে আসতে হয়েছে। লোহার ফটক খুলে ভিতরে ঢুকিয়ে দিতেই, খোকা দপ করে মেঝের উপর বসে পড়ল। সমস্ত মুখটা লাল, তার উপর ঘামের সঙ্গে মিশে গেছে চোখের জল। ভয়ে ভয়ে চারদিকটা একবার দেখে নিয়েই মাথা নিচু করল। ব্যঙ্গ ও কৌতুকে ভরা একদল নিষ্ঠুর মুখ। স্নেহ, সখ্য বা মমতার কোনো আভাস সেখানে চোখে পড়ল না।

ফটক বন্ধ করে সিপাই সরে যেতেই কতগুলো ছেলে এগিয়ে এসে খোকাকে ঘিরে ফেলল। ঢ্যাঙা মতন একজন ওর গা ঘেঁষে বসে ছদ্ম সহানুভূতির সুরে বলল, 'আহাহা! ঘেমে যে নেয়ে উঠেছ। আচ্ছা, আমি বাতাস করছি।' বলেই একটা ময়লা রুমাল বের করে মুখের কাছে নাড়তে শুরু করে দিল। চারদিকে হাসির ধুম পড়ে গেল। আর একটা ছেলে ওর চিবুকটা নেড়ে দিয়ে মুখখানা ছুঁচলো করে বলে

উঠল—'খোকার পুতুল টুকটুক, দুধ খায় চুকচুক।' সঙ্গে সঙ্গে আরেক দফা হাসির রোল। এর পরে যে এল সেই বোধ হয় সবচেয়ে বেশী রসিক। পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে খোকার মুখে গুঁজে দিয়ে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, খিদে পেয়েছে? খাও, খাও, একটা বিড়ি খাও।

বিড়ির গন্ধ খোকা একেবারেই সইতে পারত না। একে সকাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি, তার উপরে ঐ গন্ধটা নাকে যেতেই গা পাক দিয়ে উঠল। ওয়াক তুলতেই ছেলের দল নানারকম কলরব করে ছিটকে পিছিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের একটা কোণ থেকে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল একটি বড় গোছের ছেলে। ধমকের স্বরে বলল, 'এই, আবার তোরা নতুন ছেলের পেছনে লেগেছিস। দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা।' বলেই, মজাটা শুধু মুখে নয়, হাতে-কলমেও দেখিয়ে দিল, অর্থাৎ হাতের কাছে যারা পড়ল, তাদের কারো কান, কারো চুল টেনে, কারো গালে বেশ ভারী ওজনের চড় কষিয়ে, মিনিট দুয়েকের মধ্যে জায়গাটা ফাঁকা করে ফেলল।

খোকা তখন আর বসে থাকতে না পেরে শুয়ে পড়েছে। তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বড় ছেলেটি বলল, এই, কী নাম তোর?

খোকা ক্ষীণকণ্ঠে সাড়া দিল, দিলীপ।

—কী করেছিস?

—কিছু করিনি।

—কিছু করিসনি, তবে পুলিশে ধরল কেন?

দিলীপ কি জবাব দেবে ভেবে পেল না। প্রশ্নকর্তা ধমকে উঠল, কথা কসনা কেন? হাবা নাকি?

খোকা ভয়ে ভয়ে বলল, একজনে একটা ছাগল ধরে আনতে বলেছিল—

—ও, আর বলতে হবে না। তুই একটা গাধা। সকালে কিছু খেয়েছিস?

খোকা মাথা নাড়ল।

'শালারা!' বলে সে দাঁতে দাঁত ঘষে চিৎকার করে ডাকল, ও সিপাইজী।

গেটের ওধারে অদৃশ্য স্থান থেকে সাড়া এল, কেয়া হুয়া ?

ছেলেটা আপন মনে বিড় বিড় করে বলল, 'কেয়া হুয়া! ব্যাটা লাটসায়েব!' প্রকাশ্যে বলল, এধার আইয়ে না থোড়া মেহেরবানি করকে!

গেটরক্ষী ফটকের ওপাশে দেখা দিয়ে বিরক্তির সুরে বলল, ক্যা বোলতা হ্যয় ?

—বোলতা হ্যয় যে ছোট ছোট লেড়কা লোগ্‌কা ভুখ লাগ গিয়া। খানা কব দেগা ?

—দেগা যব্ টাইম হোগা ?

—টাইম তো হয়ে গ্যাছে।

—হোয়ে গেছে তো মিল্ যায়গা। চুপচাপ রহো। চিল্লানেসে রিপোর্ট্ হো যায়গা।

—রিপোর্ট্ ফিপোর্ট্ এর পরোয়া আমি করি না। আমার নাম রতন সিকদার। অনেকবার এসেছি এখানে। জমাদারকে ডেকে দিন।

—জমাদার তোমারা নোকর হ্যয় ?

—আচ্ছা, এখনি দেখিয়ে দিচ্ছি, নোকর হ্যয় না কী হ্যয়। সবাই মিলে এমন চেল্লানো শুরু করবো, যে সায়েব পর্যন্ত ছুটে আসবে।

'এই', বলে দলবলের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে সেই মোক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করবার বন্দোবস্তই বোধ হয় করতে যাচ্ছিল, এমন সময় জমাদার সাহেবের সাড়া পাওয়া গেল, 'কী হোল রে রতন ?'

—আজ্ঞে কিছুনা, একটু যেন লজ্জিতভাবে বলল রতন, বড্ড খিদে পেয়ে গেছে।

—'থালা বাটি লেকে চলা আও।' সিপাইএর দিকে ফিরে বলল, 'খোলো'।

মুহূর্ত মধ্যে যেন ডাকাত পড়ল ঘরের ভিতর। একপাল ডানপিটে ছেলের হল্লা ছুটোছুটি এবং তার সঙ্গে অ্যালুমিনিয়াম থালা বাটির তুমুল শব্দ। গেট খুলতে তর সয় না। কে কার আগে বেরোবে, তাই নিয়ে ঠেলাঠেলি। জমাদার এগিয়ে এল বেটন উঁচিয়ে। দু এক ঘা পড়লও কারো কারো পিঠে। তার জন্যে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। সেই জটলার

মধ্যে হাতে একটা হেঁচকা টান পড়তেই উঠে বসল দিলীপ। রতন চেঁচিয়ে উঠল, এই ছোঁড়া, এখনো শুয়ে আছিস। চল, খাবিনে?

খাবার ব্যবস্থা বারান্দায়। মেঝের উপর লাইন করে উবু হয়ে বসেছে ছেলেগুলো। সামনে থালা, তার পাশে বাটিতে খাবার জল। থালার উপর ঝনঝন আওয়াজ করে পড়ল এসে এক 'কাঠা' ভাত, তার একটার গায়ে আর একটা মিলছেনা, সব আলাদা বসে একে অন্যের দিকে চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে আছে। আর একজন এসে হড়হড় করে ঢেলে দিল এক 'ডাবু' ডাল, তারও দানার সঙ্গে জলের অসহযোগ। তৃতীয় এবং শেষ দফায় এল হরেক রকম আনাজ ঘেঁটে একটি কালচে রঙের আধা তরল রাসায়নিক পদার্থ, যার নাম তরকারী।

পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে তারস্বরে প্রতিবাদ চলছে. 'কম দিচ্ছ কেন।' 'ডাবু ভরেনি আর একটু দাও', 'হামকো আলু নেই দিয়া'. 'খালি ঝোল দিচ্ছ যে. তরকারী কই?' কর্তৃপক্ষের তরফ থেকেও তার সমুচিত জবাব দেওয়া হচ্ছে, 'চোপরাও', 'ঈস! লাটসায়েব। আলু চাই', 'না খাবি তো উঠে যা'—ইত্যাদি। কেউ কেউ থালা হাতে লাইন ভেঙে উঠে দাঁড়াচ্ছে, সামনে এগিয়ে বরাদ্দ পাওনা আদায় করবে বলে। পরিবেশনকারীর দল (তারাও ওদেরই মত ছোকরা-জেলের বাসিন্দা) 'ডাবু'র ডাণ্ডা উঁচিয়ে তেড়ে আসছে. কিংবা সিপাই এসে বসিয়ে দিচ্ছে ঘাড় ধরে।

এই হট্টগোলের একধারে মাথা নিচু করে বসে দিলীপ তার ভাতগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। দু'এক গ্রাস মুখে দিয়েছিল, আর পারেনি। খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে, তবু এ-খাবার তার গলা দিয়ে নামবে না। এত শক্ত মোটা মোটা ভাত, এরকম ডাল তরকারী সে কোনোদিন চোখেও দেখেনি, বিশেষ ক'রে এই রান্না! বাড়িতে যা সে খায়, সেও সামান্য ডাল-ভাত, তার সঙ্গে একটা দুটো সাধারণ তরকারী, কখনো-সখনো এক টুকরা মাছ। কিন্তু তার সবটুকুই অমৃত। সেই স্বাদ যেন মুখে লেগে আছে। জেলের অন্ন না হয়ে পরমান্ন হলেও এটা আজ তার মুখে উঠত না।

চারদিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে দেখল, সকলেই গোগ্রাসে

গিলছে। ওদিকে যাদের খাওয়া হয়ে গেছে, তারা শূন্য থালার উপর প্রাণপণে আঙুল ঘষছে এবং একটা অদ্ভুত শব্দ করে সেই আঙুলগুলো চুষে যাচ্ছে। কেউ কেউ আবার থালাটা তুলে ধরে লম্বা জিব বের করে চাটছে। খোকার ঠিক ডানপাশে যে বসেছিল, লোলুপদৃষ্টিতে কয়েকবার ওর থালার দিকে তাকিয়ে দেখে ফিসফিস করে বলল, তুই খাবিনে?

খোকা মাথা নাড়ল, এবং সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটা আর কোনো অনুমতির অপেক্ষা না করে খপ করে ওর থালা থেকে খানিকটা ভাত তরকারী তুলে নিল। বাঁপাশে যে ছিল তারও লক্ষ্য ছিল এইদিকে। সে-ই বা ছাড়বে কেন? কিন্তু হাত বাড়াতেই বাধা এল ডান পাশের দাবিদারের কাছ থেকে। তার গায়ের জোর বেশী। বাঁ ধারওয়ালা তখন চেঁচিয়ে উঠল। শুরু হল কাড়াকাড়ি এবং পলকের মধ্যে সেটা মারামারিতে গিয়ে দাঁড়াল। দুজন সিপাই বেটন উঁচিয়ে ছুটে এল এবং কয়েক ঘা না বসিয়ে দুজনের কাউকে ছাড়াতে পারল না।

খোকার উপরেও ওদের দু-চারটা কিল ঘুষি এসে পড়েছিল। সেই সঙ্গে কিছু ডাল মাখা ভাত। একপাশে দাঁড়িয়ে সেগুলো যখন ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করছে, রতন কোত্থেকে এসে বলল, বাঁদর দুটো তোকে খেতে দিল না? চল, জমাদারকে বলে তোকে নতুন ভাত-ডাল আনিয়ে দিচ্ছি।

দিলীপ মাথা নেড়ে বলল, আমি খাবো না

—খাবি না! কেন?

দিলীপ কোনো উত্তর দিল না। রতন হেসে ফেলে বলল, দূর বোকা! না খেয়ে সারাদিন থাকবি কেমন করে?

খোকার হাত ধরে টানতেও সে যখন নড়তে চাইল না, স্বাভাবিক রূঢ় কণ্ঠ যতটা সম্ভব মোলায়েম করে বলল, জেলে এসে পেরথম পেরথম ঐরকম লাগে। তারপর দেখবি, সব সয়ে যাবে। চল।

মাসখানেকের মধ্যেই দিলীপ ভট্টাচার্যের মামলা তৈরি হয়ে গেল। সোজা কেস্। চোরাই মাল সমেত হাতে-নাতে ধরা পড়েছে আসামী।

তদন্তের জটিলতা নেই। সাক্ষী-সাবুদের বাহুল্য নেই। তবু থানা-অফিসার কিছুদিন সময় নিলেন, কসাই দুটোকে ধরা যায় কিনা। সে চেষ্টা যথারীতি ব্যর্থ হল। দিলীপই একমাত্র আসামী। তার বিরুদ্ধে ৩৭৯ ধারার সঙ্গে ৪১১ ধারা যোগ করে রিপোর্ট পাঠিয়ে দিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট একজন মহিলা। বিভিন্ন ধরনের সোস্থাল ওয়ার্ক অর্থাৎ সমাজসেবায় নেতৃত্ব করে থাকেন। প্রশ্ন উঠবে, তার উপরে বিচারের ভার কেন? অন্য কোনো বিচারমঞ্চে তো নারীর আবির্ভাব ঘটেনি। 'বার'এ কেউ কেউ ঢুকেছেন, 'বেঞ্চ' পর্যন্ত পৌঁছতে পারেননি। এখানে যে এ ব্যবস্থা হল, তার কারণ বোধহয় আসামীদের বয়স। এখানে যাদের বিচার হয় সব "ছোকরা,"—শিশু ও কিশোর। মাতৃজাতির হাতে তারা সন্তানসুলভ ব্যবহার পাবে, এই রকম কোনো উদ্দেশ্য হয় তে উদয় হয়ে থাকবে কর্তৃপক্ষের মনে। কিন্তু আইন প্রণয়ন বিচারকের হাতে নেই, আছে শুধু তার প্রয়োগ। শুধু সেইটুকুতে তাঁর 'মাতৃত্ব' প্রকাশের অবকাশ কতখানি? স্ত্রী-ডাক্তার নিজের হাতে ব্যবস্থাপত্র লিখলেই কি কুইনাইনের তিক্ততা চলে যায় না, কমে যায়? নারী-হস্তের স্পর্শে আইনের কঠোর ধারগুলো মোলায়েম হয়ে উঠবে, সে-ও তেমনি দুরাশা মাত্র।

ধরুন, যদি হয়, সেইটাই কি বাঞ্ছনীয়? অস্ত্রোপচার করতে গিয়ে পুরুষ-সার্জন যেভাবে ছুরি চালান, মহিলা-সার্জনকেও সেই একই ভাবে চালাতে হবে! সেখানে যদি ক্ষিপ্রতার অভাব দেখা দেয়, দ্বিধ জাগে, করুণা বা মমতার আবির্ভাব ঘটে, বুঝতে হবে তিনি অক্ষম চিকিৎসক। নারীসুলভ দুর্বলতা দেখাতে গিয়ে তিনি চিকিৎসার বিধি লঙ্ঘন করেছেন। যেখানে কঠোরতার প্রয়োজন, কোমলতার প্রয়োগ সেখানে অপপ্রয়োগ। আইনের বেলাতেও তাই। সুতরাং ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে নারী ও পুরুষে কোনো তফাত নেই। আইনের বিধানকে যদি যথাযথ প্রয়োগ করতে হয়, উভয়কেই সমান কঠোর বা সমান কোমল হতে হবে। একজন মহিলাকে বিচারাসনে বসাবার মূলে যদি কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য থেকে থাকে, সেটা মহৎ হলেও ন্যায়ানুগ নয়।

আরো প্রশ্ন আছে। এ ধারনা কোথা থেকে এল যে,

শিশু-অপরাধীর উপর নারীর দৃষ্টি পুরুষের চেয়ে কোমলতর? কে বললে পুরুষ জাতির চেয়ে নারীজাতি কম নিষ্ঠুর? ইতিহাস কি বহুক্ষেত্রে এর বিরুদ্ধ-সাক্ষ্য দেয়নি? প্রতিদিনের সংসার-যাত্রা কি প্রায়শঃ অন্য কথা বলে না? একটি দৃষ্টান্তই বোধহয় যথেষ্ট। বালক-ভৃত্যের উপর গৃহস্থের যে অবহেলা, উৎপীড়ন কিংবা নির্মম অবিবেচনা প্রায় সর্ব দেশ এবং সর্ব কালের সাধারণ ঘটনা, খুঁজলে দেখা যাবে, তার মধ্যে গৃহকর্তার হাত যদি বা থাকে, প্রেরণা গৃহিণীর।

কিন্তু বহুদিনের বদ্ধমূল সংস্কার, যে নারীর প্রাণ কোমল। এক্ষেত্রেও তাই কোর্টবাবু, একটু বেশী সতর্ক। বিদূষী বা বুদ্ধিমতী যতই হোন, তবু তো মেয়ে-মানুষ! কি জানি কী বিভ্রাট বাধিয়ে বসেন! দেখিয়ে বসেন কোথায় কী দুর্বলতা! পুরুষ হাকিম হলে সে ভাবনা ছিল না। এঁর বেলায় শক্ত হাতে হাল ধরতে হয়। যতটা প্রয়োজন, তার চেয়ে কঠোরতর মনোভাব নিয়ে এগোতে হয়। দিলীপের ব্যাপারেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না।

আসামী কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই কোর্টবাবু বাজখাঁই গলায় ধমকে উঠলেন, এর আগে কবার চুরি করেছিস?

জবাব দিতে গিয়ে দিলীপের গলা কেঁপে গেল, কথাগুলোও ঠিক বোঝা গেল না।

কী বললি? হুঙ্কার দিলেন কোর্টবাবু। ক্ষীণ-কণ্ঠে উত্তর এল, আমি চুরি করিনি।

— চুরি করিনি! ন্যাকা!—মুখ ভেংচে এইটুকু বলেই তিনি হাকিমের দিকে ফিরলেন এবং হাত পা নেড়ে বক্তৃতার ভঙ্গিতে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, এখন থেকে সাবধান না হলে এই সব খুদে অপরাধী ভবিষ্যতে বিপজ্জনক সমাজবিরোধী শক্তিতে পরিণত হবে। ছাগল ছেড়ে কাপড়-চোপড়, থালা-বাটি এবং ক্রমশঃ হাত পাকিয়ে পাকিয়ে টাকা-কড়ি, গয়না-গাঁটিতে গিয়ে পৌঁছবে। ভদ্রঘরে জন্ম হলেও বর্তমানে যে স্তরে নেমে গেছে সেখান থেকে এখনই এদের কঠোর হস্তে উৎপাটন করা প্রয়োজন। তা যদি না হয়, এই দিলীপ ভট্টচাজ আরো অনেক দিলীপকে সংক্রামিত করবে। সে-রোগের বীজ ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়বে সমাজের উচ্চস্তরে। সুতরাং—

বক্তৃতার মাঝখানেই খোকা হাকিমের দিকে ফিরে বলে উঠল, আ
চুরি করিনি। আমাকে আমার মার কাছে পাঠিয়ে দিন। আর কখ্খনে
বাইরে যাবো না।

বলতে বলতে দু-চোখ জলে ভরে উঠল। তাড়াতাড়ি কোঁচার খুঁে
চোখ মুছে আবার কি বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় হাকিম কোর্টবাবুর দিবে
মুখ তুলে বললেন, ওর মায়ের কোনো খোঁজ করা হয়েছিল?

—চেষ্টার ত্রুটি হয়নি, ইওর অনার। কিন্তু ঠিকানা বলতে ন
পারলে কোলকাতার শহরে একটা মেয়েছেলেকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়

—কোন্ বস্তিতে থাকে তাও বলতে পারছে না?

—কোন্ দিকে, তাও ঠিকমত দেখাতে পারে না। ও-সি অনেব
জিজ্ঞাসাবাদ করেও কোনো হদিস করতে পারেনি। তার রিপোর্টেঃ
রয়েছে সে কথা। ইওর অনার মে হ্যাভ এ লুক্।

ম্যাজিস্ট্রেট আর কোনো প্রশ্ন করলেন না, সামনে-রাখা নথিপত্রেঃ
দিকে চোখ ফেরালেন।

কোর্টবাবু তার অসমাপ্ত বক্তৃতায় ফিরে গিয়ে বললেন, তদন্তকারী
অফিসারের রিপোর্ট থেকে পাওয়া যাচ্ছে, এই আসামীর একমাত্র মা ছাড়
অন্য অভিভাবক নেই। কোনো বস্তিতে একখানা ঘর নিয়ে থাকে এব
সম্ভবতঃ ঝি বা ঐ জাতীয় কোনো কাজকর্ম করে স্ত্রীলোকটিকে নিজের ও
ছেলের ভরণপোষণ চালাতে হয়। ছেলেকে বস্তি-জীবনের অসৎসঙ্গ থেবে
বাঁচাবার তার সময় নেই, সামর্থ্যও নেই। তারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমর
দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং মাকে খুঁজে পেলেও সেখানে ফিরে যাওয়
আসামীর পক্ষে কল্যাণকর নয়, সমাজের পক্ষেও অবাঞ্ছনীয়। বেঙ্গল
চিলড্রেন অ্যাক্ট প্রয়োগ করবার এ রকম উপযুক্ত ক্ষেত্র আর হতে
পারে না।

ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর অভিজ্ঞ কোর্টঅফিসারের সঙ্গে একমত না হবাঃ
কারণ দেখতে পেলেন না। সেই দিনই 'রায়' দিলেন, এবং তাতে বিশে
ভাবে উল্লেখ করলেন,—আপাত-দৃষ্টিতে চুরিটা সামান্য বলে মনে হলেও
একে উপেক্ষা করা যায় না। কালক্রমে এর মধ্যেই বৃহত্তর অপরাধে
সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আসামীর নিজের মঙ্গল

এবং সমাজস্বার্থের প্রয়োজন বিবেচনা করে, তাকে যোল বছর বয়স পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ইন্‌ডাসটি্রয়াল স্কুলে আবদ্ধ রাখবার আদেশ দেওয়া হল।

ডাক্তারের সাক্ষ্য অনুসারে আসামীর বয়স তখন দশ। তাকে যখন বুঝিয়ে দেওয়া হল, জেল নয়, ছ বছর তাকে কোন্ একটা ইস্কুলে রেখে লেখাপড়া, কাজকর্ম শেখানো হবে, দিলীপ কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে বলল, আমি সে ইস্কুলে পড়বো না। আমাদের বস্তিতে ইস্কুল আছে। মাষ্টারমশাই খুব ভালো পড়ান, খুব ভালোবাসেন আমাকে।

কোর্টে যারা ছিল, সকলের চোখেমুখে একটা চাপা হাসির ঝিলিক খেলে গেল। হাকিম গম্ভীরভাবে পেশকারকে অন্য কেস্ পেশ করবার নির্দেশ দিলেন।

একজন কনষ্টেবল এগিয়ে এসে যখন তাকে ডক্ থেকে নেমে আসতে ইঙ্গিত করল, খোকার অসহায়, ভয়ার্ত চোখ দুটো নানা মুখ ঘুরে হাকিমের উপর গিয়ে পড়ল; এবং যে-আবেদন সে জনে-জনের কাছে করেছে, কিন্তু সাড়া পায়নি, আরেকবার তারই পুনরুক্তি শোনা গেল তার করুণ কণ্ঠে—'আমি মার কাছে যাবো।'

নারী-ম্যাজিষ্ট্রেট্ তখন অন্য ফাইলের উপর ঝুঁকে পড়েছেন। কথাটা কানে গেলেও বোধ হয় মন দেবার প্রয়োজন বোধ করলেন না।

—পাঁচ—

বর্ষ্টাল স্কুল। কিছুদিন আগেও ছিল ফার্ষ্ট ক্লাশ ডিষ্ট্রীক্ট জেল চারদিক ঘিরে চৌদ্দ ফুট উঁচু পাঁচিল, মাঝখানে মোটা মোটা লোহা গরাদ-দেওয়া বড় বড় ব্যারাক, তার পাশে সেল্, ওয়ার্কশপ, কিচেন গুদামের লম্বা লাইন। চার পাঁচশ বিভিন্ন-মেয়াদী কয়েদীর আস্তানা শুধু 'ক্রিমিন্যাল প্রিজনার' নয়, চোর, ডাকাত, খুনী, জালিয়াৎ এক পাশে সরিয়ে বাকী ব্যারাকগুলোয় মাঝে মাঝে জড়ো করা হত 'স্বদেশী' বন্দী দল। কিছুদিনের জন্য একবার সুভাষচন্দ্রকেও আসতে হয়েছিল দোতলার পশ্চিমপ্রান্তে ঐ ছোট ঘরটা তাঁর বহুস্বপ্নের সাক্ষী হয়ে আছে ঘর থেকে বেরিয়েই খানিকটা খোলা ছাদ। সকালে বিকালে তার উপর পায়চারি করতেন। কখনো স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকতেন নদী এবং তা পরপারে ঐ ঘননিবেশ গাছপালার দিকে। জেল ছাড়িয়ে একটুখানি ফাঁকা জায়গা, তার পরেই গঙ্গা। সেখান দিয়ে নৌকা করে যারা যেত, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখত সেই সৌম্য মূর্তি। প্রশস্ত ললাটে অস্তমান সূর্যের স্বর্ণালোক। অবাক হয়ে ভাবত, এ কোন্ জ্যোতির্ময় পুরুষের আবির্ভা হল জেলখানায়!

'গেট্' পার হয়ে ভিতরে ঢুকলেই মাঠ। তার পূর্ব দিকে এখানে সেখানে দাঁড়িয়ে কতগুলো বট অশত্থ গাছ। বিরাট গুঁড়ির চারদিকে মাটি কিংবা ইঁট দিয়ে কবে বাঁধিয়ে দিয়েছিল সিপাইরা। তার কোনোটার উপরে বসে কাজী নজরুল ইসলাম উদ্দীপ্ত কণ্ঠে আবৃ করেছিলেন তাঁর সত্যোরচিত বিদ্রোহ-গাথা—

কারার এই লৌহকপাট
ভেঙে ফেল, কররে লোপাট,

বিদ্রোহের শাস্তিও নিশ্চয় পেয়েছিলেন। এ কাহিনী সত্য না কিংবদন্তী যদি সত্য হয়, কোথায় কোন গাছটির বেদী-মূলে সেদিন ধ্বনিত হয়েছি

সেই গম্ভীর মধুর বলিষ্ঠ কণ্ঠ, আজ আর জানবার উপায় নেই। কবি শুধু স্তব্ধ নন, আচ্ছন্ন-মানস।

সেই ডিষ্ট্রীক্ট জেল হঠাৎ একদিন জেল-জন্ম ঘুচিয়ে দিয়ে হয়ে গেল স্কুল,—বর্ষ্টাল স্কুল। বাইরের চেহারা একই রয়ে গেল। সেই কালো পাঁচিল, ব্যারাক, সেল, সেই আউটার ও ঈনার গেট। শুধু অষ্টপ্রহর বন্ধ না রেখে, তাদের পাল্লাগুলো খুলে দেওয়া হল সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত; আর গেটের মাথাব উপর ঝুলিয়ে দেওয়া হল মস্তবড় সাইনবোর্ড BE MEN—মানুষ হও।

শোনা যায় বার্ণাড শ' নাকি কোন্ জেল কিংবা ঐ জাতীয় কোনো প্রতিষ্ঠানের গেটের মাথায় এই ধরনের সাইনবোর্ড দেখে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ তির্যক ভঙ্গিতে মন্তব্য করেছিলেন, উপদেশটা বোধ হয় আমার মত ভিজিটারদের জন্যে। ভিতরে যারা থাকে, তারা তো এটা দেখতে পায় না।

বর্ষ্টালের কর্তৃপক্ষ সে প্রশ্নের অবকাশ রাখেননি, আরেকখানা সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দিয়েছেন ভিতরে, মেইন ব্যারাকের গায়ে। নবাগত আবাসিক ঈনার গেট পার হলেই দেখতে পাবে BE MEN; দেখে অনুপ্রাণিত হবে, অবশ্য যদি তার ইংরেজি অক্ষর পরিচয় থাকে।

গেট দুটো খুলে দিয়ে এবং তার মাথার উপর বিজ্ঞাপন টাঙিয়ে কারাবিভাগের কর্তারা বুঝিয়ে দিলেন, এটা জেল নয়, স্কুল। কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দাদের ভুল ভাঙ্গল না। তাদের চোখের উপর এখনো যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সেই উদ্ধত প্রাচীর। তাই ইস্কুল কেউ বলে না, বলে, 'বোরোষ্টাল জেল।' এই কটমট কথাটার মানে তাদের জানবার কথা নয়। ইংলণ্ডের কোনখানে ঐ নামে নাকি একটা ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল, কে কবে সেখানে কতগুলো ক্ষুদে অপরাধী জড়ো করে তৈরি করেছিল নতুন ধরনের কয়েদখানা, কোন্ আদর্শে কী উপায়ে তাদের মানুষ করা হত, এ সব নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। শুধু এইটুকু সম্বন্ধে তারা নিশ্চিত, এক সময়ে ছিল এটা বড়দের জেল, এখন ছোটদের।

আসল পরিবর্তন সেইখানেই। শ পাঁচেক প্রাপ্তবয়স্ক কয়েদী অন্যত্র চালান দিয়ে, এতবড় বাড়িটায় যাদের জায়গা হল, তাদের সংখ্যা

আশী-বিরাশী, বয়স আট থেকে একুশ। তার মধ্যে দুটো গ্রুপ্ বা শ্রেণী —'ইনডাসটি্রয়াল বয়েজ', ষোল পুরলেই যারা বেরিয়ে যাবে, আর 'বর্স্টাল বয়েজ', ষোল না হলে যারা এখানে ঢুকতে পাবে না। আইনের ভাষায় এবং সরকারী পরিচয়ে এরাও 'কনভিক্‌ট্', অর্থাৎ কয়েদী। কোনো স্পেসিফিক্ বা সুনির্দিষ্ট অপরাধে ফৌজদারী আইনের কোনো ধারায় উপযুক্ত কোর্ট্ যাকে দণ্ড দিয়েছেন, সে-ই শুধু এই 'স্কুলের' 'ছাত্র' হবার যোগ্য। তার বাইরে আর কারো এ অধিকার নেই।

অনেকের ধারণা, এটা দুষ্টু এবং বেয়াড়া ছেলেদের শায়েস্তা করবার জায়গা। তাদের কাছ থেকে প্রায় প্রতিদিন নানা ধরনের আবেদন আসে। বিপন্ন ধনী অভিভাবক তার বয়ে-যাওয়া ছেলে বা নিকট আত্মীয়কে কড়া শাসনে রেখে একটু ঠাণ্ডা করে দেবার অনুরোধ নিয়ে অধ্যক্ষের দ্বারস্থ হন। কেউ প্রস্‌পেকটাস্ চেয়ে পাঠান, কত বছরের কোর্স, কী কী শেখানো হয় এই সব তথ্যের ফিরিস্তি সমেত। এখানে ঢুকতে হলে কতটা বিদ্যা চাই এবং বেরিয়ে চাকরি-বাকরি সুলভ হবে কিনা, সে খবরও জানতে চান কোনো কোনো অল্প-বয়সে-বিগড়ে-যাওয়া বেকার ছেলের গরীব বাপ।

আলাদা ভাবে এত চিঠির জবাব কে দেয়? তাই এখানকারই প্রেস্ থেকে একটি সাধারণ উত্তর ছাপিয়ে রেখেছেন অধ্যক্ষের দপ্তর— "এতদ্দারা আপনাকে জ্ঞাত করান যাইতেছে যে, উপযুক্ত কোর্টের ওয়ারেণ্ট্ বিনা কোন বালককে এই বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয় না।" অর্থাৎ ছেলেকে আগে পুলিশে দিন, আর পুলিশ-কেসে পড়বার মত বিদ্যা যদি এখনো সে আয়ত্ত করে না থাকে, ততদিন অপেক্ষা করুন।

এই ইঙ্গিত গ্রহণ করেছেন কোনো কোনো অভিভাবক, সে দৃষ্টান্তও আছে। ঘর থেকে বাসন চুরি করেছে বলে বাপ ছেলের নামে থানায় এজাহার দিয়েছেন, সেখান থেকে ছুটেছেন কোর্টে, ডকে দাঁড়িয়ে হলপ করে সাক্ষ্য দিয়েছেন, তদ্বির করেছেন যাতে তার সাজা হয়। এত কাণ্ড করে ছেলেটাকে বর্স্টালে ঢুকিয়ে তারপর ফল আর মিষ্টির ঝুড়ি হাতে করে ছুটে এসেছেন তার সঙ্গে দেখা করতে।

দিলীপ কোলকাতার ছোকরা গারদ থেকে বর্স্টালে এসে পৌঁছল।

জীবনে সেই প্রথম তার রেলগাড়ি-চড়া। তার আগে রেলের বাঁশী শুনেছে, শব্দ শুনেছে, এবং এই আশ্চর্য দৈত্যটির নানা কীর্তিকলাপের চমকপ্রদ কাহিনী শুনেছে হারু ও অন্য বন্ধুদের কাছে। মনে মনে প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা ছিল, একদিন রেলে চড়বে। মার কাছে সেটা প্রকাশ করতে সাহস করেনি। মা কি করে সংসার চালায় জানত বলেই করেনি। সেই সুপ্ত আশার যে এমন করে পূরণ হবে স্বপ্নেও কি ভেবেছিল কোনোদিন?

দুজন জোয়ান পুলিশ যখন তার কোমরে দড়ি বেঁধে এবং তার একটা ধার হাতে ধরে থার্ড ক্লাশ কামরার ভিড়ের মধ্যে নিয়ে তুলল, রেলগাড়ি এবং তাকে ঘিরে যে জগৎ খোকার কল্পনা-রঙীন মনে কোনো বিস্ময় বা আনন্দ জাগিয়ে তুলতে পারল না। অথচ এই বস্তুটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার আজন্ম-লালিত সাধ ও স্বপ্ন। চারদিকে একবার মাত্র চোখ তুলেই বুঝল, এই মুহূর্তে সে-ই এতগুলো লোকের একমাত্র দৃষ্টি-স্থল। সে দৃষ্টিতে ভরা শুধু ঘৃণা ও কৌতুক। কে একজন বলে উঠল পাশ থেকে, "কতটুকু ছোকরা চুরি করেছে, ছাখ। জেলে নিয়ে যাচ্ছে, বোধ হয়।" "জেলে না দিয়ে চাবুক মেরে হাড় ভেঙে দিতে হয়।" উত্তর দিল আরেকজন।

দিলীপের মাথাটা নুইয়ে পড়ল মাটির দিকে। সে চোর, সেইটাই তার একমাত্র পরিচয়; কোমরের ঐ দড়িটা আর ঐ পুলিশ দুটো সেই কথাই তারস্বরে জানিয়ে দিচ্ছে সকলের কাছে।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার পর একজন ভদ্রলোক একটু সরে গিয়ে পুলিশের একজনকে লক্ষ্য করে বললেন, দাঁড় করিয়ে রেখেছ কেন ছেলেটাকে? বসিয়ে দাও না?

কনষ্টেবল দুজন অবশ্য আগেই বসে পড়েছিল। একজন ওর দিকে চোখ পাকিয়ে ধমকে উঠল, 'কেয়া দেখতা হ্যায়। বৈঠ্ যাও।'

যেন এতক্ষণ না বসাটাই ওর অপরাধ হয়ে গেছে।

ভদ্রলোক একটু শ্লেষের সুরে বললেন, ঐ টুকুন একটা বাচ্চা, তার পেছনে দুটো পুলিশ, তার ওপরে আবার একটা জাহাজের কাছি বেঁধেছে কোমরে। এর চেয়ে লোহার বাক্সে প্যাক্ করে আনলেই পারতে।

আশে-পাশে দু-একজন হেসে উঠল। একজন পুলিশ উষ্মার সুরে বলল, ভাগনেছে কোন্ দায়ী হোগা? তোমলোগ?

—বল কি! চলন্ত গাড়ি থেকে ভাগবে! তোমরা আছ কী করতে?

অনাবশ্যক মনে করে পুলিশের লোকেরা এ-কথার কোন জবাব দিল না।

নতুন আমদানী ছেলেদের আসবার পরদিনই অধ্যক্ষ অর্থাৎ সুপারসাহেবের কাছে হাজির করা হয়। দিলীপ এসেছিল সন্ধ্যার পর। পরদিন সকালবেলা লপ্‌সি খাইয়ে তাকে দু গেটের মাঝখানে এনে বসান হল। একদিকে সুপারের অফিস, আর একদিকে অন্য সব বাবুদের। বেলা আটটার কাছাকাছি আশে-পাশে একটা চাঞ্চল্য জেগে উঠল, এবং সঙ্গে সঙ্গে গেটের বাইরে যে পেটা ঘণ্টাটা ঝোলানো আছে, কে গিয়ে তার উপরে কাঠের হাতুড়ি দিয়ে একটা প্রচণ্ড আঘাত করল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মিলিটারী খাকী-পরা একজন বিপুলকায় ভদ্রলোক তার চেহারার সঙ্গে অত্যন্ত বেমানান একটি বেঁটে সরু বেতের ছড়ি বগলে চেপে ঝড়ের মত ঢুকে পড়লেন এবং 'লেফ্‌ট-টার্ন'-এর ভঙ্গিতে, বাঁ-পাশের দেয়াল ঘেঁষে যে লম্বা পা-ওয়ালা টেবিলটা রয়েছে, তার দিকে এগিয়ে গেলেন। সেখানে একজন সিপাই দাঁড়িয়ে ছিল। বুটে বুট ঠুকে স্যালুট করল এবং শশব্যস্তে বাড়িয়ে ধরল একটি মোটা কলম। সাধারণ কলমের চেয়ে অন্ততঃ তিনগুণ তার বেড়।

কলমটা যেন কেড়ে নিলেন ভদ্রলোক এবং টেবিলের উপর-রাখা মোটা খাতার পাতা জুড়ে ঘষ্‌ঘষ্‌ করে কী একটা লিখে তেমনি ঝড়ের বেগে আফিসে গিয়ে ঢুকলেন। গেট পেরিয়ে সকলকেই ঐ গেট-বুকে সই করতে হয়।

দিলীপের পাশে আর একটি ছেলে বসেছিল, ওর চেয়ে অনেকটা বড় এবং বছর কয়েক আগে থেকে আছে বর্ষ্টালে। কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'বড়সায়েব'; এবং কি মনে করে ফিক্ করে হেসে ফেলল। দিলীপের চোখের উপর তখনো ভাসছে ক্ষণপূর্বে

দেখা সেই বিশাল মূর্তি, যাঁর মুখের দিকে একবার তাকিয়েই সে আতঙ্কে চোখ নামিয়ে নিয়েছিল।

মানুষের আকৃতির সঙ্গে তার প্রকৃতির মিল থাকবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। অনেক ক্ষেত্রেই থাকে না। কারণ, প্রথমটির উপর তার হাত নেই, দ্বিতীয়টি বহু পরিমাণে তার করায়ত্ত। তবু এ দুয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক খুঁজে বের করাই সাধারণ মানুষের স্বভাব। কারো বাইরেটা দেখেই তার ভিতরটা সম্বন্ধে আমরা মনে মনে একটা ধারণা গড়ে তুলি। সে মন যদি শিশু-মন হয়, এই ধারণা যেমন সহজে জন্মায়, তেমনি গভীরে গিয়ে দাগ কেটে বসে।

রোগীদের বেলাতেও তাই। ডাক্তারের চেহারা তার ওষুধের চেয়ে বেশী কাজ করে। ভাল পশার গড়ে তুলতে হলে যে সব গুণের প্রয়োজন, বিদ্যা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি তার মধ্যে একটা প্রধান দফা হল আকর্ষণীয় মুখশ্রী। কুরূপা নার্স যতই করুণাময়ী হোক, রোগীর মন জয় করতে পারে না। পারলেও, সময় লাগে। ফ্লোরেন্স্ নাইটেঙ্গল যখন গভীর রাত্রে ওয়ার্ড-পরিক্রমায় বেরোতেন, মোমবাতির মৃদু রশ্মিতে আলোকিত তাঁর সেই আনত দেহ এবং শান্ত মধুর মুখের দিকে চেয়েই রোগীরা তাদের অর্ধেক যন্ত্রণা ভুলে যেত। তাদের অর্ধসুপ্ত চেতনার মধ্যে বিচরণ করত একটি নিঃশব্দচারিণী 'লেডি উইথ্ দি ল্যাম্প্', নারীদেহে মিনিষ্টারিং এঞ্জেল।

দিলীপ যে প্রথম দৃষ্টিতেই বর্ষ্টালের উপর বিরূপ হয়ে উঠেছিল, অনেকদিন মন বসাতে পারেনি, তার মূলে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছিল তার অধ্যক্ষের আকৃতি, যার সঙ্গে তাঁর প্রকৃতির মিল অতি সামান্য। এ অভিজ্ঞতা দিলীপের একার নয়, তার মত আরো অনেকের। শিশু ও কিশোরকে মানুষ করবার প্রাথমিক প্রয়োজন—যেখানে সে থাকবে, এবং বেড়ে উঠবে, সেই গৃহ ও পরিবেশের সঙ্গে তার প্রাণের যোগ। মানুষ করবার গুরুদায়িত্ব যাঁদের হাতে তাঁদের সব আয়োজন ব্যর্থ হবে যদি তাঁরা প্রথম থেকেই ওর প্রিয় হতে না পারেন। কিন্তু প্রিয়দর্শন না হলে প্রিয় হওয়া বড় কঠিন, বিশেষ করে ছোটদের কাছে।

দিলীপের পাশে যে-ছেলেটি বসে ছিল, (বছর ষোল সতর বয়স,

দেখতে আরো ছোট দেখায়,) কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ডাক পড়ল। কাঁদো কাঁদো মুখ করে দাঁড়াল গিয়ে বড় সাহেবের টেবিলের উল্টো দিকে। তার বিরুদ্ধে গুরুতর রিপোর্ট। আগেরদিন দুপুর বেলা এক ডেক ভাত অতিরিক্ত গলে গিয়ে তলায় লেগে গিয়েছিল, পোড়া গন্ধে অনেকে পেট ভরে খায়নি, তারা নালিশ করেছে ডেপুটি সুপারের কাছে। এজন্যে দায়ী ঐ ছেলেটি। ওদিন 'গ্রীণ-হাউস্'-এর রান্নার পালা। ঐ তাদের সর্দার অর্থাৎ 'ষ্টার বয়'। কিছুদিন হল, কাজকর্মে এবং স্বভাব-চরিত্রে খুশী হয়ে সাহেব ওকে 'ষ্টার' বানিয়ে দিয়েছেন। সাধারণ ছেলেদের চাইতে ওর পদ বেড়ে গেছে, এবং তার সঙ্গে কতগুলো সুবিধা সুযোগ। একটি সাধারণ ছেলের দৈনিক বরাদ্দ যেখানে আধ ছটাক মাছ বা মাংস, 'ষ্টার'-এর প্রাপ্য আড়াই ছটাক অথবা তার বদলে দুটো ডিম। তার উপরে মাসে একটাকা করে মাইনে। তা দিয়ে সে পুজো-পার্বণে মিঠাই মণ্ডা কিনতে পারে। সবচেয়ে বড় সুবিধা, অন্য ছেলেদের মত তার ঘোরাফেরায় কোনো বাধা নেই। দরকার হলে পাঁচিলের বাইরেও সে যেতে পারে। এই বাড়তি পাওনার বদলে খানিকটা বাড়তি দায়িত্বও চেপেছে তার ঘাড়ে। গ্রাণ-হাউসের সে ক্যাপ্টেন এবং সেখানকার ছেলেদের দলবদ্ধভাবে যখন যে কাজে লাগানো হয়, সেটা ঠিকমত হল কিনা, দেখবার ভার তার। কোথাও কোনো ত্রুটি হলে শাস্তিটা তার প্রাপ্য। দু'সপ্তাহ করে এক একটা 'হাউস'-এর উপর রান্নাঘরের ডিউটি পড়ে। 'হাউস' বিভাগ হয় বয়স হিসাবে। বর্ষ্টাল স্কুলে সবচেয়ে যারা ছোট তারা পড়েছে গ্রীণ-হাউসে। এই কচি এবং কাঁচাদের উপর যখন রান্না-বান্না, পরিবেশন ইত্যাদি কাজ চাপে, স্কুল কর্তৃপক্ষের দুশ্চিন্তা বেড়ে যায়। অনেকখানি অতিরিক্ত ঝক্কিও পোহাতে হয় সেই সঙ্গে। কিন্তু এর থেকে এদের অব্যাহতি দেবার ক্ষমতা তাদের হাতে নেই। আইনের অনুশাসন। তার ভিতরকার কথাটা বোধহয় এই—বাঁশকে ইচ্ছামত আকার দিতে হলে কাঁচা থেকেই ধরতে হয়। একবার ডাঁটো হয়ে গেলে আর সহজে নোয়ানো যায় না।

ছোটদের দিয়ে শক্ত কাজ করাতে গেলে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটবেই।

তার জন্যে সুপারসাহেব তৈরী ছিলেন। ছেলেটিকে একবার জিজ্ঞাসা করলেন, ভাত নামাতে দেরি করেছিলে কেন? 'বাঘবন্দী' খেলা হচ্ছিল, বুঝি?

—না, স্তর। জিজ্ঞেস করুন সিপাইবাবুকে।

সিপাই পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। কৈফিয়তের সুরে বলে উঠল, ছোট ছোট ছেলে—

—'চোপ রাও', গর্জে উঠলেন সুপার 'হাঁড়ির দুধারে বাঁশ বাঁধা রয়েছে কী করতে। চারজনে না পারে ছজন কেন লাগাওনি?'

'সিপাইবাবুর' অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। আর মুখ খুলতে সাহস করল না। সুপার নিজের মনে গজ-গজ করতে লাগলেন, 'রোজ ঐ এক কথা—ছোট ছেলে, ছোট ছেলে! আমি যেন সখ করে ধরে এনেছি এগুলো। সব আমার খাস তালুকের প্রজা!'

দোয়াত-দানি থেকে একটা মোটা কলম তুলে নিয়ে, সামনে যে ছোট্ট বাঁধানো খাতাটা ছিল—ঐ ছেলেটির টিকেট—তার উপর সজোরে চালাতে চালাতে বললেন, 'ডিগ্রেডেড্ ফর ওয়ান মানত্।' চীফ অফিসার দাঁড়িয়ে ছিল পাশের দিকে। আসামীর দিকে চেয়ে ঘোষণার সুরে বলল, 'এক মাসের জন্যে ডিগ্রেড্। সেলাম কর।'…বলে এগিয়ে এসে, ওর কাঁধে যে ষ্টার-মার্কা পেতলের ব্যাজ লাগানো ছিল, খুলে নিয়ে মিলিটারী কায়দায় সেলুট্ করে ছেলেটিকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। সিপাইটিও তার অনুসরণ করল। নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে চীফ্ অফিসার ধমকে উঠল সিপাইটিকে, তোমাকে ফোঁপর দালালি করতে কে বলেছিল? খালি খালি সাজা বাড়িয়ে দিলে ছেলেটার।

সিপাই মাথা নীচু করে রইল। অনুযোগটা অস্বীকার করতে পারল না। তারা জানে না, এই ছোট ছেলেগুলোর সম্পর্কে কোথায় কারো উপরে যেন একটা গোপন অভিমান আছে সুপারসাহেবের। এদের ভালো-মন্দের ভার তাঁর হাতে। কিন্তু সে বিষয়ে তিনি যে কত অক্ষম ও অসহায় এই সব ক্ষেত্রে সেইটাই যেন ধরা পড়ে যায়। তাঁর অধস্তন কর্মীরাই যেন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। সেই ক্ষোভের আঁচ গিয়ে পড়ে ছেলেগুলোর ওপর। অজ্ঞাতসারে অতিরিক্ত রূঢ় হয়ে

ওঠেন। ঐ দুর্বল স্থানে আঘাত না দিলে ছেলেটাকে হয়তো শুধু সাবধান করেই ছেড়ে দিতেন।

ছেলেটি তখন গেটের এককোণে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। চীফ অফিসার পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল, কাঁদছিস কেন? মোটে তো একটা মাস। দেখতে দেখতে কেটে যাবে।...... আচ্ছা, ডিগ্রেড হলেও তোর খাবারটাবারগুলো যাতে ঠিক থাকে, সেটা আমি দেখবো।

শেষদিকের আশ্বাসটুকু গোপনে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে জানিয়ে দিল চীফ্ অফিসার। ছেলেটি এবার জোরে জোরে মাথা নেড়ে প্রতিবাদ জানাল। ঐ তুচ্ছ দুটো ডিম আর দু'টুকরো মাংসের সে পরোয়া করে না। তার ক্ষোভ এবং বেদনা অন্যখানে, অনেক গভীরে। প্রৌঢ় চীফ্ অফিসার তা বুঝবে কেমন করে? এই বয়স যে সে অনেক দূরে ফেলে এসেছে। কৈশোর সব আঘাত সইতে পারে, পারে না শুধু একটি—তার মান ও মর্যাদার উপরে যে আঘাত। এ দুটি সম্বন্ধে সে অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর। যাদের উপর সে এতদিন নেতৃত্ব করে এসেছে আজ কোন্ মুখ নিয়ে দাঁড়াবে তাদের কাছে! মুখ ফুটে তারা হয়তো কিছুই বলবে না, তবু তাদের চোখের দিকে তাকাবে কেমন করে! তা ছাড়াও আর একটা জিনিস ছিল। কিশোর মনের অত্যুগ্র অভিমান। চীফ্ অফিসার যখন শাস্তিটা ঘোষণা করল, তখনো তার তীব্রতা ঠিক বুঝতে পারেনি ছেলেটি। কিন্তু তারপরেই যখন দুটো উদ্ধত হাত এগিয়ে এল বুকের উপর থেকে ব্যাজটা কেড়ে নেবার জন্যে, তার মাথার ভিতরটা দপ্ করে জ্বলে উঠল। ইচ্ছা হল ওই পেতলের চাকতিটা সে নিজেই ছুঁড়ে ফেলে দেয়। পরক্ষণেই বুক ভরে গেল দুর্জয় অভিমানে। সুপারের আনত মুখের পানে চেয়ে তার ক্ষুব্ধ মন অনুচ্চারিত কণ্ঠে বারংবার বলতে লাগল, একদিন যে গৌরব তুমি নিজেই দিয়েছিলে, আজ নিজে হাতেই তা ছিনিয়ে নিলে, সায়েব! বেশ!

কৃতিত্বের জন্যে প্রাপ্ত যে পদ বা সম্মান, অপরাধ করলে তার থেকে নেমে আসতে হবে, তার মধ্যে বেদনা যতই থাক, ক্ষোভের কারণ নেই। মানুষ ক্ষুব্ধ হয় তখন, যখন ক্ষমতার দম্ভ অনুষ্ঠানের ঘটা দিয়ে

একে বিচারের ক্ষেত্র থেকে প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসার পর্যায়ে নামিয়ে আনে। যে পদ তোমাকে দেওয়া হয়েছিল, তার থেকে তুমি বিচ্যুত হলে—এই আদেশটাই কি যথেষ্ট নয়? বিগত পদোন্নতির সেই বিশেষ চিহ্নটিকে সকলের সামনে হরণ করে তাকে অপদস্থ করবার কী প্রয়োজন? সম্মান যে হারাল সে নিজেই তার চিহ্ন ধরে রাখতে লজ্জা বোধ করবে, ব্যস্ত হয়ে উঠবে সেটা নিজে হাতে ফিরিয়ে দেবার জন্যে। সে সুযোগ তাকে দেওয়া হল না। যদি হত, সে সম্মান হারাত এই পর্যন্ত, কিন্তু অসম্মানিত হত না। এ দুয়ের মধ্যে অনেক তফাত, বিশেষ করে ছোটদের কাছে, যারা স্বভাবতঃ অবুঝ, ন্যায় বিচারের ন্যায্যতাকে বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে শেখেনি।

আরো দুটি ছেলের নামে 'রিপোর্ট' ছিল। একজন কাজ করে বুক বাইণ্ডিং সেকশনে। বাইণ্ডিং-এর কাগজ চুরি করে ঘুড়ি বানিয়েছে। 'একজিবিট্' হিসাবে ঘুড়িটাও হাজির করা হল। সাহেব হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে বললেন, কাগজ, সুতো আর লেই, এই তিনটে না হয় ওখান থেকেই পেয়েছে, কিন্তু বাঁশের শলাগুলো এলো কোত্থেকে?

উত্তরের আশায় ডেপুটি সুপারের মুখের দিকে তাকালেন। তিনি তাকালেন চীফ্ অফিসারের দিকে। চীফ্ অফিসার আসামীকেই প্রশ্ন করল, 'কাঠি কোথায় পেয়েছিস?' সে উত্তর না দিয়ে তার 'মাষ্টার' অর্থাৎ বাইণ্ডিং ইনষ্ট্রাক্টরের মুখের পানে চেয়ে ফিক্ করে হেসে ফেলল। সকলেই বুঝল এর মধ্যে কিঞ্চিৎ রহস্য আছে। সাহেব ধমকে উঠলেন, বল্, কোথায় পেয়েছিস।

—উনি দিয়েছেন স্যর, মাষ্টারকে ইঙ্গিত করে নির্বিকারভাবে উত্তর দিল আসামী।

ইন্‌ষ্ট্রাক্‌টর ভোলানাথবাবু সঙ্গে সঙ্গেই ফেটে পড়লেন, আমি! আমি দিয়েছি তোকে!

সাহেব হাত তুলে থামবার নির্দেশ দিতেই, স্থান কাল ভুলে আরো জোরে চিৎকার করে উঠলেন, মিছে কথা বলছে স্যর। এক নম্বর বদমাস ছোকরা। এ-ই সেদিন গুড় চুরি করেছিল গুদাম থেকে।

—তা করতে পারে, সহজ শান্তভাবে বললেন সুপার, গুড় গুদামে পাওয়া যায়, কিন্তু বাঁশের কাঠি তো বর্ষ্টাল স্কুলে গজায় না।

হঠাৎ সুর বদলে ধমক দিলেন ছেলেটাকে—'কান ধর।' সে যেন এইজন্যই তৈরী হয়ে ছিল এমনিভাবে তৎক্ষণাৎ দুহাতে দুটো কান চেপে ধরল। সাহেব বললেন, 'পঁচিশ বার ওঠ্‌বস্।'

এবারেও কিছুমাত্র দ্বিধা সঙ্কোচ বা ইতস্ততঃ ভাব দেখা গেল না। কালবিলম্ব না করে ওঠ-বস শুরু করে দিল। চীফ্ অফিসার জোরে জোরে গুণে চলল, এক, দুই, তিন, চার............।

ছেলেটাকে বিদায় করে বাইণ্ডিং মাষ্টারের দিকে ফিরে সাহেব ছদ্ম গম্ভীর সুরে বললেন, 'ওকে ঘাঁটিয়ে ভাল করনি ভোলানাথ। চেপে যাওয়াই উচিত ছিল।

—আজ্ঞে, স্যর—

—থাক্; একটা মিথ্যাকে ঢাকতে হলে অনেক মিথ্যা বলতে হয়। সেই পুরনো কথা। এ কাজ ও আজ নতুন করছে না, আগেও করেছে। তোমার ছেলেরা যে-সব ঘুড়ি ওড়ায় তার কোনোটাই বাজারে পাওয়া যায় না। গেলেও তুমি কিনে দিতে পার না, তা আমি জানি। নেক্‌সট্?

শেষ নির্দেশটির লক্ষ্যস্থল ডেপুটি সুপার। তিনি তৎক্ষণাৎ তিন নম্বর কেস্ পেশ করলেন। এবারকার আসামীর নাম কেশব মালাকার, ইনডাস্ট্রিয়াল বয়। কালো, নাদুসনুদুস, ভাঁটার মত গোলগাল। তিন বছর আছে এখানে। যখন এসেছিল, ঠিক একটুকরো পাঁকাটি। তারপর থেকে দৈর্ঘ্যে আধ ইঞ্চিও বাড়েনি, তার দশগুণ পুষিয়ে নিচ্ছে প্রস্থের দিকে। ঠিক হেঁটে নয়, অনেকটা গড়িয়ে গড়িয়ে সাহেবের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। মুখে একগাল হাসি।

—ও আবার কী করল! বিস্ময় প্রকাশ করলেন সুপার।

—'আজ্ঞে স্যর, পুরো খাটনি দেয়নি', এগিয়ে এসে অভিযোগ দায়ের করলেন তাঁতশালার ইন-চার্জ মধুসূদনবাবু।

—সে কি, ও তো চমৎকার সোয়েটার বোনে, জানতাম।

ডেপুটি সুপার জানালেন, সুতার অভাবে সম্প্রতি সোয়েটার

বোনা বন্ধ রাখতে হয়েছে এবং সেখানকার ছেলেগুলোকে তাঁত 'কামানে' পাশ করে দিয়েছেন।

সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, কিরে তাঁত ভাল লাগছে না?

কেশব মাথা নেড়ে জানাল, লাগছে।

—তাহলে কাজ করিসনি কেন?

—ফুটবল খেলে পা ব্যথা হয়েছে, স্যর।

সকলের মুখে চাপা হাসি খেলে গেল। সুপার বললেন, তাতে কী হয়েছে? তাঁত তো চালাবি হাত দিয়ে। পায়ের কাজ আর কতটুকু!

কেশব এ প্রশ্নের কোনো কৈফিয়ত না দিয়ে সকলের মুখের দিকে চেয়ে বোকার মত হাসতে লাগল। সাহেব ধমক দিলেন, কথা বলছিস না যে?

—দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হয়, স্যর।

সাহেব ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ফেললেন মধুসূদনবাবুর মুখে। তিনি মৃদু হেসে বললেন, বসে হাত পায় না। না দাঁড়ালে মাকুর দড়ি ধরতে পারে না।

এবার সাহেবও হেসে ফেললেন। টেবিলের ওপারে দাঁড়ানো ঘোর কৃষ্ণবর্ণ সচল তাকিয়াটির দিকে একবার তাকিয়ে তার টিকিটের উপর নতুন খাটনি লিখতে লিখতে বললেন, লিলিপুট থেকে ওর যোগ্যি স্পেশাল তাঁত যদ্দিন এসে না পৌঁছায়, ততদিন বরং র‍্যাদা চালাক। এবার থেকে কাঠ কামানে কাজ করবি, বুঝলি?

—ওখানে গেলে মারবে, স্যর।

—কে মারবে?

—দীনেশ।

—কেন?

কেশব উত্তর না দিয়ে ডেপুটি সুপারের দিকে তাকাল। তিনি ভরসা দিলেন, 'না, না, মারবে না। আমি ওকে বকে দেবো'খন। যা।'

কেশব বিশেষ আশ্বস্ত হল বলে মনে হল না। অপ্রসন্ন মুখে দাঁড়িয়ে রইল। ডেপুটিবাবু তখন দীনেশ-ঘটিত ব্যাপারটা প্রকাশ

করলেন। দীনেশ বর্ষ্টাল বয়, ষ্টার এবং ফুটবলের ক্যাপটেন। কেশবকে খেলায় নিতে তার ভয়ানক আপত্তি এবং এই নিয়েই ঝগড়া। দীনেশের বক্তব্য হল, ফুটবল মনে করে খেলোয়াড়রা যদি ওকেই পিটতে শুরু করে, তার পক্ষে ঠেকানো সম্ভব হবে না। তা সত্ত্বেও ও যখন জিদ করতে লাগল খেলবেই, তখন বলেছে, 'আমাদের বল যেদিন লিক-টিক হয়, সেইদিন আসিস। তোকে দিয়েই খেলা যাবে।' বলা বাহুল্য প্রস্তাবটা কেশবের পছন্দ হয়নি। এ নিয়ে সবাই যখন হাসাহাসি করছিল, অপমানটা হজম করতে না পেরে তখনকার মত সরে এসে আড়াল থেকে ঢিল ছুঁড়ে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করেছিল। দীনেশ সঙ্গে সঙ্গে কিছু করেনি তবে বেশ ধীরভাবে শাসিয়ে রেখেছে, সময় ও সুযোগ মত উপযুক্ত উত্তর দিতে ত্রুটি হবে না। ঢিলটা ছুঁড়লে পাটকেলটা খেতে হয়—এই সনাতন নিয়ম কেশবের জানা আছে। তাই তখন থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে এবং নিজের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ডেপুটিবাবুর কাছে নালিশ দায়ের করেছে।

সে আশা করেছিল সাহেব অন্ততঃ তার দুঃখটা বুঝবেন, এবং আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করবার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে নিরাশ হল। স্পষ্ট না বুঝলেও সন্দেহ হল, সকলের মত তিনিও যেন এতবড় ব্যাপারটাকে নেহাত হালকা করে দেখছেন। সাহেব কড়া মানুষ; দোষ করলে তাঁর কাছে কারো খাতির নেই, তা সে ষ্টারই হও আর ক্যাপটেনই হও। কিন্তু দীনেশের বিরুদ্ধে এই রকম গুরুতর অভিযোগ পেয়েও তিনি কিছুই করলেন না। একবার রেগেও উঠলেন না! একে একে সকলের মুখের পানে চেয়ে কেশবের মনে জেগে উঠল শিশুমনের সেই চিরন্তন ক্ষোভ—বড়রা সব একদল। ছোটদের উপর কারো দয়া-মায়া নেই।

আর কোন রিপোর্ট ছিল না। এবার নতুন আমদানীর পালা। দিলীপকে যখন নিয়ে আসা হল, তার বুকের ভিতরে কে যেন তখনো হাতুড়ি পিটছে। ডেপুটিবাবু তার নাম, বাপের নাম এবং সঙ্গে জামা-কাপড় কি আছে জিজ্ঞাসা করলেন। সুপারের দিকে হঠাৎ চোখ

পড়তেই সে দেখল তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকেই লক্ষ্য করছেন। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে ভয়ে চোখ নামিয়ে নিল। মিনিট খানেক পরে তিনি প্রশ্ন করলেন, বাবা কবে মারা গেছেন?

—জানি না, আমি তখন খুব ছোট।

—মা আছেন?

দিলীপ মাথাটা একদিকে হেলিয়ে বলতে চাইল, আছেন; স্বর ফুটল না। চোখ দুটো ছল-ছল করে উঠল। সাহেব বললেন, আর কে কে আছেন তোমার? দিলীপ মাথা নেড়ে জানাল আর কেউ নেই। এবার চোখের জল আর বাধা মানল না। দুটি বড় বড় ফোঁটা গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। হাতের উল্টো পিঠে তাড়াতাড়ি মুছে ফেলল। সুপার বললেন লিখতে জানো?

—জানি।

—ব্যস, তাহলে আর কি? মাকে একখানা বেশ বড় করে চিঠি লিখে দাও।

—আমার কাছে তো কাগজ নেই।

সকলের মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল। সাহেব ছদ্ম-গাম্ভীর্যের সুরে বললেন, কাগজ নেই? তাহলে তো মুস্কিল। আচ্ছা সেটা না হয় আমরাই দেবো। বাড়ির ঠিকানা জান তো?……কোথায় থাকেন তোমার মা?

—বস্তিতে।

—কোন্ বস্তি? রাস্তার নাম কি?

—জানি না।

সুপার হাতের ভাঁজ করা ওয়ারেন্টখানা খুলে নিজের মনেই বললেন, ব্যস্; এবার বোঝো ঠেলা। "অ্যাড্রেস্ আননোন।" তার মানে, ওটাও বর্ষ্টাল্ খুঁজে নেবে। ওঁরা আছেন শুধু 'ডাম্প্' করতে।

ডেপুটিবাবুর দিকে ফিরে বললেন, বেশ কড়া করে লিখে দিন তো, এক মাসের ওপর যে তোমরা আটকে রাখলে ছেলেটাকে, তার ঠিকানাটাও ট্রেস্ করতে পারনি? এ্যাদ্দিন কী করেছ তাহলে, জানতে

চাই। চিঠির একটা কপি আই, জি, কে দিয়ে বলুন, এর পরে এইরকম ইন্‌কম্‌প্লিট্‌ কেস আমরা রিফিউজ্‌ করবো।

—সেকথা আমরা আগেও কয়েকবার বলেছি স্যর। আই, জি, কোনো উত্তর দেননি।

—হুঁ ; আচ্ছা !

'দেখে নেবো' গোছের একটা উত্তেজিত ভঙ্গি করে উঠে পড়লেন সুপারসাহেব। সেই ছোট্ট ছড়িখানা কুড়িয়ে নিয়ে বগলে চেপে এবার অনেকটা নরম স্বরে বললেন, ঐ সঙ্গে ক্যালকাটা পুলিশকেও লিখে দিন, ওরা কোন খোঁজ দিতে পারে কিনা। সব দায় যেন আমাদেরই। যতো সব……।

অস্পষ্ট ইংরেজিতে কার উদ্দেশ্যে কি সব বিড় বিড় করতে করতে কোনো দিকে না তাকিয়ে সবেগে বেরিয়ে গেলেন একদা মিলিটারী বর্তমানে ক্ষুদ্র একটি ছোকরা জেলের নির্বিষ অধিকর্তা—লেফ্‌টেনান্ট্‌ জি, কে, ঘোষ।

ভোরের ঘুম তখনো তুচোখে জড়িয়ে আছে। হঠাৎ ঘরের ঠিক বাইরে একটা জোরালো বাঁশীর অদ্ভুত ধরনের কিন্তু মিষ্টি আওয়াজ শুনে দিলীপ ধড়-মড় করে উঠে বসল। পাশেই কেশবের বিছানা। তার দিকে চেয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, ওটা কী বাজাচ্ছে ?

কেশবও উঠে বসেছিল। বেশ মুরুব্বীর মত বলল, কখনো শুনিসনি বুঝি ? ওকে বলে 'বিউগিল'। আমাদের উঠতে বলছে। উঠে পড়।

দিলীপ তাকিয়ে দেখল, ঘরে যেন ডাকাত পড়েছে। অতগুলো ছেলে, সব প্রায় তারই বয়সী কিংবা খানিকটা ছোটবড়, ভীষণ হৈ-চৈ লাগিয়ে দিয়েছে। বিচিত্র তাদের পোষাক। কারো পরনে ল্যাঙট, কারো হাফ-প্যাণ্ট, কেউ চাদরটাকে লুঙির মত করে কোমরে জড়িয়ে আছে, গুটি তিনেক ছোট ছেলের সারা দেহে কিছু নেই। এক পাশে দাঁড়িয়ে একটি সর্দার গোছের ছেলে (সরকারী পদ—ক্যাপ্‌টেন) হাঁক-ডাক করে নানা রকম নির্দেশ দিচ্ছিল। ওদেরই একজনকে ধমকে

উঠল, এই পটলা, তোকে একশ দিন বলেছি না, প্যাণ্ট পরে শুবি? বুড়ো ধাড়ী; নেংটো হতে লজ্জা করে না?

পটলা নাকীস্বরে প্রতিবাদ জানাল, বা-রে, প্যাণ্টের ভাঁজ নষ্ট হয় না বুঝি?

ক্যাপটেন তখন অন্য একজনকে নিয়ে পড়েছে, জাঙিয়াটি কোত্থেকে জোটালে চাঁদ?

সেই ছেলেটা সাদা রঙের আণ্ডারওয়ারের উপর তাড়াতাড়ি খাকী প্যাণ্ট্ চড়াতে চড়াতে বলল, কোথায় জাঙিয়া? ভুল দেখছ নাকি আজকাল?

আচ্ছা আসুক ডেপুটিবাবু। ভুল দেখছি কিনা, তালাসি নিলেই বেরিয়ে যাবে।

—না ভাই, তোর পায়ে পড়ি, বলে দিস না।

কাছে গিয়ে কাঁধে হাত দিতেই ক্যাপটেন হাতটা এক ঝটকায় সরিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটারও সুর বদলে গেল। তর্জনী তুলে বলল, বেশ, আমিও তাহলে বলে দেবো, তোমার পকেটে বিড়ি আছে।

—'আচ্ছা; যা করতে পারিস করিস।' বলে প্রতিপক্ষের তর্জনীর বদলে বুড়ো আঙুলটা উঁচু করে দেখাল ক্যাপটেন।

'আণ্ডারওয়ার' তখন অন্য অস্ত্র প্রয়োগ করল। চাপা শাসানির ভঙ্গিতে বলল, দর্জী 'কামানে' যেতে হবে না কোনোদিন? গিয়ে দেখো।

ক্যাপটেনকে এবার আর মাথা তুলতে দেখা গেল না। ঢোলের মত প্যাণ্ট এবং পাশবালিশের খোলের মত সার্ট কেটে ছেঁটে চলনসই মত দাঁড় করাতে, এবং সেই সঙ্গে বাড়তি হিসাবে নিমাটা ফতুয়াটা কিংবা কমপক্ষে রুমালটা সংগ্রহ করতে ঐ স্থানটিতে প্রায় সকলেরই মাঝে মাঝে ধরনা দেবার প্রয়োজন ঘটে। তখন এই ছেলেটার এবং ওর মত আর যারা সেখানে কাজ করে, তাদের তোয়াজ না করে উপায় নেই।

বর্ষ্টাল স্কুলের ইউনিফর্ম খাকী—হাফ-প্যাণ্ট, হাফ-সার্ট, তার নীচে পরবার মত একটা গেঞ্জি জাতীয় খাটো জামা, সেও খাকী। এই রঙটির উপর এখানকার ছেলেদের (বোধহয় সব ছেলেরই) একটা সহজাত বিতৃষ্ণা আছে। শিশু ও কিশোর মন চায় বৈচিত্র্য। শুধু খাদ্যে নয়,

পোষাকেও। তাছাড়া বর্ণাঢ্য বস্তুর প্রতি তাদের চিরদিনের আকর্ষণ। বছরের পর বছর এই একঘেয়ে খাকীর কর্কশ আলিঙ্গন থেকে মুক্তি পাবার জন্যে মনটা ছটফট করে। জেলের কয়েদীর মত চব্বিশ ঘণ্টা এদের পাঁচিলের আড়ালে কাটাতে হয় না। খেলাধূলা, বনভোজন, নববর্ষের রুট-মার্চ, পুজো দেখা ইত্যাদি নানা উপলক্ষে এরা বাইরে বেরোতে পারে। সেখানে বহু লোকের ভিড়ের মধ্যে এই পোষাকই এদের সকলের থেকে আলাদা করে রাখে। পুজো মন্দিরে কিংবা রথের মেলায় এদেরই বয়সী ছেলের দল যখন রঙ-বেরঙের জামা-কাপড় পরে প্রজাপতির মত ঘুরে বেড়ায়, খাকী-মার্কা বর্ষ্টালের ছেলেরা তৃষিত চক্ষে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। খবর নিলে জানা যাবে, সে দৃষ্টিতে স্বাধীন জীবনের আকাঙ্ক্ষা যতখানি, তার চেয়ে রঙের তৃষ্ণা কম নয়।

এই প্রতিষ্ঠানের জন্যে খাকী-সজ্জার উদ্ভাবন কে করেছিলেন, সরকারী রেকর্ডে হয়তো তার উল্লেখ আছে। তিনি যে-ই হোন, এবং যে মনোভাব নিয়ে এই রঙটি নির্বাচন করে থাকুন ছোটদের মনের দিকে তাকিয়ে করেননি। ছোটদের প্রতি স্নেহ বা মমত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন, একথাও বলা চলে না। নিজের শিশু বা কিশোর পুত্রের পোশাক-নির্বাচনে খাকীকে হয়তো বর্জন করেই চলে থাকবেন। দু-চারটি মিলিটারী-ভাবাপন্ন পরিবার বাদ দিলে, এ দেশের সাধারণ গৃহস্থ খাকীকে বিশেষ প্রীতির চোখে দেখে না। এই বর্ণটির প্রতি পক্ষপাতের দৃষ্টান্ত আরো বিরল।

বর্ষ্টাল এবং ইনডাষ্ট্রীয়াল স্কুলের ছেলেগুলো পুলিশ বা মিলিটারী মনোভাব নিয়ে বেড়ে উঠুক, কর্তৃপক্ষের মনে এই জাতীয় কোনো উদ্দেশ্য ছিল বলেও তো মনে হয় না। জীবিকা ক্ষেত্রে ওর কোনোটাতেই তাদের প্রবেশাধিকার নেই। যে-কোনো সরকারী চাকরীর সব পথ তাদের কাছে চরদিনের তরে রুদ্ধ হয়ে আছে। যে ধরনের অপরাধ, এবং যে-বয়সে সে অপরাধ তারা করেছিল, দুটোই এখানে অবান্তর। একটিমাত্র প্রাসঙ্গিক কথা—'দে ওয়ার কন্‌ভিক্‌টেড ইন্‌ এ কোর্ট অব ল'; আদালতে আইন-সঙ্গত ভাবে তারা দণ্ডিত। সেদিক দিয়ে এরা সাধারণ জেল কয়েদীর সমগোত্র।

এদের সামনে এই বাধা যদি না থাকত, তাহলেই বা কী লাভ হত জঙ্গী-আদর্শে এতগুলো ছেলেকে মানুষ করে? একটি ছোট ছেলের মধ্যে সত্যিই যদি সমাজ-বিরোধী-প্রবৃত্তি দেখা দিয়ে থাকে, তাকে সমাজমুখী করবার সুযোগ দেওয়াই হল আসল কাজ। শৈশব না পেরোতেই যে গৃহচ্যুত, তাকে যদি একদিন গৃহ-জীবনের ছায়ায় ফিরিয়ে আনা যায়, সংসারের সহজ পথ থেকে যে পিছলে পড়ে গেছে তাকে যদি তুলে এনে সেই পথের উপর দাঁড় করিয়ে, হাতে যে-কোন একটা ভদ্র অবলম্বন ধরিয়ে দেওয়া যায়, তাহলেই হল। তার চেয়ে বড় আর কী কাম্য থাকতে পারে? রাষ্ট্রের কাছে, সমাজের কাছে এইটুকুই এদের প্রত্যাশা। সেখানে খাকী লাগবে কোন কাজে?

'ইউনিফর্ম'-এর প্রধান উদ্দেশ্য বোধ হয় পোষাকের ঐক্য দিয়ে একটা গোষ্ঠী-মনোভাব গড়ে তোলা। সেটা গেল ভিতরকার সম্পর্কের কথা। বাইরের জগতে ঐ পরিচ্ছদটাই পরিচয় হয়ে দাঁড়ায়। কোন্ জাতের বা কী ধরনের পোষাক, তারই উপরে অনেকাংশে নির্ভর করে গোটা গোষ্ঠীর মূল্যায়ন। সেদিক থেকে দেখতে গেলে বর্ষ্টালের এই খাকী-মার্কা বিবর্ণ খোলস লোকচক্ষে তার মর্যাদা বৃদ্ধির সহায় হয়নি; বরং ঐ ছেলেগুলোকে যেন খানিকটা কৃপার পাত্র করে তুলেছে। বলা যেতে পারে, অস্থানে এবং অপাত্রে পড়ে খাকী তার জাত হারিয়ে ফেলেছে। তাছাড়া ছোটদের পরিচ্ছদ হিসাবে ওটা শুধু অসুন্দর ও অনুজ্জ্বল নয়, অনেকটা যেন অনাথ ও অসহায়ের প্রতীক।

তর্ক উঠবে, কাপড়-চোপড়ের রং বদলালেই কি এদের সম্বন্ধে আপনার আমার দৃষ্টির রং বদলে যাবে? পুরোপুরি যাবে না; তার সঙ্গে আরো অনেক জটিল প্রশ্ন জড়িয়ে আছে; তবে অনেকটা যে যাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। রং জিনিসটা ব্যক্তি বস্তু বা বৃত্তি নিরপেক্ষ নয়, এর একটা নিজস্ব অর্থ ও সংজ্ঞা আছে। যে কাউকে যে কোনো রঙে মানায় না। সন্ন্যাসীকে সবুজ এবং বর্ষীয়সী হিন্দু বিধবাকে যদি গাঢ় রক্ত রঙে সজ্জিত করে দেখানো হত, তাঁরা যে মূল্য এবং মর্যাদা পাচ্ছেন তা পেতেন না। প্রথমজনের গৈরিক এবং দ্বিতীয়ার শুভ্র বেশ অর্থহীন বহিরাবরণ নয়, ওঁদের আদর্শ ও জীবনধারার বহিঃপ্রকাশ।

তার চেয়েও বড় কথা—শুধু অন্যের চোখে নয়, আমার চোখেও আমার একটা রূপ আছে, যা দেখে কখনো আমি লজ্জা পাই, কখনো গর্ববোধ করি। সে রূপের অনেকখানি জুড়ে আছে আমার পরিচ্ছদ ও তার রং। সেটি যদি আমার মনের মত হয়, আমার চোখে আমি শুধু যে সুন্দর হবো তা নয়, আমার কাছে আমার মর্যাদা বেড়ে যাবে। জীবনে বড় হবার প্রথম সোপান নিজের কাছে নিজের এই মর্যাদাবোধ।

বর্ষ্টালের ইউনিফর্ম তৈরী করে তার নিজস্ব দর্জীশালা। খাকী কাপড়ের থান আসে বাইরে থেকে। একজন দর্জী মাষ্টার আছেন, যার মাইনে প্রথম জীবনে ছিল বোধহয় তিরিশ টাকা, অনেক বছর অন্তর এক-টাকা হারে বেড়ে জীবনের শেষ ধাপে এসে দাঁড়িয়েছে পঁয়ত্রিশে। গুটি পাঁচেক ছেলে আছে তার 'কামানে'। দুজন সগর্বে কাঁচি চালায়, তারা 'কাটার'। মান্ধাতার আমল থেকে কয়েকখানা মোটা কাগজের ফর্মা বানিয়ে রেখেছেন মাষ্টারমশাই। তার উপরে কাপড় ফেলে দাগে দাগে কেটে ফেলে 'কাটার' ছেলেরা। একজন তার উপরে কল চালায়। তিনটি সাইজ আছে—এক, দুই, তিন অর্থাৎ বড়, মেজো, ছোট। তোমার দৈর্ঘ্যপ্রস্থ যাই হোক, এই তিনটির কোনোটাতে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। যদি ফিট না করে, অর্থাৎ হাফ্‌সার্টের হাত যদি কনুই ছাড়িয়ে ঝুলে পড়ে কবজির কাছাকাছি কিংবা হাফ প্যাণ্ট ধাওয়া করে গোড়ালির পানে, সে দোষ তোমার বে-সাইজ গড়নের। তার জন্যে দর্জী-মাষ্টার বা তার কাটারদ্বয় দায়ী নয়। তোমার কোমরটা যদি বেঢপ বেড়ে গিয়ে থাকে, যার ফলে প্যাণ্টের বোতাম আঁটতে গিয়ে প্রাণ-বেরিয়ে যায়, তার ফল তোমাকেই ভুগতে হবে। দর্জী-মাষ্টার তো বিশ্বকর্মা নন যে ঠিক ফরমাশ মত মাল যোগাবেন।

কিন্তু সংসারে কোনো কিছুই আট্‌কে থাকে না। সব সমস্যার সমাধান আছে। ঢ্যাঙা বা বেঁটে হয়েও তোমার মাপ মত পোষাক জুটে যাবে যদি দর্জী-'কামানের' দাক্ষিণ্য লাভ করতে পার। বিনিময়ে কিছু দিতে হবে। দাক্ষিণ্যের সঙ্গে দক্ষিণার অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক। দক্ষিণার নানা রূপ। কখনো দুটো বিড়ি, কখনো রন্ধনশালা থেকে সংগ্রহ করা একটুকরো মাছ, কিংবা গুদাম থেকে হাতসাফাই-এর উপার্জন একটুখানি

ভেলিগুড়। পয়সার আদান-প্রদানও একেবারে বিরল নয়। সেখানে আরেক দল লোকের আনুকূল্য চাই, অবশ্য মোটা বখরার বিনিময়ে। তাদের নাম পেটী অফিসার, ছেলেরা বলে 'মাষ্টার', কাঠ-মাষ্টার, লোহা মাষ্টারের থেকে ভিন্নগোত্র। সরকারী কাজ—পাহারা ও খবরদারি।

আর একটা কারণে ছেলেমহলে দর্জীশালার প্রচুর প্রভাব। তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ইউনিফর্মের খাকী রং এবং তার উপরে ব্যাপক অরুচি।

দুপুরের দিকে সুপার এবং তার ডেপুটি যখন অনুপস্থিত, দর্জী কামান কিঞ্চিৎ বেসরকারী কারবার করে থাকে। বর্ষ্টালের বাসিন্দার সংখ্যা যতই নগণ্য হোক, ষ্টাফ অর্থাৎ কর্মিদলটি ছোট নয়। সাত আট জন ইন্‌স্ট্রুক্‌ট্রার, হেড্‌মাষ্টার ও তার সহকারী শিক্ষক জনচারেক, ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার, কেরাণীকুল, তার উপরে চীফ ও তার উপচীফ সমেত একদল সিপাই বা পেটী অফিসার। বেতনের ব্যাপারে বেশীরভাগই দর্জী-মাষ্টারের নিকট প্রতিবেশী। সকলেরই সংসার আছে এবং সেখানে লক্ষ্মীর বদলে মা ষষ্ঠীর অতিরিক্ত অনুগ্রহ। সরকারও এদের উপর যথেষ্ট দয়াপরবশ। পেটী অফিসারের একাংশ সমেত প্রায় সকলকেই একটি করে বাসগৃহ দান করেছেন। তার ভাড়া লাগে না। সে কি কম অনুগ্রহ? 'বাসগৃহ' কথাটা আক্ষরিক অর্থে নয়, সরকারের সম্মানরক্ষার্থে ব্যবহার করা হল। আসলে সেগুলো 'গৃহ' নয়, 'বাস' করবার জন্যেও তৈরি হয়নি। ডিষ্ট্রিক্ট জেলের আমলে ছিল 'ডেডষ্টক্ আর্টিকেলস্' অর্থাৎ লোহালক্কড়ের গুদাম, এখন একগাদা হাফ্‌ডেড্ নরনারীর মাথা গুঁজবার গুহা। যাদের মাথা সেখানে বেশ কিছুদিন থেকে গোঁজা আছে, তারা যে অচিরেই পুরো-ডেড্-এর দলে গিয়ে ভিড়বে সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষ ছাড়া আর সকলেই নিঃসন্দেহ।

গুদামগুলোর পেছনের দেয়াল জেলের প্রাচীর, নিশ্ছিদ্র, নিরেট। দুপাশের দেয়ালেও একটা ফোকর পর্যন্ত নেই। সামনে একটি মাত্র দরজা। ভরদুপুরেও আলো না জ্বেলে ভিতরটা দেখতে পাবে, এ রকম চোখের জোর বন্য জন্তুর থাকতে পারে মানুষের নেই। সুতরাং দিনরাত বাতি জ্বলছে; এবং সেটা কেরোসিনের ডিবা কিংবা বর্ষ্টালের বাতিলকরা

ভাঙা হারিকেন। তার থেকে আলো বেরোচ্ছে যতটা তার দশগুণ উঠছে কালি। মারাত্মক ফলটা অনুমান করতে ডাক্তারী জ্ঞানের দরকার হবে না।

প্রতিটি বাড়ি অর্থাৎ কোয়ার্টার্সের সামনে একটু করে ঘেরা কম্পাউণ্ড। কী দিয়ে ঘেরা জানতে চাইবেন পাঠক। কেরোসিন টিন কেটে কেটে পিটিয়ে সোজা করে তৈরি হয়েছে ছোট ছোট পাত। তার উপর আলকাতরা লাগিয়ে পাশাপাশি বাঁশের বাখারিতে গেঁথে বেড়া বানিয়ে দিয়েছে বর্ষ্টালের ছেলেরা। সেইগুলো জুড়ে জুড়ে খাড়া হল কম্পাউণ্ড ওয়াল। সরকার একটি পয়সা দেননি, এই রকম উদ্ভট স্কিমের স্যাংকশনও নেই। এসব ঘোষসাহেবের পাগলামি। পি, ডবলিউ, ডি'র ইঞ্জিনিয়র মাঝে মাঝে হুমকি দেন, আমাদের বিল্ডিং-এর গায়ে কতগুলো ডার্টি আন-অথরাইজ্ স্ট্রাক্চার আমরা এ্যালাউ করবো না। পুল দেম ডাউন। সাহেব তার বেঁটে ছড়িটা বগলে চেপে ছুটে আসেন, বেড়ার গায়ে চটেঘেরা শৌচাগারগুলো দেখিয়ে বলেন, ঐ আবশ্যক কর্ম্মটির জন্যে হতভাগা মেয়েমানুষগুলোর এখনো যে একটু আড়াল দরকার। অবিশ্যি, বেশীদিন আর দরকার হবে না। যেভাবে আছে, শীগগিরই হয়তো গোরু ঘোড়ার দলে চলে যাবে। তখন আর পরদা লাগবে না। তখন আমি নিজেই এগুলো সব ভেঙে দেবো। আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। কটা দিন সবুর করুন।

একজিকিউটিভ ইনজিনিয়র হেসে চলে যান। বন্ধু লোক; প্রশ্রয়ের সুরে বলেন, আপনার সঙ্গে আর পারা যায় না, মশাই। কিন্তু আপনার ডিপার্টমেণ্ট কী করছে? ষ্টাফ কোয়ার্টারের ব্যবস্থা না করে আপনারা এখানে এলেনই বা কেন? এগুলো তো আগেই দেখবার কথা।

—'দেখবেটা কে?' উত্তর করেন ঘোষ। 'আমি যখন বলতে গেলাম স্কুল তো খুলছ, এতগুলো স্টাফ্, জায়গা দেবে কোথায়? মনিব তাকালেন তাঁর পাকামাথা পি-এর দিকে। তিনি বললেন, তার জন্যে ভাবনা নেই, সাহেব। দে ক্যান্ লিভ অ্যানিহোয়ার।

ব্যস্; তারপর ফিরতে না ফিরতেই হুকুম পেলাম, ইউ আর দি ম্যান্

অন্ দি স্পট্; একটা কিছু বন্দোবস্ত কর।' করলাম। বিনি পয়সায় এরকম খাসা কেরোসিন ওয়াল বানাতে পারতেন আপনি?'

ঐ কটা গুদামে সব লোকগুলোকে পুরে দেওয়া সম্ভব হয়নি। যেগুলো বাকী রইল, তাদের জন্যে তৈরি হল সস্তাদামের কতকগুলো কুড়ে। চাটাই-এর বেড়া, সরু শাল গাছের খুঁটি, উপরে ধানের খড়ের ছাউনি। একটা বর্ষাতেই সেগুলো পচে গলে ঝাঁজরা। পরের বর্ষার অনেক আগেই মেরামতের এষ্টিমেট্ গিয়ে পড়ে থাকে ইনস্পেকটর জেনারেলের দপ্তরে। মঞ্জুরি আসতে আসতে শীত এসে পড়ে। তালপাতা মাথায় দিয়ে নির্ব্বিবাদে বর্ষা কাটায় বর্ষ্টালের বাবুরা।

কিন্তু এদের প্রাণেও সাধ আহ্লাদ আছে। ছেলেপিলের মুখে অন্ন দিতে না পারুক, গায়ে একটা করে ভদ্রবেশ না দিলে চলে কেমন করে? ঈশ্বরের আশীর্বাদে সব বাড়িতেই, বলতে নেই, তাদের দলটা বেশ পুষ্ট। নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাবার পর আদি দম্পতিকে স্বর্গোদ্যান থেকে বিদায় করবার কালে ঈশ্বর তাদের আদেশ করেছিলেন, গো অ্যাণ্ড মালটিপ্লাই। খৃষ্টান না হয়েও সে আদেশ এরা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে আসছে। শুধু এরা কেন, এদের মত এদেশের অগণিত মানুষ; যাদের ঘরে খাবারের বদলে খাইয়েদের ভিড় অন্ততঃ দশগুণ।

এইসব বাবুদের ছেলেপিলের জামা-কাপড়-সমস্যা আংশিকভাবে মিটিয়ে থাকেন বর্ষ্টালের দর্জীমাষ্টার। কোনো রকমে কাপড়টুকু সংগ্রহ করতে পারলেই হল। তাকে কেটেকুটে কলে চড়িয়ে জামায় দাঁড় করাবার ভার তাঁর হাতে। ব্যাপারটা খয়রাতী নয়। কিন্তু যৎকিঞ্চিৎ পারিশ্রমিক দিলেই তিনি খুশী। তাঁকেও তো এই করেই চালাতে হয়। কারিগর ছেলেগুলোর লাভ হল—মাপ নেবার ফাঁক দিয়ে খানিকটা বাড়তি কাপড়। সেইগুলোই ফতুয়া, আণ্ডারওয়ার রুমাল হাফ্সার্টের রূপ নিয়ে নিরবচ্ছিন্ন খাকী-রাজ্যে কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্যের আমদানী করে থাকে। খাকীর উপর অরুচি তো সকলেরই। সুতরাং মুখ বদলাবার সুযোগ কেউ ছাড়ে না। তাই, দর্জীশালার চাঁইদের কেউ চটাতে চায় না। তাদের প্রভাব সর্বত্র।

প্রকাশ্য দিনের সাদা আলোয় দর্জীমাষ্টারের এই কালো কারবারটি

গোপন থাকবার কথা নয়। জানে সবাই, কিন্তু ফাঁস করে না কেউ। মোটামুটি সকলেরই স্বার্থ আছে। ডেপুটি সুপার নতুন মানুষ। তাঁর কানে যখন খবরটা গেল, তিনি অস্বস্তিবোধ করতে লাগলেন। সাহেবের নজরে আনবার আগে দর্জীমাষ্টারকে ডেকে পাঠালেন। মাষ্টার কিছুমাত্র না ঘাবড়ে সোজাসুজি সবকিছু কবুল করে বললেন, এতে করে সরকারী কাজের তো কোনো ক্ষতি হচ্ছে না স্যর; বরং একদল গরিব লোকের উপকার হচ্ছে। তার মধ্যে আমিও আছি।

ডেপুটি তো অবাক। চোখ কপালে তুলে বললেন, তাই বলে এসব বে-আইনী কাণ্ড চলতে থাকবে!

উত্তর এল, চিরদিনই তো চলে আসছে।

ব্যাপারটা সাহেবের কানে তুলতে হল। তিনি ফাইল পড়ছিলেন, পড়েই চললেন। ডেপুটি জোর দিয়ে বললেন, এই ম্যাল্‌প্রাকটিস অনেক দিন থেকে চলছে।

—জানি।

ডেপুটি সুপারের বিস্ময়ের অবধি রইল না। জেনেশুনেও সরকারী প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত একজন দায়িত্বশীল অফিসার কি করে এতদিন চুপ করে আছেন, তাঁর বোধ্যগম্য হল না। বললেন, এগুলো স্যর, এখনই বন্ধ করা দরকার।

—'সে চেষ্টাও করেছি', মাথা না তুলেই বললেন ঘোষসাহেব। 'টেলর মাষ্টারকে গোটাকয়েক পানিশমেণ্টও দিয়েছি। ওর সার্ভিস-বুক খুলে দেখবেন। তারপর কী হল, জানেন? (এবার তাকালেন তাঁর ডেপুটির দিকে) সব স্টাফ্ একদিন সার দিয়ে দাঁড়াল এসে ঐ গেটের মাঝখানে। বলল, "স্যর, দোষ আমাদের সকলেরই। ও বেচারা একা কেন শাস্তি পাবে? আমাদেরও পানিশমেণ্ট দিন।" আমি চুপ করে রইলাম। একজনের হাতে ছিল পে-লিষ্ট-এর খাতা। এগিয়ে এসে খুলে ধরে বলল, "শাস্তি আমাদের প্রাপ্য। যা দেবেন মাথা পেতে নেবো। কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে আপনাকে। এই দেখুন মাইনের স্কেল। বলুন, এ দুর্দিনে একটি ভদ্র পরিবারের এ দিয়ে কেমন করে চলে!"'

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন সুপার সাহেব। ক্ষণিক বিরতির পর যোগ করলেন, 'ওদের প্রশ্নের উত্তর আমার মাথায় যোগায়নি। শুধু বলেছিলাম, তোমরা কাজে যাও।'

ডেপুটি সুপার খাঁটী এবং কড়া মানুষ। দারিদ্র্যের অজুহাতে অসাধু আচরণ সমর্থন করা যায় না, সেটা তিনি জানেন। বললেন, কিন্তু স্যর, এ রকম ডিজ্‌অনেষ্ট ষ্টাফ্ নিয়ে—

'ডিজ্‌অনেষ্ট !' মৃদু হেসে বাধা দিলেন সাহেব। 'বুদ্ধদেবের সেই একমুঠো সর্ষের গল্প জানেন ? জানেন না তো ? তবে শুনুন। সদ্য সদ্য একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে একটি স্ত্রীলোক এসে কেঁদে পড়ল তথাগতের পায়ের তলায়। মনে করেছিল করুণাময় মহাপুরুষ; তাঁর কাছে গেলেই এ মহাশোকের সান্ত্বনা মিলবে। বুদ্ধ বললেন, যে গৃহে মৃত্যুর প্রবেশ ঘটেনি, সেখান থেকে একমুঠো সর্ষে নিয়ে এসো। এক ঘর থেকে আরেক ঘরে ঘুরে বেড়াল মেয়েটি। মৃত্যু হানা দেয়নি তেমন ঘর পেল না। সন্ধ্যেবেলা ফিরে এসে বলল, পেলাম না প্রভু। তবে একটা জ্ঞান লাভ হল—এ দুঃখ আমার একার নয়। সকলের।'

ডেপুটি সুপার এ গল্পের তাৎপর্য ঠিক বুঝতে পারলেন না। তাঁর সপ্রশ্ন দৃষ্টির দিকে চেয়ে সায়েব বললেন, আমি বুদ্ধদেব নই। আপনাকে সর্ষে আনতে বলবো না। কিন্তু একটি মানুষ খুঁজে আনতে বলবো যে ডিজ্‌অনেষ্ট নয়—কাজে কিংবা চিন্তায়। যদি পারেন, সেদিন আমি এদের সবাইকে একসাথে ডিস্‌মিস করবো।

ডেপুটি চুপ করে আছেন দেখে আবার বললেন, একবার উপরতলাটা ঘুরে আসুন, সন্তোষবাবু। দেখবেন, সেখানে গাদা গাদা রাঘব বোয়ালের ছড়াছড়ি। তারা যদি অবাধে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারে, গোটা কয়েক চুনোপুঁটি মেরে আর কী উপকার হবে ?

*   *   *   *

বর্ষ্টালের শাসন-তন্ত্রে একজন 'ষ্টার' এবং 'হাউস-ক্যাপ্টেনের' ক্ষমতা কম নয়। চীফ্, উপচীফ, ইনস্‌ট্রাক্টরবাবুরা এবং অনেক সময় স্বয়ং ডেপুটি সুপার পর্যন্ত এদের কথা শুনে চলেন। কিন্তু সেও একটা দর্জী ছেলের পেছনে লাগা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করল না। বিশেষ

করে বিষয়টা যেখানে সামান্য একটা জাঙিয়া। ওটা বাজেয়াপ্ত হলে, ওর জায়গায় আরেকটা সে যখন তখন তৈরি করে নেবে। মাঝখান থেকে সে-ই ওদের বিষ নজরে পড়ে যাবে। ক্যাপটেন তাই উদ্যত শুঁড় নিঃশব্দে গুটিয়ে নিয়ে অন্য দিকে মন দিল।

ঘুম থেকে উঠে 'হাউস' ছেড়ে বেরোবার আগে প্রত্যেককে তার বিছানাটি পাট করে গুছিয়ে এক লাইনে সাজিয়ে রাখতে হয়। সকলের দেখাদেখি দিলীপও তার দুটো কম্বল ভাঁজ করে রাখতে যাবে, ক্যাপটেন চেঁচিয়ে উঠল, 'হয়নি, হয়নি।' বলেই, পাশে দাঁড়ানো কেশবকে ধমকে উঠল, 'কি দেখছিস হাঁ করে? নতুন ছেলে, শিখিয়ে দিতে হবে না?' কেশব তখন এগিয়ে এসে কম্বল দুটো ওর হাত থেকে নিয়ে, আলাদা আলাদা পাট করে একটার পর একটা পরিপাট করে সাজিয়ে রাখল। তার উপরে বাড়তি প্যান্ট, সার্ট, চাদর আর বালিশটা রেখে বলল, এমনি করে রাখবে। ত্মাখো না, ওরা সবাই কি করছে। ঠিকমত না রাখলে ডেপুটিবাবু বকাবকি করে, রিপোর্ট করে দেয় সায়েবের কাছে।

'রিপোর্ট' বস্তুটির খানিকটা ধারণা আসামাত্র হয়ে গেছে। কথাটা শুনেই দিলীপ মনে মনে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। ওর কবলে যেন পড়তে না হয়। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'রিপোর্ট' করলে কী শাস্তি হয়?

—তার কিছু ঠিক আছে? এই সব ছোটখাটো দোষ করলে বেশী করে ড্রিল করায়।

'ড্রিল' জিনিসটা দিলীপের অজানা নয়। তাদের বস্তির ইস্কুলেও করতে হত। ভালোই লাগত তার। তাকে এরা 'শাস্তি' বলছে কেন বুঝতে পারল না। বলল, ড্রিল তো ভালো। আমরা ক-তো করেছি।

—'ও-ও, সেই ড্রিল বুঝি?' বোকা ছেলেটার অজ্ঞতা দেখে অবাক হল কেশব। 'এর নাম বোর্ষ্টাল ইস্কুল। থাকো না দুদিন; ড্রিল মাষ্টারের জুতোর ঠোক্কর খেলে বাপের নাম ভুলে যাবে। এই দেখ না? নীচু হয়ে ডান পায়ের গোড়ালির ইঞ্চিখানেক উপরে একটা কাটা দাগ দেখাল। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে বলল, পা মেলাতে না পারলেই ঠোক্কর। সব্বার পায়ে আছে, দুচারজন ছাড়া।

ক্যাপ্‌টেনের হাঁক শোনা গেল, এই, কী করছিস তোরা ওখানে দাঁড়িয়ে?

ছেলেরা তখন এগিয়ে গেছে। পাশাপাশি অন্য ঘর থেকেও বেরিয়ে পড়ছে কয়েক দল। এদের চেয়ে মাথায় বড়। কেশব দিলীপকে তাড়া দিয়ে বলল, চল, চল। দেরি হলে চীফ্‌ আর আস্ত রাখবে না।

দরজার মুখে এসে থেমে যেতে হল। একটি বছর নয়েকের রোগা টিনটিনে ছেলে অতি কষ্টে দুটো কম্বল বগলদাবা করে বেরোবার আয়োজন করছিল। ক্যাপটেন পেছন থেকে বাধা দিল, আরে, কম্বল নিয়ে যাচ্ছিস কোথায়?

ছেলেটা জবাব দিল না। অপরাধীর মত মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। আশে-পাশে যারা ছিল, সকলেরই চোখমুখে কৌতুক হাসি উপচে পড়ছে। একজন এগিয়ে এসে আলগোছে কম্বলটা একবার শুঁখে নাক মুখ বিকৃত করে বললে উঁ! হাসির রোল উঠল চারিদিকে। ক্যাপটেন নিজেও তাতে যোগ না দিয়ে পারল না। হাসতে হাসতেই বলল, মার মার, চাঁদা করে চাঁটি মার ওর মাথায়।

কে একজন বলে উঠল, না, না; মাথায় মারলে আরো বেশী করে করবে।

ক্যাপটেন বলল, তাহলে জোরে জোরে দুটো থাপ্পড় মার ওর গালে। বুড়ো মদ্দ, রোজ রোজ বিছানা ভাসাবে।

ছেলেটা জলভরা চোখ তুলে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, আমি ইচ্ছে করে করেছি নাকি? বলেই ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল।

মুখ ধোওয়া ইত্যাদি শেষ হতে না হতেই খাবার ঘণ্টা পড়ে গেল। আর্লি মর্নিং মীল—প্রাতরাশ। সাধারণতঃ খিচুড়ি;—চালের ভাগই বেশী, সঙ্গে সামান্য কিছু ডাল। চেহারাটা জেল্‌-এ যেমন হয়, ততটা কালো নয় (সেখানে লোহার ডেক, এখানে পেতলের), খেতেও বিস্বাদ বলা যায় না। তবু কেউ পচ্ছন্দ করে না। তার কারণ বোধহয় ঐ পদার্থটির প্রচলিত নাম—লপ্‌সি। কথাটার মধ্যেই কেমন একটা 'জেল-জেল' গন্ধ জড়িয়ে আছে। শুধু গন্ধ নয়, লপ্‌সির পেছনে একটা ইতিহাসও আছে। এখানকার বাসিন্দারা সেটা পুরোপুরি না জানলেও, যেটুকু জানে

যা শুনেছে, এর বিরুদ্ধে একটা কঠোর মনোভাব গড়ে উঠবার পক্ষে যথেষ্ট। আজ লপসি ছিল না; তার বদলে চিঁড়েগুড়ের ব্যবস্থা। ছেলের দল প্রায় বাহু তুলে নৃত্য শুরু করল। বয়সটাই এমনি। কত সহজে খুশী করা যায়, আবার কত সহজে রুষ্ট হয়ে ওঠে!

একটা টিনের শেডের মধ্যে খাবার জায়গা। 'ডাইনিং হল।' আগে সব উবু হয়ে বসত। ছোটদের বড় কষ্ট হয়। সাহেব ব্যবস্থা করেছেন লম্বা লম্বা পিঁড়ি—চারজন করে বসবে একটাতে। তার আগে এক সারিতে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা কিংবা ভজন গান। সহজ সুর। তাহলেও সকলের গলায় আসে না। কথাগুলোও জানা নেই অনেকের। তাতে কিছু আসে যায় না। যাহোক একটা তান তুললেই হল। নাইবা মিলল অন্য কারুর সঙ্গে। সে বিষয়ে চীফ অফিসার অত্যন্ত উদার। কিন্তু চুপ করে থাকতে পারবে না। ভগবানের নাম না করে পেটপূজা —সেটা যে কত গর্হিত, এই বয়স থেকে না শিখলে শিখবে কবে?

সাহেবকে একদিন এই ভজন শোনাতে ডেকে এনেছিল চীফ্। বিশেষভাবে নির্বাচিত গান। সাহেব মনোযোগ দিয়ে শুনছেন দেখে কী আনন্দ! শেষ হতেই লম্বা স্যালুট দিয়ে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করল, কেমন লাগল, হুজুর? মনিব গম্ভীর গলায় বললেন চমৎকার হয়েছে। এক কাজ করলে পার। এই কেষ্টর জীবগুলোকে মিছেমিছি কষ্ট না দিয়ে গঙ্গার ওপার থেকে কতগুলো শেয়াল এনে ছেড়ে দাও। তাতে করে একটা সুবিধে হবে, সময় মত তারা নিজে থেকেই গান ধরবে। ধর-পাকড় হাঁকডাক কিছুই করতে হবে না।

দিলীপ জীবনে কোনোদিন গান করেনি। সুতরাং চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। কেশবের হঠাৎ নজর পড়তেই, সে ওর পিঠে চিমটি কেটে বলল, 'ঠোঁট নাড়।' দিলীপ ঘাবড়ে গিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। ঠোঁট নাড়াও যে শিখতে হয়, এলোপাতাড়ি নেড়ে গেলে চলবে না। ক'দিন পরেই অবশ্য এ বিদ্যা সে আয়ত্ত করে ফেলেছিল এবং দেখে অবাক হয়েছিল যে, তার মুরুব্বি কেশবচন্দ্র তিন বছরেও এর বেশী অগ্রসর হয়নি। কেউ কেউ বোধহয় আগাগোড়াই ঠোঁট নাড়ার ক্লাশে থেকে যায়। চীফ্ ধরতে পারে না।

লপ্‌সি বা চিঁড়ে-মুড়ির পরেই ড্রিল ও ব্যাণ্ড প্রাকটিস্‌। ব্যাণ্ড পার্টির দলটি আলাদা। বেশীর ভাগই বড় বড় ছেলে, বর্ষ্টাল আইনে যাদের সাজা। কিছু ইনডাস্‌ট্রিয়ালও আছে। শহরে এদের প্রচুর নাম। রুটমার্চ বা ঐ জাতীয় রাষ্ট্রীয় উৎসবে পুলিশ ব্যাণ্ডের পেছনে 'বর্ষ্টাল জেল' এর খুদে ব্যাণ্ডও যোগদান করে থাকে। দর্শকেরা আমোদ পায়, কেউ কেউ বড় বড় চোখ করে তারিফ করে, ঐটুকু টুকু ছেলে, কী চমৎকার শিখেছে দেখেছ? কেউ বলে না, ভেবেও দেখে না, ঐ অত বড় জয়ঢাকটা বুকে করে বয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতা ঐ বেঁটে ছেলেটার কাছে আশা করা যায় কিনা, কিংবা প্রাণপণে গাল ফুলিয়ে প্রমাণ সাইজের ব্যাগপাইপগুলো যারা বাজিয়ে চলেছে, তাদের ফুসফুসের জোর কতখানি।

বর্ষ্টালের মিউজিক্‌ ড্রিলের খ্যাতিও কম নয়। ব্যাণ্ড পার্টি বাঁশী বাজায়, তার তালে তালে পায়ের ও হাতের নানা রকম কসরৎ দেখায় ছোট ছোট ছেলেরা। কখনো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে, কখনো মার্চের উপর। কোনো কোনো দিন বাঁশীর সুরে এবং তার সঙ্গে ড্রামের উপর মৃদু গম্ভীর আওয়াজ তুলে ডি, এল, রায়, অতুলপ্রসাদ কিংবা কাজী নজরুলের গান বাজায়। 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা।' 'বল বল বল সবে।' 'ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল।'

বহুদিন ধরে বহু পরিশ্রম করে শিখিয়েছে ব্যাণ্ডমাষ্টার বীর বাহাদুর। একসময়ে গোর্খা রেজিমেণ্টে ব্যাণ্ড বাজাত। এক বাঙালী বন্ধুর মুখে বাংলা গান শুনে ভাল লেগেছিল। তারই কয়েকটা বাঁশীতে তুলে নিয়েছে। তখন জানত না, একদিন তাকে বর্ষ্টালে এসে মাষ্টারি করতে হবে। স্বাস্থ্যের দরুণ অকালে পেনসন নিয়ে কাজ খুঁজছিল। পেয়ে গেল এই চাকরি। সেদিনকার বাড়তি বিদ্যাটাও কাজে লেগে গেল। জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা।

বর্ষ্টালের ভিজিটরবাবুরা, মাঝে মাঝে সস্ত্রীক সরকারী উপর-ওয়ালারা এদের ড্রিল দেখে ও মিউজিক শুনে মুগ্ধ হন। শতকণ্ঠে বীর বাহাদুরের তারিফ করেন। ব্যাণ্ডমাষ্টার বিনয়ে গলে গিয়ে হেঁ হেঁ করে, মাঝে মাঝে তার কাজটি যে কত কঠিন, তারও একটু আভাস দেয়। তার নিজের ভাষায় মোলায়েম করে বলে, আমি আর কী জানি,

হুজুর? সব আপনাদের 'মেহেরবানী। 'লেকিন' গাধা পিটিয়ে ঘোড়া বানানো—'

সে কষ্টটা যে কত বড়, অবশ্যই অনুভব করেন অনুগ্রাহকের দল। কিন্তু কতখানি পিটুনি খেয়ে খেয়ে গাধাকে ঘোড়া হতে হয়, সে ইতিহাস থাকে অন্তরালে। সে কথা কেউ ভুলেও ভাবে না। এই 'মিউজিক'-এর পিছনে দীর্ঘদিন ধরে কত শিশুকণ্ঠের কান্নার সুর চাপা পড়ে আছে তাও কারো কানে এসে পৌঁছায় না।

ছেলেরা যে বাহাদুরি দেখাল তার 'সিংহভাগ' নিশ্চয়ই অধ্যক্ষের প্রাপ্য। বিশিষ্ট ভিজিটরদের মুখ থেকে তাঁকেও অনেক প্রশস্তি-বাণী শোনানো হয়। উপরওয়ালারা যখন অভিনন্দন জানান, ঘোষসাহেব মুখে একটা গদগদ ধরনের মৃদু হাসি ফুটিয়ে তুলে কৃতার্থ হবার ভাব দেখান। তাছাড়া উপায় নেই। সেইটাই সরকারী দস্তুর। অন্যথায় তাঁরা রুষ্ট হতে পারেন। কিন্তু বন্ধুরা যখন পিঠ চাপড়ে কিংবা হাতনাড়া দিয়ে বাহবা দেন, তাঁর পুরু পুরু ঠোঁটের কোণে ফুটে ওঠে বাঁকা হাসির কুঞ্চন। মাঝে মাঝে এমন দু'একটা বেয়াড়া ধরনের মন্তব্য করে বসেন, এসব ক্ষেত্রে যেটা অত্যন্ত বেমানান। একবার একজনকে বলেছিলেন, তোমার সুখ্যাতি শুনে আমার সেই মামাবাড়ির গাড়োয়ানটাকে মনে পড়ল। আমার অবস্থাও অনেকটা তারই মত।

'কি রকম!' বন্ধু রীতিমত অবাক।

—তবে শোনো। বছর কয়েক আগেকার কথা। মামাবাড়ি যাচ্ছিলাম। সখ করে নয়, নিতান্ত বাধ্য হয়ে। মামা অনেক দিন থেকে ভুগছেন। একবার শেষ দেখা দেখে আসা। ছেলেবেলায় উনিই খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছিলেন। তা না হলে বর্ষার ঠিক পরে ও-দেশে কেউ যায় না। ষ্টেশন থেকে পাকা পনর মাইল। আগাগোড়া পাঁক। বর্ধমানের সীতাভোগ মিহিদানাই দেখেছ, তার পাঁক যে কী বস্তু নিশ্চয়ই পরখ করনি। শ্রীক্ষেত্রের পাণ্ডার চেয়েও নাছোড়বান্দা। যতই ছাড়াতে যাও, দুপায়ে লেপটে থাকবে।

প্ল্যাটফরম থেকে বেরিয়ে দেখি একখানিমাত্র গোরুর গাড়ি পড়ে আছে। গাড়োয়ান পাশে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছে। মামার ভিটেবাড়ির

প্রজা। তা নাহলে পনরশ' টাকাতেও এই পনর মাইল ঠেঙিয়ে কেউ আসত না। তাছাড়া তাকে বলা হয়েছিল, 'একজন' বাবু আসছেন, সঙ্গে মালপত্তর কিছু নেই। 'এক' যে 'বহু' হতে পরে উপনিষদের সে গভীর তত্ত্ব সে জানবে কোত্থেকে? আমার এই বিশাল বপুটার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইল যেন দিনদুপুরে ভূত দেখেছে। বিড়িটা হাত থেকে খসে পড়ে গেল, জানতেও পারল না। আমার চোখ পড়ল গোরু দুটোর দিকে। হাড়ের ওপর শুধু একটা চামড়ার ঢাকনা। তার ওপরে কেটে কেটে বসা লম্বা লম্বা দাগ।

কিন্তু বাহাদুর বটে লোকটা। যে-কাণ্ড করে, বেপরোয়া গালাগালি আর তার সঙ্গে বেধড়ক পাচনবাড়ির চালিয়ে ছ' ঘণ্টায় সেই পনর মাইল পথ ভেঙে সে আমাকে মামাবাড়ির দরজায় এনে ফেলল, তা দেখে সেদিন শুধু একটা কথাই মনে হয়েছিল—লোকটা গাড়ি না চালিয়ে সার্কাসের দলে গেল না কেন? এর চেয়ে আশ্চর্য কসরৎ কোন্ সার্কাসে দেখানো হয়?

তারপর, তোমরা যেমন আমাকে কংগ্রাচুলেট কর, আমিও তাকে তার বাহাদুরির জন্যে পিঠ চাপড়ে অভিনন্দন জানিয়েছিলাম, সেই সঙ্গে বখ্‌সিস দিয়েছিলাম নগদ পাঁচ টাকা। গোরুগুলোর মুখ দিয়ে তখন ফেনা ঝরছে, পিঠময় রক্তের দাগ। সেদিকে আর তাকাইনি।

ছেলেদের চিঁড়ে-চর্বণ শেষ হতে না হতেই মাঠের দিক থেকে ভেসে এল একটা টানা বাঁশীর সুর। ঘরময় হৈ রৈ পড়ে গেল। বাকী গ্রাসগুলো কেউ ফেলে রেখে, কেউ একসঙ্গে মুখে পুরে দিয়ে হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়ল। ভীষণ কড়া মানুষ ড্রিলমাষ্টার যদুনাথবাবু। এক মিনিট দেরি হলে আর রক্ষা নেই। ডবল মার্চ করিয়ে করিয়ে জান বের করে দেবে।

দিলীপও খাওয়া ফেলে অন্য সকলের সঙ্গে উঠে পড়েছিল। বেরোতে গিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল, কেশব নেই। আর কাউকে সে চেনে না। হঠাৎ বড় অসহায় মনে হল নিজেকে। খানিকটা অভিমানও হল নতুন জোটানো বন্ধুর উপর। এইমাত্র ছিল তার পাশে; এর মধ্যে কোথায় উধাও হয়ে গেল! এক কোণে দাঁড়িয়ে অচেনা মুখগুলোর পানে

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে চেয়ে দেখছে। হঠাৎ একটি ফর্সামত জোয়ান ছেলে যেতে যেতে থেমে গেল তার কাছে। চোখ দুটো ছোট ছোট, নাকটা চাপা, চাকার মত মুখ। হেসে বলল, তুমি বুঝি নতুন এসেছ? কথাগুলোয় কেমন একটা অদ্ভুত টান। দিলীপ মাথা নেড়ে জানাল হ্যাঁ। ছেলেটি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এসো। আমার নাম মনবাহাদুর। সবাই 'বাহাদুর' বলে ডাকে।

বাহাদুর তার হাত ধরে ড্রিলমাষ্টারের কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, নতুন ছেলে, স্যর। ভারী ঠাণ্ডা।

'গোড়াতে সবাই অমন ঠাণ্ডা থাকে', ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন যদুবাবু, 'দুদিন পরেই ন্যাজ গড়ায়। কি নাম তোর?'

দিলীপ পুরো নাম বলতেই ভেংচে উঠলেন ড্রিলমাষ্টার, ভট্টাচার্য! সাধুভাষা বলছে ব্যাটা! ভট্চায্যি বামুনের ছেলে, জেলে এলি কি করে? কী চুরি করেছিলি?

ধমকের চোটে দিলীপের পিলে চমকে গিয়েছিল। ভয়ে ভয়ে বলল, চুরি করিনি।

—কী করেছিস তবে? ডাকাতি?

দিলীপ কি বলবে ভেবে পেল না। তার হয়ে জবাব দিল মনবাহাদুর, কিছু না করেও এখানে আসা যায় স্যর।

ড্রিলমাষ্টার তার দিকে চোখ পাকিয়ে বললেন, তোকে ফোঁপর দালালি করতে কে বললে? খুব লায়েক হয়ে গেছ, না?

মনবাহাদুর আর কিছু বলল না। বিরস মুখে ওদিকে চলে গেল। সে ব্যাণ্ড পার্টির লোক। তাদের প্রাকটিস শুরু হবে এখনই।

ড্রিলমাষ্টার দিলীপকে জিজ্ঞেসা করলেন, ড্রিল করেছিস কখনো?

—করেছি।

—কোথায়?

—আমাদের ইস্কুলে।

ইস্কুলে! কোন্ ইস্কুল?

—আমাদের বস্তিতে।

'বস্তিতে!' হা-হা করে হেসে উঠলেন যদুবাবু। ব্যাণ্ডমাষ্টার

বীরবাহাদুর তখন মাঠে ঢুকছে। বলল, কী হোল, যদুবাবু? অতো হাসি কিসের?

—এই ছোকরা কি বলছে, জান? কোথাকার কোন্ বস্তিতে নাকি ড্রিল করতো! ব্যস্ আর চাই কি? এবার আমার পোষ্টটা ওকে দিয়ে দিলেই হয়।

বলেই আর এক দফা অট্টহাসি। বীরবাহাদুর কোনো উত্তর না দিয়ে তার নিজের ছেলেদের দিকে এগিয়ে গেল। যদুবাবুর দুচোখে ভ্রূকুটি দেখা দিল। এক ঝামটায় মুখখানা সরিয়ে নিয়ে দিলীপকে বললেন, ঐদিকে গিয়ে দাঁড়া। এর পরে দেখা যাবে কী ড্রিল শিখেছিস, কতখানি তোর বিদ্যের দৌড়।

আর একবার বাঁশীতে ফুঁ দিতেই ড্রিলের ছেলেরা সার বেঁধে দাঁড়াল। তাদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকিয়েই হেঁকে উঠলেন ড্রিলমাষ্টার, সে কোথায় গেল? সেই কোলা ব্যাঙটা?

উচ্চ হাসির রোল উঠল, ছেলের দলে। কে একজন বলে উঠল, পালিয়েছে, স্যর।

—পালিয়ে যাবে কোন্ চুলোয়? তুই যা; চীফ অফিসারকে বলে আয়। নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে আছে, নয়তো পাইখানায় ঢুকেছে।

প্রথম নম্বরে যে দাঁড়িয়েছিল, ওদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা, তাকেই ইঙ্গিত করলেন। সে তৎক্ষণাৎ ছুটে চলে গেল, এবং ফিরে এসে জানাল, চীফ অফিসার বললেন, আছে, কোথাও। তোরা শুরু কর। আমি ওকে খুঁজে বার করে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

যদুবাবু বিরক্তি প্রকাশ করলেন, 'তার মানে, আজও ফাঁকি দিল ছোঁড়া। এমনি করেই বদমাসগুলো মাথায় ওঠে। গোসাঁই দিয়ে কি আর জেল চলে!

এদিকে সময় চলে যাচ্ছে। অগত্যা বাকী সবাইকে নিয়েই ড্রিলের কাজ আরম্ভ করে দিলেন।

চীফ একজন পেটী অফিসারকে হুকুম করল কেশবকে খুঁজে নিয়ে আসতে। সে তামাম 'জেলটা' ঘুরে এল। তাকে পাওয়া গেল না।

চীফ ঝাঁঝিয়ে উঠল, পাওয়া গেল না মানে? উড়ে তো আর যেতে পারে না। বলে, নিজেই বেরোল খুঁজতে। সব জায়গা তন্ন তন্ন করে দেখা হল। কোথাও নেই। তবে কি পালাল? তাহলে তো পাগলা-ঘন্টি দিতে হয়। তার আগে ডেপুটিবাবুকে রিপোর্ট করতে হবে। সেই উদ্দেশ্যেই চলেছিল অফিসের দিকে। মেইন ব্যারাকের সামনে দিয়ে পথ। তার পাশে এক সার পেয়ারা গাছ। হঠাৎ মনে হল, একটা উঁচু ডাল যেন একটু নড়ছে। ভাল করে তাকিয়েই চেঁচিয়ে উঠল চীফ্, এই বাঁদর, ওখানে গিয়ে উঠেছিস? দাঁড়া একবার তোর ঠ্যাঙ্ যদি-না ভাঙ্গি আজ—নেমে আয়……।

কেশবের নামবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। চীফ এবং দু-একজন পেটী অফিসার কিছুক্ষণ লাঠি আস্ফালন করল। যাকে লক্ষ্য করে করল, সে একেবারে নির্বিকার, যেন কানেই যায়নি, কী বলছে এরা। দুডালের ফাঁকে আর একটু ঘন হয়ে বসল। বাধ্য হয়ে অন্য পথ ধরল চীফ্। নরম সুরে বলল, এখনো যদি নামিস, কিছু বলবো না। দেরি করলে আর রক্ষে নেই।

এবারে গুটি গুটি নামতে শুরু করল কেশব। মাটিতে পা দিতেই চীফ্ গর্জে উঠল, গাছে উঠেছিলি কেন?

কোনো উত্তর নেই।

—বল, কি করছিলি ওখানে?

কেশবের মাথাটা আরো খানিকটা নুয়ে পড়ল মাটির দিকে। পেটী অফিসারদের মধ্যে কে একজন বলল, পেয়ারা খাচ্ছিল, আর করবে কী?

—কোথায় পেয়ারা? এটা কি পেয়ারার সময় নাকি?

তাইতো। সকলেরই নজর পড়ল গাছগুলোর দিকে। নতুন পাতা গজিয়েছে। ফলের নাম-গন্ধও নেই।

চীফ্ আর একবার তার প্রশ্নের পুনরুক্তি করেও যখন জবাব পেল না, এগিয়ে এসে ঠাস করে চড় কষিয়ে দিল ওর গালের উপর। সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভিতর থেকে সুড়ুত করে বেরিয়ে এল একটা গোলগাল ডাঁশা পেয়ারা। ততক্ষণে আরো লোক এসে জড়ো হয়েছে চারদিকে। সকলেই অবাক! এ সময়ে পেয়ারা এল কোত্থেকে!

—'ঐ একটাই ছিল,' ধুলোজড়ানো পেয়ারাটার দিকে করুণ চোখ রেখে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল কেশব।

চীফ কোনো রকমে হাসি চেপে বলল, তা তো ছিল বুঝলাম। কিন্তু তোর এই রাক্ষুসে খিদে মিটবে কিসে বলতে পারিস? এই না একবাটি চিঁড়ে গিলে এলি?

এর প্রায় বছর খানেক পরে চীফ অফিসারের এই প্রশ্নটা কেশব নিজেই একটু অন্যভাবে জিজ্ঞাসা করেছিল তার বন্ধু দিলীপের কাছে—এত খাচ্ছি, তবু পেঠ ভরে না। কেন, বলতে পারিস? তখন তুজনের খুব ভাব হয়ে গেছে। সেদিন বর্স্টাল স্কুলে একটা ছোটখাটো উৎসব লেগে গিয়েছিল। ছোট বড় সকলের চোখেই উত্তেজনা। কী ব্যাপার? না, বেগুনি হচ্ছে। জেলবাগানের বেগুন,—পালং শাক, শালগম আর মুলোর সঙ্গে ঘেঁটে যা দিয়ে রোজই একটা একই ধরনের কৃষ্ণবর্ণ রসায়ন তৈরী হয়ে থাকে, এবং যার চেহারা দেখেই এতগুলো নাক একসঙ্গে কুঁচকে ওঠে,—তাকে আজ আলাদা করে বেসনে ডুবিয়ে ভাজা হবে। বেসনটাও বাড়তি নয়। যে-ছোলার ডাল ওদের সপ্তাহে তিনদিন গলাধঃকরণ করতে হয়, এবং বহু কসরৎ করেও জলের সঙ্গে তার মিলন ঘটানো কিছুতেই সম্ভব হয় না, তারই খানিকটা করে কেটে রেখে জমিয়ে জমিয়ে আজ হামান দিস্তায় গুঁড়িয়ে বেসনে রূপ দেওয়া হয়েছে। তেলটাও রোজকার রেশন থেকে একটু একটু করে জমানো। অর্থাৎ সরকারের অতিরিক্ত খরচ কিছু নেই। তবু সমস্ত ব্যাপারটাই বে-আইনী। মাথা প্রতি চাল ডাল তেল, নূন মায় হলুদ-লঙ্কার বরাদ্দ সব বাঁধা আছে স্কুল-কোড-এ এবং তার এক চুল এদিক ওদিক করবার ক্ষমতা সুপারকে দেওয়া হয়নি। প্রাত্যহিক রেশন সেইদিনই খরচ করতে হবে, তার কোনো অংশ জমিয়ে রাখা বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। খাদ্যবস্তুর স্কেল যাঁরা তৈরী করেছিলেন তাঁরা তো আর খেয়াল খুশি মত যা হোক একটা দাঁড় করাননি, প্রতিটি জিনিসের খাদ্যমূল্য কষে, ক্যালরি হিসাব করে তবে তার পরিমাণ স্থির করেছেন। তারপর তাকে কোডিফাই অর্থাৎ আইনবদ্ধ করা হয়েছে। সেখানে এদিক ওদিক করা শুধু আইনভঙ্গ নয়, ক্যালরির তারতম্যের দরুণ ছেলেদের স্বাস্থ্যহানির কারণ ঘটানো।

কিন্তু মিলিটারী সুপার মাঝে মাঝে আইন ও ক্যালরি—ছুটোকেই অগ্রাহ্য করে চলেন। কথা নেই, বার্তা নেই, হঠাৎ একদিন চীফ অফিসারকে ডেকে বললেন, আসছে রবিবার দিন নিমকি খাবে ছেলেগুলো, প্রত্যেকে চারখানা করে।

'যে আজ্ঞে, হুজুর' বলে সেলাম করে চলে যায় চীফ। হুকুমটা জানিয়ে দেয় 'রেশন-ষ্টোর'এর কেরাণীবাবুকে। তার মুখে অন্ধকার নেমে আসে। একগাদা কাজ বেড়ে গেল। তার সঙ্গে একঝুড়ি হিসাব। অতটা করে আটা আর তেল কেটে রাখো রোজকার রেশন থেকে, আটার বদলে ইস্যু কর চাল, সেই পরিমাণ 'বিহার ডায়েট' অর্থাৎ যারা একবেলা ভাত, আরেকবেলা রুটি খায়, তাদের সংখ্যা কমিয়ে 'বেঙ্গল ডায়েট' অর্থাৎ ছুবেলা অন্নভোজীদের সংখ্যা বাড়িয়ে দাও, বাড়তি চাল যেটা বেরিয়ে যাচ্ছে, আলাদা একজায়গায় নোট করে রাখো, ছ'মাস পরে 'রাইট অফফ্' করবেন সুপার। তেলের বেলাতেও খাতাপত্রে অমনি সব জটিল ডান দিক বাঁ দিকের ব্যাপার! এসব নির্দেশ আগে থেকেই দেওয়া আছে। পালন না করে উপায় নেই। 'কাগজপত্তর ঠিক রেখো'—সাবধান করে দিয়েছেন সাহেব, 'অডিট যেন কিছু ধরতে না পারে। আর যদি ধরে আমি তো আছি, তোমার কোনো ভয় নেই।' তবু হুঁসিয়ার হয়ে চলতে হয়। খেয়ালী হলেও প্রাণ আছে লোকটার, বুকের পাটা আছে,—নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে কেরাণীবাবুরা। এরকম 'বস্' যাতে বিব্রত না হন, অবশ্যই দেখতে হবে।

খেয়ালী 'বস'এর অত্যাচার যে কর্মীরাই ভোগ করে তাই নয়, কনট্রাক্টর-বাবুরাও বাদ যায় না।

ছেলেদের খাবার 'ফাইলে' উপস্থিত থাকা সুপারের অবশ্য কর্তব্য নয়। কালে ভদ্রে এলেই চলে। কিন্তু ঘোষসাহেবের আলাদা নিয়ম। বিকাল বেলা আফিস নেই ; তবু প্রায়ই এসে হাজির হন এবং সোজা চলে যান 'ডাইনিং সেড্'এ। ছুপুরে থাকেন তার চেয়েও বেশী। একদিন ফিডিং প্যারেড থেকে ফিরে ডেপুটিকে ডেকে বললেন, বাঁধাকপিটা বড্ড একঘেয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওটা বদলান।

—এ সময়ে বাগানে তো আর কিছু নেই। গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন সন্তোষবাবু।

এ ব্যাপারেও সরকারী বিধিনিষেধ রয়েছে। বাগানের তরকারী যদ্দিন না শেষ হচ্ছে, কিংবা ঘাটতি পড়ছে, ততদিন উপরওয়ালারা বাইরে থেকে এক ছটাকও কিনবার অনুমতি দেবেন না। এ নিয়ে হেড অফিসের সঙ্গে অনেক অপ্রিয় চিঠি চলাচল হয়ে গেছে। সুপার বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, অনেক সময় জেল-বাগানে কেবল এক কি দু রকমের সবজি পড়ে থাকে, যদিও পরিমাণের দিক দিয়ে প্রচুর। কিন্তু তাকে খাদ্যবস্তুর রূপ দিতে হলে তার সঙ্গে দু'চারটা অন্য তরকারী মেশাতে হয়। মানুষের, বিশেষ করে এইসব ছোট মানুষের, রসনা বৈচিত্র্য পিয়াসী। বলা বাহুল্য এসব হাস্যকার যুক্তি উপর মহলে পাত্তা পায়নি। সরকারী অর্থের অযথা অপব্যয়ে তাঁরা রাজী হতে পারেননা।

ডেপুটির জবাব শুনে ঘোষসাহেব খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর হঠাৎ মাথা তুলে বললেন, বিষ্টুকে দেখলাম যেন গেটে। ডাকুন তো।

বিষ্টু সরকার একজন কনট্রাকটর। ভয়ে ভয়ে এসে দাঁড়াল সাহেবের সামনে। কী একটা লিখছিলেন। লিখতে লিখতেই বললেন, কাল এক মণ আলু দিও তো বিষ্টু।

বিষ্টু আকাশ থেকে পড়ল। চুণ, আলকাতরা আর নারকেল দড়ির ঠিকাদার সে। আলুর কনট্রাকট্ অন্য লোকের। জোড়হাত করে বলল, আজ্ঞে হুজুর, আলু তো আমার নয়। ওটা বোধহয় ভুবন শা পেয়েছে।

—জানি। তোমাকে দুমণ চুণের অর্ডার দিচ্ছি। তার বদলে এক মণ আলু দেবে!

বিষ্টু প্রমাদ গণল। চুক্তি অনুসারে সে বাধ্য নয়। কিন্তু এ ব্যক্তিটির সামনে সেকথা বলবার সাহস কারো নেই। আমতা আমতা করে, মাথা চুলকোতো চুলকোতে বলল, দুমণ চুণের দামে কি একমণ আলু হয়, হুজুর?

—খুব হয়। কিছু না হয় খসালে ট্যাঁক থেকে, কতগুলো বাপ-তাড়ানো, মা-খেদানো ছেলের জন্যে। ওদের কল্যাণেই তো করে খাচ্ছ।

বিষ্টু নমস্কার করে চলে গেল। ডেপুটি ব্যাপারটা বুঝলেন না। সাহেব বুঝিয়ে দিলেন, অর্ডার যাবে চুণের, গেট বই এবং স্টক বুকে লেখা হবে চুণ, তারই দাম পাবে কনট্রাকটর। আসলে আসবে একমণ আলু, তা দিয়ে তৈরী হবে আলুর দম।

'কিন্তু এটা কি রীতিমত ইররেগুলার নয়, স্যর?' বিস্ময়ের সুরে কিঞ্চিৎ উষ্মার সঙ্গে প্রশ্ন করলেন ডেপুটি সুপার।

'হ্যাঁ, ইররেগুলার বৈকি?' অত্যন্ত সহজভাবে, লেখা থেকে চোখ না সরিয়েই তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন ঘোষসাহেব।

ডেপুটি কিছুক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, তা ছাড়া আমার মনে হয়, এইসব স্পেশাল ফুড খাইয়ে ছেলেগুলোকে আমরা বিগড়ে দিচ্ছি।

এবার মুখ তুললেন সুপার। কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালেন তার ডেপুটির মুখের দিকে। তারপর বললেন, আপনার কটি ছেলে-মেয়ে সন্তোষবাবু?

—তিনটি।

—কত বয়স তাদের?

—বড়টির ষোল, ছোট ছেলেটা সাত বছরের।

—তাদের কি রোজ রোজ একই জিনিস খেতে দেন?

সন্তোষবাবু সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না। ক্ষণকাল অপেক্ষা করে সাহেব বললেন, আপনি হয়তো জানেন না। আপনার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবেন, দেন না। আপনার এই সামান্য আয়ের মধ্যেই তাঁকে ওদের জন্যে আজ এটা কাল ওটার ব্যবস্থা করতে হয়। তা না হলে ওরা খায় না, ফেলে ছড়িয়ে উঠে যায়। মনে রাখবেন, আমরা যাদের নিয়ে আছি, তারাও ঐ বয়সী ছেলে। ভাগ্য-দোষে জেলে এসেছে বলে স্বভাবটা পালটে যায়নি, যেতে পারে না।

চীফ্ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বেগুনি ভাজাচ্ছে। কিচেনের ছেলেরা

তো আছেই, আরো কতকগুলো ফালতু ছেলেও ভিড় করেছে চারপাশে। কিচেন-এলাকার পেটী অফিসার মাঝে মাঝে বেটন উঁচু করে তাড়া করতেই পালিয়ে যাচ্ছে, আবার এক-পা দু-পা করে এগিয়ে এসে জড়ো হচ্ছে উনুনের ধারে। ভাজা বেগুনির পাহারায় রয়েছে জনকয়েক "স্টার বয়"। হঠাৎ তাদের একজন চিৎকার করে উঠল, "এই, নিল, নিল! ঐ যে যাচ্ছে।" এক পাল ছেলে ধর ধর করতে করতে ছুটে গিয়ে বমাল চেপে ধরল চোরকে। কেশব সিকদার। গোটা একটা বেগুনি তার মুখের মধ্যে, আর একটা হাতে। চারদিক থেকে শুরু হল চড় চাপড়, কীল ঘুষি, তার সঙ্গে মুঠি খুলে চোরাই মাল ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা। সে কি সহজে ছাড়তে চায়? দু তিনজনে মিলে অতি কষ্টে যখন উদ্ধার করা হল, সেটা আর খাবার মত নেই, থেঁতলে চেপ্টে টুকরো হয়ে গেছে। মুখের খানা অবশ্য সে নষ্ট হতে দেয়নি। ধ্বস্তাধ্বস্তির মধ্যেই কোঁৎ করে গিলে ফেলেছে।

চীফ্-এর হুকুম মত একজন পেটী অফিসার কেশবের কান ধরে সেল্-এ নিয়ে বন্ধ করল। সে বেলার মত খাওয়াও বন্ধ। 'যেমন নোলা হতভাগার; থাক খানিকটা উপোস করে'—রায় দিল চীফ্ অফিসার। ছেলেরাও অনেকে সমর্থন করল, 'ঠিক হয়েছে। খেয়ে খেয়ে কুমড়ো হয়েছে, তবু লোভ ছাখ না?'

জনাপ্রতি দুখানা করে বেগুনি। দিলীপের পাতে পড়তেই সে এদিক ওদিক তাকিয়ে চট করে লুকিয়ে ফেলল। আশে-পাশে যারা বসেছিল, তাদের একাগ্র লোলুপ দৃষ্টি তখন পড়ে আছে পরিবেশনের ঝুড়ির দিকে। কে জানে যদি বেঁচে যায়, আরেকখানা করে জুটে যেতে পারে।

খাওয়া শেষ করে উঠবার সময় হৈচৈ হল্লার মধ্যে বেগুনি দুখানা কোল থেকে পকেটে চালান করাটাও বিশেষ কঠিন হল না। শীতের দিন। খাবার পরে বেশীর ভাগ ছেলে যখন মাঠের দিকে রোদ পোহাতে গেল, সকলের অলক্ষ্যে দিলীপ চলল সেল্-এর দিকে। সেখানে একজন পেটী অফিসারের পাহারায় থাকবার কথা। কিন্তু কাউকে দেখা গেল না। সেল-ব্লকের সামনেই কতগুলো কাঁঠাল গাছের জটলা।

হুপুরবেলাতেও অন্ধকার মত। শীতের দিনে ভীষণ ঠাণ্ডা। হয়তো সেইজন্যেই সিপাই সেখানে নেই, ওদিকের মাঠের ধারে খোলা জায়গায় রোদে বসে আরাম করছে। সেল-এর সামনে একটুখানি পাঁচিল-ঘেরা উঠোন, ঢুকবার মুখে কাঠের দরজা। সেটা খোলা ছিল। তারই ভিতর দিয়ে দিলীপ নিঃসাড়ে পা টিপে টিপে গরাদ দেওয়া গেটের ফাঁক দিয়ে ফিসফিস করে ডাকল কেশো……। হাতহুটো জড়ো করে তার উপর মাথা রেখে ঠাণ্ডা মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল কেশব। ডাক শুনে ধড়মড় করে উঠে বসল। চোখের কোল বেয়ে নেমে আসা হুটো জলের ধারা তখনো ভাল করে শুকায়নি। তার উপরে ফুটে উঠল এক ঝলক হাসি। ছুটে এসে বন্ধ গরাদের ওপাশে দাঁড়িয়ে বলল, তোদের খাওয়া হয়ে গ্যাছে ?

দিলীপ পকেট থেকে বেগুনি হুটো তুলে নিয়ে শিকের ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে বলল, হ্যাঁ, এই নে।

কেশবের চোখ হুটো চক্‌চক্‌ করে উঠল, মুখেও জল এসে গেল। ডান হাতটা তুলতে গিয়ে হঠাৎ সামলে নিয়ে বলল, না, ভাই, ওটা তোর ; তুই খা।

--যাঃ, আমার কেন হবে ? সে তো আমি তখনি খেয়ে নিয়েছি। এ হুটো তোর জন্যে এনেছি।

—সত্যি বলছিস ?

—বা রে ! মিথ্যে বলতে যাবো কেন ?

—কি করে আনলি ?

—সে সব তোকে ভাবতে হবে না। নে ধর। চট করে খেয়ে ফ্যাল্‌। আবার কে এসে পড়বে।

কেশব আর আপত্তি করল না। বেগুনি হুটো নিয়েই মুখে পুরে দিল। চিবোতে চিবোতে বলল, খুব ভালো হয়েছে, না রে ?

দিলীপ জবাব দিল না , অবাক হয়ে ওর মুখের পানে তাকিয়ে রইল। অমৃতও বোধহয় এমন করে কেউ খায় না। খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে অনুযোগের সুরে বলল, আচ্ছা, তুই হঠাৎ ঝুড়িতে হাত দিতে গেলি

কেন বল ত? খেতে ইচ্ছে হয়েছিল, বাহাদুরকে বললেই হত। সে তো তোকে কত জিনিস এনে দেয়।

—ও সব কি আর তখন মনে ছিল? গরম গরম বেগুনি! দেখে এমন লোভ লেগে গেল! কি জানিস ভাই, প্রাণটা আমার সব সময় খালি খাই খাই করে। কি জানি কেন?

বলে খিলখিল করে হেসে উঠল। হাসি থামিয়ে কেমন একটা উদাস করুণ সুরে বলল, কতদিন যে পেট ভরে খেতে পাইনি। কিছু খেতে দিত না লোকটা।

—কোন্ লোকটা? কার কথা বলছিস?

—সেই আমার বাবাটা। আবার কে?

দিলীপ চমকে উঠল। বাবা সম্বন্ধে এভাবে কেউ কথা বলতে পারে, সে স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবতে পারে না। নিজের বাপকে সে দেখেনি বললেই হয়, মার মুখে যতটুকু শুনেছে, তার থেকেই একটা গভীর শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম জড়িয়ে আছে তার মনের মধ্যে। কখনো তাঁর উল্লেখ করতে গেলে সেই সুরটাই বেরিয়ে আসে। বাবার স্মৃতি জেগে উঠতেই হঠাৎ মাকে মনে পড়ে গেল। হয়তো সেই থেকেই বেরিয়ে এল প্রশ্নটা, তোর মা? তিনি কিছু বলতেন না?

—থাকলে তো বলবে। সে তো সেই ক-বে মরে ভূত হয়ে গেছে।

আরেকবার হেসে উঠল কেশব। কিন্তু দিলীপের কানে সেটা শোনাল ঠিক কান্নার মত।

এর কিছুদিন পরে একদিন বিকাল-বেলা খেলার ঘণ্টা পড়তেই অন্য ছেলেরা যখন 'ভলিবল' নিয়ে ব্যস্ত, ওরা দুজন সকলের অলক্ষ্যে সরে গিয়ে উত্তর দিকের পাঁচিলের ধারে একটা নিরালা কোণ বেছে নিয়ে বসে পড়ল। কেশব সেদিন কি কারণে বকুনি খেয়েছিল 'লোহামাষ্টারের' কাছে। মনটা ভাল ছিল না। হয়তো তার থেকেই বর্ষ্টালে ঢুকবার আগের দিনগুলো মনে পড়ে গিয়েছিল। সমব্যথী বন্ধুর কাছে আপনা হতেই বেরিয়ে পড়েছিল সব কথা, যা সে কোনদিন কাউকে বলেনি। এ যেন তার স্বগতোক্তি, এমনিভাবে ধীরে ধীরে বলেছিল, "মা কবে মরে গেছে আমার কিচ্ছু মনে নেই। বাবা নাকি রাত্তিরবেলা মদ খেয়ে এসে

লাথি মেরেছিল পেটের ওপর। সে সব আমি কিছু জানি না; পটলার মার কাছে শুনেছি। তাকে আমি মাসি বলতাম। তার কাছে খেতাম, শুতাম। তারপর একটু বড় হতেই বাবা এসে নিয়ে গেল। তুজনে সে কী ঝগড়া! মাসি আমাকে যেতে দেবে না, বাবাও ছাড়বে না। তারপর কারা সব এসে পড়ল এদিক ওদিক থেকে। আরো অনেকক্ষণ চেঁচামিচি হল। শেষটায় দেখলাম মাসি বসে বসে কাঁদছে আর বাবা আমার নড়া ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে। আমার একটুও যাবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু বাবার যা রাগ, আর যে রকম গুণ্ডার মত দেখতে ; ভয়ে কিছু বলতে পারিনি।"

তারপর থেকেই শুরু হল তার জীবনের তুঃখের ইতিহাস। একটি একটি করে কেশব তার সব অধ্যায়গুলো খুলে বলেছিল বন্ধুর কাছে। প্রথম থেকেই না খেতে দেবার পালা। অথচ, বাবার অবস্থা খারাপ ছিল না, বেশ সচ্ছলই বলা চলে। কোন্ একটা বস্তিতে একটা খোলার ঘরে তারা থাকত। সকালে উঠেই একটা করে পয়সা পেত কেশব মুড়ি খাবার জন্যে। এক পয়সার মুড়িতে তার পেট ভরত না। একদিন বলেছিল, আর একটা পয়সা দাও না বাবা? বাবা এমন তেড়ে উঠেছিল যে কোনোদিন আর কিছু চাইতে সাহস করেনি। বাজার করে এসে বাবা নিজেই রাঁধত। রান্না হলে একটা কলাই-করা থালায় তুমুঠো ভাত, একটু ডাল কোনোদিন বা এতটুকু তরকারী দিয়ে বসিয়ে দিত তাকে। আধপেটাও নয়। চেঁছে মুছে শেষ কণাটুকু পর্যন্ত খেয়ে বসে থাকত, যদি আর তুটো ভাত দেয়। বাবা ধমক দিয়ে উঠিয়ে দিত। তারপর মস্ত বড় এক থালা ভাত আর বাটি ভর্তি ডাল আর তরকারী নিয়ে এক ঘণ্টা ধরে বসে বসে খেত। খেয়েই শুয়ে পড়ত। উঠত সেই সন্ধ্যার মুখে। রাত্রে রান্নার পাট ছিল না। ন'টার সময় ছেলের হাতে চারটা পয়সা ধরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যেত। এই ছিল রোজকার রুটিন। কোথায় যেত, কেশব তখনো জানত না। বোরোবার আগে কোমরে একখানা ছোরা গুঁজে নিত, আর গায়ে একটা চাদর। অনেক রাত পর্যন্ত খিদের জ্বালায় ছটফট করতে করতে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ত কেশব। তার বাবা যখন ফিরত, তখন ভোর হয়ে গেছে।

তারপর একদিন এই নৈশ অভিযানের রহস্য আর তার কাছে গোপন রইল না। শুধু যে জানল তা নয়, যোগও দিতে হল বাবার সঙ্গে। তখন সে আরো খানিকটা বড় হয়েছে, কিন্তু সে শুধু মাথায়। রোগা পাকাটে চেহারা; পাঁজরের হাড়গুলো স্পষ্ট গোনা যায়। তার উপরে বেশ খানিকটা তেল মেখে ছোট্ট একটা জাঙিয়া পরে প্রায় রাত্রেই বেরোতে হত। হেঁটে হেঁটে পা ব্যথা হয়ে যেত কোনো কোনো দিন। তারপর, রাত যখন গভীর, কোনো একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত তার বাবা। শুধু বাড়িটা নয়, তার আশপাশ, সামনে পিছনের রাস্তা সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে ফিস ফিস করে বলত, জাঙিয়া খুলে আমার কাঁধে ওঠ। পাঁচিলের উপর উঠে বন্ধ দরজার চৌকাঠ বেয়ে নেমে গিয়ে ওপাশ থেকে খিল খুলে দিত। বাবা ঢুকত পা টিপে টিপে। খোলা জানলা দিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখত ঘরের ভিতরটা। কখনো উঠে যেত দোতালায়। তারপর যে ঘরে ঢুকতে হবে তার জানলার শিক ধরে বেঁকিয়ে দেবার চেষ্টা করত। কোনোদিন শুধু হাতে কিন্তু বেশীর ভাগ দিন একটা মোটা কাঠির সঙ্গে দড়ি বেঁধে আস্তে আস্তে চাড় দিতে থাকত। ছুটো শিকের মাঝখানের ফাঁকটা একটু বেড়ে যেতেই ছেলেকে বলত, ঢুকে পড়। কেশব সহজে ঢুকতে পারত না। পিঠের চামড়া উঠে যেত কখনো বা মাথাটা গলত না। ঠেলাঠেলি করে সেই শীর্ণ দেহটাকে ভিতরে চালিয়ে দিতে দিতে চাপা গলায় দাঁত কড়মড় করে বলত তার বাবা, দিন দিন খাসী হচ্ছে হারামজাদা। কাল থেকে কিচ্ছু খেতে দেবো না, শুধু জল খেয়ে থাকবি।

ঘরে ঢুকেই কেশবের প্রথম কাজ ছিল দরজাটা খুলে দেওয়া। এতটুকু শব্দ না হয়, ঘরে যারা ঘুমিয়ে আছে, তারা না টের পায়। তাহলেই বাবা মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেবে। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই বাপ ঢুকে পড়ত, আর ছেলের উপর নির্দেশ ছিল সদর দরজার কপাটের আড়ালে লুকিয়ে থাকা, যতক্ষণ সে কাজ সেরে না ফেরে।

সবদিন সুবিধা হত না। আয়োজনপর্বের মাঝখানেই কোনো এক সময়ে জেগে উঠত কেউ না কেউ। তখন প্রাণপণে পালাতে হত।

আবার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে বিনা বাধায় মনের মত কাজ হাসিল হয়ে যেত। হাতের কাছে যা পেত হাতিয়ে নিয়ে আসত ওর বাপ—ঘড়ি, কলম, সোনার বোতামসমেত সিল্কের জামা, দামী শাড়ি, টাকা ভর্তি মানিব্যাগ এবং ঐ জাতীয় খুচরো মাল। বাক্স-প্যাঁটরা বা অন্য কোনো ভারী জিনিসে হাত দিত না। একবার একটা সুটকেস সমেত রাস্তায় বেরিয়ে প্রায় ধরা পড়েছিল পুলিশের হাতে। তাড়াতাড়ি ফেলে রেখে বাপ-বেটায় দে ছুট।

গৃহস্থের হাতেও একবার ধরা পড়েছিল কেশব। পাঁচিল ডিঙিয়ে সদর দরজা খুলতেই একজন ষণ্ডামতন হিন্দুস্থানী ছুটে এসে তার একটা হাত চেপে ধরেছিল। রাখতে পারেনি। পিছলে বেরিয়ে গিয়েছিল। সেদিন বুঝেছিল, তেল মাখা নিয়ে বাবা এত খিটখিট করত কেন। ঐ তেলই সেবার বাঁচিয়েছিল তাকে। কিন্তু এর পরের বার আর কাজে লাগল না।

একতলার ঘর। গরাদগুলো মোটা মোটা। অনেক চেষ্টা করেও বাঁকানো যাচ্ছিল না। কাঠির সঙ্গে লেগে বোধহয় একটু শব্দ হয়ে থাকবে। একজন মেয়েছেলে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—চোর! চোর! কাঠি আর দড়ি ফেলে বাবা এক লাফে উঠোন পেরিয়ে উধাও হয়ে গেল। কেশব পারল না। সে-ও ছুটেছিল ঊর্ধ্বশ্বাসে। কিন্তু গেট পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই মাথাটা ঘুরে উঠল। সে রাত্রে প্রায় কিছুই খাওয়া হয়নি। 'মোটা' হয়ে যাচ্ছে বলে রোজকার সেই সামান্য বরাদ্দ থেকেও খানিকটা কমিয়ে দিয়েছিল তার বাপ। ছুটতে গিয়ে পা দুটো যেন জড়িয়ে গেল। বসে পড়ল দরজার সামনে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল এলোপাতাড়ি চড় চাপড়। সে পর্বটা কতক্ষণ চলেছিল কেশব ঠিক জানতে পারেনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। যখন জ্ঞান হল, দেখল একটা কোন অচেনা জায়গায় বেঞ্চির উপর শুয়ে আছে। পরে জেনেছিল সেটা থানা।

—ছয়—

মানুষের জীবন নিয়ে কত লোক কত গবেষণা করে গেছেন, এখনো করছেন। কবি, দার্শনিক এবং কর্মবীর প্রত্যেকে একে আলাদা দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন এবং নানা বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে তুলনা করেছেন। কেউ বলেছেন নদীস্রোত, কেউ বলেছেন রঙ্গমঞ্চ; কারো মতে এ জীবন শুধু স্বপ্ন, কারো মতে মরীচিকা। তাদের উপহাস করে উড়িয়ে দিয়েছেন আর এক দল, বলেছেন, জীবন একটা বিরামহীন সংগ্রাম; গোলাপ-কুঞ্জ নয়, কঠিন কঠোর রাজপথ।

বর্স্টাল স্কুল পরিচালনার পিছনে যে নীতি, তার মধ্যে বোধহয় এই শেষ উক্তিটির সমর্থন পাওয়া যাবে। যে কারিগর রাজপথ তৈরী করে, তার প্রধান লক্ষ্য হল, পীচ্ ঢেলে কিংবা সিমেন্ট এঁটে তাকে নিশ্চিদ্র করে তোলা, কোথাও যেন কোনো ফাঁক না থাকে। এখানকার 'ইন্‌মেট'দের দৈনন্দিন জীবনটাও তেমনি একটানা রুটিনের শক্ত সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো, উদয়াস্ত ডিসিপ্লিনের শিকল দিয়ে গাঁথা। উদয়াস্ত কথাটা বোধহয় যথাযথ হল না। উদয়ের খানিকটা আগে থেকে অস্তের অনেকখানি পর পর্যন্ত, অর্থাৎ একটা ঘুমের ঘোর থেকে উঠে আরেকটা ঘুমের কবলে নেতিয়ে পড়বার নির্দিষ্ট ক্ষণ যতক্ষণ না আসে, তার প্রতিটি মুহূর্ত কর্তৃপক্ষের করায়ত্ত। সমস্ত সময়টাকে ঘণ্টা মিনিটে ভাগ করে তারা নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন, কখন সে কী করবে এবং কী করবে না। আহার বিহার, শ্রম ও বিশ্রামের কোনো ফাঁকে একটি মিনিটও তাহার নিজের নয়, যার আশ্রয়ে বসে সে বলতে পারে—'করব আমার যা মনে লয়।'

তার মানে এ নয় যে, ওরা শুধু কাজ করে, খেলাধূলা ফুর্তি আমোদ করে না। তারও ব্যবস্থা আছে, এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানে যতটা আশা করা যায় তার চেয়ে বেশী বই কম নয়, কিন্তু সব কোডি-ফায়েড্, বিধিবদ্ধ রুটিন মাফিক। খেলার ঘণ্টায় খেলতেই হবে। যদি বল, আজ আমার খেলতে ইচ্ছে করছে না, ইউ আর লায়বল্ টু বি

পানিশ্‌ড। তোমাকে শাস্তি দিতে পারেন সুপারিণ্টেডেণ্ট। ইচ্ছা বলে তোমার হাতে কিছু নেই; তোমারি কল্যাণের জন্যে ওটা এখন সরকারী হেফাজতে গচ্ছিত। খাটনির মত খেলাটাও তোমার 'কমপালসরি', অবশ্য করণীয়। তোমার চিত্তবিনোদনের দিকেও সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন সরকার। রেডিও আছে, নিয়মিত গান, বাজনা, নাটক, আবৃত্তি, সরস্বতী পূজোর হৈ হুল্লোড় আছে। যখন তোমার দলবদ্ধ রিক্রিয়েশনের পালা, তখন যদি বলে বস, আমার ভাল লাগছে না, আমি একটু একা থাকতে চাই, সেটা হবে দণ্ডনীয় অপরাধ—পানিশেবল অফেন্স্‌। তোমার জন্যে চিন্তিত হবেন কর্তৃপক্ষ। তাঁরা জানেন কিছু না করে, নিজের মনে একা থাকা বিপজ্জনক। এম্‌প্‌টী ব্রেণ ইজ্‌-এ ডেভিল্‌স্‌ ওয়ার্কসপ্‌।

এতগুলি বিপথগামী বালকের জীবনতরীটাকে নিস্তরঙ্গ কাটা খালের ভিতর দিয়ে সমান তালে চালিয়ে নেবার দায়িত্ব যার হাতে, তিনি নিজেই এসে মাঝে মাঝে সেখানে তুফান সৃষ্টি করে বসেন। সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ এসে হয়তো দেখলেন গল্পের ক্লাশ নেবার আয়োজন করছেন হেড্‌মাষ্টার। ছেলেগুলোর মুখে নেমে এসেছে অমাবস্যা। গল্পের নামে নীতিবচন তাদের কাছে কুইনাইনের মত তেতো হয়ে গেছে। সাহেব বলে বসলেন, গল্প নয়, এখন তোদের 'যা খুশির ক্লাশ'। যা খুশির ক্লাশ মানে? মানে, যার যা খুশি কর—ছবি আঁকা, ঘোরা-ফেরা, লুকোচুরি, আড্ডা কিংবা যদি ইচ্ছে হয়, আপন মনে চুপচাপ বসে থাকা। চোখের নিমেষে ঠিক এক ঝাঁক পাখীর মত কোথায় যে উড়ে গেল ছেলেগুলো, তারাই শুধু জানে।

বাঁকা চোখে হেডমাষ্টারের ক্ষুব্ধ গম্ভীর মুখের দিকে এক পলক তাকালেন অধ্যক্ষসাহেব। গোঁফের কোণে ফুটে উঠল একটি সরু মৃদু হাসির রেখা। তারপর বিশাল দেহ এবং ক্ষুদ্র ছড়িখানা নিয়ে সদলবলে বেরিয়ে চলে গেলেন।

আরেক দিন। অফিসে বসে কাজ করছিলেন। হঠাৎ কি খেয়াল হল। চললেন ভিতরে। হল ঘরে ক্লাস নিচ্ছেন মাষ্টারমশাইরা। চার পাঁচটি শ্রেণী। মাঝখানে মাঝখানে কাঠের পার্টিশন। সাহেবকে

দেখে টিচারদের গলার জোর উচ্চতর হল সেই সঙ্গে চড়ে গেল ছাত্রদের গুঞ্জন। এখানে যারা পড়ছে, মোট সংখ্যার তিনভাগের এক ভাগ। বাকী সব ওয়ার্কসপে—তাঁত, দর্জীশালা, কামারখানা, কাঠকামান, বুক বাইণ্ডিং, প্রেস ইত্যাদি। চীফ্ অফিসারকে হুকুম করলেন অধ্যক্ষ, ঘন্টি দে দেও। ঢনঢন্ করে অসময়ে ছুটির ঘণ্টা বেজে উঠল। ছেলেরা বেরিয়ে আসতেই, সুপারের নির্দেশে তাদের দাঁড় করানো হল মাঠের পাশে দেবদারু বীথির ছায়ায়। পেছনে আরদালীর হাতে একটা বড় গোছের হাত-ব্যাগ। ভিতরে কী আছে কেউ জানে না। নানা রকম আন্দাজ চলছে নানাজনের মনে। সব গবেষণা মিথ্যা করে দিয়ে সবাইকে অবাক বানিয়ে বেরিয়ে এল কতগুলো ছোট ছোট রঙিন নোট বুক, তার সঙ্গে একটি করে পেন্সিল। নিজের হাতে ছোট বড় প্রতিটি ছেলেকে একখানা করে বিলিয়ে দিয়ে বললেন, এগুলি ইস্কুলের নয়, তোদের। যার যা খুশি লিখবি। সাপ, বাঘ আঁকতে হয়, আঁকবি। কাউকে দেখাতে হবে না।

লেফটেনাণ্ট ঘোষের নিত্য-নতুন পাগলামি নিয়ে শহরের সরকারী মহলে সরস আলোচনা প্রায়ই লেগে থাকত। এই ব্যাপারটা যখন রাষ্ট্র হল, শাসন বিভাগের উচ্চস্থানীয় জনৈক কর্তাব্যক্তি বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, বর্ষ্টালের বাছাধনদের বুঝি এখন থেকেই লেখক বানাতে চান?

—বানাতে হবে কেন? অন্য সকলের মত ওরাও জন্ম-লেখক, বর্ণ রাইটার।

—কি রকম!

—লেখক নয় কে? আমি আপনি টম্, ডিক্, হ্যারি, মানুষ বলতে যে দ্বিপদ প্রাণীকে বোঝায়, প্রত্যেকেই কিছু না কিছু লিখছে, মানে সৃষ্টি করছে। কেউ মনে মনে, কেউ মুখে মুখে, কেউবা কাগজের পাতায় কিংবা ক্যানভাসের পিঠে। আপনাদের কেতাবেই তো আছে, মানুষ বিধাতার প্রতিচ্ছায়া,—ইমেজ্ অব্ গড্। তাই যদি হয়, তাহলে সেও স্রষ্টা, এক একটি খুদে রবিঠাকুর।

ভদ্রলোক বাঙালী খৃষ্টান। লক্ষ্য করছিলেন আশে-পাশে যারা উপস্থিত সকলেই একটি বিশেষ কৌতুক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে

আছেন, তাঁর পদ-মর্যাদার কথা মনে করেই বোধ হয় প্রাণ খুলে হাসতে পারছেন না। আর কথা না বাড়িয়ে অন্য প্রসঙ্গ পেড়েছিলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এ 'পাগলটাকে' আর ঘাঁটাবেন না।

এই 'নোটবুক' নিয়েই আর একদিন কথা হচ্ছিল স্কুল-সেকশনের সেকেণ্ড মাষ্টার আশুতোষবাবুর সঙ্গে। এখানকার কর্মীদের মধ্যে, দুচারজন সিপাই সান্ত্রী বাদ দিলে, ইনিই ছিলেন সাহেবের বয়োজ্যেষ্ঠ। শুধু সে জন্যে নয়, আরো কিছু ছিল এই বাইরে-বৃদ্ধ-অন্তরে-শিশু, সদা-সঙ্কুচিত, দরিদ্র লোকটির মধ্যে, অধ্যক্ষ যাকে মনে মনে সম্ভ্রম করে চলতেন। মুখে অবশ্য ঠাট্টা তামাসার বাছ-বিচার ছিল না। একটি মাত্র জামা ছিল আশুতোষবাবুর, মান্ধাতার আমলের টুইলের সার্ট। সপ্তাহে একবার নিজের হাতে সাবান-কাচা করে নিতেন। একবার কাচতে গিয়ে পিঠের দিকে ছেঁড়াটা অনেকখানি বেড়ে গেল। তাই পরেই এসেছেন পরের দিন। গেট পেরোবার মুখে হঠাৎ সাহেবের নজরে পড়ে গেল। ওঁকে কিছু বললেন না, পাশে দাঁড়ানো ডেপুটিকে বললেন, 'স্যার আশুতোষের সবই উল্টো। আমরা ঘরের দরজা করি সামনের দিকে, উনি লাগিয়েছেন পেছনে।' কথাটা কানে যেতেই তখনকার মত কোনো রকমে মাথা নীচু করে পালিয়ে বেঁচেছিলেন আশুবাবু। কিন্তু পরদিন পার পাননি। কী একটা কাল্পনিক ব্রত উপলক্ষে 'মেমসাহেবের' কাছ থেকে ব্রাহ্মণ-ভোজনের নিমন্ত্রণ এসে উপস্থিত। না গিয়ে উপায় নেই। আহারান্তে যখন বাড়ি ফিরবার আয়োজন করছেন, মনিব-গৃহিণী দুহাতে এগিয়ে ধরলেন ভোজন-দক্ষিণা। —ধব্‌ধবে থান কাপড়, তার সঙ্গে একটি টুইলের সার্ট। আশুবাবু অসহায় ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে তাকালেন সাহেবের পানে। তিনি যেন ধমক দিয়ে উঠলেন, আমার দিকে তাকিয়ে কি হবে? আমি কী করবো! দক্ষিণা না দিলে ব্রাহ্মণ-ভোজনে পুণ্য নেই—এ-সব বিধান তো আপনারাই দিয়েছেন একদিন। গিন্নীর পাপে শেষটায় আমি সুদ্ধ নরকে পচবো?

আশুবাবু বিবাহ করেননি। দু'-একটি দূর সম্পর্কের আত্মীয় ছাড়া আর কেউ ছিল না। তারা দূরেই থাকত এবং মাসান্তে কিছু কিছু

মাসোহারা পেত। আর ছিলেন এক গুরু। আত্মীয়দের দাবী মিটিয়ে সামান্য মাইনে থেকে যা বাঁচত, প্রায় সবটাই চলে যেত তাঁর আশ্রমে। নিজের জন্যে ভাতে-ভাত কিংবা এক তরকারীর ব্যবস্থা। মাঝে মাঝে, অর্থাৎ মাসের শেষ কদিন তা-ও রোজ জুটত না। সহকর্মীরা সবকিছু জানতেন। সুতরাং 'ব্রাহ্মণ-ভোজন' প্রায়ই লেগে থাকত। তাছাড়া, এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে কখনো একটু কুমড়ো-শাক দিয়ে রাঁধা মটর ডাল কখনো এক বাটি বড়ি দিয়ে শুকতো প্রায়ই এসে যেতো খাবার সময়। রান্না জিনিস যারা পাঠাতে পারত না, তারা দিত সিধে—পাঁচপো খানেক চাল, তার সঙ্গে খানিকটা করে তেল-নুন, ডাল-মশলা। আশুবাবু আজন্ম নিরামিষভোজী, কিন্তু খেতে পারতেন। তাঁকে নিমন্ত্রণ করা মানে অন্ততঃ দুজনের মত আয়োজন। সহকর্মীরা জানতেন এবং সেই ব্যবস্থাই করতেন। উপলক্ষ কিছু থাক বা না থাক, খেতে বললে, আশুবাবু কোনো দিন 'না' বলতেন না। বাড়ির ছেলেপিলেরা প্রায়ই আসত নিমন্ত্রণ করতে। জিজ্ঞাসা করতেন—লাউঘণ্ট হবে তো রে?

—হবে।

—বেশী করে করতে বলিস মাকে।

ফোক্‌লা-মুখে এক গাল হেসে 'জয় গুরু' বলে ঠিক সময়ে গিয়ে হাজির হতেন। জাত সম্বন্ধে কোনো বাছবিচার ছিল না। ভোজ্যবস্তু সম্পর্কেও তাই। লাউঘণ্টের উপরে কিঞ্চিৎ পক্ষপাত ছিল। আর একটি প্রিয় খাদ্য ছিল আশুবাবুর—পায়েস। সেটা প্রায়ই জুটতো না। বর্ত্তালে চাকরি করে পায়েস খাওয়াবে কে? কালেভদ্রে বিয়ে-থা উপলক্ষে হয়তো কখনো মিলত এক-আধটু। কিন্তু বছরে একটি দিন প্রাণভরে পায়েস খেতেন আশুমাষ্টার—স্কুলে যেদিন সরস্বতী পূজো করতো ছেলেরা। সেদিন স্পেশাল রান্না হত ছেলেদের চাঁদায়। একেক বার একেক রকম 'মেনু', কিন্তু পায়েস ছিল কমন্ ফ্যাক্‌টর। আশুবাবু একটা গামলা নিয়ে বসতেন, ছেলেরা ঘিরে বসে খাওয়াতো। 'সেকেণ্ড স্যার'-কে সবাই ভালবাসত।

নোটবুক বিতরণের ব্যাপারটাকে আশুবাবু অন্য সকলের মত হাল্কা করে দেখেননি। এ শুধু তাঁর অর্থহীন খেয়াল নয়, এই সামান্য

বস্তুটির ভিতর দিয়ে সাহেব হয়তো শিশু-মনের একটা চিরন্তন চাহিদা মেটাবার চেষ্টা করেছেন। আত্মবিকাশের চাহিদা। ফুলের মত সে মনও নিজেকে মেলে ধরতে চায়। সে-ই তার প্রকৃতি। অন্যের ইচ্ছায় নয়, বিধানবদ্ধ প্রয়োজনের তাড়ায় নয়, নিত্য-প্রয়োজনের বাইরে তার যে খেয়াল, খুশি, অনিয়মের রাজ্য, তারই তাগিদে। সেখানে প্রত্যেকে স্বরাট্, প্রত্যেকের আলাদা পথ, আলাদা রীতি।

প্রতিটি ছেলের কাছে আরেকটা গভীর তাৎপর্য ছিল খাতাগুলোর। এখানে তার যা কিছু, সব সরকারের। ঐ একটি মাত্র ক্ষুদ্র জিনিস তার নিজস্ব। ঐটিকে নিয়ে সে যা মন চায় করতে পারে। তার জন্যে কারো কাছে কোনো জবাবদিহির দায় নেই।

নোটবুকগুলোর কী দশা হল, জানবার জন্যে সাহেবের মনে প্রচুর কৌতূহল ছিল। আশুবাবুর সঙ্গে সড় করে সেই খবরটা গোপনে সংগ্রহের চেষ্টায় ছিলেন। ছেলেবয়সের যা নিয়ম, ছ'-চার দিন চাপা-চাপির পর খাতা সম্বন্ধে তার মালিকদের হুঁসিয়ারি অনেকটা শিথিল হয়ে পড়ল। এখানে সেখানে ফেলে রাখতেও দেখা গেল কাউকে কাউকে। তারই গোটাকয়েক সকলের আড়ালে পকেটস্থ করে আশুবাবু একটা ফাঁক খুঁজে সাহেবের ঘরে গিয়ে উঠেছিলেন।

প্রতিটিতেই কিছু-না-কিছু লেখা হয়েছে। একজন শুধু ছবি এঁকেছে। প্রথম ছবিটা বেশ কিছুক্ষণ তাকালে মনে হবে মানুষেরই চেহারা। মাথাটা একদম গোল, সরু গলা, তারপর থেকে সবটাই পেট, নীচে ছুখানা ছোট ছোট পা ঝুলছে। তলায় পরিচয় দেওয়া আছে—'সায়েব'। পরের পাতায় একটি পাখি আঁকবার চেষ্টা হয়েছে। কী পাখি একমাত্র চিত্রকরই বলতে পারেন। আর একটা খাতায় পাওয়া গেল চার লাইন কবিতা। বোধ হয় কবির কোনো বন্ধুর উদ্দেশ্যে রচিত—

এমন চাটি মারবো Head-এ
ফট্ ফটাস্ ফট্।
Teeth কিলিয়ে থাকবি পড়ে,
বাঁচতে হবে Not

পাতা ওল্টাতেই আর একটা। তার সুর আরো গভীর।

Mango গাছের ফাঁকে

মৌমাছিরা ডাকে।

চাক বানাবে যবে,

অনেক Honey হবে।

'এতো দেখছি সব্যসাচী অর্জুনকেও ছাড়িয়ে গেছে', গম্ভীরভাবে মন্তব্য করলেন অধ্যক্ষ। 'তিনি দুহাতে বাণ চালাতেন, আর ইনি একই কবিতায় দু-দুটো ভাষা চালাচ্ছেন।'

আর একখানা বই খুলে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন সুপারসাহেব। কাঁচা অক্ষরে ভুল বানানে লেখা--সতিষদা অমিয়কে ষোড় করে চুমু খেয়েচে। অমিয় কানছিল। ভয়ে নালিশ করে না।

লেখাটা আশুবাবুর দিকে বাড়িয়ে ধরতে তিনি বললেন, দেখেছি স্যর। সতীশ ছেলেটাকে নিয়ে একটু অসুবিধা হচ্ছে। শুধু সতীশ নয়, ঐ রকম আরো কয়েকজন আছে। ছোটগুলোকে, বিশেষ করে অমিয় সামসুল, দিলীপ, বিজয়—এদের রীতিমত আগলে রাখতে হয়।

—'জানি', তেমনি গম্ভীরকণ্ঠে বললেন ঘোষসাহেব, 'সতীশ বা সিরাজুলের দোষ নেই, দোষ ঐ বয়সটার। আর্লি পিরিয়ড অব অ্যাডোলেসেন্স্। বড় গোলমেলে সময়। কিন্তু কী করবো! কত্তাদের এত করে বোঝালাম, এক ঢিলে দুপাখি মারাটা সব জায়গায় চলে না। এই দুটো গ্রুপকে একসঙ্গে রেখে দুটোরই সর্বনাশ হচ্ছে! বর্ষ্টাল আর ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল সব দিক দিয়েই আলাদা। দুটো আলাদা স্কুল চাই। কেউ কানেই তুললো না। এক কত্তা বলে বসলেন, "ঐ কটা ছেলে নিয়ে দুটো ইনষ্টিটিউশন!" আরে, সংখ্যাটাই কি সব? এক লক্ষ ছেলেকে হেলায় ফেলায় মানুষ করার চেয়ে একটা ছেলেকে ঠিক মত দাঁড় করাবার দাম অনেক বেশী। তা কে বোঝে?......মরুকগে, আমার কী!

মনিবের মুখে নৈরাশ্য ও বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখে, আশুবাবু কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর খানিকটা দ্বিধা ও সংকোচের সঙ্গে বললেন, একটা কথা ভাবছিলাম; কিন্তু আমার পক্ষে বলাটা বোধ হয় ঠিক হবে না।

—খুব হবে। বলুন না?

—রাত্তির বেলা তো আলাদাই রাখা হয়। স্কুলে যতক্ষণ থাকে, নজর রাখায় বিশেষ অসুবিধে নেই, যদিও অনেক সময় ছোট-বড় মিলিয়ে ক্লাস করতে হয়—কতগুলো বড় ছেলে তো 'ক' 'খ'ও জানে না। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে, যখন ওয়ার্কশপে যায়। অতটা সময়। তার ওপরে—

—ইনস্ট্রাকটরবাবুরা কিছুই দেখে না।

—আজ্ঞে, সে-কথা আমি বলছি না।

—আপনাকে বলতে হবে কেন? আমি সবই জানি। ভেবেওছি অনেক। কিন্তু—থাক, আপনি এবার আসুন। আবার যখন দরকার হবে, ডাকবো।

—আর একটা কথা, স্যর। দিলীপের মার কোনো খবর পাওয়া গেল না?

—'আর বলবেন না', মুখে একটা হতাশাসূচক শব্দ করে মাথা নাড়লেন সুপার। 'এই দেখুন না?'—বলে, ডান দিকে রাখা একটা মোটা ফাইল দেখিয়ে দিলেন। বললেন, ক্যালকাটা পুলিশ তো প্রথমটা কোনো পাত্তাই দিতে চায়নি। 'ওরকম মীগার ইনফরমেশনের ওপরে প্রসীড করা যায় না, আরো পারটিকুলারস্ দাও'। আরে, থাকলে তো দেবো? ছেলেটা যে মায়ের নামটাও বলতে পারে না। কেউ শেখায়নি তো। পাড়ার লোকে 'খোকার মা' বলে ডাকে সেইটুকুই জেনে রেখেছে। ওর কথা ছেড়ে দিন, আমিও ঐ বয়সে আমার মায়ের নাম জানতাম না, কিন্তু বৃদ্ধ প্র-পিতামহের নাম গড়গড় ক'রে মুখস্থ বলেছি।......

বলে হেসে উঠলেন। হাসি থামিয়ে বললেন, যাই হোক, এখনো হাল ছাড়িনি। ডি, সি, কে একটা ডি, ও, লিখেছি। আজ ভাবছি রিমাইণ্ডার দেবো। কেন, মায়ের কথা কিছু বলছিল নাকি আপনাকে?

—আজ্ঞে না। ওর খাতাটা দেখছিলাম। বলে, আশুবাবু দিলীপের নোটবুকটা এগিয়ে দিলেন।

প্রথম পাতায় শুধু নাম। ঠিক মাঝখানে, দুপাশে সমান ফাঁক রেখে গোটা গোটা অক্ষর—শ্রীদিলীপকুমার ভট্টাচার্য। সেদিকে কিছুক্ষণ

তাকিয়ে রইলেন সুপার। তারপর পাতা ওলটাতেই চোখে পড়ল কাঁচা কিন্তু পরিষ্কার হাতে লেখা কয়েকটি লাইন—মাগো, কাল রাতেও আমি তোমাকে স্বপ্ন দেখেছি। তুমি বারান্দায় বসে কাঁদছিলে। সেই যে ঘুম ভেঙ্গে গেল, আর ঘুমোতে পারিনি। আমার জন্যে কেঁদো না! আমি খুব ভাল আছি। এঁরা সক্কলে আমাকে ভালবাসেন।

তোমার খোকা।

কিছু নয়; অত্যন্ত সাধারণ একখানা চিঠি, সব ছেলেই যা মায়ের কাছে লিখে থাকে। তফাত শুধু এই, সে চিঠি পাঠানো যায়, তার জবাব আসে; কিন্তু এ চিঠি কেবল লেখা রইল ঐ খাতার পাতায়। যার উদ্দেশ্যে লেখা তার কাছে কখনো পৌঁছবে না, সামান্য একটা উত্তরও আসবে না কোনদিন।

নোটবুকখানা আস্তে আস্তে বন্ধ করে জানালার বাইরে লক্ষ্যহীন দৃষ্টি মেলে ঘোষসাহেব স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। আশুবাবুও আর কোনো কথা বললেন না। নিঃশব্দে নোটবুকগুলো কুড়িয়ে নিয়ে নত হয়ে নমস্কার করলেন এবং অনেকটা আচ্ছন্নের মত ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন।

•

ডেপুটি সুপারের প্রথমটা মনে হল ভুল শুনছেন। তার পরেই যেন আকাশ থেকে পড়লেন,—বলেন কি স্যর! এতগুলো ছেলে, ওয়ার্কশপে না গিয়ে করবে কী?

সাহেব হালকাভাবেই বললেন, ওখানে গিয়েই বা করছে টা কী? কাঠমাষ্টারের পাকা চুল তোলা, নয় তো লোহা-মাষ্টারের পিঠে সুড়সুড়ি দেওয়া। এই ভয়ানক ভয়ানক দরকারী কাজগুলো না-ই বা করল।

সন্তোষবাবু 'সিরিয়াস' মানুষ! কাজের কথার মধ্যে ঠাট্টা-তামাসার আমদানী পছন্দ করেন না। বললেন রুল-এ তো ওদের বেলায় কোনো 'একসেপ্‌শন্‌' নেই। বড়, ছোট সব এজগ্রুপ-এর জন্যেই এক ব্যবস্থা। তিনঘণ্টা স্কুল আর পাঁচ ঘণ্টা 'ওয়ার্কশপ্‌'। সে রুটিন আমরা বদলাই কেমন করে?

সাহেবও সেকথা জানেন। জানেন বলেই, দশ-বারো বছরের অপগণ্ড ছেলেগুলোর এই পাঁচঘণ্টা ওয়ার্কশপ-ট্রেনিং-এর হাস্যকর প্রহসন

প্রতিদিন চোখের উপর দেখেও নিঃশব্দে সহ্য করে গেছেন। ঠিক নিঃশব্দে নয়, নিজের মনে গজ্‌গজ্‌ করেছেন, মাঝে মাঝে মেজাজ চেপে রাখতে না পেরে নিজের ষ্টাফ-এর উপর অযথা ঝাল ঝেড়েছেন, তার বেশী আর কিছু করতে পারেননি। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে লেখালেখি চালাতে পারতেন। কিন্তু দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছেন, তার থেকে কাগজ কলম ও সময়ের অপচয় ছাড়া আর কোনো বস্তুই লাভ হয় না। যে পদার্থ অনড়, তাকে নড়াবার চেষ্টা করা বৃথা। তাই লেখালেখিতে আর উৎসাহ পান না। অথচ, ছেলেগুলোকে যখনই দেখেন, ছটফট না করেও পারেন না। সেক্রেটারিয়েটের দূর পাল্লায় বসে যারা লেখনী চালান, তাঁদের সুবিধা হল ঐ দূরত্ব। সেই লেখনীর প্রতিটি খোঁচায় যারা উঠছে পড়ছে, তারা থাকে চোখের আড়ালে। দেখতে হয় না খোঁচাটা কোথায় গিয়ে লাগল, অথবা ঠিকমত লাগল কিনা।

ডেপুটি যে আপত্তি তুললেন, তার উত্তরে ঐ ধরনের প্রসঙ্গই শোনা গেল ঘোষসাহেবের মুখে। বললেন, মুস্কিল কি জানেন? 'রুল' যারা তৈরী করেছেন, তাদের হাতে ছিল শুধু দিস্তা কয়েক কাগজ আর একটা করে কলম; আর আমাদের হাতে এসে পড়েছে কতগুলো জল-জ্যান্ত মানুষ, তাও পুরো মানুষ নয়, কোনোটা আধখানা, কোনোটা সিকি। প্রত্যেকের জাত, গোত্র আলাদা; মন, মেজাজ আলাদা; রুচি, প্রকৃতি, মেধা বুদ্ধি সব আলাদা। অথচ একই রুল-এর রোলার চালিয়ে সবগুলোকে লেভেল করতে হবে! কেন? এরা কি কতগুলো গাছ না ইঁট পাথর?

এই জাতীয় "বড় বড়" কথার মূল্য যে কী, সন্তোষবাবু কোনোদিন বুঝে উঠতে পারেন না। অথচ উপরওয়ালার সঙ্গে এ নিয়ে তর্ক করাও যায় না। অফিস ডিসিপ্লিনের খাতিরে এগুলো অনেক সময় শুনতে হয়; তাই শুনে গেলেন। ঘোষ আবার বললেন, কর্তাদের মাথায় ঢুকেছে ভোকেশনাল ট্রেণিং। কি করতে হবে? না; কতগুলো দশ-বারো বছরের বাচ্চা ছেলেকে ধরে রোজ পাঁচঘণ্টা ওয়ার্কশপে কাজ করাতে হবে। ইজ্‌ ইট্‌ নট্‌ রিডিকুলাস্‌? হাতেকলমে কোনো কাজ শেখবার মত বয়স হয়েছে এদের, না বুদ্ধি হয়েছে? তাছাড়া কী অধিকার আছে

আমাদের—এই কচি ছেলেগুলোকে এখন থেকে মিস্ত্রী তৈরী করবার? সব সভ্য দেশের ছেলেমেয়েরা অন্ততঃ চৌদ্দ বছর পর্যন্ত ইস্কুলে যায়। এদের সে সুযোগ কেন দেওয়া হবে না? না, মশাই; রুলএ যাই থাক, ওয়ার্কশপের নামে এই বাচ্চাগুলোর ভবিষ্যৎ আমি নষ্ট করতে পারি না। কাল থেকে চৌদ্দ বছরের নীচে যাদের বয়স, সব কটাকে আপনার ঐ 'কামান'এর মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসুন। আপনিও জানেন, আমিও জানি, ওদের দিয়ে ওখানে কোনো কাজ হয় না, শুধু গোল্লায় যাবার রাস্তা তৈরী হয়।

'ঐ সময়টা কী করবে তাহলে?' বিরক্তিপূর্ণ শুষ্ক মুখে জানতে চাইলেন ডেপুটি।

—পড়বে। হেড্‌মাষ্টারকে বলে দিন, ওরা যেন ভালোমত পড়াশুনো করে। সেদিকে ষ্ট্রিক্‌ট্ হতে হবে।

সন্তোষবাবু চলে যাচ্ছিলেন। সাহেব ঐ সঙ্গে আর একটা নতুন নির্দেশ যোগ করলেন 'ওদের মধ্যে যারা কিছুটা লেখাপড়া জানে, যেমন দিলীপ বা সামসুল, তাদের কয়েকঘণ্টা করে প্রেস-এ কাজ শিখতে দিন। মেশিনে নয়, কম্পোজ্‌ শেখাতে বলুন।'

দিলীপ এসে অবধি 'কাঠ-কামানে' কাজ করছিল। একখণ্ড তক্তার উপর রাঁদা চালাতে দিয়েছিলেন কাঠ-মাষ্টার। প্রথম দিন চালিয়েই হাতে ফোস্‌কা পড়ে গেল। কিন্তু ভয়ে কাউকে জানাল না। খুব কষ্ট হচ্ছিল, তবু তাই নিয়েই কোন রকমে ক'দিন কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। ফোস্‌কাগুলো গলে যখন ঘা হয়ে গেল, তখন আর পারল না। ওখানে যে 'ষ্টার বয়' ছিল সে দেখতে পেয়ে কাঠ-মাষ্টারের নজরে আনতেই তিনি মুখ ভেংচে উঠলেন, 'ননীর পুতুল! বলিসনি কেন ফোসকা পড়েছে? যা, হাসপাতালে যা।'

'হাসপাতাল' শুনে চমকে উঠল দিলীপ। তার ধারণা, সেখানে গেলে কেউ আর ফিরে আসে না। তার বাবাও আসেননি। তাদের বস্তির লোকেরাও ভীষণ ভয় করত হাসপাতালকে। কারো কলেরা বা বসন্ত হলে বাড়ির লোকেরা চেপে যেত, পাছে হাসপাতালে যেতে হয়।

মাঝে মাঝে যখন খুব রোগ ব্যামো দেখা দিত, কোথা থেকে একটা অদ্ভুত চেহারার মোটরগাড়ি এসে লাগত সামনেকার সেই ঝাঁকড়া আমগাছটার নীচে। জনকয়েক লোক নেমে গিয়ে গলির এ-ঘর ও-ঘর থেকে জোর করে রুগীগুলোকে বের করে গাড়িতে পুরে নিয়ে যেত। পাড়া মাথায় করে ভেঙে পড়ত মেয়েদের কান্নার রোল। এসব দৃশ্য সে খুব ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছে। তাকেও সেই হাসপাতালে যেতে হবে শুনে অন্তরাত্মা শুকিয়ে উঠল। মাথা নেড়ে ভয়ে ভয়ে বলল, আমি যাবো না। আমার ব্যথা সেরে গ্যাছে।

—দূর বোকা! সব্‌বাই সেখানে যেতে পারলে বেঁচে যায়, আর তুই বলছিস 'যাবো না'! ভয়টা কী? চল—বলে 'ষ্টার' তার হাত ধরে নিয়ে চলল।

ডাক্তার তখনো আসেননি। কম্পাউণ্ডার বসে কি লিখছিলেন। দিলীপকে তারই সামনে হাজির করা হল। তিনি সেই মোটা খাতার পাতা থেকে চোখ না তুলেই বললেন, 'কী হয়েছে?' জবাব দিল ষ্টার, 'ফোসকা গলে ঘা হয়েছে।' 'কাঠকামান? লিখতে লিখতেই জিজ্ঞাসা করলেন কম্পাউণ্ডার। 'হ্যাঁ'। সঙ্গে সঙ্গে একটা কি নাম ধরে হাঁক দিলেন এবং একজন বড় গোছের ছেলে এসে দাঁড়াতেই বিড় বিড় করে কি সব নির্দেশ দিলেন। মনে হল ইংরেজি কথা, বোধহয় কোনো ওষুধের নাম। ছেলেটা দিলীপের হাত ধরে ভিতরে নিয়ে গেল এবং ঘায়ের দিকে চেয়ে বলল, 'অ্যাদ্দিন কোথায় ছিলি?' দিলীপ কী বলবে ভেবে পেল না। সে তার জন্যে অপেক্ষাও করল না। খানিকটা মলম লাগিয়ে তার উপর তুলো দিয়ে চটপট ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল। দিলীপ তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে দেখে বলল, 'কী দেখছিস হাঁ করে? ব্যথা করছে?' দিলীপের মনে হল, তার অর্ধেক যন্ত্রণা তখনই চলে গেছে। মাথা নেড়ে জানাল, না। ছেলেটি বলল, কাল ঠিক এই সময়ে আসবি। ব্যাণ্ডেজ বদলে দেবো।

কম্পাউণ্ডার যেখানে কাজ করছিলেন, তার নাম 'ডিসপেনসারী।' ঘর ভর্তি তাক, তার উপরে ঠাসা নানা আকারের শিশি-বোতল। কিসের একটা কড়া গন্ধ আসছিল সেই ছোট্ট গুদাম মত কামরাটার ভিতর

থেকে। তার পাশের ঘরখানা অনেক বড়। সেটা হল 'ওয়ার্ড,—ঐ ষ্টার ছেলেটিই সব বুঝিয়ে দিচ্ছিল। 'চল না? দেখবি।' বলে সেখানেও নিয়ে গেল। পাশাপাশি কয়েকখানা লোহার খাট, তার উপরে লাল কম্বল মোড়া বিছানা। বেশীর ভাগ খালি। দু'তিনটিতে কারা সব শুয়ে আছে। ওদের অসুখ। তিন চারটা ছেলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তারই একজনকে ধমকে উঠল 'ষ্টার' এই জগা, তুই এখানে কী করছিস? দাঁড়া এখনই চীফ্ অফিসারকে বলে দিচ্ছি।

—'বারে, আমি খালি খালি এসেছি নাকি?' নাকী সুরে প্রতিবাদ জানাল জগমোহন।

—না, না; কে বললে খালি খালি! ভয়ানক পেট কামড়াচ্ছে, কি বলিস?

—'কামড়াচ্ছেই তো'—রীতিমত দৃঢ় উত্তর। মুখেও গাম্ভীর্যের অভাব নেই। শুধু ঠোঁটের কোণে লেগে রইল এক টুকরা দুষ্টুমি জড়ানো হাসির আভাস যার অর্থ সুস্পষ্ট।

—তুই কেন এসেছিস? তোর আবার কী হল?—এ প্রশ্নের লক্ষ্য আরেকজন। উত্তরে সে গলাটাকে যদ্দুর সম্ভব মিহি ও করুণ করে বলল, বড্ড মাথা ধরেছে।

এতবড় একটা কঠিন অসুখের খবর পেয়েও 'ষ্টার' কিছুমাত্র সহানুভূতি দেখাল না, বরং হো হো করে হেসে উঠল।

মাথাধরা ও পেট কামড়ানো—এ দুটোই এখানকার ক্রনিক ব্যাধি। রোগীর পক্ষে মস্ত বড় সুবিধা—বাইরে কোনো লক্ষণ নেই, রোগ পরীক্ষার সাধারণ যন্ত্র দিয়ে ধরা যাবে না, সুতরাং 'নেই' বলে উড়িয়ে দেবার উপায় নেই। এর জন্যে দুটি বাঁধা মুষ্টিযোগ ঠিক করে রেখেছেন ডাক্তারবাবু, প্রচলিত নিদান শাস্ত্রে যার উল্লেখ নেই। দুটোই ওঁর পেটেন্ট। পেট কামড়ানো কেস-এ ব্যবস্থা হল স্রেফ জল সাবু, আর মাথা ধরায় ক্যাষ্টর অয়েল। ওষুধ প্রয়োগ করার আগেই বেশীর ভাগ রুগী চম্পট দেয়। তবু একটা রাত, (কখনো কখনো তার চেয়েও বেশী) 'অবজারভেশনে' থাকা যায়। ঐটুকুই লাভ।

হাসপাতাল সম্বন্ধে দিলীপের পুরনো ধারণা বদলে গেল! ভয়

পাবার মত তেমন কিছু তো নেই এখানে। বুঝতে পারল না, তবে বস্তির লোকগুলো অত ভয় করত কেন। কেমন করে বুঝবে? অ্যাম্বুলেন্সে বন্ধ করে তাদের যেখানে নিয়ে ফেলা হত, সেই সব বৃহৎ বৃহৎ 'আরোগ্য নিকেতনের' আসল রূপ তো সে তখনো দেখেনি। বড় হয়ে হয়তো দেখে থাকবে।

হাতের ঘা ক'দিনেই সেরে গেল তার পবেও সে কাঠ কামানেই রইল, কিন্তু ছুতোরের হাতিয়ার ছেড়ে বদলি হল রংপালিসের ঘষামাজায়। তাও নামে মাত্র। শুধু সে নয়, সকলেই প্রায় তাই। সাহেব যতক্ষণ না ঘুরে যান, ততক্ষণ টুক্‌টাক, খুট্‌খাট। কেউ দুটো পেরেক ঠুকছে, কেউ একটু করাত চালাচ্ছে। সেই কোন্ মান্ধাতার আমল থেকে তৈরী হয়ে পড়ে আছে খানকয়েক মামুলী আসবাব— একখানা ক্যাম্প চেয়ার, দুটো টুল, একটি আলনা, আর গুটিকয়েক খেলনা। সেইগুলো রোজ ঝেড়েঝুড়ে লাইন করে সাজিয়ে রাখে 'ষ্টোর'। সাহেব চলে গেলেই আবার এলোমেলো করে সরিয়ে রেখে দেয়, যন্ত্রপাতি গুনে গুনে বাক্সে তোলে, তাতে তালা লাগিয়ে চাবিটা দিয়ে দেয় মাষ্টারের হাতে। তিনি বাড়ি চলে যান। ছেলেরাও যে-যার বেরিয়ে পড়ে ওয়ার্কশপ ছেড়ে।

এই হল মর্ণিং শিফ্‌ট, অর্থাৎ প্রাতঃকালীন কর্মসূচী। পরের পর্ব শুরু হবে দেড়টার পর। মাষ্টার আবার আসেন, এবং আসতেই 'ষ্টোর বয়' কারখানার কোণে গুটিয়ে রাখা কম্বলটা মেঝের উপর বিছিয়ে দেয়। তিনি শুয়ে পড়েন, এবং যতক্ষণ তাঁর নাসিকাগর্জন স্পষ্ট না হয়ে ওঠে, ছেলেরা এদিক ওদিক একটু নড়াচড়া করে। তার পরেই ওয়ার্কশপ ফাঁকা। কে কোথায় যায়, কেউ খোঁজ রাখে না। কেউ কেউ চলে যায় একদম গেটের বাইরে, কোনো মাষ্টার বা কেরাণীবাবুর বাসায়। সেখানে জল তোলে, বাসন মাজে, ঘর ঝাঁট দেয়, ছেলেপিলে রাখে, রাত্রের রান্নাবান্নার যোগাড়যন্ত্র করে রেখে দেয়। ঐ সময়টা উপরওয়ালাদের মাধ্যাহ্নিক বিরতি। গেটকীপারের সঙ্গে বন্দোবস্ত আছে, চীফ্ অফিসারের দ্বিতীয় দফা ডিউটি কিংবা ডেপুটি সুপারের বৈকালিক আফিস শুরু হবার আগেই সব আবার যথাস্থানে ফিরে আসে।

এই নিষিদ্ধ গোপন কাজগুলোর জাত ও প্রকৃতি যাই হোক, বেশীর ভাল ছেলের এতে আপত্তি নেই, বরং আকর্ষণ আছে। এই সময়টির জন্য গভীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে থাকে। মা, বাপ, ভাই, বোন নিয়ে যে-জীবন, তার স্বাদ অনেকেই পায়নি। অথচ এই সেই বয়স, যখন তার জন্যে সকলেরই মনে মনে তৃষ্ণা জাগে। তাই যতটুকু পায়, তারই লোভ এদের প্রতিদিন বাইরে টেনে নিয়ে আসে—ছক-কাটা রুটিনের মমতাহীন ঘূর্ণী থেকে গার্হস্থ্য-জীবনের স্নিগ্ধ ছায়ায়। হয়তো সেখানে আসলের চেয়ে মেকীর ভাগ বেশী; স্নেহের সঙ্গে স্বার্থবুদ্ধির খাদ, অনুগ্রহের মধ্যে অবজ্ঞার গন্ধ। তবু, এখানে আসবার আগে তা-ই বা ক'জন পেয়েছে? খুঁজলে দেখা যাবে, দু-চারজন বাদ দিলে সবাই হয়তো কেশব সিকদার কিংবা তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর দল।

ওয়ার্কশপ থেকে সকলে চলে গেলেও দিলীপ একা বসে থাকত। অন্য ছেলেগুলো টানাটানি করলেও যেত না। স্কুল লাইব্রেরী থেকে একটা করে বই নিয়ে আসত। আশুবাবু বেছে দিতেন। নানা ধরনের বই—গল্প, ভ্রমণ, মহাপুরুষদের জীবনচিত্র, দেশ-বিদেশের ইতিকথা, নতুন আবিষ্কারের কাহিনী। পড়তে পড়তে তন্ময় হয়ে যেত। জানতেও পারত না কখন চলে গেছেন কাঠমাষ্টার। ওয়ার্কশপ বন্ধ করতে এসে পেটি অফিসার ডেকে তুলে দিত। তখন হয়তো জোর ফুটবল চলছে বর্ষ্টালের মাঠে। খেলছে চৌদ্দ জন, দুদিক থেকে গলা ফাটাচ্ছে চারচৌদ্দং ছাপান্ন।

কাঠকামান থেকে বেরিয়ে দেবদারু গাছের লাইন বাঁয়ে রেখে পশ্চিমদিকে এগোলেই প্রথমে পড়ে স্কুলবাড়ি। তার পরেই খান-দুই কামরা নিয়ে দিলীপের রহস্য জগৎ। জানালার ঠিক ধারেই একটা অদ্ভুত যন্ত্র। সামনে দাঁড়িয়ে একটি বড় ছেলে পা দিয়ে নীচের দিকে কোথায় দোলা দেয়, অমনি ঘটর ঘটর করে চলতে থাকে লোহার ডাণ্ডাগুলো, একটা ছোটখাটো দৈত্য যেন হাড়গোড় নেড়ে জেগে ওঠে। ছেলেটি পা চালাতে থাকে আর ডান হাত দিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে টেনে নেয় বড় বড় কাগজের সীট। সেগুলো এক সেকেণ্ড আগে ছিল সাদা, যখন বেরিয়ে আসে আগাগোড়া লেখায় ভর্তি!

আসতে যেতে জানালার ধারে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দিলীপ তন্ময় হয়ে দেখত। নিশ্চয়ই কোনো যাদু আছে ঐ ঘূর্ণায়মান যন্ত্রটা আর তার ঐ একটানা ঘটঘট আওয়াজের মধ্যে। দেখত আর ভাবত কবে সে ঐ ছেলেটার মত বড় হবে, ঐখানে দাঁড়িয়ে অমনি করে অনায়াসে চালাবে ঐ অদ্ভুত কলটাকে। শুধু কি ঐ একটা? ওর চেয়েও কিম্ভুতকিমাকার কালো কালো আরো কতকগুলো যন্ত্র সারি সারি সাজান ছিল দেয়ালের ধারে। তাছাড়া ছিল এক সার বড় বড় কাঠের ডালা, তার মধ্যে একরাশ ছোট ছোট লোহার টুকরো। বাহাদুর বলেছিল লোহা নয়, সীসা; ওগুলো সব অক্ষর, যার নাম টাইপ। দু-তিনটে ছেলে খড়ম পায়ে ঐ ডালার সামনে দাঁড়িয়ে একটি একটি করে তুলে তুলে ঐ টাইপগুলো পর পর সাজিয়ে ফেলত ছোট এক খণ্ড পেতলের তক্তার উপর।

ওরা খড়ম পরে আছে কেন? জানতে চেয়েছিল দিলীপ। বাহাদুর বলেছিল, সীসাতে একরকম বিষ আছে। পায়ে ঘা হতে পারে কিনা, তাই।

—হাত দিয়ে ঘাঁটছে যে?

—হাতেও একটা কিছু পরা উচিত। এখানে সে সব নেই। কী করবে, খালি হাতেই কাজ করতে হয়।

বাহাদুরের কাছেই শোনা, এর নাম প্রেস—ছাপাখানা। কোন্ কোন্ অফিসের কি সব কাগজপত্র ছাপা হয়। সেই এখানকার ষ্টার। সব কিছুর তদারক করে, নতুন ছেলেদের শেখায়, আবার দরকারমত কলও চালায়। প্রেস-এর সব কাজ সে শিখে নিয়েছে। প্রেসমাষ্টার খুব ভালবাসেন তাকে। দুচোখে গভীর শ্রদ্ধা ও বিস্ময় নিয়ে দিলীপ চেয়ে দেখত এই ছোট-চোখ চ্যাপ্টা-নাক হাসিহাসি-মুখ শান্ত ছেলেটির দিকে। তাকে সবাই কেমন তাচ্ছিল্য করে বলত বাহাদুর, দিলীপ বলত বাহাদুর-দা। বাহাদুর ভরসা দিয়েছিল আর একটু বড় হলেই সে সাহেবকে বলে দিলীপকে প্রেসে নিয়ে আসবে এবং নিজের হাতে যত্ন করে সব কাজ শিখিয়ে দেবে। সেই শুভদিনের অপেক্ষায় সে বসে বসে দিন গুনছিল।

সেদিনটিও যে তার জন্যে এত কাছে এসে অপেক্ষা করছে, দিলীপ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। ডেপুটিবাবু যখন ডেকে নিয়ে জানিয়ে দিলেন,

কাল থেকে তিন ঘণ্টা করে তাকে প্রেস-এর কাজ শিখতে হবে, সে যেন হাতে স্বর্গ পেয়ে গেল। তার সঙ্গে আর একটি ছেলে এল দর্জিকামান থেকে। তার নাম সামসুল, ওর চেয়ে কয়েক বছরের বড়, ফর্সা রং ভালো স্বাস্থ্য ও সুন্দর চেহারা। প্রেসমাষ্টার বাহাদুরকে ডেকে ওদের কম্পোজ শেখাতে বলে দিলেন, আর ওদের বললেন মন দিয়ে পড়াশুনো করতে। তা না হলে কাজ শিখতে পারবে না, শিখেও কোন লাভ হবে না। এটা শুধু হাতের কাজ নয়, তার সঙ্গে মাথারও।

সামসুল খানিকটা উপরের দিকে পড়ে, মোটামুটি ইংরাজী জানে। তাকে দেওয়া হল ইংরাজী হরফ, আর খোকাকে বাংলা। খোকার ঝোঁক মেসিনের দিকে। বাহাদুরকে একান্তে পেয়ে চুপিচুপি বলল, ওখানে কবে যাবো বাহাদুর দা ?

সে হেসে ফেলল, দাঁড়াও, ঠ্যাংদুটো আরেকটু লম্বা হোক, তবে তো।

সামসুলের সঙ্গে দিলীপের জানাশুনো ছিল, মিশবার সুযোগ হয়নি। তবে প্রথম থেকেই ভালো লেগেছিল ছেলেটিকে। এবারে আরো ভালো লাগল এবং দু'দিনেই ভাব জমে উঠল। সামসুল ওকে বলত, বড় ছেলেগুলোর সঙ্গে কখনো মিশবি না।

—কেন ? জানতে চাইত দিলীপ।

—ওরা ভালো না।

দিলীপ ঠিক ধরতে না পেরে তাকিয়ে আছে দেখে বলত, আর একটু বড় হ, তখন বুঝবি।

বুঝতে অবশ্য বেশী দেরী হয়নি। কয়েকজন বড় ছেলে—বিশেষ করে সতীশ এবং সিরাজুল যেসব বিশ্রী কথা বলত, গায়ে পড়ে যে-ভাবে ভাব করতে আসত, দুপুরবেলা কিংবা সন্ধ্যার পর ফাঁক পেলেই আড়ালে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করত, তার থেকে সমস্ত দলটার উপরেই তার কেমন বিতৃষ্ণা গড়ে উঠেছিল। সামসুলের মত সেও ওদের এড়িয়ে চলতে শুরু করল। কিন্তু, দেখে অবাক হয়ে গেল, একদল ছোট ছেলে, তার মধ্যে কেশোও ছিল, ঐ বড় ছেলেগুলোর ভীষণ নেওটা। ওদের সঙ্গে ঘোরে, দুপুরের দিকে যখন অফিসাররা কেউ থাকেন না, ওয়ার্কশপ থেকে

বেরিয়ে গিয়ে ওদের হাত ধরে কোথায় কোথায় চলে যায়। বড়দের মধ্যে অনেকে ছিল 'ষ্টার বয়'। তারা যে বাড়তি খাবার পেত, ডিম, মাছ, মাংস, তার খানিকটা করে ভাগ এই পেটোয়া ছোট ছেলেগুলোকেও খেতে দেখেছে দিলীপ। তাকেও কোনো কোনো 'ষ্টার' সাধাসাধি করত, কিন্তু সে রাজী হয়নি।

বড়দের মধ্যে একজন ছিল সবদিক দিয়ে ব্যতিক্রম। সে বাহাতুর। ছোটদের, বিশেষ করে দিলীপকে সে খুব ভালবাসত, কাছে বসিয়ে কত কথা বলত, কিন্তু কোনোদিন অন্যায়ভাবে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেনি। তারও একটা জিনিস দিলীপ পছন্দ করত না—তুপুরবেলা গেটের বাইরে চলে যাওয়া। আর যারা যেত, তারা যে এ-বাসায় ও-বাসায় কাজ করতে যায়, সেকথা কারো অজানা ছিল না। দিলীপও জানত। যাবার সময় তাদের কারো হাতে থাকত নতুন বাঁধা ঝাঁটা, কারো হাতে লোহাকামানে তৈরী একটা অ্যালুমিনিয়ামের মগ,কিংবা গুদাম থেকে খানিকটা ফিনাইল বা ঐ জাতীয় ঘর-সংস্কারের টুকিটাকি দরকারী জিনিস। তারা যখন বেরোত, প্রায়ই দল বেঁধে। এবং সঙ্গে থাকত পেটী অফিসার। বাহাতুর যেত আলাদা এবং একা। মাঝে মাঝে লুকিয়ে নিয়ে যেত একটা সেদ্ধ ডিম, কিংবা তু-টুকরো মাংস—ষ্টার হিসেবে তার যে খাবার, কিংবা হাসপাতাল থেকে চেয়ে আনা একটু চিনি, চা বা তু-এক শ্লাইস পাঁউরুটি। কখনো কখনো ওর হাতে থাকত ছোটদের পড়বার মত কোনো বই, একটা খাতা বা পেনসিল। সবটাই হত গোপনে; শুধু দিলীপের কাছে লুকোবার চেষ্টা করত না। কিন্তু কোথায় যায়, কার জন্য নিয়ে যায় ঐ জিনিসগুলো, সেটা কোনোদিন বলেনি, দিলীপও করবো করবো করে জিজ্ঞাসা করেনি। একদিন বলে ফেলল, তুপুর বেলা তুমি কোথায় যাও, বাহাতুর-দা?

—যাই এক জায়গায়। একজনকে দেখতে।

—কে সে?

বাহাতুরের মুখে একটা ম্লান ছায়া ভেসে উঠল। দূরে পাঁচিলের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বলল, তোকে একদিন বলবো। কিন্তু দেখিস আর কেউ যেন জানতে না পারে।

—আমি কাউকে বলবো না।

—আমি জানি। সেই জন্যেই তো তোকে আমি সব বলতে পারি। কদিন যাক; তারপর। কেমন?

দিলীপ মাথা নেড়ে জানাল, আচ্ছা।

সামসুলের সঙ্গে যখন আরো ভাব হল, একদিন নিজের কথা—নিজের কথা মানেই মায়ের কথা—বলতে বলতে দিলীপ হঠাৎ প্রশ্ন করেছিল, তোমার মা আছেন?

—আছে।

—চিঠি লেখেন তোমাকে?

—মা লিখতে জানে না।

—বাড়ির কোনো চিঠি পাও না?

—বাবা লেখে মাঝে মাঝে। আমি তার একটারও জবাব দিইনি।

—'কেন?' বিস্মিত হল দিলীপ।

—কী হবে চিঠি লিখে? এই বেশ আছি।

দিলীপ বুঝতে পারল না কী বলতে চায় সামসুল, তবু চুপ করে রইল। তার বাবাকে সে দেখেনি বললেই হয়। তবু কেন যেন মনে হয়, তিনি যদি থাকতেন, আজ তাকে এখানে আসতে হত না। যার বাপ আছে তার আর ভাবনা কি? কোনো বিপদ তাকে স্পর্শ করতে পারে না। তবে কি এও কেশবের মত? বাবা থাকতেও নেই?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কি মনে করে আবার জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা ভাই তুমি জেলে এলে কেমন করে?

সামসুলের চোখ দুটো হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠল। সেই মুহূর্তে এরই সঙ্গে জড়িত কোনো প্রসঙ্গ বোধহয় ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল তার মনের মধ্যে, ঐ প্রশ্নটা তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। দিলীপ মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠল। কিন্তু বুঝতে পারল না এতে রেগে যাবার কী আছে। একথা তো তাকেও কতজনে জিজ্ঞাসা করেছে, অনেকে আবার নিজে থেকে বলে গেছে তার কাছে

সামসুল ততক্ষণ নিজেকে সামলে নিয়েছে, মনে মনে লজ্জিত হয়েছে বন্ধুর কাছে এই আকস্মিক ভাবান্তর প্রকাশ পড়ায়।

মৃদু হেসে ওর কাঁধে হাত দিয়ে অন্তরঙ্গ সুরে বলল, চল, খেলতে যাই।

দিলীপ নিঃশব্দে পাশে পাশে চলল। কিছুক্ষণ পরে তেমনি কাঁধে হাত রেখেই বলল সামসুল, কেমন করে জেলে এলাম জানতে চাইছিলি? সে সব কথা তোকে বলা যায় না, ভাই।

—কেন?

—তুই বুঝবি না।

—বুঝবো না কেন?

—তুই যে বড্ড ছেলেমানুষ।

কথাটা দিলীপের পচ্ছন্দ হল না। এমন কি ছেলেমানুষ সে? আর ও-ই বা এমন কি বড়! খানিকটা অভিমান হল বন্ধুর উপর। তাই অপ্রসন্ন মুখে চুপ করে রইল।

দিনকয়েক পরে প্রেস ছুটি হবার পর সামসুল তাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে চুপিচুপি বলল, জানিস, বাহাদুরের নামে 'রিপোর্ট' হবে।

দিলীপ যেন আকাশ থেকে পড়ল। বাহাদুর এমন কী করতে পারে যার জন্যে 'রিপোর্ট' হবে! বলল, কেন?

—ব্যাণ্ড-মাষ্টারের বাড়িতে কী সব মেয়েছেলে নিয়ে ব্যাপার। ওখানে ও যায়তো প্রায়ই। মাষ্টারের বৌ গিয়ে বলে দিয়েছে চীফ অফিসারের কাছে। তাতে আর মাষ্টারে কথা হচ্ছিল; আমি হঠাৎ গিয়ে শুনে ফেলেছি। এখনো কেউ কিছু জানে না।

দিলীপ কিছু বুঝতে না পেরে বলল, কী করেছিল বাহাদুর?

—মাষ্টারের একটা মেয়ে আছে না? তার সঙ্গে নাকি,—থাক ওসব কথা তোকে শুনতে নেই।

দিলীপের মাথার ভিতরটা যেন ওলটপালট হয়ে গেল। বাহাদুর তো তেমন ছেলে নয়। কোনো রকম মন্দ কাজ সে করতে পারে, এ যে একেবারেই বিশ্বাস করা যায় না। সামসুল একমনে কী ভাবছিল। খানিকক্ষণ পরে আবার শোনা গেল তার কথা। আর কাউকে নয়, যেন নিজেকেই শোনাচ্ছে, এমনি ভাবে বলল, বাহাদুরের কোন দোষ নেই: নিশ্চয়ই ঐ মেয়েটা মিথ্যে করে লাগিয়েছে ওর নামে। ওরা সব পারে।

বলতে বলতে যেন কতদূরে চলে গেল, তারপর হঠাৎ কেমন উত্তেজিত হয়ে পড়ল। চোখদুটো থেকে একরাশ আগুন ঠিকরে এল। দিলীপের দিকে ফিরে বলল, জানিস? আমার নামে সে-ও এমনি বদনাম দিয়েছিল। আমি নাকি জোর করে অত্যাচার করেছি। মিথ্যা কথা। সে-ই আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল মটরক্ষেতের মধ্যে। আমার চেয়ে সে দুবছরের বড়। আমি তো ইচ্ছে করে যাইনি। বাপজান আমার কথা বিশ্বাস করল না, জুতো দিয়ে মারল আমাকে। তারপর সেই অতো রাত্তিরে ঘাড় ধরে বের করে দিল বাড়ি থেকে।

সামস্থলের দু চোখ জলে ভরে উঠল আর সেই দিকে বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল দিলীপ। স্পষ্ট কিছুই বুঝল না, কিন্তু কিছু না জেনেও একটা দৃঢ় প্রত্যয় হল তার মনে—সামস্থল কোনো দোষ করেনি। কে একটা মেয়ে তার নামে মিথ্যা দোষারোপ করেছিল, আর তার বাবা তাকে জুতো মেরে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছেন। সব বাপই বোধ হয় এমনি। কে জানে হয়তো তার বাবাও ঠিক এই করতেন। ছোট হলেও, সেই মুহূর্তে সমস্ত পৃথিবীর উপর কেমন একটা অস্পষ্ট ক্ষোভ আর অভিমানে তার সমস্ত মনটা ভরে উঠল। সংসারে সবাই নিষ্ঠুর; কোথাও যেন দয়ামায়া ভালবাসা এসব কিছু নেই।

বড় হবার পর যখন সবকিছু বুঝতে শিখেছে, জীবনের এই দিন-গুলোর কথা ভাবতে গিয়ে দিলীপের অনেকবার মনে হয়েছে, এই যে এক একটি ছোট ছেলে সংসারের সহজ ও সাধারণ পথ ছেড়ে বিপথে নেমে পড়ে, সৎ ন্যায় ও সুন্দরের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে, খুঁজলে বেরিয়ে পড়বে, তার মূলে রয়েছে এমনি কোনো অপ্রত্যাশিত আঘাত; যাকে সে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে, কিংবা বিশ্বাস করে, তার কাছ থেকে কোনো নির্মম আচরণ। দীর্ঘ ছ বছর কাল এই বর্স্টাল স্কুলে তাকে কাটাতে হয়েছিল। সম এবং অসমবয়সী অনেক ছেলের সঙ্গে সে মিশেছে। কত বিচিত্র তাদের কাহিনী। কত জটিল ও বিস্ময়কর অবস্থা-বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে ঐখানে এসে তারা দাঁড়িয়েছিল! কিন্তু একটি জায়গায় প্রায় সকলেই এক। সেখানে রয়েছে আপনজনের কোনো

অবহেলা, অনাদর কিংবা অবিচার, কারো কারো বেলায় তার চেয়ে কঠোরতর কোনো লাঞ্ছনা বা অত্যাচার।

ছোটখাটো 'অপরাধ' করবার প্রবণতা শিশুমনের স্বাভাবিক ধর্ম। তাদের দৈনন্দিন কর্মতালিকায় এমন কতগুলো বিষয় থাকে, যাকে বলা যেতে পারে 'অন্যায়' বা 'অনুচিত'। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সেগুলো তাদের কাছে নিছক আমোদ বা 'স্পোর্ট'। কোথাও কোথাও তার পিছনে থাকে লোভ, বাহাদুরি, কিংবা বন্ধুমহলে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি। একে যদি 'অপরাধ' বলা যায়, তাকে রোধ করবার একমাত্র অস্ত্র ক্ষমা ও স্নেহের শাসন। সে শাসন যখন মাত্রা হারিয়ে ফেলে, অথবা নির্যাতন কিংবা প্রতিহিংসার রূপ নেয়, তখন ঐ শিশুসুলভ 'অপরাধ'গুলোই সত্যিকার অপরাধের পথ ধরে, যার নাম 'ক্রাইম'। ফুলের বুকে যদি কীট এসে বাসা বাঁধে, বুঝতে হবে সে দোষ ফুলের নয়, দোষ রয়েছে, যে গাছে সে ফুটল, তার কোনোখানে। একটি নির্মল শিশু কিংবা একটি নিষ্পাপ কিশোর যে পাপের ছাপ কপালে নিয়ে বর্ষ্টালে এসে দাঁড়ায়, সে পাপ তার নয়, তার বাপমায়ের কিংবা কোনো নিকটআত্মীয় বা অভিভাবকের। অভিভাবক যেখানে অনুপস্থিত, সেখানেও খুঁজলে দেখা যাবে, সে পাপ আপনা থেকে জন্মায়নি, তার শিকড় রয়েছে, যে পরিবেশে তার জন্ম যেখানে সে বেড়ে উঠেছে, তারই পাঁকের তলায়।

বর্ষ্টালের 'ক্ষুদে ক্রিমিন্যাল'গুলোই এই পরম সত্যের জীবন্ত সাক্ষী।

ঘোষসাহেবের একটা দিনের গুটিকয়েক কথা দিলীপ কোনোদিন ভুলতে পারেনি। সেদিন তার পনর বছরের কিশোর মন নিয়ে তার সবটুকু মানে বুঝতে শেখেনি। বুঝেছিল অনেক পরে।

সাহেবই তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন কী কাজে। খুব সম্ভব প্রেস-সংক্রান্ত কোনো জরুরী নির্দেশ বা ঐ জাতীয় কিছু। তখন সে প্রেস-মাষ্টারের ডান হাত এবং অনেক ব্যাপারে ডেপুটিবাবু কিংবা সাহেবের সঙ্গেও সরাসরি যোগাযোগ রাখতে হয়। সুপার একটি ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলছিলেন বলে অফিসের দরজার পাশে অপেক্ষা করছিল। হঠাৎ কানে গেল, তিনি বলছেন.

দেখুন, কিছু মনে করবেন না, আমি স্পষ্ট কথার লোক। ছেলে আপনাদের নিজে থেকে বিগড়ে যায়নি। আপনারাই পথ দেখিয়েছেন।

'আমরা পথ দেখিয়েছি! আপনি বলছেন কি!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলেন ভদ্রলোক।

—হ্যাঁ, আপনারা।

ভদ্রলোকের মুখে আর কথা সরেনি; বোধহয় অতি বিস্ময়ে মূক হয়ে গিয়েছিলেন। সাহেব বলেছিলেন, আপনাদের সন্ধ্যেবেলার প্রোগ্রামটা একবার মনে করুন। প্রায় প্রত্যহ দুজনে মিলে, মাপ করবেন, একটু বিশেষ সাজগোজ করে বেরিয়ে যাওয়া। কোনোদিন সিনেমায়, কোনোদিন বা পার্টি, ক্লাব কিংবা হোটেলে। ওকে বলতেন, আমরা একটু ঘুরে আসছি। তুই বসে বসে পড়। মাঝে মাঝে ও জানতে চাইত, কোথায় যাচ্ছ তোমরা, আপনারা ধমকে উঠতেন, তা দিয়ে তোর কাজ কী? দরকারে বেরুচ্ছি। ও কিন্তু জানত সে দরকারটা হচ্ছে গান, বাজনা, স্ফূর্তি, আমোদ, পান-ভোজন। আপনি যখন থাকতেন না আপনার পকেট হাতড়ে দেখত, পেয়ে যেত হোটেলের বিল, কিংবা সিনেমার টিকিটের আধখানা। ফিরে এসে, কী দেখলেন কোথায় গিয়েছিলেন তা নিয়ে খোসগল্প জুড়ে দিতেন দুজনে মিলে। পাশের ঘরে শুয়ে মাঝখানের খোলা দরজা দিয়ে ও সব শুনত। আপনারা মনে করতেন খোকা ঘুমিয়ে পড়েছে। ভুল। ঘুমোয়নি; ঘুম আসত না ওর। অনেক রাত পর্যন্ত ছটফট করত, আর শুনলে অবাক হবেন, মনে মনে প্ল্যান করত কী করে এর শোধ নেবে।

'—শোধ নেবে মানে? কিসের শোধ?' রীতিমত উষ্মার সুরে বলে উঠেছিলেন ভদ্রলোক।

—আপনাদের অবহেলার। ভুলে যাচ্ছেন ও আপনাদের একমাত্র সন্তান।

—আপনি ভুল করছেন। আমরা তো ওকে একদিনের তরেও অবহেলা বা অনাদর করিনি।

সাহেব হো-হো করে হেসে উঠেছিলেন, সে কথার কোনো জবাব দেননি। তারপর বলেছিলেন, আপনার পকেট থেকে যখন দু-একটা

টাকা চুরি যেতে শুরু হল, আপনারা প্রথমে সন্দেহ করলেন চাকরটাকে। মারধোরও করলেন খানিকটা, কিন্তু চুরি বেড়ে চলল এবং ছড়িয়ে পড়ল মানিব্যাগ থেকে ভ্যানিটিব্যাগে। তারপর একদিন চাকরটাই বলে দিল, চোর কে। খোকা অস্বীকার করতে পারত, বেশীর ভাগ ছেলে তাই করে। কিন্তু ও করেনি। কতো ভাল ছেলে আপনাদের! তবু আপনি তাকে না খেতে দিয়ে ঘরে বন্ধ করে রাখলেন।

—কী করবো! আমার ছেলে চোর, এটা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারিনি।

—জানি। কিন্তু কেন চুরি করেছে, জানতে চাননি, ভেবেও দেখেননি। শুধু টাকাপয়সা সম্বন্ধে সাবধান হয়েছিলেন। কিন্তু তখন সে অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। নতুন ছবি আসামাত্র না দেখলে ভাত হজম হয় না, যেমন আপনাদেরও হত না। মাঝেমাঝে দু-একজন বন্ধু-বান্ধব মিলে চীনে হোটেলে জাঁকিয়ে না বসলেই বা চলে কেমন করে? তাই নিজের বাড়ির বাক্সে যখন তালা পড়ল, পরের বাড়ির তালা ভেঙে সাইকেল নিয়ে সরে পড়া ছাড়া আর কী উপায় ছিল, বলুন?'

ভদ্রলোক খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ওবুঝি এইসব কথাই বলেছে আপনাকে?

—আজ্ঞে না। ও কিছুই বলেনি। দুটো একটা প্রশ্ন করে, বাকীটুকু ওর মুখের দিকে চেয়ে আমি নিজেই অনুমান করে নিয়েছি। এতো শুধু আপনার ঘরের কথা নয়, এখানে যারা আছে তাদের অনেকের পেছনেই রয়েছে ঐ এক ইতিহাস। একটু এদিক আর ওদিক! দেখে দেখে আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। হয়তো কিছু বাড়িয়ে বলেছি, কিংবা—

'না, কিচ্ছু বাড়িয়ে বলেননি আপনি', বলে উঠলেন ভদ্রমহিলা, 'এর কোনোটাই মিথ্যা নয়। কিন্তু তার থেকে এতবড় সর্বনাশ হবে, একবারও কি ভাবতে পেরেছিলাম?'

ভারী করুণ শোনালো ভদ্রমহিলার কথাগুলো। ঘরের আবহাওয়াটাই যেন বদলে গেল। কিছুক্ষণ কারো কোনো কথা শোনা গেল না।

তারপর ভদ্রলোক বললেন, যা হয়ে গেছে তার তো আর প্রতিকার নেই। এখন কি করে ছেলেটাকে আমরা ফিরে পেতে পারি, সেইটুকু আপনাকে করে দিতে হবে, মিষ্টার ঘোষ। আমি একাই আসছিলাম, কিন্তু ওঁকে আর ঠেকিয়ে রাখা গেল না।'...বলে, স্ত্রীকে দেখিয়ে দিলেন।

মিষ্টার ঘোষ ভদ্রমহিলার দিকে চেয়ে বললেন, মনে হচ্ছে এর আগেও যেন আপনি এসেছিলেন একবার।

—একবার নয়, দু-দুবার এসে ফিরে গেছি। উনি জানেন না। কিন্তু একটিবার চোখের দেখাও দেয়নি হতভাগা।

বলতে বলতে মুখ নিচু করে আঁচলে চোখ মুছলেন। ভদ্রলোক অনুনয়ের সুরে বললেন, আপনি চেষ্টা করলে দুমিনিটের জন্যে হয়তো একবার দেখা করিয়ে দিতে পারেন। আপনার কথা সে নিশ্চয়ই অমান্য করবে না।

—তা করবে না। তবে, সেটা আমি চাই না মিষ্টার ব্যানার্জি। এদের মনের ওপর কোনো জোর খাটানো বা চাপ দেওয়া আমার ইচ্ছা নয়। নিজে থেকে যদ্দিন না আসে, আপনাদেরও অপেক্ষা করতে বলবো।

মৃদু হেসে যোগ করলেন, বয়সটাই যে অদ্ভুত। প্রথমে উগ্র অভিমান, তারপর আসে লজ্জা। শ্রীমানের বোধহয় সেই ষ্টেজ চলছে। থাক কিছুদিন নিজের মনে। লজ্জাবতী লতা যেমন ছুঁলেই কুঁকড়ে যায়, এরা আবার তার ওপরেও এককাঠি।

বলে আর একদফা ছাদ ফাটানো হাসি হেসে উঠলেন লেফ্‌টেনাণ্ট ঘোষ।

ওদের কথাবার্তায় ছেলেটার নামের উল্লেখ না থাকলেও দিলীপ আন্দাজ করতে পেরেছিল। শচীন ব্যানার্জি, ইনডাসট্রিয়াল বয়। মাস দু-এক আগের আমদানী।

সাহেবের ঘর থেকে ফিরে এসে শচীন এবং আরো অনেকের সঙ্গে নিজেকে সেদিন সে মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু সহজে কোনো মিল খুঁজে পায়নি। সে যেন সবার থেকে আলাদা। সাহেবের

কথাগুলোও একটি একটি করে ভেবে দেখেছিল। তার জীবনের সঙ্গে তার সঙ্গতি কোথায়? বাবাকে সে পায়নি। তার সমস্ত শৈশব জুড়ে আছে শুধু মা। কিন্তু তাঁর প্রতিদিনের প্রতিটি কথা, প্রতিটি আচরণ তন্ন তন্ন করেও তো কণামাত্র অবহেলা বা অনাদর খুঁজে পাওয়া যায় না। সবটুকু ভরে আছে অপরিসীম স্নেহ। শুধু একটি দিনের সেই একটি মাত্র রূঢ় কথা, একটি মাত্র আঘাত। কিন্তু কত দুঃখ, কত বড় লাঞ্ছনায় মা সেদিন হাত তুলেছিল তার গায়ে, মুখ ফুটে বলেছিল সেই দুটি মর্মান্তিক কথা, দিলীপের চেয়ে কে বেশী জানে? সেদিন সে জ্ঞান তার ছিল না। হয়তো তার জন্যে দায়ী মায়ের সেই নিরবচ্ছিন্ন স্নেহ-যত্নময় কোমলরূপ, চোখ ফুটবার পর থেকে অত দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যেও মুহূর্তের তরে যার ব্যতিক্রম ঘটেনি। মাঝেমাঝে একটু যদি কঠোর হত মা, কিংবা একটু কম ভালবাসত তাকে, সেদিনকার আঘাতটা বোধহয় অতখানি তীব্র হয়ে বাজত না। ভালবাসা যেখানে যত গভীর, অভিমানটাও সেখানে তত বেশী উগ্র।

পরবর্তীকালে দুনিয়াটাকে যখন সে আরো স্পষ্ট করে চিনতে শিখেছে, যখন বুঝতে পেরেছে, জীবন-প্রত্যূষে যে মসিরেখা তার ললাটে অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল, সংসারের কাছে সেইটাই তার পরিচয়, তখনো মাঝে মাঝে ঘোষসাহেবের নানাদিনের নানা কথা তার মনে আন্দোলিত হত। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করত, তার কপালের উপর এই যে পাপচিহ্ন তার জন্যে তার শিশুমন যদি দায়ী হয়ে না থাকে, তবে কে দায়ী? এ কার পাপ? উত্তর পায়নি!

এই প্রসঙ্গে একদিন, সেই ছেলেবেলায় মায়ের মুখে শোনা কয়েকটি কথা তার মনে পড়েছিল।

মা যা বলেছিলেন সেদিন তার পুরোপুরি অর্থবোধ হয়নি। কিন্তু কথাগুলোর একটা ক্ষীণ রেশ বোধহয় লুকিয়ে ছিল মনের কোনো কোণে। অনেকদিন পরে সেইটুকুই হঠাৎ ভেসে উঠেছিল চেতনার মধ্যে। মা বলেছিলেন, খোকা, তুই যখন বড় হবি, একটা কথা কোনোদিন ভুলিস না। লোভের চেয়ে বড় শত্রু আর কিছু নেই। লোভই মানুষকে পাপের পথে নিয়ে যায়, অন্যায়ের দিকে টানে। যেটুকু তোর পাওনা, তাই

নিয়ে খুশী থাকিস, তার বাইরে কখনো হাত বাড়াতে যাসনে। আমি যখন থাকবো না, আমার এই কথাটা মনে রাখিস, বাবা।

যে কোনো কারণেই হোক, মায়ের মনটা সেদিন ভাল ছিল না। সন্ধ্যার পর একা একা অন্ধকার বারান্দায় থামে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসেছিল। ঘরের মধ্যে রেড়ির তেলের প্রদীপের নীচে দিলীপ বসে পড়ছিল কিন্তু বই-এর পাতায় মন দিতে পারছিল না। মায়ের ম্লান মুখখানা বারবার ভেসে উঠছিল থেকে থেকে ঝাপসা হয়ে যাওয়া অক্ষর-গুলোর উপর। তারপর আর থাকতে না পেরে তার পাশটিতে এসে বসে পড়েছিল। মা তার দিকে তাকায়নি, বাইরের অন্ধকারের পানে চেয়ে ধীরে ধীরে থেমে থেমে ঐ কটি কথা বলে গিয়েছিল। দিলীপের ইচ্ছা হয়েছিল জিজ্ঞাসা করে, তোমার কী হয়েছে, মা? পারেনি। কেমন একটা ভয়-জড়িত-সঙ্কোচ যেন তার গলাটা আটকে ধরেছিল। মায়ের আঁচলের একটা ধার চেপে ধরে নিঃশব্দে বসে ছিল তার গা ঘেঁষে।

সেইখানে বসেই মা সেদিন আরো কত কী সব বলে গিয়েছিল। তার সবখানি তার মনে নেই। যেটুকু আছে তাও অস্পষ্ট। তার বেশীরভাগই যেন মায়ের নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া। সে ছিল শুধু উপলক্ষ্য। অনেক কথার মধ্যে মা বলেছিল, তিনি তো চাননি। বারবার বলেছিলেন, 'এটা অন্যায়, এ আমি পারবো না। আমারই জিদ তাঁকে টেনে নামিয়েছিল। জিদ নয়, পাপ। শেষ পর্যন্ত আমার সেই পাপের ছোঁয়া তিনিও এড়াতে পারলেন না। সারাজীবনে যার এতটুকু ময়লা কোথাও লাগেনি, শুদ্ধ নিষ্পাপ মানুষ, যাবার সময় একটা কালো দাগ নিয়ে গেলেন! কিন্তু সে কালি আমি তোর গায়ে লাগতে দিইনি, খোকা। সে নোট আমি ছুঁইনি। হাসপাতালের চিঠিটাও তখনই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম।

—কোন্ নোট্, মা?

—বড় হ; তারপর একদিন বলবো।

সে বলা আর হয়নি। সেই নোট এবং তার রহস্যময় ইতিহাস দিলীপের কাছে অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। মায়ের মুখে সেদিন যা দেখেছিল, যা শুনেছিল, বড় হবার পর তার থেকে একটা ধারণাই শুধু

গড়ে উঠেছিল তার মনে—ঐ নোট তাদের জন্যে কেবল অকল্যাণ বয়ে আনেনি, ওর মধ্যে জড়িয়ে আছে তার বাবার জীবনের কোনো মসিচিহ্ন। তবে কি ঐখানেই রয়েছে তার প্রশ্নের উত্তর? জ্ঞান হবার আগেই যে কালো রেখা কপালে নিয়ে সে যাত্রা শুরু করেছিল, সেটা কি তার পিতৃদত্ত উত্তরাধিকার? জন্মার্জিত অভিশাপ? তাই বা কেমন করে হবে? যিনি আজন্ম-শুভ্র, আজীবন শুদ্ধাচারী, তাঁর এই মুহূর্ত-লব্ধ কালিমা-স্পর্শ কি এত গভীর যে সন্তানের ললাটেও তার ছাপ থেকে যাবে? সেই অভিশপ্ত অর্থ তো তারা ভোগ করেনি। স্পর্শ পর্যন্ত করেনি মা। তার নিজের জীবনের কোনোখানেও সে-টাকার ছোঁয়াচ লাগেনি। তবে? এ প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। হতে পারে, পাপ অবিনশ্বর, তাকে মুছে ফেলা যায় না। নোট ছিঁড়ে ফেলা যায়। কিন্তু তার মধ্যে অলক্ষ্যে জড়িয়ে আছে যে অন্যায় লিপ্সা, তার কখনো ধ্বংস নেই। তার সংক্রমণ এড়ানো যায় না। অকস্মাৎ একদিন কোনো অনুকূল আবহাওয়ার স্পর্শ লেগে একটি শিশুমনের মধ্যে যখন সে ফুটে বেরোয়, সৎ এবং সভ্য জগৎ সেই অবোধ ও অপোগণ্ড মানুষটার উপরেই চাপিয়ে দেয় সকল দায়। সারাজীবন ধরে তাকেই তার দণ্ড দিতে হয়। কেউ জানতে চায় না, তার মধ্যে কোথা থেকে এল এই কালব্যাধি, প্রভাতের অস্ফুট কলিকায় একটা বিষাক্ত কীট হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসল কেমন করে।

বর্ষ্টাল স্কুল থেকে মুক্তি পাবার অনেক দিন পরেও পেছনের দিকে তাকিয়ে দিলীপের মন মাঝেমাঝে এই সমাধানহীন প্রশ্নজালে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত।

প্রতিদিন সকালবেলা প্রেস খুলবার সঙ্গে সঙ্গেই বাহাদুর এসে পড়ে। অন্য সকলের কাজ শুরু হবার আগে তাকে অনেক কিছু করতে হয়—প্রেস-মাষ্টারের টেবিলটা ঝেড়ে কাগজপত্র গুছিয়ে রাখা, সেদিনকার 'জব'গুলোর লিষ্টিকরা, কাকে কি 'টাস্‌ক' দিতে হবে ঠিক করা, কোন 'ম্যাটারটা' মেসিনে চড়াতে হবে, কোন অর্ডারটা আগে 'কম্পোজে' যাবে, কোন কোন 'প্রুফ'গুলো দেখা হয়নি—ইত্যাদি। প্রায় সবই প্রেস-মাষ্টারের কাজ; তারই করবার কথা, কিন্তু বিনোদবাবু প্রতিটি

খুঁটিনাটি বাহাদুরের ঘাড়ে চাপিয়ে নিশ্চিত হয়ে আছেন। এ সব বিষয়ে সেও রীতিমত ওয়াকিফহাল। আফিসের বাবুরা তো জানেন। সাহেবেরও অজানা নেই। তাই অনেক সময় প্রেস সম্পর্কে হঠাৎ কোনো দরকার পড়লে তাঁর কাছেও বাহাদুরের ডাক পড়ে।

আজ বাহাদুর অনুপস্থিত। ব্যাপারটা কারোই নজর এড়াবার কথা নয়। ছেলেমহলে এই নিয়ে কানাঘুষা শুরু হল, যদিও কি ঘটেছে, তার সঠিক খবর কারো জানা নেই। কিছুক্ষণ পরে বিনোদবাবু এলেন: অন্যদিন এর আগেই এসে পড়েন। আজকের এই দেরী এবং তাঁর মুখের ঐ থমথমে ভাব—হুটোর সঙ্গেই যে বাহাদুরের যোগ আছে, বুঝতে কারো অসুবিধা হল না। দিলীপকে তিনি একটু বিশেষ সুনজরে দেখেন। ছেলেরা তা জানত। তাই তাদের মধ্যে যারা কিছু বেশী উৎসাহী, মাষ্টারের কাছ থেকে রহস্যটা ভেদ করবার জন্যে ওকেই এসে চেপে ধরল। ওর নিজের আগ্রহও কম ছিল না। আস্তে আস্তে বিনোদবাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়াল, এবং তিনি চোখ তুলতেই জিজ্ঞাসা করল, বাহাদুরদা আসেনি কেন, স্যর?

'—সে আসবে না,' গম্ভীরভাবে বললেন বিনোদবাবু।

—আসবে না! কেন?

—তাকে বাইরের 'বাগান দফায়' 'পাশ' করা হয়েছে। যাও, কাজ করোগে। যেটা না পারবে আমাকে দেখিয়ে নিও।

কথাটা সকলেরই কানে গেল, এবং প্রত্যেকে নিজের নিজের জায়গায় থ' হয়ে বসে রইল। সেই মুহূর্তে কাজ করবার মত মনের অবস্থা কারোই ছিল না। দিলীপও ফিরে এসে বসল তার ছোট্ট টুলটার উপর। জিজ্ঞাসা করবার ইচ্ছা ছিল কেন তাকে বাগানে যেতে হয়েছে, কিন্তু মাষ্টারের কথা শুনে বুঝল তিনি এ সম্বন্ধে আর কিছু বলতে চান না।

ব্যাণ্ড-মাষ্টারের মেয়ের বয়স চৌদ্দ-পনের। তার কাছে একটি কুড়ি-একুশ বছরের বর্ষ্টাল বয়'-এর গোপন আনাগোনা! আইন ভঙ্গের প্রশ্ন তো রয়েছেই, তাছাড়া নৈতিক দিক থেকে এটা আরো গুরুতর। যে-প্রশাসনিক শৈথিল্য এর জন্যে দায়ী তার গুরুত্বও কম নয়।

আইন অনুযায়ী চলতে গেলে, অর্থাৎ যাকে বলে 'অফিসিয়াল অ্যাকসন' নিতে হলে জল অনেক দূর গড়াবে, এবং এ-ব্যাপারে সাক্ষাৎ ভাবে যারা জড়িত, তারা ছাড়াও আরো অনেকে জড়িয়ে পড়বে। দুর্নামের পাল্লা হেড-অফিস পর্যন্ত ধাওয়া না করে ছাড়বে না। তার জেরও সহজে মিটবার নয়। সবদিক বিবেচনা করে এবং হয়তো ছেলেটার ভবিষ্যৎ ভেবে কর্তৃমহলে ব্যাপারটা চেপে যাওয়াই সিদ্ধান্ত হল। কাজ ও স্বভাবের গুণে বাহাদুর সকলেরই প্রিয়পাত্র। তার উপরে পেটী অফিসার-মহলে তার প্রচুর প্রভাব। দ্বিপ্রাহরিক বিরামের ফাঁকে গেটকীপারের সাহায্যে কিংবা তার চোখে ধুলো দিয়ে আবার পাছে সে গেট থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে ব্যাণ্ড-মাষ্টারের বাড়ি গিয়ে হাজির হয়, তাই ডেপুটি সুপার তাকে বাইরের বাগানে অর্থাৎ জেলের পেছনে বেশ খানিকটা দূরে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। বাগানে যারা কাজ করে, মাঝখানে খাবার সময়টুকু বাদ দিয়ে প্রায় সারা দিনটা তাদের সেখানেই কাটাতে হয়। তার উপরে বাগানী সিপাইটিও বেশ কড়া। বিশেষ করে বাহাদুরের বেলায় রীতিমত হুঁসিয়ার থাকবার জন্যে ডেপুটিবাবু তাকে গোপন নির্দেশ দিলেন।

পরোক্ষভাবে বাহাদুরের খানিকটা শাস্তিও হল। সে শুধু 'ষ্টার' নয়, 'স্পেশাল ষ্টার'; লেখাপড়া জানে; প্রেসের কাজে যে সম্মান ছিল, বাগানে তা নেই; জেলের মধ্যে যে অবাধ গতিবিধির অধিকার ছিল, বাইরে গিয়ে তার অনেকখানি খর্ব হল। ছেলেদের চোখে সে বেশ কিছুটা ছোট হয়ে গেল।

খাবার 'ফাইলে' বাহাদুরের সঙ্গে একবার চোখোচোখি হতেই দিলীপ সঙ্গেসঙ্গে চোখ নামিয়ে নিল। কেমন একটা লজ্জা ও সঙ্কোচ যেন তার মাথাটাকে নুইয়ে দিল। তার সঙ্গে কিসের খানিকটা অভিমান। এই পাহাড়ী ছেলেটাকে সে এরই মধ্যে অনেকখানি ভালবেসে ফেলেছিল। তার কোনো বড় ভাই নেই। যদি থাকত তাকেও হয়তো এই চোখেই দেখত। এ কী করেছে, সে সম্বন্ধে তার কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। এই পর্যন্ত জানে, কাজটা ভাল নয়। ভাল, মন্দ যাই হোক, সকলের আগে তারই কি জানবার অধিকার ছিল না?

কিন্তু বাহাদুর তাকে কিছুই বলেনি। এ কথাটা সে কিছুতেই ভুলতে পারছিল না।

খাবার পর, ভিড়ের হাত এড়িয়ে দেবদারু বীথিকার ধার দিয়ে দিলীপ বিষণ্ণ মনে একা একা একটু ফাঁকার দিকে যাচ্ছিল ; পেছন থেকে ডাক শুনে ফিরে দাঁড়াল। বাহাদুর এগিয়ে এসে ওর পিঠের উপর হাত রেখে মৃদু হেসে বলল, কি রে ? আমার ওপর রাগ করেছিস ?

দিলীপ সে কথার জবাব না দিয়ে বলল, 'তোমার নামে ওরা কী সব যা-তা বলছে, বাহাদুরদা।' বলতে বলতে চোখদুটো হঠাৎ ছলছল করে উঠল। সেটা লুকোবার জন্যে মাথা নীচু করে পেছন ফিরে দাঁড়াল।

বাহাদুরের মুখের উপর থেকে হাসির রেখা মিলিয়ে গেল, ফুটে উঠল গাম্ভীর্যের ম্লান ছায়া। দূরে মাঠের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বলল, বলুক গে। তুই কোন জবাব করিসনে। একটু ফুরসৎ পেলেই সব তোকে জানাবো।

গেটের পাশ থেকে বাগানী সিপাইএর হাঁক-ডাক শোনা গেল— 'এই, কোথায় গেলি রে তোরা ?' বাহাদুর ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, এখন চলি। কেমন ?

বাগানে তখন পুরো মরশুম চলছে। 'দফা' নিয়ে ফিরতে রোজই দেরি হয় বাগানীর। ঐ দিন এল প্রায় সন্ধ্যার মুখে। অন্য সব ছেলেরা তার আগেই খেয়ে নিয়েছে। ব্যারাকের সামনে খোলা মাঠে "সিনেমা" অর্থাৎ ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ দেখানো হবে। সকলের মুখেই উত্তেজনা। সেই কিম্ভুত যন্ত্রটা এসে গেছে। ছোটবড় সবাই সেখানে ভিড় জমিয়ে কলরব করছে। আর কোনদিকে কারো নজর নেই। পেটী অফিসাররাও ওদের সামলাতে ব্যস্ত। বাগানের ছেলেরা কোনো রকমে নাকে-মুখে দুটো গুঁজে নিয়ে ছুটে এসে দলে ভিড়ে গেল। দিলীপের চোখদুটো বাহাদুরকে খুঁজছিল, ইচ্ছা ছিল তার কাছে গিয়ে বসবে, কিন্তু কোথাও তাকে দেখতে পেল না। তারপর ছবি শুরু হতেই আর কিছু মনে রইল না। বাহাদুর তো তুচ্ছ, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তার চোখের সুমুখ থেকে লুপ্ত হয়ে গেল, দাঁড়িয়ে রইল শুধু একখানা সাদা রং-এর পরদা এবং তার উপরে একটি রূপকথার চলমান জগৎ। বসন্তের টিকা না

নিলে কী বিপদ ঘটে, কুইনাইন না খেলে একটা ছোট্ট মশা কী কাণ্ড বাধায়—এই সব দরকারী তথ্য নিয়ে ছবি। পাশে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক লম্বা লাঠির ছুঁচলো ডগা দিয়ে সেইগুলোই দেখাচ্ছিলেন এবং সেই সঙ্গে চলেছিল তার অনর্গল বক্তৃতা। দিলীপের কানে তার একটি বর্ণও যায়নি। মুগ্ধ চক্ষু মেলে সে শুধু দেখছিল; তন্ময় হয়ে ডুবে গিয়েছিল ঐ দ্রুত অপস্রিয়মান ছবিগুলোর মধ্যে। কে জানত এত বিস্ময়ও ছিল পৃথিবীতে!

এক সময়ে সব শেষ হয়ে গেল। পেছনে দাঁড় করানো যাতুযন্ত্রটা এতক্ষণ ধরে যে একটানা শব্দ করে চলেছিল, সেটা হঠাৎ থেমে গেল, ভদ্রলোক তাঁর বক্তৃতা থামিয়ে লাঠি নিয়ে সরে গেলেন। দিলীপ তখনো সেই রূপকথার রাজ্যে বিচরণ করছে। সহসা যেন কোন রূঢ় আঘাতে স্বপ্নের ঘোর থেকে জেগে উঠল। ভারী রাগ হল ঐ ভদ্রলোকের উপর। এত তাড়াতাড়ি শেষ করে দিলেন, আর একটু দেখাতে পারলেন না!

সকলের মুখেই 'সিনেমা'র তারিফ, কণ্ঠে আনন্দের উচ্ছ্বাস। তার মধ্যে শোনা যাচ্ছে চীফ অফিসারের হাঁক-ডাক। সবাই গিয়ে এবারে লাইন করে দাঁড়াতে হবে ব্যারাকের সামনে। সেখানে এক-তুই-তিন করে 'গুনতি' মেলানো হবে। তারপর যে যার ঘরে ঢুকে যাবে। ঠিক সংখ্যাটা যতক্ষণ না মেলে, কর্তৃপক্ষের তুশ্চিন্তা কাটে না, বিশেষ করে যেদিন সিনেমা দেখানো হয়। গেট খোলা থাকে, 'স্টাফ'-এর ছেলেমেয়েরা অবাধে আসতে পায়, তাদের বন্ধুরাও ভিড় করে। সাহেবের হুকুম আছে। ডেপুটি সুপার আইনের দিক থেকে আপত্তি করেছিলেন, 'সিকিউরিটি'র দোহাই দিয়েছিলেন। কোনোটাই টেঁকেনি। সাহেব তাঁর সেই বরাবরকার হাল্কা হাসিটা দিয়েই সব উড়িয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন 'আপনার আমার ছেলেগুলোর পকেটে না হয় কিঞ্চিৎ রেস্ত আছে, মাঝে মাঝে তু-একটা আসল সিনেমা দেখতে পায়। কিন্তু ওরা?—বলে, সেই বেঁটে লাঠিটা উঁচিয়ে ধরেছিলেন এক পাল ছেলে-মেয়ের দিকে, 'সিনেমার'-গন্ধ পেয়ে যারা ছুটে এসেছে তাঁরই কর্মীদের কোয়ার্টার থেকে। 'ওদের তো এইটুকুই সম্বল।' হঠাৎ কি মনে প্রশ্ন

করেছিলেন, 'এখানকার সিনেমার সবচেয়ে কমদামী টিকেটগুলো কত ক'রে জানেন ?'

—বোধ হয় পাঁচ আনা।

—তার মানে, ভর গোষ্ঠীর এক দিনের বাজার খরচ।

ডেপুটি বলেছিলেন, আর কিছু নয়, ভিড়ের মধ্যে দুটো-একটা যদি ভেগে যায়, এই ভাবনা।

—ভাবনা ওদেরও আছে। ভেগে যাবে কোথায় ? খাবে কী ?

এইখানেই বোধ হয় একটু ভুল করেছিলেন অভিজ্ঞ ও বহুদর্শী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। আহার ও আশ্রয়ের ভাবনাই মানুষের মনের প্রায় সবখানি জুড়ে থাকে, সন্দেহ নেই ; তবু তার বাইরেও এমন কিছু আছে, কোনো অন্তর্নিহিত তাড়না, যার আকস্মিক আবির্ভাব ঐ দুটো প্রবল চিন্তাকে এক মুহূর্ত আচ্ছন্ন করে ফেলে। তখন সে সব কিছু ভুলে অজানা অনিশ্চিতের গর্ভে ঝাঁপ দেয়, একবারও ভাবে না, কী খাবো কিংবা কোথায় থাকবো।

এমনি একটা বিরল অভিজ্ঞতা যে ঐ দিনই তার জন্যে অপেক্ষা করছিল, তিনি নিশ্চয়ই ভাবতে পারেননি। 'সিনেমা শো' ভেঙে যাবার পর মাঠ যখন ফাঁকা হয়ে গেছে, গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে সেই লাঠিওয়ালা ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প জমিয়েছিলেন। সন্তোষবাবুও ছিলেন তাঁর পাশে। হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল চীফ অফিসার। বাইরের লোক দেখে একবার একটু ইতস্ততঃ করল। ডেপুটি জিজ্ঞাসা করলেন, ও দিকে সব ঠিক আছে তো

—না স্যর। শুষ্ক মুখে জবাব দিল চীফ অফিসার।

—না মানে !

—একটা কম পড়ছে। বাহাদুরকে পাওয়া যাচ্ছে না।

ডেপুটির মুখে আর কথা সরল না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। চীফের রিপোর্ট সাহেবের কানে গিয়েছিল। অস্ফুটস্বরে 'সে কি !' বলে তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকলেন। সেদিকে চেয়ে ডেপুটি সুপার যেন হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন —'অ্যালার্ম' !

গ্রীন হাউসের ছেলেরা সবে কম্বলগুলো খুলে বিছানা পাতবার আয়োজন করছে, গেটের পেটা ঘণ্টায় ঢন ঢন আওয়াজ শুনে থমকে দাঁড়াল। যারা বেশী দিন ধরে আছে, সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'পাগলা ঘন্টি।' স্টার হাঁক দিল, 'জোড়ায় জোড়ায় বসে পড়।' দিলীপ 'পাগলা ঘন্টির' নাম শুনেছে, কিন্তু সেই ভয়াবহ বস্তুটির সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি। তার বুকের ভিতবটা অজান্তে কেঁপে উঠল। ততক্ষণে অনেকেই গিয়ে এক সারিতে দুজন-দুজন করে বসে পড়েছে হল-এর সামনেটায়। সেও তাদের দেখাদেখি একজনের পাশে গিয়ে বসল। একটু পরেই সহকারী চীফ অফিসার নোট বই আর পেন্সিল নিয়ে ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকল এবং দো, চার···ছয় বলে জোরে জোরে গণনা শুরু করল। সংখ্যাটা যখন খাতায় টুকে নিচ্ছে, লাইনের মাঝখান থেকে কে একজন বলে উঠল 'কে ভাগল?'

'উস্‌মে তোম্‌হারা কোন্ কাম হ্যয়?' চোখ পাকিয়ে, মুখ ভেংচে জবাব দিল সহকারী চীফ, এবং সঙ্গে সঙ্গে তেমনি ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল।

কিন্তু খবর চাপা রইল না। মিনিট কয়েকের মধ্যেই শুরু হল চাপা গলার গুঞ্জরন। অনেকের মুখেই গভীর বিস্ময়। বাহাদুরের পক্ষে এ যেন একেবারে অসম্ভব। দু-একজন বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে জানাল, এ তারা আগেই বুঝতে পেরেছিল। কেউ কেউ এই সুযোগে দিলীপকে খানিকটা খোঁচা দিয়ে গেল—"কিরে, তোর সঙ্গে এত ভাব; আর শেষটায় তোকে ফেলেই চলে গেল!" দিলীপ সাড়া দিল না। কথা বলবার মত মনের অবস্থা তার ছিল না।

পরদিন কানাঘুষার ভিতর দিয়ে আরেকটা আরো সাঙ্ঘাতিক খবর তার কানে এসে পৌঁছল—ব্যাণ্ড-মাষ্টারের মেয়েকেও গত রাত থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। বাহাদুরই যে ঐ মেয়েটাকে নিয়ে পালিয়েছে, এ বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই। বড় ছেলেগুলোর মধ্যে একটা দল বাহাদুরকে দেখতে পারত না। তারা রীতিমত উল্লসিত হয়ে উঠল। সিরাজুল আর সতীশ এই নিয়ে নানা কুৎসিত কথা রটিয়ে বেড়াতে লাগল। তাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হল দিলীপ, সামসুল এবং আরো কয়েকটি ছোট

ছেলে, বাহাতুর যাদের বিশেষভাবে ভালবাসত এবং ওদের সংশ্রব থেকে দূরে রাখবার চেষ্টা করত। দিলীপ একেবারে ভেঙে পড়েছিল। সতীশদের সব কথার মানে না বুঝলেও এটুকু বুঝবার বয়স তার হয়েছিল যে, এই মেয়েঘটিত ব্যাপারটা অত্যন্ত খারাপ, এবং পালোনোর চেয়ে বেশী গর্হিত কাজ করে গেছে বাহাতুর। তার সেই তুপুরবেলা বাইরে বেরিয়ে যাওয়া, গোপনে কাগজ, পেন্সিল, খাবার যোগানো, ব্যাণ্ড-মাষ্টারের বাড়ির দিকে তার গভীর আকর্ষণ, যে অজ্ঞাত কারণে তাকে হঠাৎ প্রেস থেকে বাগানে চালান দিলেন ডেপুটিবাবু—সবটাই একটা বিশ্রী রূপ নিয়ে দেখা দিল দিলীপের মনে। বাহাতুর যে বলি বলি করেও শেষ পর্যন্ত তার কাছে সব চেপে রেখেছিল, তার কারণ নিশ্চয়ই এই, যে সেটা বলবার মত নয়। ঐ মেয়েটার সঙ্গে তার সম্পর্ক কী, তার স্পষ্ট ধারণা না হলেও, সেটা যে মন্দ, এ বিষয়ে দিলীপের মনে আর সন্দেহ রইল না। অথচ এই বাহাতুরকে সে কত উপরে আসন দিয়েছিল। সেখান থেকে আরেকজনের এই অপ্রত্যাশিত পতনের আঘাত আজ যেন তারই বুকে এসে বাজল। এর মধ্যে যে লজ্জা জড়িয়ে আছে, সেও তার অংশীদার। এমন করে তার সব স্বপ্ন যে ভেঙে দিয়ে গেল, সেই পাহাড়ী ছেলেটার উপর দারুণ অভিমানে সমস্ত মন ভরে উঠল।

সামসুলের সঙ্গে দেখা হতেই সে বলল, এ আমি জানতাম। ঐ ডাইনীটাই ওকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে। ঐ তো ওদের কাজ। এমন ভাব করবে যেন কত ভালবাসে তোকে, তারপর কায়দা পেলেই ঘাড় মটকাবে।

বলতে বলতে কেমন নিবিষ্ট হয়ে পড়েছিল যেন কোন্ অতীত দিনের কোনো প্রত্যক্ষ দৃশ্যাবলীর মধ্যে। তারপর হঠাৎ বিচক্ষণ ব্যক্তির মত রায় দিয়েছিল, "অতটুকু ছেলের কাছে যা শুধু আশ্চর্য নয়, একান্ত অপ্রত্যাশিত—জানিস? মেয়ে জাতটাই বেইমান। ওদের কখনো বিশ্বাস করিস না।"

জীবনে ঠেকে শেখার চেয়ে বড় পাঠ আর কিছু নেই। অর্বাচীনকে সে রাতারাতি প্রবীণ বানিয়ে তোলে, বালকের মুখে যোগায় বৃদ্ধের বুলি।

বিচারক যখন কোন অপরাধীকে কারাদণ্ড দেন, সেই সঙ্গে সেই দণ্ডাদেশ প্রয়োগ করবার ভার ন্যস্ত করেন কারাগারের অধ্যক্ষের উপর। You are required to execute the sentence according to law. বর্ষ্টাল স্কুল, স্কুল হলেও কারাগার। এখানকার অধিবাসীরা দণ্ডিত বন্দী। একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ নিয়ে তারা আসে। তার থেকে যতটুকু মাফ প্রত্যেকের প্রাপ্য, বাদ দিয়ে, বাকী সময়টা তাদের ঐ বন্দীশালায় আটকে রাখার দায়িত্ব ওখানকার কর্তৃপক্ষের। সেটা লঙ্ঘন করা অপরাধ। নির্দিষ্ট কাল পার হবার আগে যদি কেউ পালিয়ে যায়, তার জন্যে সেই বন্দী যেমন দণ্ডনীয়, তেমনি তার নিরাপত্তার জন্যে যারা দায়ী, তাদেরও শাস্তি পেতে হয়। সুপারের কাজ হল সেই দায়িত্ব স্থির করা। তার আগে এই পলায়নের প্রাথমিক রিপোর্ট দাখিল করতে হবে পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কারাবিভাগের দপ্তরে।

খানিকক্ষণ ব্যর্থ খোঁজাখুঁজির পর সেই রাত্রেই সুপার তাঁর নিজের অফিসে বসে সেই রিপোর্টের খসড়া তৈরি করছিলেন। পাশে দাঁড়িয়ে ডেপুটি সন্তোষবাবু। দুজনের মুখেই দুশ্চিন্তার ছায়া। ছেলেটা শুধু পালিয়ে যায়নি, তাদেরই অধীনস্থ কোনো কর্মীর কোয়ার্টার্স থেকে একটা মেয়েকে নিয়ে উধাও হয়েছে। 'এসকেপ'-এর সঙ্গে অ্যাবডাকশন। পলায়নের সঙ্গে নারীহরণ। বর্ষ্টালের মুখে একরাশ কালি লেপে দিয়ে গেছে। সুপারের সব আক্রোশ গিয়ে পড়ল ঐ 'বুরবক' ব্যাণ্ড-মাষ্টারের উপর। এতদিন কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিল লোকটা? ওর বৌটাই বা কেমনধারা মানুষ? মা হয়ে বয়স্থা মেয়েকে একা ঘরে রেখে সিনেমা দেখতে এল বর্ষ্টালের মাঠে!

দরজার বাইরে শোনা গেল বিনীত গম্ভীর স্বর—একবার আসতে পারি, স্যর? ব্যাণ্ড-মাষ্টার বীরবাহাদুর। ও আবার কী চায়? সাহেব বললেন, 'এসো।' বীরবাহাদুর ঘরে ঢুকে মিলিটারী কায়দায় সেলুট করে দাঁড়াল। সাহেবের কণ্ঠে ফেটে পড়ল তাঁর মুহূর্ত পূর্বের রোষ—অ্যাদ্দিন কী করছিলে? আজ এসেছ মেয়ে চুরির নালিশ করতে।

—নালিশ করতে আসিনি, স্যর!

—তবে কী জন্যে এসেছ?

—বলতে এসেছি, আমার কোন নালিশ নেই। মেহেরবানি করে আমার মেয়েকে এর মধ্যে জড়াবেন না।

—তা কী করে হবে? ঝাঁজিয়ে উঠলেন সন্তোষবাবু। এত বড় একটা ব্যাপার আমরা চেপে যেতে পারি না। ঘটনাটা ঘটেছে বর্ষ্টাল স্কুলের হাতার মধ্যে।

বীরবাহাদুর কোনো জবাব দিল না, যেন শুনতেই পায়নি কথাগুলো। সাহেবের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল। সুপার কয়েক মুহূর্ত তার মুখের দিকে চেয়ে ধীর স্বরে বললেন, তুমি আলাদা ভাবে পুলিশ-কেস করতে চাও?

—জী না; পুলিশে আমি যাবো না।

—কিন্তু তোমার স্ত্রী যে বিশেষ করে বলে গেলেন ডেপুটিবাবুর কাছে—

—মেয়েলোকের কথা ধরবেন না, স্যর। সে যা-ই বলুক, আমি বলছি, আমার মেয়ের ভালমন্দ, মান ইজ্জত আমি বুঝবো। তা নিয়ে সরকারের কিছু করবার নেই। দয়া করে আমার পারিবারিক ব্যাপারে আপনারা হাত দেবেন না।

সুরটা অনুনয়ের হলেও, তার মধ্যে সুস্পষ্ট দৃঢ়তার আভাস। ডেপুটিবাবু আবার একটা কি বলতে যাচ্ছিলেন, সাহেব হাত তুলে বাধা দিলেন। এ স্বর তিনি চেনেন। অনেক দিন ঘর করেছেন এই অন্তরে-বাহিরে-জটিলতাহীন ফৌজী জাতটার সঙ্গে। ভালভাবেই জানেন, এদের মনে কোনো বাঁক নেই, সে চলে সরল রেখার সোজা পথ ধরে। এরা যা বোঝে, একবারেই বোঝে, তারপর অন্য কিছু বোঝাতে যাওয়া বিড়ম্বনা।

ঘোষসাহেব আর একবার তাঁর ব্যাণ্ড-মাষ্টারের মুখের দিকে তাকালেন; পেশী ও রেখায় একটা সংকল্পের ছাপ ছাড়া আর কিছু পড়তে পারলেন না। তার পিছনে নিশ্চয়ই কোনো ইতিহাস আছে, যা সে ব্যক্ত করতে চায় না। আর কোনো প্রশ্ন না করে শুধু বললেন, 'আচ্ছা, তুমি যাও।' ডেপুটিবাবুর দিকে ফিরে যোগ করলেন, 'শেষের লাইনকটা বাদ দিয়ে খালি এসকেপ রিপোর্টটা পাঠিয়ে দিন।'

বর্ষ্টাল স্কুলের যান্ত্রিক জীবন ধারায় যে-টুকু উচ্ছলতা ছিল, এই আকস্মিক দুর্ঘটনা তার প্রায় সবখানিই যেন একদিনে শুষে নিয়ে গেছে। অফিসে, ব্যারাকে, ওয়ার্কশপে এমন কি খেলার মাঠেও কেমন একটা থমথমে ভাব। যে-যার রুটিন বাঁধা কাজগুলো একটার পর একটা প্রায় নিঃশব্দে করে যাচ্ছে ; কোথাও কোনো চাঞ্চল্য নেই। বাহাদুরের উপরে যারা নানা কারণে বিরূপ ছিল এবং এই ব্যাপারটা নিয়ে প্রথম প্রথম বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, তারাও যেন হঠাৎ চুপসে গেছে।

স্কুল হিসাবে শিক্ষাবিভাগ বর্ষ্টালকে প্রাইমারী বা প্রাথমিক স্কুলের পর্যায়ে ফেলেছিলেন, কিন্তু আর একদিক দিয়ে তার মান ছিল হাইস্কুলের। উপযুক্ত বিবেচিত হলে এখানকার ছেলেদের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেবার অনুমতি ছিল। দীর্ঘ দিন সেটা সম্ভব হয়নি। তেমন ছেলে পাওয়া যায়নি। দিলীপকে যদি ঠিকমত তৈরী করা যায়, সে হয়তো একদিন, এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানকে বিশ্ববিদ্যালয় যে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন, তার যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারবে, এমনি একটা আশা অধ্যক্ষের মনে জেগে থাকবে। তাই তার পড়াশুনোর জন্যে কতগুলো আলাদা বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। আশুবাবুকে ডেকে বলেছিলেন, এ কাজটা আপনাকেই করতে হবে। পুরো ছ বছর সময় পাচ্ছেন ; পারবেন না ?

আশুবাবু ক্ষণকাল চিন্তা করে উত্তর দিয়েছিলেন, ঠিক বলতে পারছি না স্যর। তবে না-পারবার কোনো কারণ দেখি না। ছেলেটির মেধা আছে, পড়বার ও শিখবার আগ্রহ আছে, আর আমার দিক থেকে চেষ্টার কোনো ত্রুটি হবে না।

"তাহলেই হল"—যেন শুধু আশ্বস্ত নয়, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ, এমনি সুরে বলেছিলেন ঘোষসাহেব।

তারপর থেকে আশুবাবুর কাজ বেড়ে গিয়েছিল। স্কুলের রুটিন মত ক্লাস নেবার পর, অন্য ছেলেদের ছুটি হয়ে গেলে তিনি দিলীপকে নিয়ে তাঁর 'স্পেশাল ক্লাস' শুরু করতেন। ওরই মধ্যে এক ঘণ্টা ছিল হেডমাষ্টারের ইংরেজি ক্লাস।

বাহাদুর চলে যাবার পাঁচ-ছ দিন পর শূন্য স্কুল-বাড়ির কোণের দিকের একটা ঘরে দিলীপ আশুবাবুর কাছে বসে পড়ছিল। সেদিন-কার মত কাজ শেষ হলে বইখাতা গুছিয়ে নিয়ে চলে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই তিনি বললেন, তোমার একখানা চিঠি আছে।

—আমার চিঠি! বিস্ময়াবিষ্ট স্বরে এই দুটি কথা যেন অজ্ঞাতসারেই বেরিয়ে এল মুখ থেকে।

হ্যাঁ; এই নাও।

দিলীপ হাত বাড়াতে গিয়েও পারল না, বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মাষ্টারমশাই-এর মুখের পানে। এখানে অনেকের নামে চিঠি আসে, তাদের মা-বাবা-ভাই-বোনেদের কাছ থেকে। তার কোনোদিন আসে না। কে লিখবে? কে আছে তার? যে ছিল, একটি মাত্র মানুষ যে লিখতে পারত, সে হয়তো আজও পথে পথে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তবে কি এতদিন পরে—? আশুবাবুর গলা শোনা গেল। বোধ হয় ওর অন্যমনস্ক ভাবটা লক্ষ্য করে বললেন, বাহাদুর লিখেছে।

'বাহাদুরদা!' অস্ফুট কণ্ঠে কথাটা উচ্চারণ করে, সঙ্গে সঙ্গে ধার খোলা খামখানা যেন ছিনিয়ে নিল দিলীপ। ভাঁজ খুলেই পড়তে শুরু করল।

ভাই দিলীপ,

ভেবেছিলাম, আমার সব কথা তোকে একদিন বলবো। তার আর সময় হল না।

বুঝতে পারছি, ওখানে সকলেই আমাকে ছিঃ ছিঃ করছে। তুইও খুব দুঃখ পেয়েছিস। ওরা নিশ্চয়ই বলছে আমি একটা মেয়ে নিয়ে পালিয়ে গেছি। কিন্তু কেউ জানে না, ও আমার মায়ের পেটের বোন। ওকে বাঁচাবার জন্যেই, শুধু নিন্দা নয়, এত বড় একটা অপরাধের বোঝা আমাকে মাথায় তুলতে হল। পালানো ছাড়া আমার আর কোনো পথ ছিল না।

শুনে তুই অবাক হচ্ছিস নিশ্চয়ই—ব্যাণ্ড-মাষ্টার আমার বাবা, আমাদের মা নেই। এই বোনটাকে আমি কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি। কয়েক বছর পরে হঠাৎ বাবা আবার বিয়ে করে বসল।

আমাদেরও দুঃখের দিন শুরু হল। তারপর কি করে আমি জেলে গেলাম, সে সব কথা এখন থাক।

রন্‌মায়াকে ওরা পেট ভরে খেতে দিত না। যখন তখন মার-ধোর করত। মাঝে মাঝে লুকিয়ে একবারটি দেখে আসা ছাড়া আমার করবার কিছু ছিল না। তাও বন্ধ হয়ে গেল। সে সব তো তুই জানিস।

সেদিন হঠাৎ জানতে পেলাম, আমার সৎমা ওকে বিয়ে দেবার নাম করে বিক্রী করে দিচ্ছে তার এক মাতাল বদমাস আত্মীয়ের কাছে, আর বাবা সব জেনেও চুপ করে আছে। তারপর আর থাকতে পারিনি।

ওকে নিয়ে কোথায় কি অবস্থায় আছি, সে কথা তোকে জানাতে পারবো না। ওর একটা ব্যবস্থা করতে পারলেই, আমি ফিরে গিয়ে ধরা দেবো। দোষ করেছি তার শাস্তি অবশ্যই নিতে হবে।

কত কথা বলবার রইল। যদি কোনোদিন সুযোগ পাই, সেদিন জানাবো।

স্কুলের ঠিকানায় লিখলে আমার চিঠি ওঁরা তোকে না-ও দিতে পারেন। তাই মাষ্টারমশাই-এর নামে পাঠালাম। তিনি আমাদের দুজনকেই ভালবাসেন। তাঁর হাতে যদি পৌঁছয়, তুই নিশ্চয়ই পাবি।

ওঁকে আমার প্রণাম দিস।

বাহাদুরদা।

আশুবাবু নিঃশব্দে অপেক্ষা করছিলেন। ঐ সঙ্গে দু-লাইন তাঁকেও লিখেছে বাহাদুর—দয়া করে চিঠিখানা দিলীপকে দেবেন ; আর সেটা যদি সম্ভব না হয়, যেটুকু তাকে জানানো প্রয়োজন মনে করেন, জানালে কৃতজ্ঞ হব।

দিলীপ পড়া শেষ করেই বলল, আপনি পড়েছেন, স্যর ?

তিনি মৃদু হেসে জবাব দিলেন, তোমার চিঠি ; আমি কেন পড়বো ? কী লিখেছে ?

—পড়ে দেখুন। আমি জানি, বাহাদুর কোনো দোষ করতে পারে না। এখনই গিয়ে সবাইকে এ চিঠি দেখাবো।

আশুবাবু লাইনকটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মাথা নেড়ে বললেন, তার দরকার নেই। তোমার যদি ইচ্ছা হয়, সাহেবকে দেখাতে পার।

—আমি এখ্‌খনি যাচ্ছি।

ছুটে বেরোতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। ছেলেদের নামে যে-সব চিঠি আসে প্রথমে অফিসে খোলা হয়। একজন কেরানীবাবু সেগুলো পড়ে দেখেন; তারপর মস্ত বড় একটা 'সিল' মেরে সাহেবের সই নিয়ে যার চিঠি তাকে ডেকে পাঠিয়ে বিলি করেন। এ নিয়ম সে জানে। কিন্তু এখানে তার কোনোটাই হয়নি। সাহেব যদি রেগে যান?

আশুবাবু তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, কী হল? দিলীপ ভয়ে ভয়ে চোখ তুলল। যে-কথাটা মনে এসেছিল সঙ্গে সঙ্গে বলতে পারল না। চিঠিখানা শুধু একবার উল্টে দেখল। তার থেকেই তিনি অনুমান করে নিলেন। এই মুখগুলোর প্রতিটি রেখা, চোখের প্রতিটি ভাষা তাঁর মুখস্থ হয়ে গেছে। আশ্বাসের সুরে বললেন, সাহেব যদি জিজ্ঞেস করেন, কোত্থেকে পেলে এই চিঠি, কেমন করে পেলে, সত্যি কথাই বলো। তাতে তোমার কোনো ভয় নাই।

দিলীপের সমস্ত মুখখানা খুশির আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বইগুলো টেবিলের উপর ফেলে বিদ্যুদ্বেগে ছুটে বেরিয়ে গেল।

এর আগে সাহেবের কাছে সে নিজে থেকে কখনো কোনো ব্যাপার নিয়ে যায়নি। এই বিপুলকায় ব্যক্তিটিকে ঘিরে তার প্রথম দিনের সেই ভয় তখনো সবখানি কাটেনি। সেই মুহূর্তে কে তার মনে এই দুর্জয় সাহস এনে দিল, সে নিজেই জানে না। ঊর্ধ্বশ্বাসে মাঠ পার হয়ে সুপারের অফিসের সামনে পৌঁছতেই, গেটকীপার হেঁকে উঠল, কী চাই? তার আগেই সে পরদা ঠেলে ঘরে ঢুকে পড়েছে। সাহেব চোখ তুলে চাইতেই এগিয়ে গিয়ে বলল, বাহাদুর চিঠি লিখেছে, স্যর।

ঘোষসাহেবের দুচোখে বিস্ময় ফুটে উঠল, বাহাদুর চিঠি লিখেছে! কোথায়?

দিলীপ চিঠিখানা টেবিলের উপর রাখল। তুলে নিয়ে এপিঠ ওপিঠ দেখে বললেন, তোমার চিঠি!

—হ্যাঁ, স্যর।

—কে দিলে তোমাকে?

—মাষ্টারমশাই দিয়েছেন। তাঁর নামে এসেছে কিনা?

—কোন্ মাষ্টারমশাই?

—সেকেণ্ড স্যর!

চিঠি পড়তে পড়তে সুপারের কপালে কুঞ্চন দেখা দিল। বাঁ হাতে 'কলিং বেলটা' বাজিয়ে দিলেন এবং গেটকীপার এসে দাঁড়াতেই বললেন, আশুবাবু।

আশুবাবু জানতেন তাঁর ডাক পড়বে। দিলীপের পিছন পিছন গেটে এসে ও-দিকের অফিসে অপেক্ষা করছিলেন। সাহেবের ঘরে পা দিতেই তিনি দিলীপকে বললেন, আচ্ছা, তুমি এখন যাও। চিঠিটা আমার কাছে রইল। পরে পাঠিয়ে দেবো।

আশুবাবুর দিকে ফিরে বললেন, এ যে দেখছি রীতিমত তাজ্জব ব্যাপার। আপনি জানতেন কিছু?

আশুবাবু মাথা নেড়ে জানালেন, না। 'কলিং বেল'-এ আর একবার আঘাত পড়ল। ব্যাণ্ড-মাষ্টারের জরুরী তলব।

বীরবাহাদুর কদিনের ছুটি নিয়েছিল, কিন্তু বাসা থেকে বেরোত না। মিনিট কয়েকের মধ্যেই ধীরভাবে এসে দাঁড়াল টেবিলের ওপারটায়। তার সেই চিরাভ্যস্ত মিলিটারী কুর্ণিশের কোনো ব্যতিক্রম ঘটল না, কিন্তু দাঁড়াবার ভঙ্গিটা আজ যেন তেমন ঋজু নয়, মাথাটা নুয়ে পড়ছে বুকের উপর। মুখ দেখে এদের মনের খবর পাওয়া বড় কঠিন, কিন্তু এই মুহূর্তে যে একটি বিষণ্ণ-গম্ভীর ছায়া সেখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সেটা সহজেই চোখে পড়ে। সাহেব ক্ষণকাল নিবিষ্ট মনে সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, গোটাকয়েক কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, বীরবাহাদুর। আশা করি ঠিক ঠিক জবাব দেবে।

—বলুন স্যর, তেমনি নীচের দিকে চেয়েই উত্তর দিল ব্যাণ্ড-মাষ্টার।

—ঐ ছেলেটা তোমার কে হয়?

বীরবাহাদুর জিজ্ঞাসা করতে পারত কোন্ ছেলেটা, অনাবশ্যক বলেই করল না। সোজাসুজি জবাব দিল, আমার ছেলে।

দুজনেই বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালেন। এমন দ্বিধাহীন দ্রুত উত্তর বোধহয় আশা করেননি। সাহেবের দ্বিতীয় প্রশ্ন শোনা গেল, সে কথা এতদিন চেপে রেখেছিলে কেন?

বীরবাহাদুর সাড়া দিল না, মাথাও তুলল না, যেমন ছিল তেমনিভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। সুপার তিক্ত স্বরে বললেন, জেলখাটা ছেলের বাপ বলে পরিচয় দিতে লজ্জা হচ্ছিল বুঝি?

বীরবাহাদুর মাথা তুলে তাকাল। শান্ত কণ্ঠে বলল, আপনি মনিব। আপনার কাছে মিথ্যে বলবো না। যদিও ছেলে আমার চুরি ডাকাতি করে জেলে আসেনি, যে জন্যে এসেছিল, তার জন্যে আমিই অনেকখানি দায়ী, তবু দশজনে আঙুল দেখিয়ে বলবে, ওটা ব্যাণ্ড-মাষ্টারের ছেলে, ভাবতেই মনটা কেমন ছোট হয়ে যেত। বলি বলি করেও বলতে পারিনি।

—'আশ্চর্য!' ক্ষুব্ধ কিন্তু নিম্নস্বরে যেন আপন মনে বললেন সুপার। বীরবাহাদুর সেদিকে কান দিল না, ধীরে ধীরে আগেকার সূত্র ধরে বলল, কিন্তু তারপর যে-লজ্জা আমাকে সে দিয়ে গেল, তার কাছে এই জেলে-আসাটা কিছুই নয়। আজ আর আমি মাথা তুলতে পারছি না, সাহেব।

—পালিয়ে গেছে বলে?

—না, স্যর, শুধু পালিয়ে গেছে বলে নয়।

—তবে? নিজের বোনকে সঙ্গে নিয়ে গেছে; তার মধ্যে লজ্জার কী আছে?

—কেন নিয়ে গেছে, তা তো আপনারা জানেন না, স্যর। বাপের হাত থেকে ছোট বোনটাকে বাঁচাবার জন্যে। আমি সেই বাপ—সে-লজ্জা আমি ঢাকবো কী দিয়ে!

সাহেব এবং আশুবাবু—দুজনেরই মনে পড়ল দিলীপকে লেখা বাহাদুরের চিঠির সেই কটি লাইন। বলবার মত কিছু খুঁজে পেলেন না। ফৌজ থেকে অসময়ে অপসারিত এই অসহায়, নিরুপায়, ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যাণ্ড-মাষ্টারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বীরবাহাদুর তার সেই ফৌজী ভঙ্গিতে দু-কদম সামনে এগিয়ে গেল। বুক পকেট থেকে বের করল একখানা চার ভাঁজ-করা ফুলস্ক্যাপ কাগজের অর্ধসীট, দুহাতে ভাঁজ খুলে টেবিলের উপর বিছিয়ে দিয়ে ফিরে এল তার আগেকার জায়গায়। তারপর সোজা হয়ে স্যালুঠ করে দাঁড়াল। সুপার এক নজরে সেই কাগজখানা দেখে নিয়েই বিস্ময়ের সুরে বললেন, চাকরি ছেড়ে দিচ্ছ!

—হ্যাঁ, সাহেব। অনেকবার ভেবেছি, ছাড়ব; পারিনি। পনর বছর ব্যাগপাইপ বাজিয়ে বুকটা ঝাঁজরা হয়ে গেছে। বুড়ো বয়সে কোথায় যাবো, কী খাবো—এই ছিল ভাবনা। কিন্তু আজ আর তা ভাবলে চলে না।···আর একটা আরজি আছে স্যর। দরখাস্তটা মঞ্জুর হতে যদি কদিন সময় লাগে, মেহেরবানি করে তদ্দিন আমার ছুটিটা বাড়িয়ে দেবেন।

কয়েক মুহূর্ত ছেদ পড়ল। তারপর আবার শোনা গেল তার মৃদু গম্ভীর স্বর—না জেনে অনেক কসুর হয়তো করেছি আপনার কাছে, অনেক গাফিলতি দেখিয়েছি, তার জন্যে মাপ করবেন।

শেষ দিকে গলাটা একটু ভারী হয়ে উঠল। আশুবাবু অন্যদিকে মুখ ফেরালেন। সাহেব বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। খট্ করে জুতোর শব্দ কানে যেতেই চোখ তুলে দেখলেন, অ্যাবাউট্ টার্ণ করে বীর বাহাদুর বেরিয়ে যাচ্ছে।

মাস তিনেক পরে দিলীপ একদিন শুনল বাহাদুর ধরা পড়েছে ধরা দেবার জন্যে সে নিজেই আসছিল বর্ষ্টাল স্কুলের অধ্যক্ষের কাছে গঙ্গা পার হয়ে এপারে আসতেই একজন পুলিশের হেড কনেষ্টবল চিনতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে গেছে। থানা থেকে সেণ্ট্রাল জেলে। খবর পেয়ে সাহেব তাকে বর্ষ্টালে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেছিলেন। বর্ষ্টাল স্কুলস্ এ্যাক্ট্-এর ধারা উল্লেখ করে এস্, ডি, ও-কে লিখেছিলেন, এখান থেকে কোনো ছেলে যদি পালিয়ে যায়, পুলিশের কাজ হল সেই পলাতক 'ইন্‌মেট্'কে অ্যারেষ্ট্ করে স্কুল-হেফাজতে পৌঁছে দেওয়া। তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করা বা না করা—সেটা স্থির করবেন বর্ষ্টালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

পুলিশের তরফে সে বিষয়ে বিশেষ আপত্তি না থাকলেও, এস, ডি, ও, রাজী হননি। উত্তরে জানিয়েছিলেন, আসামী যে শুধু ল-ফুল কাষ্টডি থেকে পালিয়ে গেছে, তাই নয় নারীহরণের মত জঘন্য অপরাধের দায়ে সে অভিযুক্ত। বিচারসাপক্ষে জেল-হাজতই তার উপযুক্ত স্থান। তার হয়ে বর্ষ্টাল স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ওকালতি করছেন, এটা খুবই বিস্ময়কর।

শেষের দিকে কিঞ্চিৎ বিদ্রূপ মিশিয়ে যোগ করেছিলেন, সেন্টিমেণ্ট্ জিনিসটা ভাল; কিন্তু তার অপপ্রয়োগ বা অতিপ্রয়োগ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া দরকার। বিশেষ করে একজন দায়িত্বশীল সরকারী কর্মচারীর পক্ষে এই জাতীয় ভাবপ্রবণতা একান্ত অবাঞ্ছনীয়।

চিঠি পেয়েই ঘোষ সাহেব ডিষ্ট্রিক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেটের বৈঠকখানায় ধাওয়া করেছিলেন এবং আসল ঘটনাটাও খুলে বলেছিলেন। তাতে কোনো ফল হয়নি। প্রশাসনিক ব্যাপারে এস, ডি, ও, কালেকটরের অধীন হলেও একজন ফার্ষ্ট ক্লাস্ ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে তাঁর এলাকার বাইরে। সেখানে তিনি হাত দিতে পারেন না। এর পরে নিষ্ফল ক্ষোভ বুকে চেপে চুপ করে যাওয়া ছাড়া অধ্যক্ষসাহেবের আর কোনো পথ রইল না।

—সাত—

বস্তির অলিতে-গলিতে যে হরেকরকম মানুষের বাস, তার মধ্যে এরকম ভারবাহী জীব আছে, যার নাম 'ওয়ালা'। আগর-ওয়ালা ঝুনঝুনওয়ালা নয়, (তাঁরা থাকেন বড়বাজারের প্রাসাদচূড়ায়), মুড়িওয়ালা, ডালওয়ালা, পাঁপড়ওয়ালার দল। তাদের কর্মক্ষেত্র শহর, আস্তানা শহরতলী। ওখানকার রাস্তায় সারাদিন টহল দিয়ে আর গলা ফাটিয়ে এখানকার গলিতে এসে খোলার ঘরে রাত কাটায়। এছাড়া আর দু'জন ওয়ালা আছে; বস্তির বাসিন্দা না হলেও বস্তি-বাসীর বুকের উপর তাদের দিবারাত্রির আসন। তারা হল—পাহারাওয়ালা আর বাড়িওয়ালা; পুলিশ ও মালিক; শান্তিরক্ষক ও আশ্রয়দাতা। কিন্তু সেই রক্ষণ ও আশ্রয়ের জন্যে নিশ্চিন্ত হওয়া দূরে থাক, তাদের নাগাল থেকে কী করে দূরে থাকা যায় এখানকার ছেলে-বুড়ো তাই ভেবেই অস্থির।

বস্তি থেকে একটা ছোট ছেলে দিন-দুপুরে উধাও হয়ে গেল,—গরিব ব্রাহ্মণ-বিধবার একমাত্র ছেলে—এ নিয়ে আশেপাশের লোকগুলো একেবারে নিশ্চেষ্ট ছিল, একথা বলা চলে না। রাস্তায়, পার্কে, হাসপাতালে, ভিখারীদের আড্ডায় এবং আরো অনেক সন্দেহজনক জায়গায় ব্যাপক খোঁজাখুজির পালা বেশ কিছুদিন ধরে চালিয়ে এটা যে ছেলেধরার কীর্তি, এই ধারণাটাই শেষ পর্যন্ত দৃঢ়তর হল। একটা জায়গা তারা সাবধানে এড়িয়ে গিয়েছিল, সেটি পুলিশ-থানা। 'ডায়েরী করার' প্রস্তাবটা কারো কারো মুখে শোনা গেলেও সাধারণভাবে সমর্থন পায়নি। বিদেশী শাসকের পুলিশ। তাকে পীড়নের যন্ত্র ছাড়া অন্য কোনোরূপে তখনো এরা দেখতে শেখেনি। সাধ করে তার কবলে কে পড়ে? তাছাড়া 'স্বদেশী' হাঙ্গামার যুগ। কোথা থেকে কী সূত্র ধরে কোন্ ফ্যাসাদ এসে পড়বে কেউ বলতে পারে না।

সুবিপুল শোকের মধ্যে এক ধরনের বৈরাগ্য আছে। মন সব কিছুতে নিরাসক্ত হয়ে পড়ে। নির্মলার তখন সেই অবস্থা। সারাজীবন

ধরে একটার পর একটা আঘাত তাকে সইতে হয়েছে। বারবার পড়ে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছে। দুর্ভাগ্যের কাছে নতি স্বীকার করেনি। এবারে যখন চরম আঘাত এসে পৌঁছল, আর উঠতে ইচ্ছা হল না। মনে হল, করবার আর কিছু নেই। যে তীক্ষ্ণ বেদনাবোধ মানুষকে চুপ করে থাকতে দেয় না, ঠেলে তুলে দেয়, সেটা তার চলে গিয়েছিল। দেহের কোনো অঙ্গে ক্রমাগত ঘা দিতে থাকলে কিছুক্ষণ পরে সেখানটা অসাড় হয়ে যায়। দেহের অন্তরে যে মন, তার বেলাতেও তাই। নির্মলার মনে সেদিন কোনো সাড়া ছিল না।

খোকা চলে যাবার পর কিছুদিন সে ঘর ছেড়ে একবারও বাইরে যায়নি। রান্নাঘরের দরজা খোলেনি। বিন্নুর মা আসতেন, জোর জুলুম করে দুটো খাইয়ে যেতেন। অন্যান্য বাড়ির মেয়েরাও কেউ কেউ এবেলা ওবেলা ঘুরে যেত। নানা কথা বলে সাহস সান্ত্বনা দিত। হারু ছেলেটা বড় মুষড়ে পড়েছিল। তার মাও এসে দাঁড়িয়েছে কবার, কিন্তু কি বলবে, কি করবে, ভেবে পায়নি। এতটা যে গড়াবে কেমন করে জানবে সে? এ কেমন ধারা ছেলে! মা একটু গায় হাত তুলেছে বলে ঘর ছেড়ে চলে যাবে! তার ছেলেকে তো সে দুবেলা দূর দূর করছে, কখনো বা মেরে আধমরা করে দিচ্ছে। খানিকক্ষণ কান্নাকাটি চেঁচামিচি করে, ঘণ্টাখানেক গা ঢাকা দিয়ে থাকে, তারপর আবার যে কে সেই। দুপাক ঘুরে এসেই বলবে, 'মা, ভাত দাও।' এ ছেলে গেল কোথায়!

যে যা বলত, নির্মলার কাজ ছিল শুধু নিঃশব্দে শুনে যাওয়া। ভালো কথায় সায় দিত না, মন্দ কথারও প্রতিবাদ করত না। বেশীরভাগ সময় চুপ করে শুয়ে থাকত।

তারপর একদিন আবার তাকে উঠতে হল। বিন্নুর মার সংসারে বোঝা বাড়িয়ে আর কতদিন চলে? এমনিতেই তাদের ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। যে-রান্নাঘরের পাট চুকে গেছে বলে ধরে নিয়েছিল, আবার গিয়ে বসতে হল তার উনুনের ধারে। যাহোক দুটো ফুটিয়ে নিয়ে মুখে না দিয়েও পারল না। দেহ যতক্ষণ আছে, তার প্রয়োজন মিটিয়ে যেতে হবে। এরই নাম প্রাণ-ধারণের দায়। ধড়ে প্রাণ থাকতে তার হাত থেকে কারো রেহাই নেই।

ঘরে বসে থাকলেও চলে না। পুঁজিপাটা বলতে যৎসামান্য যা কিছু ছিল সব তুদিনেই শেষ হয়ে গেল। এবার নতুন করে জীবিকার সন্ধানে বেরোতে হবে। আবার সেই দোরে দোরে ধর্ণা দেওয়া—ওগো ঝি রাখবে তোমরা? এতদিন খোকা ছিল। তার জন্যে সব দীনতা সে সয়ে নিয়েছে। উঞ্ছবৃত্তির হীনতা গায়ে মাখেনি। আশা ছিল, কদিন আর? খোকা বড় হলে আর তাকে পরের তুয়ারে ঘুরতে হবে না। আজ সে আশা নির্মূল হয়ে গেছে। তবু তাকে গিয়ে দাঁড়াতে হবে ঔদ্ধত্যের, অবজ্ঞার কাছে, হাত পেতে নিতে হবে তাচ্ছিল্যের অন্ন; শুধু নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে। এর চেয়ে বড় গ্লানি আর কী আছে?

বিন্নুর মা প্রায়ই এসে পীড়াপীড়ি করতেন, একটা কিছু কর। হাত পা কোলে করে কদ্দিন আর বসে থাকবি? ছেলে তো নয়, পেটের শত্তুর। তার জন্যে ভেবে ভেবে শরীরপাত করে কী লাভটা হবে শুনি। বাঁচতে হবে তো?

—বেঁচেই বা আমার কী লাভ হবে দিদি?

—মরণ কি চাইলেই আসে রে? আমাদের যে কাছিমের প্রাণ।

সেই পুরনো সান্ত্বনা। নির্মলা আর কথা বাড়াল না, চুপ করে রইল। সেদিন যেন একটা অন্য সুর শোনা গেল বিন্নুর মার মুখে। বললেন, আমার বড় ছেলেটাকে তুই দেখিসনি। সাত বছরে পড়তেই কী যে কাল রোগ ধরল! হাত-পাগুলো কাঠি, পেটটা ঢাকের মত। ডাক্তার বলল, বেশী করে ফলের রস আর ছানা খেতে দিন। কোথায় পাবো? তুবেলা তুটো ডাল-ভাত জোটাতে পারি না, তায় ছানা আর ফল! পুরো একটা বছর ভুগে ভুগে যেদিন চলে গেল, কি মনে হয়েছিল জানিস? মনে হয়েছিল, ছেলে আমাকে মুক্তি দিয়ে গেছে। রাত পোহালে তার ভাবনা আর ভাবতে হবে না।

বলতে বলতে, দীর্ঘদিন পিছনে ফেলে আসা সেই রাত্রিটির মধ্যে যেন তলিয়ে গেলেন বিন্নুর মা। কিছুক্ষণ পরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে নির্মলার দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, তোর সে সান্ত্বনা নেই। তোর ছেলে তো তোকে মুক্তি দিয়ে যায়নি। যতদিন বাঁচবি, তোকে যে তারই জন্যে তৈরী হয়ে বসে থাকতে হবে।

নির্মলা চমকে উঠল। এ যেন তারই অন্তরের প্রতিধ্বনি। আশা অবিনশ্বর। তার মৃত্যু নেই। অন্ধকার প্রান্তরে একটি দূরাগত ক্ষীণ দীপশিখার মত কদিন আগেই সে ধীরে ধীরে নির্মলার বুকের মধ্যে দেখা দিয়েছিল। বিনুর মার শেষ কথাটি যেন সেই সলতেটাকে একটুখানি উসকে দিয়ে গেল। তাকে বাঁচতে হবে। খোকা ফিরে আসুক আর না-ই আসুক, তারই জন্যে তাকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে।

বাইরের দরজার ঝাঁপটা ভেজানো ছিল। তার উপরে কার হাতের শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে অচেনা গলার হাঁক—'চিঠি আছে'। ধড়মড় করে উঠে বসল নির্মলা। লুটিয়ে পড়া আঁচলখানা কোনোরকমে গায়ে জড়াতে জড়াতে ছুটে গেল দোরগড়ায়। নিশ্চয়ই খোকার চিঠি! সে ছাড়া আর কে আছে তার? কে পাঠাবে চিঠি! বিনুর মাও ব্যস্ত-ভাবে তার পিছনে এসে দাঁড়ালেন। ততক্ষণে একটানে দরজা খুলে পিওনের হাত থেকে চিঠিখানা যেন কেড়ে নিয়েছে নির্মলা। ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে আছে সেই দিকে। চিঠি নয়, কোণের দিকে সুতো দিয়ে গাঁথা তুখানা ছাপানো কাগজ। 'বাকী ভাড়ার নালিশ করেছে বাড়িওয়ালা' গম্ভীরভাবে জানিয়ে দিল আদালতের পিওন, 'এটা সেই পরোয়ানা। আপনারই নাম তো নির্মলা ভট্টাচার্য? নিন, সই করুন।'

কাঁধে ঝোলানো ব্যাগের ভিতর থেকে একটা দোয়াত বের করে, কলমের ডগাটা তার মধ্যে ডুবিয়ে বাড়িয়ে ধরল নির্মলার দিকে।

তিন মাসের ভাড়া দেওয়া হয়নি। বাড়িওয়ালার সরকার গত মাসেই শাসিয়ে গেছে, বাড়ি না ছাড়লে নালিশ করবে। নির্মলার খেয়াল ছিল না। ভুলেই গিয়েছিল, পৃথিবী বসে নেই। সে যখন তার নিজের তুঃখের কোটরে চোখ বুজে পড়ে আছে, বাইরের তুনিয়া তার সেই পুরনো পথ ধরেই এগিয়ে চলেছে। সে অমোঘ নীতির একচুল পরিবর্তন হয়নি। তোমার তুর্ভাগ্য একান্তভাবে তোমার। সেদিকে তাকিয়ে সংসার তার দাবি ছাড়বে কেন?

বিনুর মা জিজ্ঞাসা করলেন, কত টাকা বাকী?

—'ছটাকা!' কাগজ তু'খানার দিকে চোখ রেখেই বলল নির্মলা।

অঙ্কটা শুনে আর দ্বিতীয় কথা নয়, শুধু একটা ভীতিমূলক শব্দ

বেরিয়ে এল বিনুর মার গলা থেকে। এর পরের পর্বগুলো দুজনের কারোই অজানা নেই। বস্তির ঘরে ঘরে অহরহ সে দৃশ্য ঘটছে। টাকা দিতে না পারলে ঐ পিওন আবার আসবে এবং সেবারে তার হাতে থাকবে মালক্রোকের পরোয়ানা। মাঝখানে দিন কয়েকের বিরতি, তারপর পেয়াদা এসে টেনে বার করবে 'অস্থাবর' বলতে যা কিছু আছে তোমার ঘরে—ভাতের হাঁড়ি, জলের গেলাস, পরণের কাপড়। ছ'মাসের শিশুর দুধের ঝিনুকটাও বাদ যাবে না। তাতেও যদি পাওনা আদায় না হয়, লাঠি হাতে দর্শন দেবে বাড়িওয়ালার ভোজপুরী দরোয়ান। বাকী সম্বল যেটুকু পড়েছিল—বাক্স, পেটরা, কাঁথা, কম্বল সব চলে যাবে রাস্তায়। তার সঙ্গে ভাড়াটেকেও যেতে হবে, স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে। একটাবেলা না পেরোতেই সেই ঘরে আবার দেখা দেবে নতুন মুখ, শুরু হবে নতুন ঘরকন্না।

বস্তিজীবনের দুদিকে এই দুই ওয়ালা—পাহারাওয়ালা আর বাড়িওয়ালা। একজনের হাত থেকে রক্ষা পেলেও, আর একজনের কবল থেকে নিষ্কৃতি নেই। নির্মলার ভাগ্যাকাশে উভয়ের সমবেত আবির্ভাব। প্রথম জন কেড়ে নিয়েছে তার ছেলে, এবার দ্বিতীয় এসে হাত বাড়াল তার মাথা গুঁজবার আশ্রয়টুকুর দিকে।

কদিন আগে হলেও নিজেকে সে এই ভাগ্যের হাতেই ছেড়ে দিত। মনে মনে বলত, যা হয় হোক, করবার আর কিছু নেই। কিন্তু আজ মনে হল এই বাসাটুকু তার যেমন করে হোক, বাঁচিয়ে রাখতে হবে; সেইসঙ্গে নিজেকেও। এবার থেকে শুরু হবে তার অন্তহীন প্রতীক্ষা। কিন্তু এই আসন্ন সমস্যার সমাধান হবে কেমন করে? এতগুলো টাকা আসবে কোথা থেকে?

হঠাৎ মনে পড়ল, তার পুরনো মনিব বাড়িতে মাইনে বাবদ কিছু পাওনা রয়ে গেছে। চার টাকার মত হবে। আপাততঃ তাই দিয়েই হয়তো বাড়িওয়ালাকে ঠেকানো যেতে পারে। তার পর বলে কয়ে ঐ কাজটাই যদি আবার পাওয়া যায়, বাকী দুটো টাকা আগাম চেয়ে নেবে। 'আগাম' কথাটা মনে আসতেই নির্মলার বুকের ভিতরটা তোলপাড় করে উঠল। আরেকজনের মুখে এই শব্দটা শুনেই সেদিন তার ধৈর্যের বাঁধ

ভঙ্গে গিয়েছিল, জিহ্বারও কোনো অর্গল ছিল না। মূঢ়ের মত চিৎকার করে বলেছিল, আগাম বলে ভিক্ষা চাইতে লজ্জা করে না? তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার ইচ্ছাকেই মেনে নিয়েছিলেন। আগাম চাইতে যাননি, তারই অন্যায় জিদের কাছে বিসর্জন দিয়েছিলেন তাঁর চিরজীবনের আদর্শ। অদৃষ্টের কী পরিহাস! আজ সে নিজেই চলেছে মনিবের কাছে আগাম চাইতে!

বিনুর মা বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। নির্মলা তাড়াতাড়ি দরজায় শিকল তুলে দিয়ে বাইরের ঝাঁপটা ভেজিয়ে রেখে তাঁকে গিয়ে বলল, ওদিকটায় একটু নজর রাখবেন দিদি। আমি চট করে একবার ঘুরে আসি।

—কোথায় যাচ্ছিস এত বেলায়?

—দেখি, সেই টাকা কটা পাওয়া যায় কিনা।

—ও বেলায় যাস। এখন বেরোলে রান্না করবি কখন?

—না, দিদি, মনে যখন পড়ল, কাজটা সেরেই আসি।

বলতে বলতে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল। বিনুর মা সেইদিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলেন, কদিন আগে এই টাকার কথা তিনিই ওকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। নির্মলা তাচ্ছিল্যভরে জবাব দিয়েছিল, থাকগে, ওর জন্যে আর ওখানে যেতে ইচ্ছে করে না।

বিনুর মার হাতে কোনো কাজ ছিল না। রান্নাবান্নার পাট অনেক আগেই সেরে ফেলেছেন। স্বামী খেয়েদেয়ে কাজে বেরিয়েছেন, ছেলে স্কুলে। নির্মলা যখন গলির বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল, তারপরেও অনেকক্ষণ বাইরের দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে রইলেন। ফাঁকা রাস্তা। পুরুষেরা যে যার জীবিকার ধাঁধায় বেরিয়ে পড়েছে, মেয়েরা ভিতরে—কেউ বাকী রান্নাটা সেরে রাখছে, কেউ খাওয়া-দাওয়া মিটিয়ে ফেলছে। মাঝে মাঝে কচি ছেলের কান্না, আর মায়েদের চিৎকার ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। কলের জল চলে গেছে; সেখানটাও জনহীন।

বিনুর মার হঠাৎ নজরে পড়ল, শহরের দিক থেকে তুজন পুলিশের লোক কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছে এবং এদিক ওদিক তাকিয়ে কিছু একটা বোধহয় খুঁজছে। ওদের দেখেই তুচোখে বিরক্তি এবং তার

সঙ্গে কিছু আশঙ্কাও ফুটে উঠল। তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে সরে যাবেন এমন সময় একজন পুলিশ বলে উঠল, 'ওগো বাছা, শুনছ?' বিনুর মা বাধ্য হয়েই দাঁড়ালেন। লোকটি এগিয়ে এসে বলল, এখানে খোকার মা বলে কেউ থাকে?

বিনুর মার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। পুলিশের লোক যখন খোঁজ করতে এসেছে, নিশ্চয়ই কোনো নতুন বিপদ দেখা দিয়েছে হতভাগীর। কোনো রকম দ্বিধা না করে বলে ফেললেন, না; ওনামে এখানে কেউ থাকে না।

—আশে-পাশে কোনো বাড়িতে?

—কোথাও নেই।

—তোমরা এখানে কদ্দিন আছ?

—পাঁচ ছ বছর হবে।

পুলিশ কনষ্টেবল তার সঙ্গীর দিকে ফিরে বলল, তাহলে ঠিকই বলছে। এ বস্তিতে হবে না। ওদিকটায় চল।

দ্বিতীয় লোকটি এদিক ওদিক একবার দেখে নিয়ে বলল, আমগাছ আর জলের কল কিন্তু ঠিক মিলে যাচ্ছে।

প্রথম পুলিশটি হেসে উঠল—তা মন্দ বলনি। গোটা বেলেঘাটায় আমগাছও আর নেই, কলও এই একটি।

সঙ্গীটি বিরক্তির সুরে বলল, তা না হয় আছে, কিন্তু আর কত ঘুরবে বল দিকিন? সেই সকাল থেকে হেঁটে হেঁটে পায়ের সুতো ছিঁড়ে গেল। চল এবার ফিরি। এরকম খোঁজার কোনো মানে হয় না।

পুলিশের লোকেরা নিজেদের মধ্যে কিসব বলতে বলতে শহরের দিকে চলে গেল। বিনুর মা তার আগেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। এরা যে খোকার খবর নিয়ে আসতে পারে, এরকম কোনো সম্ভাবনা তাঁর একবারও মনে হয়নি। পুলিশ তার খোঁজে এসেছিল, শুনতে পেলে এই দুঃসময়ে নির্মলা পাছে আরো ব্যাকুল হয়ে পড়ে, তাই এ ব্যাপারটা তার কাছে বেমালুম চেপে যাওয়াই স্থির করলেন।

সদরদরজা বন্ধ ছিল। কড়া নাড়বার বেশ কিছুক্ষণ পরে ভীম

নামে চাকরটি বিরক্তমুখে চোখ রগড়াতে রগড়াতে এসে খুলে দিল এবং নির্মলাকে দেখেই ঝাঁজিয়ে উঠল, কী চাই? পরক্ষণেই বিস্ময়ের সুরে বলল, খোকার মা! ঈস্, তোমাকে যে চেনাই যাচ্ছে না। খুব অসুখ করেছিল বুঝি?

—নির্মলা ম্লান হাসির সঙ্গে জবাব দিল, না তো। মা কোথায়?

—ঘুমুচ্ছে। উঠতে সেই চারটে, নীচে নামতে পাঁচটা। তুমি কি আর কোথাও কাজ করছ?

—না।

—ভালোই হয়েছে তাহলে। তিনদিন হল বাসনমাজার লোক নেই। আমাকে বলছে খুঁজে আন। আমি কোথায় পাই, বল দেখি? তুমি যাবার পর তিন-তিনটে নিয়ে এলাম; সব দুদিন-চারদিন কাজ করেই পালিয়ে গ্যাছে। দিনরাত খিটখিট করলে টেঁকে? তোমার আমার কথা আলাদা। কেমন একটা মায়া পড়ে গ্যাছে। কি বল?

হঠাৎ বোধহয় খেয়াল হল, নির্মলা এতক্ষণ দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে। বক্তৃতা থামিয়ে বলে উঠল, ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ভেতরে এসে বসো। তাহলে কাল থেকেই আসছ তো?

নির্মলা ঢুকতে ঢুকতে বলল, দেখি, ওঁরা যদি বলেন…।

—বলবে না মানে? তোমার মত লোক পাবে কোথায়?

ওপর থেকে গৃহিণীর গলা শোনা গেল—কে রে? কার সঙ্গে বক বক করছিস? দুপুরবেলা দুমিনিট একটু চোখ বুজবো, তারও কি জো আছে? চব্বিশ ঘণ্টা বাড়িতে যেন কাগ পড়ছে, আর চিল উড়ছে।

ভীম এই সব মন্তব্য গায়ে না মেখে খুশি-ভরা দরাজ গলায় ঘোষণা করল, খোকার মা এসেছে, মা। গৃহিণী এবার আর বিরক্তি প্রকাশ করলেন না, বিশেষ উৎসাহও দেখালেন না। সংক্ষেপে বললেন, বসতে বল।

পাঁচটা নয়, তার অনেক আগেই আজ তাঁকে নীচে নামতে দেখা গেল। নেমেই অনুযোগের সুরে বললেন, ধন্যি মানুষ তুমি বাছা। সেই যে গেলে, তারপর একবার একটা খবরও কি নিতে নেই, এখানকার লোকগুলো রইল না গেল? অ্যাদ্দিন কাজ করলে, এত করে খাওয়ালাম, দাওয়ালাম, কাপড় চোপড় দিলাম—

কথার মাঝখানেই ভীম অনেকটা যেন কৈফিয়তের মত বলে উঠল, ওর খুব শক্ত অসুখ করেছিল, মা। দেখুন না চেহারা কত খারাপ হয়ে গেছে।

—'তুই থাম, বাপু', ধমকে উঠলেন গৃহিণী, 'অসুখ যেন আর কারো করে না। এই যে আমি তিন মাস ধরে অম্বলে ভুগছি, খবর রাখিস তোরা?'

ভীম চুপ করে গেল। নির্মলা গোড়া থেকেই নীরব ছিল। সে জানে, এসব অভিযোগ শুধু শুনে যেতে হয়, উত্তরে কিছু বলতে নেই, বললে তার খণ্ডন হয় না, বরং অনাবশ্যক তিক্ততা বেড়ে চলে।

আরো কিছুক্ষণ সংসারের নানা আপদ-বিপদ ঝক্কি-ঝঞ্ঝাটের একটানা বর্ণনা দিয়ে এবং তাঁকেই যে সব এক হাতে টানতে হচ্ছে, নৈলে কে কোথায় ভেসে যেত, ইত্যাদি তথ্য সগর্বে পরিবেশন করে গৃহিণী এতক্ষণে কাজের কথায় নেমে এলেন—তা, অ্যাদ্দিন পরে কী মনে করে?

এর পরেই টাকার কথাটা পাড়তে নির্মলার বড় লজ্জা হল। কিন্তু না বললেও চলে না। সুযোগ-সুবিধামত আরেক দিন এসে বলবে, তারও উপায় নেই। ভাড়া না মেটালে যে কোনো মুহূর্তে তাকে পথে দাঁড়াতে হবে। তাই কয়েকবার ইতস্ততঃ করে, মাটির দিকে চেয়ে কোন রকমে বলে ফেলল, টাকা কটার বড় দরকার ছিল মা। বাড়িওয়ালা—

—ও, তাই বল। টাকার তাগাদায় এসেছ? আমি আরো ভাবছিলাম—

সদরদরজায় কড়া-নাড়ার শব্দ হতেই গৃহিণী চাকরটাকে ডেকে বললেন, 'ছাখ্ তো কে?' ভীম গিয়ে কপাট খুলতেই কর্তাকে ঢুকতে দেখা গেল, সঙ্গে সঙ্গে গিন্নীর দু'চোখে ভ্রূকুটি ফুটে উঠল। মাথার উপর আঁচলের কোণটা তুলে দিয়ে বললেন, আজ এত সকাল সকাল?

কর্তা সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে খুশী গলায় বললেন, কে এসেছে ছাখ।

তাঁর পিছনে নতুন আগন্তুকের দিকে নজর পড়তেই গৃহিণী কলকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন, ও মা! ওকে কোত্থেকে ধরে আনলে?

—ভুল করলে দিদি। আমিই বরং ওঁকে ধরে নিয়ে এলাম। ওঁর সেই ক্লাইভ ষ্ট্রীটের কোটর থেকে। যে তেপান্তরে এসে ডেরা বেঁধেছ—

নির্মলা অজানতে কখন মুখ তুলে তাকিয়েছিল। সেদিকে একবার চেয়েই আগন্তুক সহসা স্তব্ধ হয়ে গেল। গৃহিণী তার বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টি অনুসরণ করে বললেন, ও কেউ না। আমাদের বাসনমাজার ঝি, খোকার মা। চল ঘরে চল।

বলে, বৈঠকখানার দিকে ইঙ্গিত করে নিজেই প্রথম পা বাড়ালেন এবং চলতে চলতে ঘাড় ফিরিয়ে খোকার মার উদ্দেশ্যে বললেন, তোমাকে খানিকক্ষণ বসতে হবে বাছা।

নির্মলা এক পলক তাকিয়েই সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। যে স্বর শুনে মাথা তুলেছিল, তার আর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। অনুমানে যখন বুঝল ওঁরা সকলেই ওদিকে এগিয়ে গেছেন, সেই মুহূর্তে কাউকে কিছু না বলে এবং কোনো দিকে না চেয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গিয়ে রাস্তায় পড়ল। তখন শুধু একটিমাত্র চিন্তাই তাকে অধিকার করে বসেছিল —যত দ্রুত এবং যত শীঘ্র সম্ভব এখান থেকে তাকে দূরে গিয়ে পড়তে হবে। কেন, এমন করে পালাবার কী অর্থ হতে পারে, সেকথা ভেবে দেখবার মত মনের অবস্থা তার ছিল না।

ঘণ্টাখানেক পরে চা জলখাবারের ব্যবস্থা করবার জন্যে গৃহিণীর যখন এদিকে আসবার প্রয়োজন হল, নির্মলাকে দেখতে না পেয়ে ভীমকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে কোথায় গেল রে?

—কী জানি মা, আমি তো বাইরে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি, নেই।

একটু আগে বড় মেয়ে ফিরেছে স্কুল থেকে। বলল, কার কথা বলছ? খোকার মা?

ভীম বলল, হ্যাঁ, দিদিমণি। তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে নাকি?

—আমি যখন আসছিলাম, হঠাৎ দেখি ওধার দিয়ে যাচ্ছে। ডাকলাম, সাড়া দিল না। কিছু একটা ভাবছিল বোধহয়। শুনতে পায়নি। জোরে হেঁটে চলে গেল।

—শুনতে ঠিকই পেয়েছে। পাঁচ মিনিট বসিয়ে রেখেছি বলে গোসা হয়েছে মহারাণীর।

—কী জন্যে এসেছিল?

—টাকা আদায় করতে, আর কী জন্যে?

--দিয়ে দিলেই পারতে। গরিব মানুষ। দরকারে না পড়লে আসত না

গৃহিণী ঝাঁজিয়ে উঠলেন, আমি কি বলেছি, দেবো না? বিজন এল, তাই একটু বসতে বলেছিলাম। অপরাধের মধ্যে তো এই।

—কে এল? বিস্ময়ের সুরে প্রশ্ন করল মেয়ে।

—তোর বিজন-মামা। ও, তুই বুঝি এখনো দেখিসনি?

—না; কোথায়?

—ওপরে, আমার ঘরে।

মেয়ে ছুটতে ছুটতে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল। ঠিক পাশেই কলতলায় কর্তা হাত-মুখ ধুচ্ছিলেন। খোকার মা সম্পর্কে এদের সব কথাই কানে গিয়েছিল। কন্তু সে সম্বন্ধে তিনি কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না। দোতলায় উঠবার সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে ভীমকে শুধু ডেকে বললেন, তোর কাজ সারা হলে একবার ওপরে আসিস।

নির্মলার জীবনে বিজন ব্যানার্জি নামক ব্যক্তিটির যে ছায়া পড়েছিল, সেটা ঠিক চলতি মেঘের ছায়া নয়। কোলকাতার শহরে অবস্থাপন্ন ঘরে স্বাচ্ছন্দ্য-লালিত, আমুদে ও প্রিয়দর্শন, মেজদির এই আদুরে দেওরটিকে ঘিরে তার কুমারী মনে একদিন গভীর মোহসঞ্চার ঘটেছিল। ওদের তুজনের সম্পর্কে তার বাবা যে ইচ্ছা ও আশা পোষণ করতেন, এবং যা তিনি মেজোমেয়ের কাছে অপ্রকাশ রাখেননি, সেইটুকু আশ্রয় করে সে নিজের জন্যে একটি স্বপ্নলোক গড়ে তুলেছিল। তারপর সে স্বপ্ন যেদিন ভেঙে গেল, সেদিন, আঘাত যতই লাগুক, যা পায়নি, তার জন্যে হা-হুতাশ না ক'রে যা পেল, তার মধ্যেই নিজেকে গুটিয়ে আনবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। ঠিক সেই সময়ে ধূমকেতুর মত আবার যদি ঐ বিজন এসে না দাঁড়াত তার নতুন পথের দোরগোড়ায়, নির্মলা

হয়তো সেই দূর গ্রামোপান্তে খড়োঘর আর ধানের গোলা-ঘেরা দরিদ্র থার্ড-মাষ্টারের স্বাদগন্ধহীন স্বল্পপরিসর সংসারের মধ্যেই নিরুদ্বেগে জীবন কাটিয়ে দিতে পারত। কিন্তু তার ভাগ্যবিধাতার অভিপ্রায় ছিল অন্যরকম। তাই তার বিবাহিত জীবন শুরু হতে না হতেই এক পরম সন্ধিক্ষণে বিজন ব্যানার্জির পুনরাবির্ভাব। কেবল মাত্র আবির্ভাবের আঘাতটাই হয়তো তেমন সুদূরপ্রসারী হত না। কিন্তু বিজন সেদিন সেই বিগত দিনের মতই নির্মলার একান্ত সান্নিধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিল এবং সেই সঙ্গে তার অন্তরের গোপন-লালিত ক্ষত স্থানটিকেও অকপটে উন্মুক্ত করে তুলে ধরেছিল। একদিন যাকে কামনা করেছিল, আজ সে অপ্রাপনীয়া জেনেও সেই ঈপ্সিত সম্পর্কের নিষ্ফল দাবি শিথিল করতে চায়নি। নির্মলা সেটা রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। তা ছাড়া আর কীই বা তার করবার ছিল? সেকথা কি বিজন জানত না? জানত। কিন্তু জানা আর মানা তো এক জিনিস নয়। প্রাপ্যকে নতশিরে গ্রহণ করবার মত মনোবল সংসারে বড়ই দুষ্প্রাপ্য। বিজনের তা ছিল না। হয়তো সে বয়স তার নয়, কিংবা সে চারিত্রিক দৃঢ়তা তার আয়ত্ত হয়নি। তাই যাবো যাবো করেও তার যাবার দিন কেবলই পিছিয়ে গেছে। চিরজীবনের তরে যাকে হারালাম, তাকে যতটুকু কাছে পাওয়া যায়—এই দুর্জয় মোহ সে ত্যাগ করতে পারেনি। তার হাসি-গল্প-আমোদ-তামাসার অন্তরালে ছিল লোভ। নির্মলার কাছে সেটা লুকনো ছিল না।

এমন সময়ে এল নরেন এবং তাকে নিয়েও শুরু হল নানা রকম ঠাট্টা-পরিহাস, রঙ্গ-রসিকতার পালা। সেখানে প্রধান নায়কের অংশ নিল বিজন। কে জানে, সেটা কি শুধু নিরুদ্দেশ্য সরল কৌতুক না তার মধ্যেও লুকিয়ে ছিল কোনো হিংস্র আঘাত—চেয়ে ছাখ নির্মলা, কী তুমি পেতে পারতে আর কী পেয়েছ? আসলে যা-ই হোক, অন্য সকলে যেভাবেই নিক, নির্মলার কানে কিন্তু এই রূঢ় ইঙ্গিতটাই সেদিন মুখর হয়ে উঠেছিল। বিজনের প্রতিটি আচরণ, প্রতিটি হাসির আবরণ ভেদ করে অবজ্ঞা ও অপমানের বিষমাখানো ধারালো তীর সোজা এসে বিঁধেছিল তার বুকে।

এ ইঙ্গিত তো নির্মলার কাছে নতুন নয়। মেজদির মুখে এবং

অন্য কারো কারো চোখে এর সুস্পষ্ট আভাস সে আগেই পেয়েছে। কিন্তু তাদের সঙ্গে ঐ বিশেষ লোকটির অনেক তফাত। ঐ একটি মাত্র মানুষের কাছে সে হার মানতে পারে না। নিজের মনে সে যদি একে মিথ্যা বলে জানত, হয়তো এ আঘাত তার গায়ে লাগত না। কিন্তু তখনো যে তার অন্তরের অনেকখানি জুড়ে আছে না-পাওয়ার ক্ষোভ। কালক্রমে একদিন হয়তো সেটা নিভে যেত। কিন্তু তার আগেই, যাকে আশ্রয় করে সে জ্বালা, সেই এসে তাতে ইন্ধন জুগিয়ে বসল। তার মূর্খ, অর্ধসভ্য, দরিদ্র স্কুলমাষ্টার স্বামীর সম্বন্ধে সভ্য, সুশিক্ষিত বড়লোক বিজন ব্যানার্জির সেই তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গোক্তি—'যে যা, তাকে সেইভাবেই দেখা উচিত ছিল' নির্মলার মনে যে দাবদাহের সৃষ্টি করেছিল, সে সেখানেই থেমে যায়নি, ছড়িয়ে পড়েছিল তার ছোট্ট শান্ত সংসারের বুকের উপর। সে যেন একটা উদ্ধত চ্যালেঞ্জ, দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান। তারই প্রত্যুত্তরে শুরু হল তার জীবনব্যাপী নির্মম সংগ্রাম। সেখানে ঐ বিজন তার প্রতিদ্বন্দ্বী, এবং তার বিরুদ্ধে নিজেকে ও নিজের স্বামীকে সে আগাগোড়া অস্ত্রের মত ব্যবহার করে গেছে। সর্বস্ব পণ করে, বহু দুঃখ বরণ করে গ্রাম্যজীবনের সেই দীনতার ভিতর থেকে স্বামীকে টেনে তুলে ঐ দাম্ভিক লোকটার সমস্তরে না নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত তার কিছুমাত্র স্বস্তি ছিল না। এ যেন এক সর্বনাশের খেলা, যেখানে হার মানুষকে নিরস্ত করে না, মাতিয়ে তোলে। তেমনি এক মত্ততার উন্মাদনা নির্মলার সমস্ত চেতনাকেও আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল; তাকে ফিরে তাকাবার অবকাশ দেয়নি, একটির পর একটি দুঃখ-দুর্দশার ভিতর দিয়ে শুধু অন্ধ বেগে চালিয়ে নিয়ে গেছে। তারপর একদিন অকস্মাৎ সে ধ্বংস-যজ্ঞের অবসান, এবং তার শেষ আহুতি তার হতভাগ্য স্বামী।

কিন্তু মৃত্যুকে অস্বীকার করাই বোধ হয় জীবনের ধর্ম। প্রত্যক্ষ সত্য হলেও তাকে চরম সত্য বলে মানুষ কোনোদিন মেনে নেয়নি। চির-বহমান জীবনধারাকে সে ব্যাহত করেছে কিন্তু অবলুপ্ত করেনি। নির্মলার মত সর্বস্বহারা সামান্য নারীর ক্ষুদ্র জীবনেও মৃত্যু শেষ ছেদ টেনে দিতে পারল না। একটি অসহায় শিশুকে বুকে করে আবার শুরু হল তার যাত্রা। আবার সেই নিরলস সংগ্রাম, কঠোর বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার লড়াই, অবিচ্ছিন্ন নৈরাশ্যের অন্ধকারে দূরাগত আশার সঙ্কেত।

খোকাকে আশ্রয় করে নির্মলা আবার নতুন করে বুক বেঁধেছিল। প্রচণ্ড ঝড়ের তাড়নায় যে ভবিষ্যৎ বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, তারই ভগ্নস্তূপের উপর গড়ে তুলেছিল স্বপ্নসৌধ। সেখানেও যখন আঘাত এসে পড়ল, নিরন্ধ্র অন্ধকার ছাড়া তার চোখের সুমুখে সেদিন আর কিছুই রইল না। তারপরেও তাকে উঠতে হল। খোকা তো তাকে একেবারে মুক্তি দিয়ে যায়নি। তাছাড়াও রয়ে গেছে মানুষের সেই চিরন্তন জীবনধারণের দায়। কিন্তু সে শুধু দায়, তার সঙ্গে একটুখানি ক্ষীণ প্রত্যাশা—খোকা যদি ফিরে আসে। যে সংগ্রাম দিয়ে তার জীবনারম্ভ, স্বামীগৃহে প্রথম মিলনের মাধুর্যটুকু পর্যন্ত যার তাপে শুকিয়ে গিয়েছিল, তার প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে। সে পরাজিত, ক্ষত-বিক্ষত। জয়ী হয়েছে তার প্রতিদ্বন্দ্বী, বিজন ব্যানার্জি। সে আজ কোথায়, কী করছে, কেমন আছে, নির্মলা জানে না। মাঝে মাঝে শুধু সেই শেষদিন-দেখা দম্ভারক্ত উদ্ধত মুখখানা চোখের উপর ভেসে ওঠে। তার সঙ্গে মিশে রয়েছে জয়ের উল্লাস। নির্মলার বুকের ভিতরটা রী রী করে জ্বলে যায়। তীব্র কিন্তু চাপা আগুন : তার চারদিক ঘিরে পুঞ্জীভূত পরাজয়ের কালি। তারই ছাপ তার মুখময়। সে মুখ নিয়ে তার আপনজনের কাছে যদিবা গিয়ে দাঁড়াতে পারত, সেই একজনের চোখে পড়তে পারে না। পাছে সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা কোনোদিন দেখা দেয় তাই বড়দি, মেজদির কাছ থেকেও তার এই অজ্ঞাতবাস। চরম দুঃখের দিনেও তাদের একটা খবর পর্যন্ত দেবার চেষ্টা করেনি।

কিন্তু সংসারে দৈবের হাত কে এড়াতে পারে? সেই দুর্ঘটনাই ঘটল তার জীবনে। একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে অবাঞ্ছিত অবস্থার মধ্যে অকস্মাৎ দেখা হয়ে গেল সেই মানুষটির সঙ্গে। সেখানে কী তাদের পরিচয়? একজন সাদরে গৃহীত আত্মীয়, আরেকজন বিতাড়িত ভৃত্য।

পুরানো মনিবের বাড়ি থেকে বেরিয়ে নির্মলার মনে হল, পলকের তরে দেখা সেই দুটো চোখ যেন তাকে তাড়া করে নিয়ে চলেছে। কী ছিল তার মধ্যে? বিস্ময়? না, তার সঙ্গে মেশানো কিছু অনুকম্পা? এর চেয়ে আক্রোশ, অবজ্ঞা কিংবা অপমানও অনেক বেশী সহনীয়।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। নির্মলা সেই যে এসে বারান্দার মেঝের উপর

আঁচল পেতে শুয়ে পড়েছিল, আর ওঠেনি। ভুলে গিয়েছিল, আজ তার রান্না হয়নি, খাওয়া হয়নি। অনাহারের জ্বালা আর কতটুকু? তার চেয়ে অনেক বেশী তীব্র দহনে তার সমস্ত অন্তরটা জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিল। তাকে নিয়ে বারংবার এ কী পরিহাস করে চলেছেন ভাগ্যবিধাতা? পরাজয় মেনে নিয়েই তো সে এককোণে পড়েছিল, সকলের চোখের আড়ালে। সেটুকু স্বস্তিও তাঁর অসহ্য হল? সেখান থেকে টেনে বার করে দাঁড় করিয়ে দিলেন গর্বোদ্ধত বিজেতার কৃপাদৃষ্টির হীনতার তলে। তবে কি বুঝতে হবে তার সংগ্রাম শেষ হয়নি? সেই ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে ঐ দুর্বিষহ আঘাতের মাঝে? কিন্তু কী নিয়ে লড়বে সে? খোকা যে তার দুটো হাতই ভেঙে দিয়ে গেছে। কিংবা হয়তো তারই জন্যে আবার এই নতুন আহ্বান।

টিনের ঝাঁপে কার হাতের আওয়াজ পাওয়া গেল। নিশ্চয়ই বিনুর মা। খোঁজ নিতে এসেছেন, খাওয়া হল কিনা, ওখানকার খবর কী? নির্মলা শুয়ে শুয়েই চেঁচিয়ে সাড়া দিল, আসুন দিদি; খোলা আছে।

আস্তে আস্তে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল ভীম। নির্মলা তাড়াতাড়ি উঠে বসে আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে ফেলল। বিস্ময়ের সুরে বলল, 'তুমি!' সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে ঘরের দিকে যেতে যেতে বলল, দাঁড়াও আলো জ্বালি।

ভীম এদিক ওদিক তাকিয়ে বারান্দার একপাশে বসল এবং নির্মলা আলো নিয়ে বেরিয়ে এলে বলল, অনেক দিন আগে একবারই এয়েছিলাম তোমায় বাসায়। ভাবনা ছিল চিনে আসতে পারবো কিনা। দেখলাম ভুলিনি। তা, তুমি হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে চলে এলে যে?

নির্মলা একমুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলল, গিন্নীমা ব্যস্ত রয়েছেন, দেখলাম। ভাবলাম আরেকদিন এলেই হবে।

—ব্যস্ত না আরো কিছু! গরিব লোককে খালি খালি ঘোরানো। থাক, টাকার জন্যে তোমাকে আর যেতে হবে না। আমি নিয়ে এয়েছি।

--তুমি কেন আবার কষ্ট করতে গেলে? গ্যাখ দিকিন।

ভীম ট্যাঁক থেকে নোটকখানা বের করতে করতে বলল, কষ্ট কিসের? একটু বেড়িয়ে গেলাম। এমনি তো বাসা থেকে বেরোবার

যোটি নেই। চব্বিশ ঘণ্টা খালি খাটো। তুমি থাকতে তবু খানিকটা আজাড় ছিল।

নির্মলা চুপ করে শুনছিল। তার দিকে এক পলক তাকিয়ে ভীম অনুরোধের সুরে বলল, চলনা আবার ?

—তোমরা বরং অন্য লোক খুঁজে নাও, ভীম।

—কেন, তোমার হাতে তো কাজ নেই, বলছিলে ?

নির্মলা জবাব দিল না। কেন যে ওখানে গিয়ে তার আর দাঁড়াবার উপায় নেই, সে কথা কাউকে বলা যায় না। ভীম তার নিজের বুদ্ধি দিয়ে যা বুঝল তার থেকেই বলল, গিন্নী একটু খিট্‌খিট্‌ করে। বাবু কিন্তু মানুষটা বড় ভালো। এই ছাখনা, যেই কানে গ্যাছে তুমি খালি হাতে ফিরে এয়েছ, ওপরে ডেকে নিয়ে টাকাটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, যা ভীম, এক্ষুনি দিয়ে আয়।

নির্মলা বিস্মিত এবং খানিকটা লজ্জিত হল--বাবু পাঠিয়েছেন তোমাকে !

—তুমি ভাবছ গিন্নী পাঠিয়েছে ? হুঁঃ ! তুমিও যেমন। যাক্ : এবার আমি উঠি। কতো কাজ পড়ে আছে। বাড়িতে আবার নতুন কুটুম এয়েছে। যে-সে কুটুম্ নয়, গিন্নীর ভাই, কত্তার বড় কুটুম্। তবু তো আপন নয়, শুনলাম। মাসতুতো না পিসতুতো কী একটা হবে।

বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে ফেলল ভীমচন্দ্র। উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙে বলল, আমার কথাডা একবারটি ভেবে দেখো, খোকার মা।

ভীম চলে যাবার পরেও বাইরের দরজা খোলা ছিল। নির্মলা ইচ্ছা করেই বন্ধ করেনি। ভেবেছিল, এদিকটা একটু গুছিয়ে রেখে বিনুর মার কাছে যাবে। টাকা কিছুটা যোগাড় হয়েছে, এখবরটা দিয়ে আসা দরকার। নিশ্চয়ই উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন।

মিনিট কয়েক পরে হারিকেনটা হাতে করে উঠোনের মাঝামাঝি এসেই যেন ভূত দেখে থমকে দাঁড়াল। সেই দীর্ঘ সুঠাম দেহ, একটু যেন অনুজ্জ্বল, অবনত। সেই কণ্ঠ, কিন্তু সেদিনের তুলনায় অনেক ধীর, অনেক গম্ভীর—‘তুমি কি বাইরে যাচ্ছিলে ?’

নির্মলা মুহূর্ত মধ্যে নিজেকে সংযমের আবরণে ঢেকে ফেলল। মৃদুস্বরে বলল, হ্যাঁ।

—খুব জরুরী দরকার ?

—না।···বলে ফিরে এল, এবং ঘরের ভিতর থেকে একখানা পিঁড়ি এনে পেতে দিল বারান্দার কোণে। বিজন তার উপর বসতে বসতে বলল, খুব অবাক হয়ে গ্যাছ, না ? ভাবছ, বাড়ি চিনলাম কী করে।

নির্মলা জবাব দিল না, হাতকয়েক দূরে দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বিজন নিজে থেকেই জানাল, চাকরটা আসছে শুনে ওর পেছু নিয়েছিলাম। ও অবিশ্যি জানে না। দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসোনা ?

নির্মলা বসল না, কোনো উত্তর করল না, যেমন ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। বিজন কিছুক্ষণ উঠোনের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলল, ভাবছ, এতদিন পরে খোঁজ নেবার কী দরকার ছিল। কী করব, বল ? খুঁজে পাবার মত কোন পথই তো রাখনি। আমি না হয় কেউ নয়। বৌদিকেও তা একখানা পোষ্টকার্ড লিখে জানাতে পারতে, কোথায় আছ, কেমন আছ।

সহজভাবে বললেও কথাগুলোর মধ্যে অনুযোগের সুর অস্পষ্ট রইল না। কিন্তু নির্মলা নিরুত্তর। বিজনও জবাবের জন্যে অপেক্ষা করল না, নিজের কথার সূত্র ধরেই বলে চলল, কোথাও কোনো খবর না পেয়ে তোমাদের দেশের বাড়িতেও আমাকে যেতে হয়েছিল। গিয়ে দেখলাম, দরজায় তালা, উঠোনে এক হাঁটু জঙ্গল। বছরকয়েক আগে তোমরা কোলকাতায় চলে এসেছ, এর বেশী আর কেউ কিছু বলতে পারল না।······কী হয়েছিল নরেনদার ?

—অ্যাক্‌সিডেণ্ট্।

—অ্যাক্‌সিডেণ্ট্! তারপর ?

—হাসপাতালে গিয়ে আর দেখতে পাইনি।

কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব। তারপর বিজনই আবার কথা বলল, খোকা কোথায় ? তাকে তো দেখছি না।

—সে নেই।

কী বললে! আর্তকণ্ঠে যেন চেঁচিয়ে উঠল বিজন।

—বাড়ি থেকে চলে গেছে, আর আসেনি।

—বল কি! কদিন হল?

—আজ সাত মাস দশ দিন।

—খোঁজ করনি?

বলেই সঙ্গে সঙ্গে যোগ করল, তুমি আর কী খোঁজ করবে? কাকে দিয়েই বা করবে? বয়স কত ছেলের?

—দশ বছর।

আবার সেই দুঃসহ নীরবতা এবং এবারেও বিজনই সেটা ভঙ্গ করল। ধীরে ধীরে যেন বহুদিনের ওপার থেকে ডাকল, নির্মলা।

—বলুন।

—তুমি আমার সঙ্গে চল।

—কোথায়! বিস্ময়ে চোখ তুলল নির্মলা। স্বল্প আলোকেও সে বিস্ফারিত দৃষ্টির শিখা বিজনের নজর এড়াল না। বলল, না, না; আমার বাড়িতে নয়। সে কথা বলবার মত স্পর্ধা আমার নেই; যদিও, নিশ্চয়ই জানো, যদি যেতে, তোমাকে মাথায় করে রাখতাম। বলছিলাম, বৌদির কাছে চল। তোমার দিদি, মায়ের পেটের বোন; সেখানে যেতে তো কোনো বাধা নেই।

—আমি কোথাও যাবো না।

—যাবে না।

—না।

—কেন?

শুধু প্রশ্ন নয়, একটা ক্ষুব্ধ বেদনার সুর ফুটে উঠল তার মধ্যে। নির্মলা জবাব দিল না। বিজন বলল, দেখা যদি না হত, সে কথা ছিল আলাদা; কিন্তু দেখবার পর তোমাকে একা এই অবস্থায় ফেলে আমি নিশ্চিন্ত মনে চলে যাবো, এই কি তুমি বলতে চাও?

—আমার কোথাও যাবার উপায় নেই। দয়া করে এ নিয়ে আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না।

—বেশ; করবো না। কিন্তু কিসের জন্যে তুমি নিজেকে এমন

করে ক্ষয় করে চলেছ, কার ওপরে তোমার এ দুর্জয় অভিমান, তাও কি কখনো জানতে পারবো না ?

—কারো ওপরে আমার কোনো অভিমান নেই।

বিজন আহত দৃষ্টিতে একবার সেই আনত মুখের দিকে তাকাল; হারিকেনের মৃদু আলোয় বিশেষ কিছুই চোখে পড়ল না। তারপর ধীরে ধীরে বলল, বুঝতে না পেরে একদিন যে আঘাত তোমাকে দিয়েছি, যত অপরাধ করেছি তোমার কাছে, তার কোনোটাকেই আমি ছোট করে দেখছি না। তবু বলবো, তুমি আমাকে ভুল বুঝেছিলে। আমার সেদিনকার সেই মনটাকে যদি—

—'ওসব কথা থাক', বাধা দিয়ে বলে উঠল নির্মলা।

—বেশ। কিন্তু আজকের এই কথাটা তোমাকে শুনতে হবে, নির্মল। একটা কোনো ভার আমাকে দাও। বল, তোমার জন্যে আমি কী করতে পারি।

সেই পুরনো ডাক—'নির্মল', যা শুনলে একদিন তার বুকের ভিতরটা উদ্বেলিত হয়ে উঠত। আজ সেখানে কোনো সাড়া নেই। তবু কী ছিল ঐ তিনটি অক্ষরের মধ্যে, একটা শ্লেষতিক্ত রূঢ় জবাব মুখে এসেও আটকে গেল। তার বদলে বেরিয়ে এল একটি শান্ত সহজ কিন্তু দৃঢ় উক্তি—অনেক দিন আগে এই কথাটা আপনি আরেকবার জানতে চেয়েছিলেন। সেদিন যে উত্তর দিয়েছিলাম আজও তাই দেবো। আমার জন্য আপনাকে কিছুই করতে হবে না। যেমন আছি, তেমনি থাকতে দিন। আর—

হঠাৎ থেমে যেতেই বিজন সাগ্রহে বলে উঠল, 'বল।' নির্মলা তেমনি অবিচলিত কণ্ঠে যোগ করল, আর কোনোদিন আমার সামনে আসবেন না।

· বিজনের মাথাটা নেমে এল বুকের উপর! কিছুক্ষণ মাটির দিকে চেয়ে থেকে, একটি স্খলিত নিঃশ্বাস নিঃশব্দে বুকে চেপে উঠে দাঁড়াল এবং ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল। নির্মলা যেখানে ছিল সেখান থেকেই বলল, শুনুন।

বিজন ফিরে তাকাল।

—'দয়া করে মেজদি বা আর কাউকে আমার কোনো কথা জানাবেন না। আশা করি আমার এই শেষ অনুরোধটুকু রাখবেন।'

বলেই, বোধ হয় তার বহু-যত্ন-রক্ষিত দীর্ঘ সংযমের বাঁধটিকে আসন্ন ভাঙনের মুখ থেকে বাঁচাবার জন্যে সবেগে ঘরের ভিতর গিয়ে ঢুকল। বিজনও মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে খোলা দরজা দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

বিনুর মা সে রাত্রে আর সময় করে উঠতে পারেননি। পরদিন তাঁর সংসারের সকালবেলার প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে এসে পড়লেন। এসেই জিজ্ঞাসা করলেন, কী হল ? টাকা পেয়েছিস ?

—পেয়েছি ; কিন্তু পুরোটা এখনো যোগাড় হয়নি।

আর কত চাই ?

নির্মলা দুটো আঙ্গুল তুলে দেখাল। বিনুর মা ম্লানমুখে বললেন, মাসের শেষ, আমারও হাতে কিছু নেই। ওঁকে বললাম, ওঁরও সেই অবস্থা।

—ছিঃ ছিঃ, এই নিয়ে আবার ওঁকেও বিরক্ত করতে গেছেন ? এমনিতেই যা করছেন আপনারা—

—কী আর করছি বল ? করবার সাধ্যি থাকলে তো করবো ?

'বাসায় কে আছে ?' ভেজানো দরজার ওপার থেকে কার গলা শোনা গেল। বিনুর মা বললেন, 'তুই বস, আমি দেখি।' ঝাঁপের কাছে এগিয়ে গিয়ে না খুলেই বললেন, কে গা ?

…খোলো, বলছি।

ঝাঁপটা টানতেই একজন ফেরিওয়ালা গোছের লোক এগিয়ে এল। মাথায় মস্ত ঝুড়ি, তার উপরে গোটা দুই মুখবন্ধ টিন, তার পাশে সরাঢাকা মাটির হাঁড়ি, ঝাঁকাটা নামিয়ে রেখে লোকটি বলল, তুমি—আপনি থাকেন এখানে ?

ততক্ষণে নির্মলাও এসে দাঁড়িয়েছিল। তার দিকে দেখিয়ে বিনুর মা বললেন, না ; ও থাকে। কেন ?

লোকটি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দুজনকে লক্ষ্য করে বলল, আপনারা ?

—আমরা বামুন।

—পেন্নাম। কিন্তু দারোয়ানজী যে বললে একজন ঝি থাকে এ বাসায়। ভাড়া দিতে পারেনি বলে মাসের এই কডা দিন পরেই উঠে যাচ্ছে। তাইতো দেখতে এনু। আমার একটা বাসা চাই কিনা? একখানা ঘর এট-টু রান্নার জায়গা হলেই চলবে। বোধ করি, ভুল করে অন্য বাসায় ঢুকেছি। বুড়ো মানুষ, ঠিক ঠাহর করতে পারিনি আপনারা কিছু মনে করবেন না, মা।

মাথায় বিড়েটা ঠিক করে নিয়ে ঝুড়িটা তুলতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে পেছনে এসে দাঁড়াল বাড়িওয়ালার দারোয়ান। তাকে দেখতে পেয়েই লোকটি বলে উঠল, এই যে দারোয়ানজী, ছ্যাখতো কাণ্ড। ভুল করে কোথায় ঢুকতে কোথায় ঢুকে পড়েছি। ছিঃ ছিঃ।

—ভুল কেনো হোবে? এহি বাসা আছে।

—কিন্তু তুমি যে বললে, কে একজন ঝি নাকি থাকে সেখানে—

—হাঁ, হাঁ। পুছনা উস্‌কো, ঝি আছে না কী আছে।

চোখের ইঙ্গিতে নির্মলাকে দেখিয়ে দিল দারোয়ান। গোঁফের কোণে এক ঝলক মুচকি হাসিও দেখা দিল সেই সঙ্গে।

ঝাঁকাওয়ালা লোকটি বড় বড় চোখ করে হতভম্বের মত তাকিয়ে রইল নির্মলার দিকে। ফিস্‌ফিস্ করে যেন নিজের মনে বলল, বলছ কি তুমি! বামুনের মেয়ে, ঐরকম লক্ষ্মীঠাকুরের মত চেহারা—

তারপরেই মনস্থির করার ভঙ্গিতে জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, না বাপু, এ বাসায় আমার দরকার নেই। বামুনের মেয়েকে ঘরছাড়া করতে পারবো না।

—ঠিক আছে। তুমি না লেবে তো দোসরা আসবে। ভাড়াটিয়াকা অভাব হোবে না।

এই বলেই দারোয়ান চলে যাচ্ছিল। নির্মলা বলল, ঘর আমি ছাড়বো না। সরকারমশাইকে বলে দিও।

—ভাড়া? ফিরে দাঁড়িয়ে জানতে চাইল দারোয়ান।

—ভাড়া দিয়ে দেবো।

—পুরা?

নির্মলা জবাব দেবার আগেই বিনুর মা অনুরোধের সুরে বললেন

ুরো কি আর পারে, বাবা? বিধবা মানুষ; সামান্য কিছু বাকী থাকবে। সটা আসছে মাসে নিও।

বাকী থাকলে হোবে না। দোস্‌রা ঘর দেখো……বলতে বলতে গরোয়ান দাপটের সঙ্গে বেরিয়ে গেল। সেইদিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থকে, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে ফেরিওয়ালা লোকটি বলল, সব. কসাইএর ল, বুঝলে মা? দয়ামায়া বলতে কিছু নেই, কোথাও নেই।

বিনুর মার দিকে এক পা এগিয়ে গিয়ে, যেন কত বড় অপরাধ করছে, এমনিভাবে হাত কচলাতে কচলাতে বলল, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, মা ঠাকরুন?

—বল না, বাবা?

—কত টাকা হলে ওদের পুরো ভাড়াটা শোধ যায়?

—বেশী কিছু না, তুটো টাকা। কিন্তু সময়গতিকে তাও অনেক হয়ে দাঁড়ায়। বুঝতেই তো পারছ।

লোকটি মাথা নিচু করে কি ভাবল, তু-একবার ইতস্ততঃ করল, তারপর তেমনি কুণ্ঠার সুরে বলল, টাকাটা যদি আমি দিয়ে দি?

না, না; তা কি করে হবে? সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল নির্মলা।

—এমনি তো দিচ্ছি না মা, ধার দিচ্ছি। তোমার যখন সুবিধে হবে, শোধ করে দিও।

—তাতে হয়তো অনেক দিন লেগে যাবে।

—লাগলই বা। তোমার আশীর্বাদে সেজন্যে আমার কোনো কষ্ট হবে না।

—তাছাড়া তোমাকে তো আমরা চিনি না। কোথায় কেমন করে—

—সে সব তোমাকে ভাবতে হবে না। আমিই এসে নিয়ে যাবো —বলে, আর কোনো ওজর আপত্তি তুলবার সুযোগ না দিয়েই ফতুয়ার পকেট থেকে তুটো টাকা তুলে নিয়ে সসঙ্কোচে বাড়িয়ে ধরল বিনুর মার সামনে। তিনি টাকাটা নিয়ে গভীর কৃতজ্ঞতার সুরে বললেন, বেঁচে থাকো, বাবা। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। গরিব বিধবার কত বড় উপকার যে করলে তুমি, সে শুধু আমরাই জানি।

—ও সব কথা বলো না, মা। কে কার উপকার করে? যা কি
করবার ঐ একজনই করছে—বলে, আকাশের দিকে আঙুল তু
দেখালো।

—তুমি কোথায় থাকো, বাবা? জানতে চাইলেন বিনুর মা।

—এই তো কাছেই, এখান থেকে আধ কোশটাক হবে। এ
রকমই বস্তি। পাঁচ বছর আছি সেখানে। বেশ ছিলাম, মা। জমিদারে
লোক এসে বলল, সব উঠে যাও।

—কেন?

—তাই গ্যাখো না? ওখানে নাকি নেক্ না কী হবে। বাবু
'বাইচ' খেলবে, সাঁতার কাটবে। তার জন্যে মর তোমরা। গরীবের ঠঁ
কোথাও নেই, মা। তাদের কথা কে ভাবে? যাই; আজ-কালের মধ্যে
যেখানে হোক একটা আস্তানা দেখতে হবে।

ঝুড়িটা মাথায় তুলতেই নির্মলা বলল, তোমার টাকা দুটো পে
কিন্তু কদিন দেরি হবে। এ মাসে বোধ হয় পেরে উঠবো না।

তার জন্যে তুমি কিছু ভেবো না! যেদিন পার দিও। আচ্ছ
তাহলে এখন আসি, মা।

বিনুর মা বললেন, এসো। তোমার নামটা তো বললে না, বাবা

—আমার নাম গোকুল, গোকুল দাস। আমরা হোলাম বাউরী।

—কী কর তুমি?

—যা দেখছেন; জিনিস ফেরি করি। মুড়ি, মুড়কি, মোয়া, যখ
যেটা চলে। তোমাদের আশীর্বাদে তাতেই চলে যায়।

দিন পনর পরে বিকালের দিকে নির্মলা ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল। বাই
থেকে দরাজ গলার হাঁক শোনা গেল—মা ঠাকরুন আছেন?

—কে?

—আজ্ঞে, আমি গোকুল।

নামটা শুনেই নির্মলার মুখ শুকিয়ে গেল। টাকা দুটোর জন্যে
কদিন তার কিছুমাত্র স্বস্তি ছিল না। দিনকয়েক হল কাজ অবশ্য একট
জুটেছে। মাইনে আগের মতই। কিন্তু সেটা হাতে আসতে এখনো প্রা
এক মাস। এদিকে ভাড়া মিটিয়ে দেবার পর একেবারে নিঃসম্বল অবস্থা

গাকুল যে এরই মধ্যে এসে পড়বে জানা ছিল না। থাকলেই বা কী রতে পারত? গিয়ে কী বলবে, একটা মাস কি করে ঠেকিয়ে রাখা ায়, এইসব ভাবতে ভাবতে অপ্রসন্ন মুখে এগিয়ে গিয়ে ঝাঁপটা খুলে দল। গোকুলের মাথায় আজ আর ঝুড়ি নেই। ভিতরে ঢুকে হাতজোড় রে প্রায় মাটি ছুঁয়ে প্রণাম করে বলল, এনু একবার খবর নিতে। াসবার কি আর যো আছে, মা? তুটি বেলা খালি চরকির মতো ঘোরা ার ঘোরা, তবে তো তুটো পয়সা আসে। না খাটলে ঘরে বসিয়ে কে াওয়াবে বল? তার ওপরে আবার বাসা-বদলির ঝামেলা। তোমার াশীর্বাদে ঘরখানা ভালোই পেয়েছি। সামনে এই রকম এট্টু উঠোনও াছে। তা, তোমার সেই ভাড়ার গণ্ডগোল মিটে গ্যাছে তো? কসাই াটাদের পাওনা-টাওনা সব চুকিয়ে দিয়েছ

—হ্যাঁ, সে সব মিটিয়ে দিয়েছি। তোমার টাকাটা কিন্তু আজ দতে পাচ্ছি না, গোকুল।

—কী মুস্কিল! আমি কি টাকার তাগাদায় এসেছি? সে তুমি যদিন খুশি দিও।

—বেশী দেরি হবে না। একটা নতুন কাজ পেয়েছি। প্রথম মাসের াইনেটা পেলেই দিয়ে দেবো।

গোকুলের মুখে একটা ম্লান ছায়া পড়ল, কপালে দেখা দিল কুঞ্চন-রখা। বলল, কী কাজ? যা করছিলে তাই?

—তাছাড়া আর কী করবো বল?

—না মা, ও কাজ তুমি ছেড়ে দাও। বেরাম্মন, বন্নছেষ্ট, পরের টো ঘাঁটা কি তোমার সাজে? ওতে যে আমাদেরও পাপ হয়, মা?

নির্মলা বিস্মিত হল। যা শুনল, শুধু একটা মত নয়, এই নিতান্ত ম্পর সামান্য-পরিচিত লোকটির কাছ থেকে এই গভীর আত্মীয়তার সুর ন একেবারেই আশা করেনি। এরই মাধুর্য তাকে কিছুক্ষণের জন্যে াভিভূত করে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারল না। গোকুল হূর্তকাল কি ভেবে নিয়ে, মাথা নেড়ে দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, না না, তামাকে আর এই ছোট কাজ করতে আমি দেবো না। তুমি আজই ায়ে সেখানে জবাব দিয়ে এসো।

নির্মলার ওষ্ঠ প্রান্তে ম্লান হাসি ফুটে উঠল—নিরুপায়ের করুণ
হাসি। শান্তভাবে বলল, তা না হয় দিলাম। তারপর?

—পরের ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। 'মা' বলে যখন
ডেকেছি, সে ভার আমার।

—তা কি হয় গোকুল? এই দুঃসময়ে যে উপকার তুমি করেছ
আমার চিরদিন মনে থাকবে। তার ওপরে—

—এই ছাখ, উব্‌গারটা আবার কী কোরলাম? ঐতো সামান্য
দুটো টাকা। তাও ধার।

—টাকাটা সামান্য। কিন্তু তার পেছনে যা রয়েছে, মোটেই সামান্য
নয়। তার ওপরে এই যে খোঁজ খবর নিচ্ছ, এও কি কম? এমনি মাঝে
মাঝে এসে একবার করে দেখে যেও; তাহলেই হবে। যতদিন শক্তি
সামর্থ্য আছে, নিজের পেটটা নিজেই চালিয়ে নিতে পারবো। তার জন্যে
যেন কারো কাছে হাত পাততে না হয়, এইটুকুই আমার কামনা।

গোকুল দাঁতে জিব্‌ কেটে ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলল, ছিঃ ছি
হাত পাততে যাবে কোন্‌ দুঃখে? তাও আবার আমার মত ছোট জাতের
কাছে। কিন্তু তোমার এই কাজটা আমার ভালো লাগে না মা। একলা
মানুষ; দুবেলা তিনবেলা নয়, একবেলা দুটো নিরিমিষ্যি। তার জন্যে
তোমাকে পরের বাড়ি বাসন মাজতে হবে, আমরা থাকতে? এডা কেমন
ধারা কথা?

—আমার কপাল; তোমরা কি করবে? অন্য কাজ আমাকে
দিচ্ছেই বা কে? জানাও তো নেই তেমন কিছু।

—কে বললে নেই? খাটতে যখন পেছপাও নও, এক সন্ধে
আহার আর দুখানা বস্তর, এ তুমি ঘরে বসেই যোগাড় করতে পার।
টুকুর জন্যে তোমাকে পরের দোরে ঘুরতে হবে না।

—আমি তো বুঝতে পারছি না, ঘরে বসে কী আমি করতে পারি
আর সে সব ব্যবস্থাই বা কে করবে।

—আমি করবো। তার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি
খালি একবার গিয়ে তোমার সেই বাসার কাজডা ছেড়ে দিয়ে এসো।

—এখনই ছেড়ে দেবো?

—হ্যাঁ, এখনই। আর সেখানে যেতে দিচ্ছিনে!

নির্মলা তখনও একটু ইতস্ততঃ করছে দেখে আরো খানিকটা জোর দিয়ে বলল, তোমার কোনো চিন্তা নেই, মা। তুমি আমাকে চেন না। গোকুল বাউরী যে-সে পাত্তর নয়; যা ধরে তা না করে ছাড়ে না।…বলে, সগর্বে মাথা নাড়তে লাগল। তারপর হঠাৎ আসন্ন সন্ধ্যার ঘনায়মান ছায়ার দিকে নজর পড়তেই লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। দরজার দিকে যেতে যেতে বলল, কালকের দিনটা বাদ দিয়ে, পরশু আবার আসবো। তুমি কালই গিয়ে ওখানকার সম্পক্ক চুকিয়ে দিয়ে এসো।

পরক্ষণেই বাইরে থেকে হাঁক শোনা গেল—খিলডা তুলে দাও, মা।

যেমন বলে গিয়েছিল, একদিন পরে সকাল বেলা গোটা নয়েকের কাছাকাছি গোকুল আবার এসে উপস্থিত। মাথার ঝুড়িটা আগের দিনের চেয়ে বড় এবং বেশ খানিকটা ভারী। দাওয়ার কোলে নামিয়ে রেখেই, মাথার উপর থেকে বিড়ে পাকানো গামছাখানা খুলে হাওয়া খেতে সুরু করল। সাড়া পেয়ে নির্মলা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বিস্ময়ের সুরে বলল, এ সব কী?

—'দাঁড়াও, বলছি', মুখে সেই সদাপ্রসন্ন হাসি।

—ঈস্, কী রকম ঘেমে গ্যাছ! দাঁড়াও, আমি পাখা নিয়ে আসছি।

—শোনো একবার কথা! আমি কি তোমাদের মতো ভদ্দরনোক যে বসে বসে পাখার হাওয়া খাবো। এই আমাদের পাখা…বলে, ঘূর্ণমান ময়লা গামছাটা আরও জোরে চালিয়ে দিল। তারপরেই, যেন কোনো বড় রকমের সর্বনাশ ঘটেছে, এমনি ভাবে চেঁচিয়ে উঠল, ওডা কী করছ! তোমার বাড়ি এসে ঐ পিঁড়ে পেতে বসবো আমি?

চিৎকার শুনে নির্মলা ভয় পেয়ে গিয়েছিল, এবার হেসে ফেলল, কিসে বসবে তাহলে?

দাওয়ার সামনে খোলা উঠোনের উপর জাঁকিয়ে বসে গোকুল তখনই সে প্রশ্নের সমাধান করে দিল। মাথা দুলিয়ে বিজ্ঞের মত বলল, এবার বুঝেছ? আমার বাবা বলতো কি জানো? বলত, মাটিই খাঁটি, আর সব নকল।

খানিকটা জিরিয়ে নিয়ে গোকুল এবার তার ঝুড়ির দিকে মন দিল। একটি একটি করে জিনিসগুলো নামিয়ে রাখতে লাগল—একটা মস্ত বড় কড়া, দুটো ধামা, একগোছ বাঁশের শলা, আরো কী সব টাকিটুকি। তারপর বেরোল একটা গুড়ের হাঁড়ি, দু'চারটে টিনের কৌটা এবং তার পাশ থেকে আর একটা ছোট ঝুড়িতে কিছু আতপ চাল, ডাল, তেল মসলা সৈন্ধব নুন আর কিছু তরি-তরকারী। উপরের জিনিসগুলো খালি করবার পর বেরিয়ে পড়ল প্রায় আধ ঝুড়ি ধান।

নির্মলা এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি, শুধু আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে ছিল। নামানো শেষ হলে বলে উঠল, এ কী করেছ! এ সব দিয়ে কী হবে?

—কোন্‌টা দিয়ে বল? এক এক করে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

—এত ধান কিসের?

—খৈয়ে ধান। খৈ ভাজবে। এই যে কড়া দেখছ না?

নির্মলা হেসে উঠল, ওমা! খৈ ভাজবো কেমন করে!

—যেমন করে সব্‌বাই ভাজে।

—শিখেছি নাকি কোনোদিন?

—আমি শিখিয়ে দেবো।

—তুমি!

—পেত্যয় হচ্ছে না? ভাবছ ওডা মেয়েছেলের কাজ। তোমার গোকুল সব পারে, মা। আশেপাশের দশখানা ঘরে একবার জিজ্ঞেস করে এসো—কোন্ মেয়েছেলেডা আমার চেয়ে ভাল খৈ ভাজে।

নির্মলা বুঝতে পারল, না জেনে বড় কঠিন জায়গায় আঘাত করে বসেছে। তাড়াতাড়ি বলে ফেলল, না, না, তোমার সঙ্গে তাদের তুলনা। কিন্তু আমি কি পারবো?

—খুব পারবে, খুশী হয়ে বলল গোকুল, একবারের বদলে দশবার দেখিয়ে দেবো। তার জন্যে কি?

—আচ্ছা, আর বাকী ওসব কী?

—শুধু খৈ ভাজলেই তো হবে না। তার থেকে তৈরী হবে মোয়া—যারে বলে জয়নগরের মোয়া। এই গুড় আর মসলা পাতি—

হঠাৎ নির্মলার মুখের দিকে নজর পড়তেই মাঝপথে থেমে গিয়ে গভীর বিস্ময়ে বলে উঠল, কী হল !

পরিবর্তনটা এমন আকস্মিক ও এত সুস্পষ্ট যে, কারো চোখেই এড়ায় না। মুহূর্তপূর্বে যে কৌতুক হাসির উজ্জ্বল রেখাগুলো নির্মলার চোখেমুখে দেখা দিয়েছিল, চোখের নিমেষে মিলিয়ে গিয়ে সবটা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল একটি দূরাগত করুণ ছায়া। গোকুল আর একবার তার প্রশ্নের পুনরুক্তি করতেই সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিল। অস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'ও কিছু না। হ্যাঁ, কি বলছিলে, বল।' গোকুল পাছে অন্য কিছু মনে করে কোনোরকম আঘাত পায়, এই ভেবে নির্মলা আবার যথাসাধ্য সহজ হবার চেষ্টা করল। কিন্তু দুজনের মধ্যে সেই আগেকার সুরটুকু আর ফিরে এল না।

গোকুল যে-সব জিনিসের ফেরি করে, তার মধ্যে প্রধান পণ্য জয়নগরের মোয়া। জয়নগর নামক জায়গাটি কোথায় সে জানে না। যেখানেই থাক, এই বেলেঘাটার বস্তির একখানা খোলার ঘরের মধ্যেই তার সবটুকু স্থান-মাহাত্ম্য এসে বাসা নিয়েছে। পাড়ায় পাড়ায় এ-বস্তুটির ভীষণ চাহিদা এবং সেটা ক্রমশঃ বাড়ের মুখে। নিয়মিত যোগান দেওয়া ওর একার পক্ষে আর সম্ভব হয়ে উঠছে না। গ্রামের বাড়িতে দুটি ছেলে আর তাদের মা। সামান্য কিছু জমি-জিরেত আছে; সে-সব আগলাতে হয়। তাদের কাউকে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। তাই সে এমন একজন লোক খুঁজছিল, যে তাকে মোয়া তৈরীর কাজে সাহায্য করতে পারে। নির্মলাকে দেখে এবং ঘটনাচক্রে তার সব কথা জানবার পর, প্রথমে মনে হয়েছিল, এই ব্রাহ্মণ-কন্যাটিকে তার জীবিকার হীনতা থেকে মুক্তি দিয়ে তার ভরণপোষণের ভার নিজের হাতে তুলে নেবে। কিন্তু যখন বুঝল, এ-মেয়ে নিজের পা ছাড়া কিছুতেই অন্য কিছুর উপর ভর করবে না, তখন সে স্থির করে ফেলল, একেই সে শিখিয়ে-পড়িয়ে তার ব্যবসায়ের অংশীদার করে নেবে। নির্মলার উপরে প্রথম থেকেই যে মায়া পড়ে গিয়েছিল, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল শ্রদ্ধা এবং তার ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্ভ্রমবোধ। তার থেকে এই মেয়েটির কর্মক্ষমতার উপরেও একটা বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল। একে দিয়ে

তার 'জয়নগর' পরিকল্পনা সফল হবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না।

এই সহায়-সম্বলহীন বিধবা ব্রাহ্মণকন্যাটির আত্মসম্মানবোধ কতখানি সজাগ, সেটুকু বুঝতে গোকুলের দেরি হয়নি। এর মধ্যে কোনো সাহায্য বা অনুকম্পার গন্ধ পেলে পাছে সে পিছিয়ে যায়, তাই সমস্ত ব্যাপারটাকে নিছক একটি যৌথ কারবারের প্রস্তাব হিসাবে হাজির করল। বোঝাতে চাইল, কোনো নিঃস্বার্থ পরোপকারের বাসনা নিয়ে সে আসেনি, তার একমাত্র উদ্দেশ্য ব্যবসায়, এবং পরিশ্রমের বিনিময়ে নির্মলার যেটুকু ন্যায্য পাওনা, সেইটুকুই তাকে দেওয়া হবে। তার বেশী আর কিছু নয়। নির্মলা অবশ্য শুধু সেইদিকটাই দেখল না। ব্যবসায়-বুদ্ধির অন্তরালে হৃদয় বলে আর একটি অদৃশ্য এবং দুর্লভ বস্তুও তার দৃষ্টি এড়াল না। কিন্তু এ নিয়ে সে আর কোন কথা তুলল না। শুধু চাল, ডাল, সব্জি ইত্যাদির চুপড়িটা চোখের ইসারায় দেখিয়ে মৃদু হেসে বলল, 'ওগুলোও কি মোয়া তৈরীর জন্যে?' ইঙ্গিতটা বুঝলেও গোকুলকে কিছুমাত্র অপ্রতিভ বোধ হল না; যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেছে, এমনি ভাবে কিঞ্চিৎ উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল, 'এই দ্যাখ, আসল কথাটাই ভুলে গেছি। এ তল্লাটে কিছু পাওনা-আদায় আছে। সে-সব সেরে ঘরে ফিরতে বেলা গড়িয়ে যাবে। তারপর কি আর হাঁড়ি ঠেলতে ইচ্ছে করে?' বলে, যেন ভিক্ষা চাইছে এমনিভাবে হাত দুটি জোড় করে যোগ করল, 'এ-বেলাডা মায়ের হাতের দুটি পেসাদ পাবো।'

বলবার পর আর দাঁড়াল না। একরকম পালিয়ে যাবার মত দ্রুত পায়ে বেরিয়ে চলে গেল। দরজার পাশ থেকে চেঁচিয়ে বলল, বারোডার মধ্যেই এসে পড়বো।

সেই রাত্রে গোকুলের প্রস্তাবটা বিনুর মাকে জানাতেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে মত দিলেন। বললেন, মানুষ দেখলেই বোঝা যায়। ও তোকে ঠকাবে না। তুই আর দোমনা করিসনে। এতে ভালোই হবে। কিছু কিছু আমিও তোকে দেখিয়ে দিতে পারবো।

প্রথম দিকে নির্মলাকে যে মোয়াটা তৈরী করতে দেওয়া হল, সেটা মোট চাহিদার সামান্য অংশ। ক্রমে তার উৎসাহ বেড়ে গেল,

জিনিসও ভাল হতে লাগল। সেই সঙ্গে কাজের পরিমাণও বাড়ল। সমস্ত সকালটা যায় খৈ ভাজতে এবং সেগুলো বাছতে। দুপুরবেলা নামমাত্র বিশ্রামটুকু সেরে নিয়েই মোয়ার কড়া নিয়ে বসতে হয়। সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ চলে, কখনো একটু রাতও হয়ে যায়।

গোকুল দুবেলা আসে, ওজন করে ধান দিয়ে যায়, হিসাব মত মোয়া বুঝে নেয়। সপ্তাহের শেষে নির্মলার পাওনা মিটিয়ে দেয়। নির্মলা মাঝে মাঝে বলে, এখন থাকনা তোমার কাছে। পালিয়ে তো আর যাচ্ছ না।

—পালিয়ে না যাই, মরে তো যেতে পারি।

নির্মলার বুকের ভিতরটা ধক্ করে ওঠে। বাইরে সে-ভাব গোপন রেখে হাল্কা সুরে বলে, 'ইস্, মরতে দিচ্ছে কে তোমাকে?' গোকুলের ভারী মজা লাগে। হাসতে হাসতে বলে, শোনো কথা। বুড়ো হয়েছি, এবার যেতে হবে না? এমনিতেই কত পাপ করেছি তার ঠিক নেই। তার ওপরে আবার বামুনের কাছে দেনা রেখে মরবো? সব্বোনাশ।

যত দিন যেতে লাগল, গোকুল মাল তৈরীর কাজটা নিজের হাত থেকে ক্রমশঃ নির্মলার হাতে দিয়ে, শুধু যোগানের দিকে মন দিচ্ছিল। মাস কয়েক পরে একদিন এসে বলল, তোমার হাতে কি যাদু আছে মা? এরই মধ্যে আমার খদ্দেরগুলোকে ভাগিয়ে নিলে! এখন আর গোকুল বুড়োর জিনিস কারো রোচে না। বলে কি জানো? সেই যে সেদিন দিয়ে গেলে, সেইরকমডা এনো।

নির্মলা মনে মনে গর্ববোধ করে, কিন্তু বাইরে প্রতিবাদ জানায়, এ তোমার বানানো কথা, গোকুলকাকা। তোমার ধারে-কাছে ঘেঁষতেও আমার আরো এক যুগ লাগবে।

—না, মা। তোমার হাতখানি বড় মিষ্টি। ওঁর ছোঁয়া যাতে লাগে, তারই স্বোয়াদ বেড়ে যায়। রান্না খেয়েও দেখলাম কিনা? একেবারে অমর্ত্ত।

রোদের দিকে তাকিয়ে গোকুল হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ল। ঝুড়িটা মাথায় তুলতে তুলতে বলল, বেলা হল, আসি। তোমার আবার রান্নাবান্না আছে তো।

বৃদ্ধের মনোগত ইচ্ছেটা নির্মলার কাছে গোপন রইল না। বলল,

তোমাকে যে দুটো খেয়ে যেতে বলবো, আজ আর তার উপায় নেই। ওদিকের পাট বন্ধ।

—কেন? অবাক হয়ে তাকাল গোকুল।

—আজ আমার একাদশী।

—ও, বলে একটা নিঃশ্বাস ফেলে অন্যমনস্কের মত বাইরের দরজার দিকে পা বাড়াল।

সেদিন বিকেলেই গোকুল আবার এসে উপস্থিত। নির্মলা একটা কি সেলাই নিয়ে বসেছিল। মৃদু হেসে বলল, আজ তো আমার ছুটি গোকুলকাকা।

গোকুল সে প্রসঙ্গে না গিয়ে একটা সরাঢাকা ছোট্ট নতুন হাঁড়ি বারান্দার উপর রেখে বলল, তুলে রাখো।

—কী ওটা?

—কিছু না, দুটো মোয়া। কাল সকালে চান করে উঠে মুখে ফেলে জল খেও।

—না, গোকুলকাকা। এটা তুমি নিয়ে যাও।

—আমি খালের ঘাট থেকে ডুব দিয়ে এসে শুদ্ধু কাপড়ে আলাদা করে তোমার জন্যেই করেছি, মা।

—না, না, সেজন্যে নয়।

—তাহলে?

নির্মলা চুপ করে রইল। গোকুল বলল, পেরথম যেদিন এই মোয়ার কথা বলি, সেদিনও তোমার মুখখানা এমনি আঁধার হয়ে গিয়েছিল। নিচ্চই এট্টা কোনো দুঃখু আছে তোমার মনে। ছেলের কাছেও কি সেডা বলা যায় না, মা?

—আমাকে তুমি মাপ করো, গোকুলকাকা। ও-মোয়া আমি মুখে তুলতে পারবো না। আমার খোকা বড় ভালবাসত।

—তোমার খোকা!

—হ্যাঁ, একদিন বায়না ধরে বলল, দিতেই হবে কিনে। ঘরে একটি পয়সা নেই, কি দিয়ে কিনি? উল্‌টে আরো বকেছিলাম। তারপর আর কোনোদিন চায়নি।

বলতে বলতে নির্মলার দুচোখ ছাপিয়ে বেরিয়ে এল জলধারা। গোকুল সেই দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। খোকার কথা এই প্রথম শুনল নির্মলার মুখে, চোখের জলও দেখল এই প্রথম। আর কোনো কথা না বলে হাঁড়িটা তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে নতমুখে বেরিয়ে চলে গেল।

—আট—

আশুতোষবাবুর চাকরির মেয়াদ শেষ হল। দীর্ঘ তিরিশ বছর একনাগাড়ে বর্ষ্টালে কাটাবার পর এবার তাঁর অবসরের পালা। যাবার আগে ছেলেরা তাদের 'সেকেণ্ড স্যর'কে বিদায় অভিনন্দন জানাতে চায়। হলঘরের কাঠের পার্টিশন সরিয়ে সকোলাহলে চেয়ার বেঞ্চি সাজাবার প্রথম পর্ব শুরু হয়েছে। সভা হবে। মাঝে মাঝে সুপার বা বাবুদের কেউ যখন বদলি হয়ে যান, তখনো এই রকম সভার আয়োজন হয়ে থাকে। আজকের ব্যাপারটা আরো বড়। বদলি নয়, বরাবরের মত বিদায় নিচ্ছেন মাষ্টার মশাই। তাই অনুষ্ঠানটাও ব্যাপক। শুধু দুটো ফুলের মালা আর একটা তোড়া দিয়ে কাজ সারা নয়, তার সঙ্গে কলাগাছ ও দেবদারু পাতার গেট, রঙীন কাগজের শিকল, দেয়ালের গায়ে মৌসুমী ফুল আর পাতায় জড়ানো বড় বড় রিঙ। ওদিকে আর একটা বিশেষ আয়োজন চলেছে, বদলির বেলায় যা কখনো হয় না। একটি ছোটখাট বিদায় ভোজ। তাদের বড় আদরের 'সেকেণ্ড-স্যর'কে ঘিরে বসে শেষবারের মত পায়েস খাওয়াবে ছেলের দল। 'ষ্টার বয়'রা তাদের মাসিক এক টাকা সরকারী রোজগার থেকে দরাজ হাতে চাঁদা দিয়েছে, অন্যান্য ছেলেরা, পালপার্বণে যাদের বাড়ি থেকে কিছু কিছু হাতখরচ আসে, তারাও কম দেয়নি। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ওদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা। কাজ যত তার চেয়ে অনেক বেশী কলরব।

সকলেই আছে, সকলেই কিছু না কিছু করছে, নেই শুধু একজন। এই অনুষ্ঠানের কোথাও তাকে দেখা যাচ্ছে না। একটি 'ষ্টার'এর হঠাৎ নজরে পড়তেই বলে উঠল, ওরে, দিলীপ কোথায়? তাকে তো দেখছি না।

তাইতো—অনেকেই তাকিয়ে দেখল এদিক ওদিক। পাশ থেকে কে একজন ব্যঙ্গের সুরে মন্তব্য করল, সে তো আর তোর আমার মত খারাপ ছেলে নয়; সে পড়ছে।

—যাঃ, আজকের দিনে পড়বে কিরে! অসুখটসুক করেনি তো?

কেশব একটা উঁচু টুলের উপর দাঁড়িয়ে কলাগাছে দেবদারু পাতা জড়াচ্ছিল। বলল, সে এসব হৈচৈ ভালোবাসে না। তাছাড়া আশুবাবু-স্যর চলে যাচ্ছেন!

অনেকেই সায় দিল। মাষ্টারমশাই যে সকলকেই ভালবাসতেন এবিষয়ে দ্বিমত না থাকলেও দিলীপের উপর যে তাঁর একটি বিশেষ স্নেহদৃষ্টি ছিল, এটা কারোই অজানা নয়। দিলীপও যে তাঁর প্রতি কতখানি অনুরক্ত তাও সবাই জানে। আর একটি ছেলেকে বলতে শোনা গেল, ওরই সব চেয়ে বেশী ক্ষতি হল। আসছে বছর পরীক্ষা।

সভারম্ভের আগে পর্যন্ত ছেলেদের যত কিছু হাঁকডাক, ছুটোছুটি, সেকেণ্ড মাষ্টার মশাই ঘরে ঢুকবার পর তাঁর দিকে নজর পড়তেই সব যেন মন্ত্রবলে বন্ধ হয়ে গেল। সাহেব তখনো আসেননি। ডেপুটি সুপার সেই শূন্য আসনের ঠিক পাশটিতে আশুবাবুকে নিয়ে বসিয়ে দিলেন। কালও যিনি ছিলেন স্বতঃপ্রফুল্ল, সদাহাস্যময়, একটা রাত যেতেই কে যেন তাঁর মুখের উপর থেকে সব দীপ্তিরেখা নিঃশেষে মুছে নিয়ে গেছে। গালদুটো ঝুলে পড়েছে, চোখের কোলে কালি, নিষ্প্রভ দৃষ্টি, তার মধ্যে কেমন একটা অসহায় ব্যাকুলতা। ছেলেরা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল, সেকেণ্ড স্যরকে যেন চেনা যায় না। দিলীপ বসেছিল একেবারে পেছনের বেঞ্চিতে। ছেলেরা কেউ কেউ তাকে সামনের দিকে বসার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিল। সবচেয়ে উঁচু ক্লাসের ছাত্র হিসাবে, সেইটাই তার স্থান। কিন্তু কিছুতেই তাকে টেনে আনা যায়নি। মাষ্টার মশাই-এর মুখের দিকে একবার মাত্র তাকিয়েই সেই যে মাথাটা নুয়ে পড়েছিল, আর চোখ তুলতে পারেনি।

মিনিট কয়েক পরেই সুপার এসে পড়লেন। একটি ছোট ছেলে তাঁকে এবং আশুবাবুকে নিজেদের বাগানের ফুল তুলে নিজের হাতে গাঁথা মালা দিয়ে সংবর্ধনা জানাল। দু-তিনটি ছেলে স্বরচিত কবিতা পাঠ করে বিদায়ী শিক্ষককে শ্রদ্ধা নিবেদন করল। তার মধ্যে ছন্দ মিল এবং ভাষার ত্রুটি যাই থাক, একটি গভীর আন্তরিকতার সুর সকলের অন্তরে গিয়ে পৌছল। হেডমাষ্টার মশাই তাঁর দীর্ঘদিনের সহকর্মীর

গুণাবলী বর্ণনা করে বক্তৃতা দিলেন। ডেপুটিবাবুও কিছু বললেন। শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে অনেকের ইচ্ছা, দিলীপ কিছু বলুক। সেই তো বর্ষ্টাল স্কুলের উপযুক্ত প্রতিনিধি। অধ্যক্ষের অনুরোধে সে উঠে দাঁড়াল, কিন্তু একটি কথাও বলতে পারল না। আশুবাবুকে যখন আহ্বান জানানো হল তিনি খানিকক্ষণ অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে বললেন, তিরিশ বছর যারা আমাকে ঘিরে ছিল, তারা আমার কাছে নেই, অথচ আমি আছি, একথা এখনো আমি ভাবতে পারছি না। যে-কটা দিন বাঁচবো, তোমরা আমার সমস্ত মন, সমস্ত চেতনা জুড়ে থাকবে। আর আমি কিছু বলতে পারছি না।

সকলের শেষে ঘোষ সাহেব যে সামান্য কটি কথা যোগ করলেন, সেটা আশুবাবুরই প্রতিধ্বনি। বললেন, আশুবাবু বর্ষ্টাল স্কুল ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, একথা প্রত্যক্ষ হলেও সত্য নয়। এটা উনি যেমন বিশ্বাস করতে পারছেন না, আমরাও মেনে নিতে পারি না। এই প্রতিষ্ঠানের বাইরে আমাদের সকলেরই নানা রকম আকর্ষণ আছে, আছে ঘর-সংসার, আত্মীয়বান্ধব এবং তার সঙ্গে কত রকম পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন। ওঁর থাকবার মধ্যে শুধু এই স্কুল আর তার একপাল ছেলে। তার বাইরে ওঁর কোনো অস্তিত্ব নেই। ওঁকে আমরা কোনোদিনই হারাবো না। যেখানেই থাকুন, এই ছেলেগুলোর মধ্যেই ওঁকে আমরা দেখতে পাবো।

কাল সকালেই চলে যেতে হবে। সহকর্মীদের দেখাশুনোর পালা মিটিয়ে সন্ধ্যার পর আশুবাবু সাহেবের বাড়ি গেলেন শেষ বিদায় নিতে। কথাবার্তা যেটুকু হল, বেশীর ভাগই নীরবে, দুজনের মনে মনে। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকবার পর সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, দেশের বাড়িতেই যাচ্ছেন তো?

—আজ্ঞে না। সেখানে কেউ নেই। ঘরদোরও না থাকার মধ্যে।

—তাহলে?

—আপাততঃ গুরুদেবের কাছে যাচ্ছি। তারপর তিনি যা আদেশ করেন।

—সারা জীবনের সব কিছু রোজগার তো গুরুজীকেই দান করে বসে আছেন। বাকী জীবনটা—

আশুবাবু দাঁতে জিব কেটে ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলে উঠলেন, তাঁকে দান করতে পারি আমি! সে স্পর্ধা কোনোদিন মনেও আসেনি। বলতে পারেন, তাঁরই অনুগ্রহের দান তাঁর হাতে তুলে দিয়েছি। তিনি যে গ্রহণ করেছেন, তাতেই আমি ধন্য।

সাহেব অনেকটা নিজের মনে বললেন, তার মানে পেনসন আর প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকা কটাও ঐভাবেই যাবে। যাক, ওসব কথা তুলে যাবার সময় আর আপনার মনে দুঃখ দিতে চাই না। যখন ইচ্ছে হবে একবার ঘুরে যাবেন। আপনার বর্ষ্টাল আপনারই রইল।

আশুবাবুর দুচোখ ছলছল করে উঠল। উত্তরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মত কী একটা বলতে গেলেন, পারলেন না। সাহেব কিছুক্ষণ পরে বললেন, 'আপনি ছিলেন, একটা বিষয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত ছিলাম।'

আশুবাবু চোখ তুলতেই যোগ করলেন দিলীপের কথা বলছি। যাবার আগে পরীক্ষাটা দিয়ে যেতে পারবে কিনা, কে জানে?

—যথাসাধ্য চেষ্টাও করেও আপনার আদেশ আমি পালন করতে পারিনি, স্যর।

—না, না; এর বেশী আপনি আর কী করতে পারতেন? এত অল্প সময়ের মধ্যে যতখানি এগিয়ে দিয়ে গেলেন, সেটা আর কাউকে দিয়ে সম্ভব হত না।

—বিশেষ করে ওর কথাটাই আমাকে সব সময়ে পীড়া দেবে। মাঝে মাঝে চিঠিপত্র লিখে হয়তো আপনাকে বিরক্ত করবো।

—একশবার করবেন। আমিও যখন যা হয়, আপনাকে জানাবো।

আশুবাবুর গুরুদেব সম্বন্ধে তাঁর সহকর্মী মহলে যথেষ্ট কৌতূহল ছিল। থাকাই স্বাভাবিক। কে তিনি, কী নাম, কী তাঁর কীর্তিকলাপ, কোথায় আশ্রম—ইত্যাদি নানা প্রশ্ন প্রায়ই লেগে থাকত সকলের মুখে। আশুবাবু বিব্রত বোধ করতেন; তিনি জানতেন উত্তরটা তাদের খুশী করতে পারবে না। নাম একটা ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু সেটা অন্য দশজনের মত সাধারণ, সাদামাটা। আদিতে 'স্বামী' নেই, অন্তেও নেই 'আনন্দ'।

'আশ্রম' বলতে হুগলী জেলার কোন এক নগণ্য গ্রামের শেষপ্রান্তে গঙ্গাতীরে গাছপালার আড়ালে খানকয়েক টালিছাওয়া মাটির ঘর। কার্যকলাপও প্রচার করবার মত কিছু নয়। গ্রামের বেশীর ভাগ লোক জেলে। জমিজমা নেই; পাশের গ্রামের মুসলমানদের মত কলকারখানায় খাটে না, গয়লাদের মত দুধ-ছানার কারবার করে না, তাদের একমাত্র আশ্রয় গঙ্গা। মৃত্যুর পর সকলেরই, ওদের জীবনে এবং মরণে। কিন্তু মাটি-মা যেমন সহজে বরদা নন, 'বহু খোঁড়াখুঁড়ি'র পর 'শস্যকণার' সন্ধান মেলে, গঙ্গা-মাও তাই। অনেক কাঠখড় দড়াদড়ি না হলে তাঁর 'শস্য'-ভাণ্ডারে পৌঁছানো যায় না। সে সব সরঞ্জাম জোটেনি বলে বছরের পর বছর ধরে গঙ্গা এদের কোলে ঠাঁই দেওয়া ছাড়া আর কিছুই বড় একটা দিতে পারছেন না। তবু গঙ্গাকে এরা ছাড়েনি। বাপ পিতামহের ফেলে যাওয়া খানকয়েক ভাঙ্গা নৌকা আর গোটা কয়েক ছেঁড়া জাল নিয়ে ভোর না হতেই ভাসতে শুরু করে এবং সন্ধ্যার পর প্রায়-শূন্য হাতে ঘরে ফিরে আসে।

এমন সময় ওদের পাড়া থেকে কয়েক গজ দূরে এক সারি বহু পুরনো আম-কাঠালের জটলার ধারে কোত্থেকে এসে ডেরা বাঁধলেন এক 'সাধুবাবা'। অদ্ভুত সাধু। দাড়ি নেই, জটা নেই, গেরুয়া পরেন না, গাঁজা খান না, ধুনি জ্বালান না। সারাদিন ঘরে বসে কী সব পড়েন আর সন্ধ্যার ঠিক আগে চোখে চশমা এবং পায়ে স্যাণ্ডাল পরে গঙ্গার তীর ধরে অনেক দূর চলে যান। সঙ্গীসাথী কেউ নেই। রবিবারে, কিংবা ছুটির দিনে বিভিন্ন ট্রেণ ধরে একদল নানা বয়সী ভদ্রলোক আসেন ওঁর কাছে। সেদিন আর উনি পড়েন না, বেরোন না, প্রায় সারাদিন ধরে চলে শুধু কথাবার্তা।

'ভদ্রলোকের' পাড়াটা এখান থেকে কিছু দূরে। তাঁরা এদিকটায় বড় বেশী ঘেঁষেন না। দুএকজন কালেভদ্রে দেখা দেন, মাছ সংগ্রহ কিংবা আদায় তহশিলের প্রয়োজনে। প্রবীণ লোক। তাঁদের কেউ কেউ সাধুর সঙ্গ লাভ করতে এসে নিরাশ হয়ে ফিরে গেছেন। এ কেমনধারা 'সাধু!' ধর্মকথা নয়, আধ্যাত্মিক আলোচনা নয়, মহাপুরুষ প্রসঙ্গ বা দার্শনিক মতবাদ নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ নয়, এঁর যত কিছু জিজ্ঞাসা ও

আগ্রহ কেবল বৈষয়িক বিষয়ে। গ্রামে এবং আশে পাশে কত লোকের বাস, কী তাদের উপজীবিকা, কি রকম আয়, যুবকেরা কী করে, লেখা-পড়ার হার কত ইত্যাদি। পাল্টা প্রশ্ন করে তাঁরা এই সাধুটির সম্বন্ধে যে সব তথ্য সংগ্রহ করলেন, তাও নৈরাশ্যজনক। এক সময়ে নাকি কোন সরকারী অফিসে চাকরি করতেন; অবসর নেবার পর সংসারের কোলাহল ভাল লাগল না, তাই নিরিবিলি দেখে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। বৃটিশ দাপটের যুগ। 'সরকারী' নামটা শুনলেই মন সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। তাঁরা ফিরে গিয়ে নানা কথা রটিয়ে দিলেন। কেউ বললেন, লোকটা পুলিশের স্পাই, কেউ বললেন, ফেরারী আসামী, যাঁরা আরো বুদ্ধিমান তাঁরা গম্ভীরভাবে রায় দিলেন, স্পাই, তবে পুলিশের নয়, ওর আসল মতলব নতুন কোনো ট্যাকস বসাবার মাল-মসলা যোগাড়-করা। অতএব শত হস্তেন—। যে-কটি নিষ্কর্মা যুবক তাস পিটে আর থিয়েটারে রিহার্সাল দিয়ে দিন গুজরান করছিল এবং একদিন সদলবলে এসে সাধুটিকে বাজিয়ে দেখবার মতলব আঁটছিল, তাদের সাবধান করে দিলেন প্রবীণ অভিভাবকেরা—ভুলক্রমেও যেন এদিকটা কেউ না মাড়ায়, কোথাকার কোন স্বদেশী হাঙ্গামায় ফাঁসিয়ে দিতে কতক্ষণ!

'সাধু'ও 'ভদ্রপাড়া'য় না ঘেঁষে আস্তে আস্তে এগিয়ে এলেন জেলে-পাড়ার দিকে। তারা ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'সাধুবাবা' নিজে থেকে এসে পায়ের ধুলো দিয়েছেন তাদের কুঁড়েঘরের আঙিনায়! কিন্তু তারপরেই রীতিমত আশ্চর্য হয়ে গেল যখন উনি ঠাকুর-দেবতা, নামকীর্তন, পূজা-পাঠ বা ঐ জাতীয় কোনো প্রসঙ্গে না গিয়ে সোজাসুজি ঘর-সংসারের কথা পাড়লেন, জানতে চাইলেন সারা বছর মাছ ধরতে হলে কখানা নৌকা চাই, কটা জাল, মোটামুটি খরচ কত, কার কী পরিমাণ দেনা আছে মহাজনের ঘরে। সকলের শেষে অকপটে স্বীকার করলেন তিনি 'সাধু' নন, সাধারণ সংসারী মানুষ, ওদের মধ্যে থেকে আপন জনের মত বাকী কটা দিন কাটিয়ে দিতে চান। তারপরেও আরো কিছুদিন গেলে তাদের সন্দেহ ঘুচতো। কিন্তু বুদ্ধির দৌড় তো বেশী নয়। তাই শেষটায় আর দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। এগিয়ে এল খোলা মনে একরাশ অভাব-অভিযোগের লম্বা ফিরিস্তি নিয়ে। সাধুর নতুন নামকরণ হল 'বাবাঠাকুর।'

ইতিমধ্যে তারা টের পেয়েছিল, প্রতি মাসের প্রথম দিকে কতগুলো করে মণিঅর্ডার আসে আশ্রমের ঠিকানায়। সেই দিকেই পড়ল ওদের লোলুপ দৃষ্টি। দলবেঁধে এসে প্রার্থনা জানাল, বাবাঠাকুর যদি দয়া করেন, তাহলে তাদের সব কষ্ট দূর হতে পারে। তিনি বললেন 'ও টাকা তোমাদের দেবার উপায় নেই। ওর অনেক ভাগীদার। (হেসে একগোছা মণিঅর্ডার ফরম দেখিয়ে দিলেন) তোমাদের টাকা তোমরা যোগাড় করবে।

—আমরা কোথায় পাবো! একেবারে আকাশ থেকে পড়ল মাতব্বরের দল।

—পাবে ব্যাঙ্ক থেকে।

ব্যাঙ্কের নাম শুনেছে কেউ কেউ, শহরে গিয়ে চোখেও পড়েছে দু-একজনের, মস্ত বড় পাকা বাড়ি, গেটে বন্দুকধারী দারোয়ান, সামনে দাঁড়িয়ে আছে মোটর। যারা ঢুকছে আর বেরোচ্ছে তারা সব বড় বড় বাবু, জাঁদরেল চেহারা, জমকালো পোষাক-আসাক। সেখানে পাত্তা পাবে তাদের মত গরীব মানুষ! বাবাঠাকুর কি ঠাট্টা করছেন তাদের সঙ্গে?

তিনি বললেন, সে ব্যাঙ্ক নয়, এ অন্য ব্যাঙ্ক। তোমরাই হবে তার মালিক, তোমাদেরই কারো ঘরে বসবে তার আফিস। ধারও নেবে তোমরা, তার স্থদ থেকে যে লাভ হবে সেটাও তোমাদের।

একজন, যে ওদের মধ্যে সব চেয়ে চালাক, হেসে বলল, টাকাটা আসবে কোত্থেকে?

—সহরের বড় ব্যাঙ্ক থেকে। ধারও বটে, মূলধনও বটে। তার জন্যে তোমাদের সবাইকে জোট বাঁধতে হবে। টাকা যেটা আসবে, তোমাদের সকলের টাকা, সমান অংশ, সমান অধিকার। তা দিয়ে যা কিছু কেনা হবে, নৌকো, জালের স্থতো, বাঁশ দড়ি, আলকাৎরা—তারও মালিক ঐ জোট, যার নাম সমবায় সমিতি। মাছ যা উঠবে, একসঙ্গে নিয়ে যাবে সহরে, বিক্রী করে যে টাকা পাবে, তার থেকে ব্যাঙ্কের কিস্তি শোধ দিয়ে বাকীটা ভাগ হয়ে যাবে তোমাদের অর্থাৎ সমিতির মেম্বরদের মধ্যে।

মাতব্বরদের চোখে মুখে ঔৎসুক্যের আলো ফুটে উঠল, তার মধ্যে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বপ্ন। সঙ্গে সঙ্গেই আবার ম্লান ছায়া পড়ল তার উপর। এত বড় কাণ্ড করবার মত কে আছে তাদের মধ্যে? সবাই নিরক্ষর মুখ্যু। লেখাপড়া, তদ্বির-তালাস, হিসাব-পত্তর—ঝামেলা তো কম নয়। ঠাকুরমশাই বললেন, আমি তোমাদের সাহায্য করবো।

১৯২২-২৩ সালের কথা। গ্রামাঞ্চলে সমবায় ঋণ সমিতি গঠনের দিকে কিঞ্চিৎ নজর দিয়েছেন ইংরেজ সরকার। মহাজনেরা যথাশক্তি বাধা দিচ্ছেন। লাল ফিতার দৌরাত্ম্যও কম নয়। সরকারী মহলে একদা কিঞ্চিৎ প্রতিপত্তি ছিল মৈত্র মশায়ের—(ঐটাই তাঁর পৈতৃক পদবী)—সৌহার্দ্যও ছিল সহকর্মীদের সঙ্গে। তারই বলে অনেক অনাবশ্যক জটিলতার হাত এড়িয়ে আবশ্যক মঞ্জুরিটা অল্পদিনেই এসে গেল। একটা অজ্ঞাত এবং অবজ্ঞাত ক্ষুদ্র গ্রামের কতগুলো শ্রীহীন ভাঙা কুঁড়েঘরের এককোণে গড়ে উঠল এ তল্লাটের প্রথম কো-অপারেটিভ ক্রেডিট্ সোসাইটি।

ছোট-বড় সব রকম ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের আসল মূলধন টাকা নয়, সততা; এই দুর্ভাগা দেশের জাতীয় চরিত্রে যার একান্ত অভাব। মৈত্র মহাশয়ের সে কথা জানা ছিল এবং সেই জন্যে গোড়া থেকেই ওদিকটায় নজর রেখেছিলেন। এই লোকগুলোর অপরিসীম অজ্ঞতাও তাঁকে কম বাধা দেয়নি। সেটা দূর করবার জন্য এদের কয়েকটি ছেলেকে কিছুটা লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থাও তাঁকে করতে হয়েছিল। বাপ-দাদার পেশা থেকে সরিয়ে না এনে কিংবা তার উপরে কোনো রকম অনিচ্ছা বা অশ্রদ্ধার উদ্রেক না করিয়ে যতটা শেখানো যায়, এই ছিল তাঁর লক্ষ্য; যাতে করে কালক্রমে তাদেরই কাউকে ব্যাঙ্কের কাগজপত্রের দিকটার ভার ছেড়ে দেওয়া যায়।

এই গ্রামের ব্রাহ্মণ-পাড়ায় একটি পরিবারের সঙ্গে আশুবাবুর দূর-সম্পর্কের আত্মীয়তা ছিল, এবং সেই সূত্রে কিঞ্চিৎ আর্থিক যোগাযোগও রাখতে হয়েছিল। তাদেরই কারো অসুখের খবর পেয়ে একটা রবিবার এখানে কাটাতে এসেছিলেন। সন্ধ্যাবেলা গঙ্গাতীরে বেড়াতে গিয়ে একটি বৃদ্ধ জেলের সঙ্গে কথায়-বার্তায় 'বাবাঠাকুরের' যে বর্ণনা শুনেছিলেন,

তাতেই তাঁর দিকে আকৃষ্ট হন। আলাপ-সালাপের পর আকর্ষণ ক্রমশঃ গাঢ় হতে থাকে। পরের আর একটা রবিবার সকালের দিকে এসে দেখেন ঠাকুরের ঘর-ভর্তি বাইরের লোক। বেশীর ভাগই তার মত নীচু-স্তরের চাকরিজীবী। নানা কাজের ভার তাঁদের উপর। সেই সম্পর্কে উপদেশ ও নির্দেশ নিতে এসেছেন গুরুর কাছে। মন্ত্রদাতা বা দীক্ষাদাতা গুরু নন, যে যে কাজে তারা ব্রতী, তারই প্রেরণা ও পরামর্শদাতা, সেই অর্থে গুরু। কেউ কোন্ এক বস্তিতে নাইট-স্কুল চালান, কেউ কোনো কোনো নিম্নবিত্ত ভদ্রপরিবারের মেয়েদের মধ্যে কিছু কিছু কাঁচামাল যুগিয়ে তৈরী মাল বাজারে দিয়ে তাদের কিঞ্চিত বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা করে থাকেন, কারো কারো গোপন কর্মস্থল মার্চেন্ট অফিসের কেরাণী সমাজ। অল্প সুদে এবং ক্ষেত্র বিশেষে বিনাসুদে কিছু কিছু ধার দিয়ে, রাঘব-বোয়ালরূপী পশ্চিমী দারোয়ান এবং নেকড়েরূপী কাবুলিওয়ালার কবল থেকে ধীরে ধীরে সেব দেনায়ডোবা লোকগুলোকে বের করে আনার দুরূহ কাজের ভার নিয়েছেন তাঁরা। টাকাটার যোগান দেন মৈত্রমশাই। নিজের টাকা নয়, দশজনের কাছ থেকে যা আসে। এমনি একজন 'শিষ্য' বসেছিলেন পিছন দিকে; মাথায় একটা ব্যাণ্ডেজ। গুরু সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মাথায় ঐ আশীর্বাদী নির্মাল্যটি কার হাতের? পাঁড়েজী না খাঁ-সাহেব? দ্বারভাঙ্গা না আফগানিস্তান?

—আজ্ঞে, আফগানিস্তান হলে কি আর এত অল্পের ওপর দিয়ে যেত? এটা আমাদের বড় দারোয়ানজীর ভাড়াকরা লেঠেল। অবিশ্যি বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি।

—'ওদিকেও বুঝি অসুবিধে হচ্ছে?' ···বুড়ো আঙুলের উপর তর্জনী দিয়ে টাকা বাজাবার ভঙ্গি করলেন।

—খুব। এ মাসে নতুন মক্কেল একটাও জোটেনি, পুরনোর মধ্যেও তিনজনকে ছাড়িয়ে এনেছি।

—আহা বেচারা! তুমি তার আঁতে ঘা মারবে, আর সে বুঝি হাত-পা কোলে করে চুপ করে বসে থাকবে?

ঘরের আরেক দিকে একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের বলিষ্ঠ যুবকের দিকে ফিরে বললেন, মহীনের কী খবর? ঘাড়ের ব্যথা সেরেছে?

ছেলেটি সলজ্জ ভাবে মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

কে একজন জিজ্ঞাসা করল, ঘাড়ে ব্যথা হল কেমন করে?

—ও, তা জান না বুঝি? মহীনবাবুর বিদ্যাসাগর হবার সখ চেপেছিল। হাওড়া ষ্টেশনে এক বাবু ছোট্ট একটা সুটকেসের জন্যে কুলী ডাকছিলেন। ওর সেটা সহ্য হল না। বলে বসল, আমাকে দিন, কুলীভাড়াটাও দিতে পারেন ইচ্ছা করলে। বাবুটির কেমন সন্দেহ হল, ছোকরার কোনো মতলব আছে নিশ্চয়ই। কোন কথা না বলে মালটা কুলীর ঘাড়েই চাপিয়ে দিলেন। কুলী ব্যাপারটা অত সহজে ছেড়ে দিল না। মুখ ভেংচে কী একটা ঠাট্টা করতেই ও-ও তেড়ে জবাব দিল। তারপর যা হয়ে থাকে। ভিড়ের মধ্যে পেছন থেকে ঘাড়ের ওপর কিঞ্চিৎ দাওয়াই। তবে বাঙালের ঘাড় তো, অত সহজে সোজা হবার নয়। এবারে নিয়ম করে কুলীগিরি চালাচ্ছে মহীনচন্দ্র। আফিস ছুটির পর পাঁচটা ছত্রিশের ট্রেণে বাড়ি ফিরত, এখন ছটা বিয়াল্লিশের গাড়ি ধরতে হচ্ছে। এক ঘণ্টা মোটটানা চাকরি।

এক ভদ্রলোক জানতে চাইলেন, মোট বইতেও তো লাইসেন্স্ লাগে। পুলিশে ধরছে না?

—ধরতে পারলে তো? মহীন যে সেখানে মোটওয়ালার নিজের লোক। কারো ভাই, কারো বড় কুটুম্ব। 'চলুন জামাইবাবু, আসুন দিদি, এইটুকু মাল, কুলী কী হবে?' বলে, বাঁ কাঁধের ওপর একটা পেল্লায় ট্রাঙ্ক্ তুলে আর ডান হাতে বিছানাটা জাপটে ধরে এগিয়ে চলল। এর পরে আর লাইসেন্স্ চাইবে কে?

মহীন বলল, রেলের বাবুরা কেউ কেউ জেনে গেছে। কিছু বলে না।

—বলবে কী? ওরাও ছা-পোষা মানুষ। গরিব ভদ্রলোকের ওপর তাদের কুলী-পল্টনের জুলুমবাজি চোখের ওপর দেখছে তো? সঙ্গে যদি একটু বেশী মোট-ঘাট থাকে, একেবারে কাঁদিয়ে ছেড়ে দেয় ব্যাটারা।

—'সত্যি; মহীনবাবু একটা কাজের কাজ করছেন,' প্রশংসার সুরে কে একজন বলে উঠলেন, 'ওঁর মত আর দু'চারটি ছেলে যদি এগিয়ে আসে, কুলীগুলো শায়েস্তা হয়ে যাবে।'

মৈত্রমশায় বললেন, সে চেষ্টাও চলছে। মহীন বসে থাকার ছেলে নয়। কী হল? জোটাতে পারলে দু-একটি সাকরেদ?

– আজ্ঞে, আসছে হপ্তা থেকে দুজন বন্ধু জুটবে বলে মনে হচ্ছে। আসতে তো চায় অনেকেই। কিন্তু ভারী মোট বইবার মত গায়ের জোর থাকা চাই। সে রকম লোক পাওয়া শক্ত। তারপর কুলীগুলো ক্ষেপে আছে। তার জন্যও তৈরী থাকতে হচ্ছে।

মহীন উঠে এসে কতকগুলো রেজগি মৈত্রমশায়ের পায়ের কাছে রেখে বলল, পাঁচ টাকা দশ আনা আছে; গেল হপ্তার রোজগার।

মৈত্রমশায় জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।

মহীন যোগ করল, সাহায্য নেবার মত গরিব পার্টি বেশী ছিল না, দুচারটি সৌখীন বড়লোক ধরলাম। কিছু বখসিস্ পাওয়া গেল। না দিয়ে ছাড়লেন না।

—'বাঃ, তাহলে রোজগারও হচ্ছে কিছু? তা, এক কাজ কর। একদিনের মত তোমার চাকরিটা বাদ দাও। এখানে কত আছে বললে? পাঁচ টাকা দশ আনা। আচ্ছা; তার সঙ্গে এই নাও চার টাকা ছ আনা। এই টাকাটা তোমাকে বৌবাজারে একটা বাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে। দাঁড়াও ঠিকানাটা লিখে দিচ্ছি।'...বলে একটা খাতার পাতা ওলটাতে লাগলেন এবং তারই ভিতর থেকে একটা নাম-ঠিকানা খুঁজে একটুকরা কাগজে লিখে দিয়ে টাকা সমেত এগিয়ে ধরলেন মহীনের দিকে। বললেন, গলিটা খুঁজে পেতে একটু কষ্ট হবে। একটা অত্যন্ত পুরনো বাড়ির একতলার পেছন দিকে থাকেন ভদ্রলোক। ভেতরে চলে গিয়ে টাকাটা ওঁর হাতে দিও, আর কাউকে দিও না।

বেলা বাড়তেই অনেকে উঠে পড়লেন। একটু পরে কোলকাতার দিকে যাবার একটা ট্রেণ ছিল। তাতেই ফিরবেন বেশীর ভাগ। যাবার আগে প্রায় সকলেই কিছু কিছু টাকা 'গুরুদেবের' পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করলেন। তিনি কারো মাথায় হাত রেখে, কারো বা বাহু ধরে, পাত্র বিশেষে নানা রকম সরস মন্তব্য এবং সস্নেহ পরিহাসের ভিতর দিয়ে একে একে সবাইকে বিদায় দিলেন। দু'চারজন যাঁরা রয়ে গেলেন, উঠে গিয়ে বোধহয় রান্নাবান্নার তদারকে লাগলেন। মৈত্রমশায়ের একটি

ভৃত্যজাতীয় লোক আছে। তার নাম মধু। রবিবারে তার বেশ কিছু কাজ বাড়ে।

আশুবাবুর উঠবার তাড়া ছিল না। এতক্ষণ এক কোণে বসে সব নিঃশব্দে লক্ষ্য করছিলেন এবং গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনছিলেন তাঁদের কথাবার্তা। এবার এগিয়ে এসে কুণ্ঠার সঙ্গে বললেন, আমাকে কী কাজ দিচ্ছেন ?

পরিচয়াদি আগেই হয়েছিল। মৈত্র লঘু সুরে বললেন, 'আপনি যা করছেন মশাই তার চেয়ে শক্ত কাজ আর কী আছে ? একপাল গেছো বাঁদর ধরে রেখেছে গবর্মেণ্ট। আপনারা তাদের ন্যাজ খসিয়ে মানুষ বানাবার চেষ্টা করছেন।' বলে উচ্চরোলে হেসে উঠলেন। তারপর মিনিটখানেক কী ভেবে নিয়ে একেবারে অন্য সুরে বললেন, কিন্তু মানুষ হচ্ছে কি ?

—জানি না। আমরা শুধু চাকরি করে যাচ্ছি, এই পর্যন্ত।

—তা'ছাড়া আর কীই বা করতে পারেন আপনারা ? তার পরের ভাবনা যাদের, তারা ভাবেন না। সরকারী দপ্তরে ঐ জিনিসটার বড় অভাব। সব আছে, নেই শুধু 'ইমেজিনেশন্'। আমি নিজেই তার সাক্ষী।

বর্ষ্টালের নীতি, পদ্ধতি এবং দৈনন্দিন কর্মসূচী নিয়ে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হল। অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে হল আশুতোষকে। তাঁর নিজের মনে যে-সব কথা বহুদিন থেকে আনাগোনা করছিল, সাহেবের সঙ্গে মাঝে মাঝে যে-সব আলোচনা হয়ে থাকে, তারও কিছু কিছু তিনি এই প্রসঙ্গে খুলে বললেন। শুনবার পর মৈত্র বললেন, ছেলেগুলোর সম্বন্ধে আমার কৌতূহল বেড়ে গেল। সময় পেলে মাঝে মাঝে আসবেন। আরো শুনবো।

সেই থেকে শুরু। তারপর সুযোগ পেলেই একদিনের ছুটি নিয়ে এখানটা একবার ঘুরে যেতেন আশুবাবু। মৈত্রমশায়েরও এই প্রাণখোলা লোকটিকে ভাল লেগেছিল। অন্য অনেকের মত আশুবাবুও ওঁকে মনে মনে 'গুরুদেব' বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে তাঁর ফরমাস মত দু-একটা ছোট-খাট কাজ করে দিয়ে তৃপ্তি পেতেন। কিন্তু বেশী বা ভারী কাজের ভার মৈত্র ওকে দিতেন না। বলতেন, 'তোমার তো দশটা পাঁচটার

কলমপেষা নয়, চব্বিশ ঘণ্টার চাকর। করবে কখন?' কিন্তু কিছু একটা না দিতে পারলে আশুবাবুর মনে স্বস্তি ছিল না। তাই কাজ বা 'সার্ভিস্'এর বদলে দিতেন অর্থ। সামান্য উপার্জনের একটা মোটা অংশ চলে যেত গুরুদেবের আশ্রমে। প্রথম দিকে তিনি মাঝে মাঝে আপত্তি জানাতেন, কিন্তু আশুবাবু দুঃখ পান বলে ইদানিং হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত বলেছিলেন, তুমি এখন যা করছ, কর। সরকার যেদিন ছুটি দেবেন, ততদিন যদি বেঁচে থাকি, এসো। ভেবে দেখা যাবে, কী করা যায়। আর একটা কাজ করতে পারবে? তোমাদের ওখান থেকে যে ছেলেগুলো বেরিয়ে যায়, যতটা পার, তাদের সঙ্গে যোগ রাখবার চেষ্টা ক'রো।

আশুবাবু আশ্রমে যতবার এসেছেন, খালি হাতে। বেশ কিছুদিন থেকে আত্মীয়ের বাড়িতে ওঠা ছেড়ে দিয়েছিলেন। সোজা এখানেই উঠতেন। সকালে এসে সন্ধ্যার দিকে চলে যেতেন, জিনিসপত্রের দরকার হত না। আজ তাঁর সঙ্গে একটা ছোট্ট তোরঙ্গ আর সতরঞ্চি জড়ানো হালকা বিছানা দেখে মৈত্রমশায় বলে উঠলেন, কী ব্যাপার? জেল থেকে খালাস পেলে?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ, বলে আশুবাবু গুরুদেবের পায়ের ধুলো নিলেন।

—বাঁচালে বাপু। এখানকার রান্না-ডিপার্টমেণ্ট নিয়ে বড় বিব্রত হয়ে পড়েছি। মধু অবিশ্যি আছে, কিন্তু একজন পাকাপোক্ত ম্যানেজার দরকার। প্রায়ই লোকজন থাকে। তা, তোমাকে পেয়ে বর্তে গেলাম। হাজার হলেও সমঝদার লোক।...বলে হেসে উঠলেন।

আশুতোষের ভোজনানুরাগ এখানেও রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল। তারই প্রতি গুরুর এই সস্নেহ ইঙ্গিতে তিনি সলজ্জ মুখে বললেন, রান্নাঘরের আসল জিনিসের ওপর আমার আকর্ষণ আছে, কিন্তু তার খবরদারির বিদ্যেটা তো শিখিনি।

—এবার বাধ্য হয়ে শিখবে। তা না হলে নিজেরাই ঠকবে। আমারও কিঞ্চিৎ স্বার্থ আছে। বুড়ো বয়সে একটু ভাল-মন্দের লোভ কার না হয়?

আশুতোষ জানেন, এটা গুরুর অতিভাষণ। আহার সম্বন্ধে তিনি

অত্যন্ত সংযমী এবং সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী। এদিকে যে আয়োজনই হোক, অনেকদিনের পুরনো বন্ধু সনাতন ইকমিক-কুকারটি ছাড়া অন্য কারো রান্না তাঁর রোচে না। সে ব্যবস্থাটুকুও তিনি নিজের হাতে করে নেন, মধুকে বা অন্য কাউকে হাত লাগাতে দেন না। ছোঁয়ামেলার বাধা কিছু নেই। এইটাই তাঁর নীতি ও অভ্যাস। অবশ্য এ নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করতে ছাড়েন না। ইক্‌মিকের নামমাত্র উপকরণ দিয়ে নিজের সামান্য প্রয়োজনটুকু মিটিয়ে মাঝে মাঝে রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে উঁকি দেন। ছুটির দিনের দুপুর বেলা কজন 'শিষ্য' মিলে সেদিন হয়তো একটু বিশেষ আয়োজন করেছেন। গুরু ছদ্ম বিস্ময়ের সুরে বলে ওঠেন, ঈস, করেছ কি! এ যে রীতিমত 'ফিস্‌টি'। তা, আমাকে তো একবার ডাকলে না, বাপু।

ওঁদের ভিতর থেকে কেউ পাল্‌টা পরিহাস করেন, আপনাকে ডেকে কী লাভ হত? অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্‌।

—আহা! একবার পরখ করেও তো দেখতে পারতে সত্যিই অরসিক কিনা। থাক, তোমরা খাও, আমি আর নজর দিতে চাই না··· বলে হাসতে হাসতে নিজের ঘরে চলে যান। কখনো বা দরজার সামনে বসে ওদের খাওয়া দেখেন এবং এর ওর সম্বন্ধে নানারকম সরস মন্তব্য করে ভোজনের আসর জমিয়ে তোলেন।

মৈত্রমশাই মুখে যাই বলুন, তাঁর রন্ধন-ডিপার্টমেণ্টের ভার নেবার জন্যে আশুবাবুকে যে আসতে বলেননি, সেটা কদিন পরেই বোঝা গেল। সন্ধ্যার পর বর্স্টাল সম্বন্ধে কথা পাড়লেন এবং সেই প্রসঙ্গে জানতে চাইলেন, ওখান থেকে বেরোবার পর ছেলেগুলো সব যায় কোথায়?

আশুবাবু বললেন, কেউ কেউ বাড়ি ফিরে যায়।

—সে আর কজন? বেশীর ভাগই তো বাপ-তাড়ানো মা-খেদানো। অনেকে বোধ হয় সে সব বালাই জন্মাবার পরেই চুকিয়ে ফেলেছে। তাদের নিয়ে তোমরা কী কর?

—তাদের জন্যে বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নেই। নামমাত্র একটা 'আফ্‌টার-কেয়ার'এর আস্তানা আছে। সেখানে কিছুদিন থাকতে পায়।

—তারপর?

—তারপর আর কী? যেখানে খুশি চলে যায়। অবিশ্যি ওঁরা কিছুটা চেষ্টা করেন, যদি কোনো কাজ-কর্ম জুটিয়ে দেওয়া যায়।

—কাজ-কম্ম শেখাবার বহর যা শুনলাম তোমার কাছে, বিশেষ কিছু জোটে বলে তো মনে হয় না। তাছাড়া ঐ বয়সের একটা ছেলে, কি কাজই বা করতে পারে, যদি না তাকে আরো খানিকটা এগিয়ে দেবার ব্যবস্থা থাকে? সে রকম কিছু আছে কি? ইংরেজিতে যাকে বলে ফলো-আপ্ কোর্স্।

—আজ্ঞে না, সে সব কোনো ব্যবস্থা নেই।

—তার মানে সোজা কথায়—যাও বাবা, চরে খাওগে।

আশুবাবু জবাব দিলেন না, দেবার মত কিছু পেলেন না। এ দিকটা তিনিও ভেবেছেন। সরকারী ভাষ্য অনুসারে যারা কৈশোরেই অ্যান্টি-সোস্যাল-এর দলে চলে গেছে, কটা বছর আটকে রেখে একটু ড্রিল, ছু পাতা 'অজ-আম', আর তার সঙ্গে গোটা কয়েক পেরেক ঠোকা কিংবা বার ছুই মাকু চালানোর মহড়া দিয়ে রাস্তায় ছেড়ে দিলেই কি তাদের সমাজ-বিরোধী প্রবৃত্তির চিকিৎসা হয়ে গেল? ঐখানেই সরকারের সব দায়িত্ব শেষ? বর্স্টাল স্কুলস্ অ্যাক্টে যাদের সাজা, অর্থাৎ কুড়ি একুশ বছরে যারা বেরিয়ে যায়, তাদের তবু ডান হাত বাঁ হাত জ্ঞান হয়েছে, কিন্তু ঐ ইনডাষ্ট্রিয়াল গ্রুপের ছেলেগুলো? ষোল বছর হতেই এক একজনকে যখন ছেড়ে দেওয়া হয়, সে বিশ্বাস করতেই চায় না, আজ থেকে ঘণ্টা বাজিয়ে, থালা সাজিয়ে কেউ তাকে খেতে ডাকবে না, কিংবা গায়ের জামা, পরনের প্যান্ট ছিঁড়ে গেলে ধমক দিয়ে বলবে না, গুদামে গিয়ে বদলে নিয়ে আয়। দোতলার হলঘরে তার ছোট্ট বিছানাটি, যার প্রতিটি বস্তু সে এতগুলো বছর নিজের বলে জেনে এসেছে, কম্বল ছুখানা কত যত্নে পাট করে, তার উপরে নিজের হাতে কাচা ধবধবে ওয়াড় পরানো বালিসটি সাজিয়ে রেখেছে, সব ঐ পড়ে রইল। 'আমাদের স্কুল', 'আমাদের গ্রীণ হাউস' বলে যাকে জানত, এই মুহূর্তে তার সঙ্গে সব সম্পর্কে শেষ হয়ে গেল! এবার কোথায় যাবে সে, কে ছুটো খেতে দেবে, রাত্রির অন্ধকারে কোনখানে জুটবে একটু মাথা গুঁজবার ঠাঁই?

খালাসের দিন ছ আনা পয়সা মাত্র সম্বল করে সাহেবের ঘর থেকে

বেরিয়ে, বর্স্টালের খাকী পোষাকে নয়, দীর্ঘ দিন আগে নিয়ে আসা নিজের সেই জীর্ণ মলিন জামাকাপড়টুকু কোনো রকমে জড়িয়ে এই সব ছেলে যখন ফ্যালফ্যাল চোখে তাকাতে তাকাতে গেট পেরিয়ে অজানা পথে পা দিয়েছে, তাদের মুখের উপর এই প্রশ্নগুলো স্পষ্ট দেখতে পেয়েছেন আশুবাবু। নিঃশব্দে সরে গেছেন সেখান থেকে। যদি কেউ মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করে বসে, কী উত্তর দেবেন তিনি? এর কোনো সমাধান তাঁর জানা নেই।

আজ সেই বর্স্টাল ছেড়ে দূরে চলে এসেও সেই মুখগুলো চোখের উপর ভেসে উঠছিল। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। গুরুর কণ্ঠস্বরে হঠাৎ চমক ভাঙল। মৈত্রমশাই বলছিলেন, তোমার কথায় যদ্দূর বুঝলাম, ওখানে যে-সব ট্রেড তোমরা শেখাতে, তার মধ্যে প্রেস্ আর বুক বাইণ্ডিং—ভদ্রঘরের ছেলেদের পক্ষে এই দুটোই যাহোক একটু কাজে লাগবার মত। তাছাড়া এগুলো মোটামুটি শিখতে খুব বেশী সময় লাগে না। শিখতে পারলে মোটা ভাত কাপড়ের ব্যবস্থাও হতে পারে। কী বল?

আশুবাবু সায় দিলেন এবং বললেন, বর্স্টাল থেকে বেরিয়ে যাবার পর অনেক ছেলে আমাকে চিঠিপত্তর লেখে। আপনি বলবার পর আমিও যতদূর পারি তাদের সঙ্গে যোগ রেখেছি। তার থেকে দেখেছি, ঐ দুটো সেকশনে যারা ছিল, তাদের মধ্যে দু-একজন ছোটখাটো প্রেস-এ ঢুকতে পেরেছে। বাকী 'কামান'এর ছেলেগুলো কোথাও পাত্তা পাচ্ছে না।

—কেমন করে পাবে? সেখান থেকে যে বিদ্যে তারা নিয়ে গেছে, তা দিয়ে কিছুই হয় না। যাক্, তুমি এক কাজ কর। কোলকাতায় গিয়ে বই পাড়ার কাছাকাছি অল্প ভাড়ায় একটা বাড়ি ঠিক করে একটি ছোট্ট প্রেস্ খুলে দাও, তার সঙ্গে বই বাঁধাই। দুএকজন ট্রেণ্ড লোক রাখো, আর তোমার পুরনো মক্কেল যতগুলো জোটাতে পার, নিয়ে এসো। বাঁদরগুলোর একটা হিল্লে হোক।

আশুবাবু নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন। বর্স্টাল প্রসঙ্গে গুরুর সঙ্গে কদিন থেকেই তাঁর নানা আলোচনা চলছিল। কিন্তু এরকম একটা

পরিকল্পনা তিনি মনে মনে স্থির করে ফেলেছেন, অনুমান পর্যন্ত করতে পারেননি। শিষ্যের অভিভূত দৃষ্টির দিকে চেয়ে মৈত্র বললেন, কী ভাবছ? পারবে না?

—আজ্ঞে, আপনার আশীর্বাদ থাকলে কেন পারবো না? ভাবছিলাম—

—টাকা পয়সা কোত্থেকে আসবে! সেজন্যে আটকাবে না। আজ পর্যন্ত তুমিও তো কম টাকা দাওনি।

আশুবাবু প্রতিবাদস্বরূপ সবিনয়ে কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় জেলেপাড়া থেকে কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কের কজন মেম্বর সোরগোল করতে করতে এসে পড়ল। মৈত্র বললেন, এখন আর কথা হবে না। এ সম্বন্ধে যতখানি খোঁজ খবর নেওয়া দরকার, আগেই সেরে রেখেছি। খরচপত্রের খসড়াও মোটামুটি তৈরী। তোমার সঙ্গে বসে ফিনিসিং টাচটুকু দিতে শুধু বাকী। তার আগে বাড়িটা ঠিক করা দরকার। তুমি বরং কাল সকালেই চলে যাও। আমার কাছেও খান দুই বাড়ির খবর আছে। ঠিকানা দিয়ে দেবো।

বাড়ি পেতে দেরি হল না। শুধু বাড়ি নয়, তার সঙ্গে একটি ছোট প্রেস্। মালিক হঠাৎ মারা যেতে তার ছেলেরা আর চালাতে চাইল না। একেবারে তৈরী জিনিস; সুবিধা দরেই পাওয়া গেল। নীচেটায় যন্ত্রপাতি, আফিস, পেছন দিকে রান্না-খাওয়া স্নানাদির ব্যবস্থাও আছে। উপরে খান তিনেক ঘর। তার মধ্যে সব চেয়ে ছোট কামরাটি নিলেন আশুবাবু, বাকী দুটোতে তার পুরনো ছাত্রদের আস্তানা। একটি একটি করে সাত আটজন এসে জুটল, কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে যারা বেরিয়ে গেছে বর্ষ্টালের প্রেস্ এবং বুক বাইণ্ডিং সেকশন থেকে। সবাই বেকার নয়, কেউ অন্য ছাপাখানায় কাজ করছিল, কেউ ঢুকেছিল মুদী দোকানে এবং পাইস হোটেলের 'বয়'এর কাজে। ছেড়ে দিয়ে চলে এল সেকেণ্ড স্যারের প্রেস-এ। কথাটা কানে যেতেই আশুবাবু কষে বকুনি দিলেন, দূর হতভাগা, সেকেণ্ড স্যারের প্রেস কি রে! তোদের প্রেস; তোরাই এর মালিক, আমি তোদের ম্যানেজার।'

ওরা তো অবাক—'বা-রে, আমরা আবার মালিক হলাম কেমন করে?'

'মিছিমিছি মালিক বুঝি?'—বলে উঠল একজন। সঙ্গে সঙ্গে হাসির রোল।

—'মোটেই মিছেমিছি নয়,' মাথা নেড়ে বললেন আশুবাবু। 'সব টাকাটা তোদের ধার দিয়েছেন গুরুদেব। আস্তে আস্তে শোধ দিতে হবে।'

ছেলেদের মুখ শুকিয়ে গেল। এত টাকা তারা শোধ দেবে কেমন করে! আশুবাবু বললেন, 'গতর খেটে। মাইনে পাবি তো? তারই খানিকটা দিয়ে মাসে মাসে শেয়ার কেনা হবে প্রত্যেকের নামে নামে। লাভ যেটা হবে, তার থেকে ধারের কিস্তি মিটিয়ে বাকিটা তোদের নামে জমা হতে থাকবে। উনিই সমস্ত পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন।

ছেলেগুলো মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। এসব শক্ত শক্ত কথা তারা জীবনে কোনোদিন শোনেনি। বুঝতেও পারল না একবিন্দু। তার জন্যে কোনো দুশ্চিন্তাও দেখা গেল না। 'সেকেণ্ড্ স্যর' যখন আছেন এর মধ্যে, তখন এসব তাদের না বুঝলেও চলবে। কলরব করতে করতে বেরিয়ে গেল। একজন বলল, আপনার গুরুদেব কোথায় থাকেন স্যর?

—গঙ্গার ওপারে তাঁর আশ্রম। একদিন তোদের নিয়ে যাবো। প্রণাম করে আসবি।

—নয়—

'জেন্ট্রি' বা 'মিডল ক্লাস' বলতে যাদের বোঝায়, (বিত্তের দিক দিয়ে আজ যারা 'মধ্য' থেকে 'নিম্ন'পানে দ্রুত ধাবমান), চাকরি নামক পরম বস্তুটি তাদের কাছে চিরদিনই দুর্লভ। সে-বাজারে বিদ্যাবুদ্ধির জোর যতই থাক বা না থাক, আসল মূলধন 'মামার জোর'। বিশেষ করে ইংরেজ আমলে সওদাগরী অফিসে সেটা ছিল অপরিহার্য। বিজন ব্যানার্জির ঐ সম্বলটি গোড়া থেকেই মজুত ছিল। বাপ ঢুকেছিলেন রেল কোম্পানীর ক্লেমস অফিসে এবং মুরুব্বীর খুঁটা ধরে বেশ খানিকটা উঁচুতেও উঠেছিলেন। তিরিশ বছর পরে যখন বেরিয়ে এলেন, তখন তাঁর হাতে প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের মোটা টাকার চেয়েও বড় সঞ্চয় কয়েকটি শাঁসালো উপরওয়ালার নেকনজর। সেই জোরে বড় মেজো দুটি ছেলের পাকা ব্যবস্থা নিজের জীবদ্দশাতেই করে ফেলেছিলেন এবং তৃতীয় অর্থাৎ বিজনের বার্থটিও রিজার্ভ করে রেখে গেলেন। অপেক্ষা শুধু তার বি-এ ডিগ্রির। যথাসময়ে সেটি লাভ করবার পর মা এবং দাদাদের তরফ থেকে যখন তাগিদ এল, বিজন বলে বসল, 'এম-এ পড়বো'। দাদারা বোঝালেন, তাতে লাভ কিছু নেই, শুধু দুটি বছর এবং সেই সঙ্গে দুটি ইনক্রিমেণ্ট নষ্ট করা। কেননা, রেলের সাহেবরা 'ব্যাচেলর' এবং 'মাষ্টার'-এর তফাৎটা ঠিক বুঝতে পারেন না! তা সত্ত্বেও বিজন নিজের সিদ্ধান্তে অটল রইল।

এম-এ পাশ-এর খবর বেরোতেই আবার যখন তাকে সেই পুরনো কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল, বিজন তখন 'কর্মখালি'র বিজ্ঞাপন দেখে দেখে চোস্ত ইংরেজিতে দরখাস্তের মুসাবিদা করতে ব্যস্ত। মাথা না তুলেই সোজা জানিয়ে দিল, 'রেলে চাকরি করবো না।' সমস্ত পরিবারের মুখে শুধু বিস্ময় নয়, সেই সঙ্গে খানিকটা শোকের ছায়া নেমে এল। সবাই একবাক্যে রায় দিলেন, এ ছেলের কপালে দুঃখ আছে। তা নৈলে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে কেউ আলেয়ার পেছনে ছোটে? এ বাজারে

এম-এ পাশের দাম কী? একটা পঞ্চাশ টাকার মাষ্টারিও জোটে না। কথাটা মিথ্যা নয়। তবু বিজন পাল্টা প্রশ্ন তুলল, রেলের কেরানীর মাইনেও তো তিরিশ টাকা।

—আহা, মাইনেটাই তো সব নয়, বলে, একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করলেন বড়দাদা। প্রকাশ্যে বললেন, তাছাড়া ফিউচার প্রস্‌পেক্‌ট দেখতে হবে না?

—'ও চাকরি আমার ভালো লাগে না'। তর্কের পথে আর বেশী না এগিয়ে ঐখানেই দৃঢ় হাতে ছেদ টেনে দিল বিজন।

বছর খানেক ধরে দিস্তা কয়েক দরখাস্ত ছাড়বার পর সাড়া পাওয়া গেল সি পি অর্থাৎ মধ্যপ্রদেশের এক অখ্যাত শহর থেকে। নতুন কলেজ খোলা হচ্ছে; একজন লজিকের অধ্যাপক চাই। ফিলজফিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রথম নাম ছিল বিজন ব্যানার্জীর। একশ টাকা তলবে ওকেই তাঁরা নির্বাচিত করেছেন। বাড়ি থেকে এল সমবেত বাধা। মা বললেন, রেলের চাকরি না করতে চাস, না করলি। তাই বলে, অত দূরে যেতে হবে কেন?

—কাছাকাছি তো কিছু জুটছে না।

—আজ না জোটে কাল জুটবে। জলে তো আর পড়নি।

বিজন সে অনিশ্চয়ের অপেক্ষায় বসে থাকা সমীচীন বলে মনে করল না। নাই বা থাকল সচ্ছলতার অভাব। তবু বেকার জীবনের মধ্যে কেমন একটা অমর্যাদা আছে, যার সূক্ষ্ম ধারগুলো উঠতে বসতে লাগে, বিশেষ করে যে পরিবারে আর দুজন কর্মক্ষম পুরুষ বসে নেই। তার চেয়েও একটা বড় কারণ ছিল, যা কাউকে বলা যায় না।

নির্মলা তার জীবনে বিগত হয়েও শেষ হয়ে গেল কই! চোখ বুজলেই দেখা যায় আজও সে বিক্ষত অন্তরের গভীর স্তর জুড়ে আছে। আনন্দের রঙে রঙীন, বেদনার রক্তে রঞ্জিত। যে স্বপ্নের মায়ামাধুরী নিয়ে সে এসেছিল, যে বাস্তবের রূঢ় আঘাত দিয়ে সে চলে গেছে, কোনোটাই মুছে যায়নি। একদিকে দুটি প্রসন্ন নয়নের স্নিগ্ধ আলো, আরেকদিকে রুষ্ট চক্ষুর বিষাক্ত বহ্নি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে তার চোখের উপর। কোনোটাকেই ভোলা যায় না, ভুলতে ইচ্ছা করে না।

তবু ভুলতে তো হবেই। যে দ্বার চিরদিনের তরে বন্ধ হয়ে গেছে, বার বার তার উপরে করাঘাত করে কী লাভ? যে তার ছিঁড়ে গেছে, কোনোদিন জোড়া লাগবে না, তার একটা ক্ষীণ সূত্রকে জীইয়ে রাখা শুধু বিড়ম্বনা। কিন্তু লোভী অন্তরটার উপরে তার বিশ্বাস নেই। নিজেকে তাই অনেক দূরে এমন জায়গায় নিয়ে ফেলতে হবে যেখান থেকে ইচ্ছা করলেই ছুটে আসা যায় না। সান্নিধ্যে যে উজ্জ্বল, অমলিন, দূরত্বের দিগন্ত রেখায় সে একদিন ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে যাক, এই তার একমাত্র কামনা।

সন্ধ্যার পরে ট্রেন। বিকালের দিকে বিমলা দেওরের ঘরে এসে সঙ্গে নিয়ে যাবার জিনিসপত্রগুলো স্যুটকেসে গুছিয়ে দিচ্ছিল। খানিকটা দূরে বসে বিজন কোন এক বন্ধুকে চিঠি লিখছিল। বিমলা কণ্ঠে খানিকটা রাগত ভাব এনে বলল, একশবার করে বললাম এর ওপরের সাইজটা নাও। 'না এতেই হবে'। হলতো? গরিবের কথা বাসী হলে ফলে। এখন কী উপায় করি বল দেখি?

বিজন মুখ না তুলেই বিজ্ঞের মত গম্ভীরভাবে বলল, উপায় অত্যন্ত সহজ।

—যথা? কৌতুকের সুরে জানতে চাইল বিমলা।

—যেগুলো ঢুকছে না, স্রেফ বাদ দিয়ে দাও।

—বা, বা, বা! এই বুদ্ধি না হলে আর সংসার করবে কি করে?

—সংসার করতে যাচ্ছি নাকি? মৃদু হেসে বলল বিজন।

—তা ছাড়া আর কি? মা, ভাই, ভাজ—এদের নিয়ে আর কদিন চলে মানুষের? চাকরি মানেই নতুন সংসারের পত্তন, নতুন মানুষের —কি বলবো?—আবাহন।

—অন্যের বেলায় হয়তো তাই, কিন্তু আমার? আমার কথা আর কেউ না জানুক, তুমি তো জানো।

বিজন হয়তো চায়নি, তবু একটা উদাস সুরের করুণ রেশ নিয়ে বেরিয়ে এল কথাগুলো।

বিমলা হঠাৎ চকিত দৃষ্টি তুলে দেওরের দিকে তাকাল। মুখের উপর ফুটে উঠল গাম্ভীর্যের ছায়া, কণ্ঠের সে তরলভাবটিও রইল না। উঠে

এসে ওর টেবিলের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল, জানি বলেই একটা কথা তোমাকে বলতে চাই, ঠাকুরপো। তুমিই একদিন কোন প্রসঙ্গে ঠাট্টা করে বলেছিলে, প্রকৃতি শূন্য সইতে পারে না। কথাটা সত্যি। আমার মনে হয় মানুষের জীবনে আরো বেশী সত্যি। শূন্য নিয়ে বেঁচে থাকা যায় না। যা হল না, হতে পারে না, তাকে আঁকড়ে ধরে কে কবে সুখী হতে পেরেছে?

—সুখী হওয়া হয়তো সকলের ভাগ্যে নেই।

—ওটা মেয়েলী অভিমানের কথা। মেয়েরা ঐ বলে নিজেদের মিথ্যা সান্ত্বনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখে। তুমি পুরুষমানুষ, তোমার মুখে ওটা সাজে না।

বিজন চুপ করে রইল। বিমলা তিক্ত কণ্ঠে বলল, একজনাকে চেয়েছিলাম; পেলাম না। তাই বলে সারাজীবনটা হা-হুতাশ করে কাটিয়ে দিতে হবে! জীবনের চেয়ে বড় হল একটা মেয়ে!

'মেজো বৌমা!'—দরজার বাইরে থেকে শাশুড়ীর ডাক কানে যেতেই বিমলা সাড়া দিল, যাই মা। মাথার উপর থেকে আঁচলটা পড়ে গিয়েছিল, সেটাও তুলে দিল। তিনি ঘরে ঢুকে বললেন, বিজুর খাবারটা তুমি নিজে হাতে গুছিয়ে দিও। টিফিনক্যারিয়ারের কোন বাটিতে কি থাকবে, ঠাকুর ওগুলো ঠিক পেরে উঠবে না।

—না মা; ওসব আমি ঠিক করে দেবো। এখনো দেরি আছে।

—ও, তুমি বুঝি বাক্স গোছাচ্ছিলে? সব দেখে শুনে দিয়েছো তো? সুটকেসটা বোধ হয় ছোট হয়েছে, বৌমা। ওতে কি সব ধরবে?

—না; এটাতে কুলোচ্ছে না। ওঁর সুটকেসটা এনে দিচ্ছি।

—তাই দাও। কাছের পথ নয় যে, কোনো কিছুর দরকার পড়লে কেউ গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

বিজন ক্ষীণ-কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাল, কী যে হবে এত সব লটবহর টেনে নিয়ে? আমি বলছিলাম—

—তোমাকে আর কিছু বলতে হবে না। তুমি ওর কথা শুনো না বৌমা। যা যা দরকার সব দিয়ে দাও।

বিমলা ঘাড় নেড়ে সায় দিল এবং শাশুড়ীর অলক্ষ্যে দেওরের দিকে চেয়ে ভ্রূভঙ্গি দিয়ে জানিয়ে দিল—কেমন জব্দ! তারপর দ্রুত পায়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, আমি স্যুটকেসটা নিয়ে আসি।

মা ছেলের কাছে সরে এলেন। সর্বাঙ্গে সস্নেহ দৃষ্টি বুলিয়ে বললেন, এখানকার মত ওদেশে গরমের ছুটি আছে তো?

—তা বোধ হয় আছে। ওখানে তো আরো বেশী গরম।

—ছুটি হলেই চলে আসবি। জ্যৈষ্ঠ মাসের সতরই একটা দিন আছে। আপাততঃ ঐটাই স্থির রইল।

বিজন বুঝতে পারলেও জিজ্ঞাসা করল, কিসের দিন?

মা সে প্রশ্নের জবাব দিলেন না। নিজের সঙ্গেই যেন আলোচনা করছেন, এমনিভাবে বললেন, এরপর ছুটি হতে হতে সেই পূজো। আশ্বিন মাস। তারপর বড়দিন, সেও পৌষ মাস। তারপর—না, অতদিন দেরি করা যায় না। যত শীগ্‌গির হোক শুভ কাজ মিটিয়ে ফেলা দরকার।

বিজন এতক্ষণে কথা বলল, ওসব এখন থাক।

—কেন? মায়ের কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর।

—ও সম্বন্ধে আমি এখনো মনস্থির করিনি।

—কেন, সম্বন্ধটা ফেলনা হল কোনদিক দিয়ে? অমন চমৎকার মেয়ে, অত ভাল ঘর, দেবে থোবেও ভাল। সব দিক ভেবেচিন্তে কত্তা নিজে মুখে কথা দিয়ে গেছেন।

—জানি। সম্বন্ধ ভালো কি মন্দ, তা নিয়ে আমি কিছু বলছি না। আমার আপত্তি বিয়ে নিয়ে। বিয়ে আমাকে করতে বলো না। আমি পারবো না।

মায়ের মুখে সহসা কোন কথা যোগাল না। 'কেন'—এ প্রশ্নটাও জিজ্ঞাসা করতে পারলেন না। বিস্ময়ে ক্ষোভে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মিনিটখানেক পরে স্যুটকেস হাতে করে বিমলা ঘরে ঢুকতেই নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠলেন, শুনলে বৌমা? শুনলে কি বললে বিজু? আমার মুখের ওপর শুনিয়ে দিল, ও বিয়ে করবে না!

বিমলা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ডান হাতে শ্বশ্রুকে জড়িয়ে ধরে দরজার দিকে আকর্ষণ করে বলল, আপনি ওঘরে চলুন মা। অত উতলা হবেন না। ছেলেরা ঐ রকম বলে থাকে। আমি শুনছি কী বলতে চায় ও।

মায়ের দুচোখের কোল বেয়ে তখন অশ্রুধারা নেমে এসেছে। বললেন, আর কী শুনবে তুমি। ও আমাদের কিছুই চায় না। অত করে কাজ ঠিক করে গেলেন, নিলে না ; মেয়ের বাপকে কথা দিয়ে গেলেন, তাও মানবে না! এইজন্যই কি এত কষ্ট করে, এত লেখাপড়া শিখিয়ে এতবড়টা করলাম!······বলতে বলতে দুচোখে আঁচল চাপা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

সেদিন ঐ প্রসঙ্গে আর কোনো কথা হয়নি। কিন্তু যাত্রার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত সকলের মুখে যে গম্ভীর, থমথমে ভাবটা দেখা দিয়েছিল, সেটা শুধু বিচ্ছেদের বেদনা নয়, তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষোভ ও হতাশা, অনুক্ত হলেও বিজনের কাছে তা অস্পষ্ট ছিল না। গার্ড-সাহেব গাড়ি ছাড়বার বাঁশী বাজাতেই জানালায় মুখ বাড়িয়ে বিমলা ফিস্‌ফিস্ করে বলেছিল, চিঠিতে সব জানাবো। মাসখানেক যাক, একটু গুছিয়ে বস। তারপর।

পর পর কয়েকখানা দীর্ঘ চিঠিতে অনেক কিছু জানিয়েছিল বিমলা। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী জায়গা জুড়ে থাকতেন মা। দিনদিন তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়ছে, যে সংসার ছিল তাঁর প্রাণ, তার থেকে একেবারে সরে দাঁড়িয়েছেন, সারাদিন নিজের ঘরটিতে চুপ করে বসে থাকেন, লোকজন দেখলে বিরক্ত হন, কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করতে গেলে নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলেন, আমি কিছু জানি না, তোমরা যা ভাল বোঝ কর—এই জাতীয় বিস্তৃত বর্ণনা। শুধু বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত হবে, বৌদি তেমন পাত্র নয়। এই সব কিছুর মূলাধার যে সে-ই, এবং প্রতিকারের চাবিটিও তার হাতে, বিমলা তার নিজস্ব ভঙ্গিতে এই সুস্পষ্ট সত্য কথাটাও দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করত। বিজনের অস্বীকার করবার উপায় ছিল না। মাকে সে জানত। বিজু তাঁর শেষ বয়সের সন্তান। স্বামী তাকে মানুষ করে যেতে পারেননি, কিন্তু তার ধাপগুলো তৈরী করে

রেখে গেছেন। ছেলেকে তারই উপর পা দিয়ে দিয়ে ছককাটা রাস্তা ধরে এগিয়ে যেতে হবে, এইটুকুই তিনি জানেন। সেখানে এতটুকু হেরফের বরদাস্ত করতে পারেন না। তবু ছেলের মুখ চেয়ে, ছকের বাইরে তার অনেকগুলো পদক্ষেপ তিনি মেনে নিয়েছিলেন। তাকে এম-এ পাশ করতে দিয়েছেন, রেলের রাস্তা না ধরে কলেজের চাকরিতে ঢুকতে দিয়েছেন, বাড়ি-ঘর ফেলে, নিতান্ত বিনাকারণে একা একা দূর দেশে পাড়ি দেবার যে দুর্বুদ্ধি, তাতেও শেষ পর্যন্ত বাধা দেননি। কিন্তু স্বর্গত স্বামীর শেষ ইচ্ছা ও আদেশ এবং তাঁর নিজের একান্ত মনের শেষ কামনাটুকু জেনে-শুনেও যখন সে পায়ে ঠেলে চলে গেল, পরলোকগত পিতার প্রতিশ্রুতির মর্যাদা পর্যন্ত রাখতে চাইল না, তখন সেই চরম আঘাত বুক পেতে নেওয়া তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হল না। এতদিন কোনরকমে দাঁড়িয়ে থেকে এবারে তিনি ভেঙে পড়লেন। তাঁর এই পরিণতি বিজনের কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল না। শিশু বয়স থেকে সে অতিমাত্রায় মাতৃনির্ভর। সুতরাং দূরে থেকেও উদাসীন থাকতে পারল না, মায়ের কথা ভেবে ভেবে প্রবাসের দিনগুলো দুঃসহ হয়ে উঠল।

বৌদি জানিয়েছে, প্রতিকার তার হাতের মধ্যে। সেও জানে। শুধু একটা মুখের কথা—'আমি রাজী আছি'। বাপ-মায়ের মনোনীত এবং সমস্ত পরিবারের মনোমত পাত্রীটিকে গ্রহণ করলেই সব সমস্যা মিটে যাবে। কিন্তু গ্রহণ কি শুধু পাণিগ্রহণ? বহু-আড়ম্বর-মুখরিত উৎসব সন্ধ্যায় বরাসনে বসে দেবভাষায় 'গৃহ্ণামি' 'গৃহ্ণামি' বলে পুরোহিতের প্রতিধ্বনি করলেই কি বলা হল—তোমাকে নিলাম? নিজের অন্তর সে জানে। সেখানে তো কোন আয়োজন নেই, উৎসব নেই, ঐ কথাটি মনে-প্রাণে বলবার জন্যে কেউ বসে নেই। একটি নির্দোষ, সরল, নিঃসন্দিগ্ধ মেয়ের সঙ্গে প্রতারণা করবার কী অধিকার আছে তার?

এই কথাটাই সে বিমলাকে লিখে জানিয়েছিল। উত্তর এল সঙ্গে সঙ্গে। লিখল,—"ঠাকুরপো, তুমি অনেক লেখাপড়া শিখেছ। তোমাকে উপদেশ দেওয়া আমার সাজে না। আমার বিদ্যের দৌড় তো জান। পাড়ার লাইব্রেরীর খানকয়েক বাংলা নাটক-নভেল পর্যন্ত। মনে পড়ে

তারই কোনো একটাতে পড়েছিলাম—মানুষের মন যেন নদীস্রোত জীবনের ছোট-বড় সুখ-দুঃখ নৌকোব মত তার উপর দিয়ে ভেসে চলে যায়। কোনোটা দ্রুতগতি, কোনোটা মন্থর। তারই মধ্যে দু'-একখানা হয়ত কদিনের জন্যে নোঙর ফেলে। কিন্তু থাকে না কেউ। পুরনো যায়, নতুন আসে। স্রোত কাউকে ধরে রাখে না। তোমার মনের মধ্যে যে নোঙর ফেলে বসে আছে, মনে হচ্ছে আর উঠবে না, সেও দুদিন পরে ভেসে চলে যাবে। যে আসছে তাকে জায়গা দিতে হবে তো। এই নিয়ম। আমি তোমার চেয়ে অনেক বিষয়ে ছোট হলেও, বয়সে বড়, অভিজ্ঞতায় বড়। এটা আমার শুধু নভেল পড়া বিদ্যে নয়, নিজের চোখে দেখেছি। আমার এই কথাটা তুমি মেনে নিও, ভাই।"

"সুরমার জন্যেও তোমার কোনো ভাবনা নেই। সে এসে তার পাওনা ঠিক বুঝে নেবে। তার জন্যে যদি দুদিন অপেক্ষা করতে হয়, করবে। মেয়েরা সব কিছুর জন্যেই তৈরী হয়ে আসে। তোমার মন এখনো 'বিমুখ' বলে তুমি ভয় পাচ্ছ। বিমুখকে উন্মুখ করবার চেষ্টাই তো মেয়েদের সাধনা। উদাসীনকে উৎসুক করে তোলাই তাদের ব্রত। উমার কথা পড়নি? দেবাদিদেবের মত শ্মশানচারী বৈরাগীও তার কাছে হার মেনেছিলেন। তুমি কি শিবের চেয়েও অসাধ্য? মনে রেখো, সব মেয়ের মধ্যেই উমা আছে। সুরমাও একদিন জয়ী হবে।"

সকলের শেষে ছিল সব চেয়ে যেটা দরকারী কথা। "মার অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে চলেছে। আর দেরি করলে হয়তো তাঁকে আমাদের হারাতে হবে। সে দুঃখ কি সইতে পারবে? মাঘের গোড়াতেই দিন আছে, তোমার চিঠির অপেক্ষায় আমরা উৎকণ্ঠিত হয়ে দিন গুনবো।"

এর পর সেই সমবেত উৎকণ্ঠার নিরসন ছাড়া বিজনের সামনে আর কোনো পথ ছিল না। মাঘের প্রথমেই যে দিন ছিল, তারই এক শুভলগ্নে সকলের ইচ্ছাকে মেনে নিয়ে সুরমাকে সে গ্রহণ করেছিল। মা যেন আবার নতুন জীবন ফিরে পেয়েছিলেন। বহু ঘটা করে, সকলের সব সাধ মিটিয়ে প্রায় নিঃসম্বল হয়ে ছোট ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন। সবাইকে একে একে ডেকে বলেছিলেন, 'এই আমার

শেষ কাজ ; বল তোমাদের কার কী ইচ্ছে।' উকে চেয়েছিল গড়ের বাদ্য, কেউ জমকালো প্রসেশন, কারো ফরমাস ছিল বাঈজী নাচ। কোনোটাই তিনি অপূর্ণ রাখেননি।

লগ্ন শুভ হলেই কি তার ফল শুভ হয়? সব সময় হয় না। মঙ্গলানুষ্ঠানের সমাপ্তি-পর্বে মঙ্গলের আবির্ভাব ঘটবেই—একথাও জোর করে বলা যায় না। বিজনের জীবনে ঘটেনি। বাসর-সজ্জার মঙ্গল-দীপ নিবতে না নিবতেই তার লক্ষণ দেখা দিল।

ফুলশয্যার দুদিন পরে। এ পর্যন্ত সুরমার সঙ্গে তার একটি কথাও হয়নি। শুভরাত্রির নিভৃত শয্যায় সুযোগ আসেনি তা নয়, কিন্তু কেমন একটা সঙ্কোচ এসে যেন তার মুখ চেপে ধরেছিল। হয়তো শুধু সঙ্কোচ নয়, তার সঙ্গে কিছুটা অপরাধবোধ—'জায়গা নেই জেনেও কেন একে ডেকে নিয়ে এলাম।' তার পরের রাত্রিতে আবার দেখা হল, তখনো ঐ একই চিন্তার রেশ তার মন জুড়ে আছে—এই ফুলের মত মেয়ে ; অন্য কারো হাতে পড়লে সুখী হতে পারত। আমি কেন সে পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালাম? নিজেকে বড় ছোট মনে হল, বড় স্বার্থপর। প্রাণপণে চেষ্টা করল, সব ভাবনা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সহজভাবে দুটো কথা বলতে। প্রতিবারেই ব্যর্থ হল। প্রহরের পর প্রহর কেটে গেল। বিস্তীর্ণ শয্যার আরেক প্রান্তে জড়সড় হয়ে পাশ ফিরে শুয়ে রইল তার সুন্দরী, শোভন-সজ্জিতা নবোঢ়া স্ত্রী। একটিবার তার ভীরু কোমল হাতখানি স্পর্শ করা হল না, কাছে ডেকে বলা হল না, শোনো। তারপর কখন গভীর অবসাদে জুড়ে এল চোখের পাতা। সকালে ঘুম ভাঙতেই প্রথম চোখ মেলে দেখল, শূন্য শয্যা খাঁ খাঁ করছে। কোথায় গেল সুরমা! ঘরের ও পাশটায় কার্পেটের উপর কম্বল ঢাকা দিয়ে পড়ে আছে একটি কাপড়-চোপড়ের কুণ্ডলী। বিজন বিছানার উপর উঠে বসতেই, সেও ধড়মড় করে উঠে পড়ল এবং কোনো দিকে না তাকিয়ে শশব্যস্তে বেরিয়ে চলে গেল।

সে রাতটা ছিল শ্বশুরবাড়িতে জোড়ে আসবার পর দ্বিতীয় দিন। বিজন স্থির করে রেখেছিল, আজ যেমন করে হোক সব দৌর্বল্যকে

কাটিয়ে উঠতে হবে। যা ঘটে গেছে, স্বেচ্ছায় হোক, বাধ্য হয়ে হোক, যে সত্যকে মেনে নিতে হয়েছে, তার মুখোমুখী দাঁড়াবার মত সৎসাহস তাকে অর্জন করতেই হবে। 'স্ত্রী বলে যাকে গ্রহণ করেছি, তার যোগ্য আসন যদি তাকে না দিতে পারি, সে অপরাধও কম নয়। বৌদি বলেছিল, মেয়েরা সব কিছুর জন্যে তৈরী হয়েই আসে। হয়তো তাই। তবু পুরুষকেই অগ্রণী হয়ে আহ্বান জানাতে হয়।'—এই সঙ্কল্প নিয়েই সে শয়নঘরে এসে ঢুকেছিল। কিছুক্ষণ পরেই সুরমা এল এবং স্বামী কিছু বলবার আগেই নিঃসঙ্কোচ পদক্ষেপে এগিয়ে এসে নিজের মাথার বালিশটা টেনে নিয়ে সহজভাবে বলল, আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি নীচে শুচ্ছি।

বিজন বিস্ময়ে মুখ তুলল, কেন?

সুরমা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। কয়েক মুহূর্ত মেঝের দিকে তাকিয়ে থেকে মৃদু কণ্ঠে বলল, আপনার অসুবিধা হবে, তাই।

—অসুবিধা হবে! কে বললে?

—আমি জানি। এ বিয়েতে আপনার মত ছিল না। আপনার বাবা আমার বাবাকে যে কথা দিয়েছিলেন সেইটে রাখবার জন্যেই বাধ্য হয়ে রাজী হয়েছেন।

বিজন স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল। অস্বীকার করবার উপায় নেই। তবু বিয়ের উৎসব শেষ না হতেই সদ্য-পরিণীতা স্ত্রীর মুখ থেকে একথা শুনতে হবে, এটা তার কল্পনার বাইরে। সুরমা এক পলক ওর দিকে তাকিয়ে আবার বলল, আপনার মা এবং দাদা-বৌদিরা অনেক করে আপনাকে রাজী করিয়েছেন, তাও আমি জানি।

কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের কী নির্মম বিরোধ! কী প্রত্যাশা নিয়ে সে আজ ঘরে এসেছিল, আর কী তাকে শুনতে হল! এই নিদারুণ আশাভঙ্গের আঘাতেই বিজনের মনটা বিষাক্ত হয়ে উঠল। সুরমার দিকটা ভেবে দেখল না। তিক্তকণ্ঠে বলল, তাই যদি জানতে, তুমি কেন রাজী হলে? বললেই পারতে এ বিয়ে আমি করবো না?'

—'আমি!' দুটি বিস্ফারিত দীপ্ত চক্ষু স্বামীর চোখের উপর তুলে ধরল সুরমা, 'আপনি পুরুষমানুষ হয়ে যা পারলেন না, আমি মেয়ে হয়ে তাই বলবো! কে শুনত আমার কথা?

সুরমা ঠিকই বলেছিল। কেউ শুনত না। তাকেই বরং শুনতে হত অনেক কথা। সবাই ছিঃ ছিঃ করত, নির্লজ্জ বেহায়া বলে তিরস্কার করতেন অভিভাবকেরা। 'এসব নাটক নভেল পড়বার ফল'—বলে. ব্যঙ্গোক্তি করতেন প্রতিবেশিনী প্রবীণার দল। তরুণীরা মুখ টিপে হাসত। যে পরিবারে তার জন্ম, যে সমাজে, যে সব আত্মীয়স্বজনের বেষ্টনীর মধ্যে সে বড় হয়েছে সেখানে একটি অনূঢ়া মেয়ের মুখ থেকে এত বড় স্পর্ধার কথা শুনবার জন্যে কেউ প্রস্তুত ছিল না। মেয়ে আবার বিয়ে করবে কি! তাকে বিয়ে দেওয়া হয়। সে শুধু, দত্তা, তৃতীয় পক্ষ মাত্র।

বিজনও সেই সমাজে সেই পরিবেশে মানুষ। সুতরাং তার প্রশ্নটা যে নিতান্তই অর্থহীন, সহজেই বুঝতে পেরেছিল, এবং উত্তরের মধ্যে যে বিস্ময় ছিল, তাতেও কিছুমাত্র বিস্মিত হয়নি। শুধু বিস্ময় নয়, তার সঙ্গে জড়ানো একটা প্রচ্ছন্ন তিরস্কার তীক্ষ্ণ শরের মত তার বুকে এসে লাগল। বলবার মত আর কোনো কথা খুঁজে পেল না। সুরমা আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল। হাতের বালিশটার দিকে চেয়ে, যেন অন্য কারো বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে, যার সঙ্গে সে জড়িত নয়, এমনি নির্লিপ্ত সুরে বলল, যে কারণে আপনি বিয়ে করতে চাননি, তাও আমি জানি। সবই শুনেছি।

—কী জানো? কী শুনেছ তুমি? তড়িৎ স্পর্শে মানুষ যেমন চমকে চেঁচিয়ে ওঠে তেমনি একটা ত্রস্ত স্বর বেরিয়ে এল বিজনের গলা থেকে।

—থাক; সে কথা আপনার ভালো লাগবে না। শান্তকণ্ঠে এই দুটি কথা বলেই সুরমা বালিশ আর কম্বলটা টেনে নিয়ে ওদিকের দেয়ালের পাশে মেঝের উপর গিয়ে শুয়ে পড়েছিল। হয়তো এক সময়ে ঘুমিয়েও পড়েছিল। কিন্তু বিজন একটিবারও দুচোখের পাতা এক করতে পারেনি। অনেকবার মনে হয়েছে এখনই নেমে গিয়ে ওকে ডেকে তুলবে, হাত ধরে নিজের পাশটিতে বসিয়ে বলবে, তোমার সব অভিযোগ আমি অকপটে মেনে নিচ্ছি সুরমা। কিন্তু তোমার আমার মধ্যে যে বাধা দাঁড়িয়ে আছে সেটা অলঙ্ঘ্য নয়। তাকে আমি জয় করব। তার জন্যে শুধু কটাদিন সময় চাইছি তোমার কাছে।

এই কথাগুলো যদি সেদিন মুখফুটে বলতে পারত, সুরমা হয়তো মুখ ফিরিয়ে থাকতো না। কৈশোরে পা দিয়েই সে শুনে আসছে, বিজনের কাছে সে বাগদত্তা। দূর থেকে তাকে দেখেওছে অনেকবার। এই প্রিয়দর্শন, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কৃতী ছেলেটির পাশে নিজেকে বসিয়ে বছরের পর বছর মনে মনে কত মধুর স্বপ্ন রচনা করেছে। সর্বাঙ্গ দিয়ে উপভোগ করেছে সেই কল্পিত স্পর্শের শিহরণ। তারপর নানা কানাঘুষার মধ্য দিয়ে কোত্থেকে একখানা কালো মেঘ ভেসে এসে সেই নিত্যপ্রতীক্ষিত মিলনাকাশের একটা কোণ জুড়ে বসল। মা থেকে আরম্ভ করে বহুকালের পুরনো ঝি সারদার মুখেও তার ছায়া! শঙ্কায়, বেদনায় তার সঙ্গে কী এক অর্থহীন অভিমানে সুরমার ভীরু হৃদয় ভরে উঠল। বিজন যে তাকে চায় না, অন্য কারো কাছে তার মন বাঁধা পড়ে আছে—এই কথাগুলো নানাসূত্রে পল্লবিত হয়ে তার কানে আসতে লাগলো। তার মধ্যে একদিকে ব্যর্থতার বেদনা, আরেকদিকে প্রত্যাখ্যানের লজ্জা। সকলের চোখের আড়ালে নিজের ঘরের নিরালা কোণটি ছাড়া তার আর কোনো আশ্রয় রইল না।

তারপর একদিন তাদের ঝিমিয়েপড়া বাড়িটা হঠাৎ যেন জাদুমন্ত্রে জেগে উঠল। বোন ভাজ এবং সখীরা মিলে তাকে সেই কোণ থেকে টেনে এনে হাসিপরিহাস ঠাট্টা তামাশায় অতিষ্ঠ করে তুলল। স-কলরবে শুরু হল আসন্ন উৎসবের আয়োজন। মেঘ কেটে গেছে। সকলের সঙ্গে সুরমার মনেও সেই আশ্বাসের আনন্দ। শোভাযাত্রা করে ব্যাণ্ড বাজিয়ে বরের গাড়ি যখন তাদের বাড়ির দরজায় এসে পৌঁছল, সুরমার সাজানো পর্ব তখনো মাঝপথে। চিরুনি, চন্দন, মালা, কাজল ফেলে এক ঝাঁক উড়ন্ত পায়রার মত মেয়েরা চোখের নিমেষে কোথায় উধাও হয়ে গেল। সুরমারও কি ইচ্ছা হয়নি তাদের মত একটা কোনো জানালার আড়াল থেকে কতবার দেখা চেনা মুখখানা আজ আবার নতুন চোখ দিয়ে দেখে আসে? কিন্তু লজ্জা এসে তার পা দুটো জড়িয়ে ধরেছিল। মেয়েরা ফিরে এসে বলাবলি করেছিল—কেমন যেন গোমড়ামুখো বর! চমকে উঠেছিল সুরমা। সে কি! সে যাকে দেখেছে তার মুখখানা যে সদাহাস্যোজ্জ্বল। তারপর নিজেকেই আবার বুঝিয়েছিল, মেয়েগুলো

যেন কী! বিয়ে করতে এসে কেউ হাসতে হাসতে নামে নাকি বরের গাড়ি থেকে? চারদিকে সব গুরুজন রয়েছে না? কিন্তু যেখানে গুরুজন নেই, কেউ নেই, শুধু দুজনে একা, সেখানে যখন দেখা হল, দামী বেনারসীর আধঘোমটার অন্তরাল থেকে ভীরু চোখ দুটি যখন অলক্ষ্যে তুলে ধরল স্বামীর মুখের পানে, তখন আর কোনো কৈফিয়ৎ বা সান্ত্বনা দিয়ে নিজেকে বোঝাতে পারেনি। তারপরেও রাতের পর রাত ব্যর্থ অপেক্ষায় কাটিয়ে নিঃসন্দেহে বুঝেছিল সুরমা, না, মেঘ কাটেনি। শুধু কাটেনি নয়, তার নবারব্ধ যাত্রাপথের যতখানি চোখে পড়ে সবটাই বোধহয় মেঘেঢাকা।

পরের ইতিহাস দীর্ঘ হলেও ঘটনাবহুল নয়। ছুটি ফুরিয়ে যাবার ওজুহাত দেখিয়ে বিজন হয়তো তখনকার মত একটা আশু সঙ্কটের হাত থেকে নিস্তার পেয়েছিল। ভেবেছিল, আপাততঃ পালিয়ে গিয়ে ভারাক্রান্ত মনটাকে একটু হালকা হবার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। সুরমার সেই নিরুত্তাপ চোখ দুটো সে যেন কিছুতেই সহ্য করতে পারেনি। তার চেয়ে সে যদি তীব্র ভাষায় নালিশ জানাত, রসনায় কিংবা চোখের তারায় বিষের জ্বালা ছড়িয়ে আক্রমণ করত তাকে, বিজনের পক্ষে সেটাই ছিল অনেক বেশী সহজ ও সুসহ। সেই প্রত্যাশাই সে করেছিল। কিন্তু সুরমা সে পথে যায়নি। বোধহয় ভেবেছিল, পাওনা যেখানে শূন্য, সেখানে পেলাম না বলে অভিমান জানাতে যাওয়া হাস্যকর। না-পাওয়ার মধ্যে বেদনা আছে! সেটা সয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু প্রত্যাখ্যানের মধ্যে আছে অপমান। সাধ করে হাত বাড়িয়ে সেটা মাথায় তুলতে কে চায়?

বিমলা হয়তো ঠিকই বলেছিল। মেয়েরা যখন স্বামীর সংসারে আসে, অনেক কিছুর জন্যে তৈরী হয়ে আসে। তেমনি একথাও সত্য, প্রথম পাওনা দিয়েই তারা আগামী দিনের পাওয়া ও না-পাওয়ার হিসাব কষে। ঐদিনের রূপটি ওদের জীবনে অক্ষয়। পুরুষ যাকে পেল, তাকে সে সারাজীবন ধরে একটু একটু করে চেনে, কিন্তু নারী যার হাতে প্রথম হাত রাখল, তাকে সে চেনে ঐ একটি মাত্র স্পর্শ দিয়ে; শুভদৃষ্টির আড়ালে কিংবা বাসরের কোলাহলে একটি মাত্র দৃষ্টি দিয়ে।

ভুল যে করে না, তা নয়। কিন্তু সে ভুল সহজে ভাঙে না। অনেক সময় তার মাশুল গুনতে হয় সারাজীবন।

সুরমা তার স্বামীর সম্পর্কে ভুল করেনি। তবু সব জেনেই, অন্তরে না হোক, বাইরের দিক থেকে ঘটনাপ্রবাহকে স্বীকার করে নিল। নিজেকে বোঝাল, মানুষের জীবনে যা কিছু ঘটে সবই কি তার মনোমত? বেশীর ভাগই নয়। অনেক ঘটনাই দুর্ঘটনা। তবু সে সত্য, 'মানি না' বললেই মিথ্যা হয়ে যায় না। অস্বীকার করলেও তার হাত থেকে মুক্তি নেই। সুতরাং যা ঘটেছে তারই স্রোতে নিজেকে ছেড়ে দাও। যে পরিবারে, যে পরিবেশে সে মানুষ, যেখানে এসে সে দাঁড়াল, সেখানে একটি সামান্য লেখাপড়াজানা সাধারণ মেয়ের সামনে তা ছাড়া আর পথ কী? মন? তার দিকে কেউ তাকায় না। সংসার বড় নির্মম। সে নিজের মনে নিজের পথে এগিয়ে যায়। কারো মন-রাখা তার কাজ নয়। ঐ অলক্ষ্য বস্তুটি কোথায় কোন্ চাকার তলায় থেঁতলে গুঁড়িয়ে গেল, সেসব দেখলে তার চলে না।

বিয়ের মাস দুয়েক পরেই শাশুড়ী একদিন বললেন, বৌমা, আসছে রবিবারে বিমান তোমাকে বিজুর কাছে রেখে আসবে। ওকেই আসতে লিখেছিলাম। বলছে ছুটি পাবে না।

সুরমা চুপ করে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল, যেমন থাকতে হয়, নববিবাহিতা বধূ শ্বশ্রুর মুখে এ জাতীয় প্রস্তাব শুনে যেমন থাকে। শাশুড়ী ভাবতে লাগলেন তাঁদের কালে তাঁরা কী করতেন। লজ্জায় জড়সড় হয়ে মাটিতে মিশে যেতেন, নয়তো ছুটে পালাতেন। কিন্তু যুগ বদলে গেছে। এরা এতে লজ্জা পায় না। যাবার জন্যেই দুপা বাড়িয়ে আছে। তাছাড়া, বয়স্থা মেয়ে; বিয়ের রাত থেকেই বরটিকে চিনতে শেখে। তাঁর কালের কনে-বৌ ত নয়। তবু বলা কর্তব্য বলেই বললেন, এই সবে এলে। মনে করেছিলাম, দুটোদিন তোমাকে নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করবো। সকলেরই তাই ইচ্ছে। সব্বার ছোট তুমি। কিন্তু ওদিকে বিজু একলা। খোট্টার দেশে একটা পছন্দমত রান্নার লোক পর্যন্ত পাওয়া যায় না। গেলেও কে তাকে চালায়? তুমি না গেলে ওর কষ্ট হবে।

একটু থেমে স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন, নিজের ঘরসংসার বুঝে নাও। তোমরা সুখী হও, এই আমার সবচেয়ে বড় সাধ।

শাশুড়ীর এবং সেই সঙ্গে শ্বশুর ও পিতৃকুলের সমবেত সাধ মেটাবার জন্যেই যেন সুরমা শুভদিনে যাত্রা করে মেজো ভাসুরের সঙ্গে স্বামীর কর্ম্মস্থলে গিয়ে পৌঁছল। নিজের মনের দিকে তাকাল না। সেখানে কোনো সাড়া জাগল কিনা, কোনো উৎসাহের জোয়ার কিংবা আগ্রহের জাগরণ, সে প্রশ্ন একান্ত অবান্তর বলে এক কোণে ঠেলে রেখে দিল। যেতে হবে, তাই যাওয়া, ঘটনার গতির সঙ্গে পা ফেলে চলা। এর বেশী আর কিছু ভাবার নেই, করবার নেই।

শুরু হল তুজনের সংসার। বিজনের সহকর্মীরা প্রায় সকলেই বয়সে বড়। সব বাড়িতেই তুটি-চারটি ছেলেমেয়ে এবং আনুষঙ্গিক ঝঞ্ঝাট ও বিশৃঙ্খলা। তাঁরা বেড়াতে আসেন, কখনো একা, কখনো জোড়ে। সুরমা হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে, ঋতু ও সময় ভেদে চা, ফল, সরবৎ, নিজের হাতে তৈরী তুটি-একটি মিষ্টান্ন দিয়ে আপ্যায়ন করে অতিথিদের, হাসি-পরিহাসে যোগ দেয়। ছোট্ট বাসাটুকুর প্রতিটি কোণ তাঁরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন। কোথাও কোনো ত্রুটি নেই। সব পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি। প্রতিটি জিনিসে, সাজানো-গোছানোর বিশেষ ভঙ্গিতে গৃহকত্রীর সযত্ন নিপুণ হাতের স্পর্শ। সকলের মুখেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। "ঠিক যেন তুটি কপোত-কপোতী" "What a loving pair!" "আপনাদের দেখলে হিংসে হয়" ইত্যাদি। ওরাও বেড়াতে যায় এবাড়ি ওবাড়ি। একটা সাধারণ শাড়ি পরেই হয়তো তৈরী হয়েছিল সুরমা। বিজনের চোখে পড়তে বলল, ওটা কেন, আর একটু ভালো কিছু পরে নাওনা?' সুরমা দ্বিরুক্তি না করে তখনই কাপড় পালটে আসে। 'এই তো বেশ' বলে ঔদাসীন্যের ভানও নেই, স্বামীর ইচ্ছায় নতুন সাজে সেজে আসবার আগ্রহও নেই।

দিনগুলো কেটে যায় কাজকর্মের ভিড়ে এবং লোকজন বন্ধুবান্ধবদের সাহচর্যে। রাত আসছে ভাবতেই এক অবর্ণনীয় শঙ্কায় বিজনের বুক ভরে ওঠে। সেখানে তুজনের মাঝখানে কোনো অন্তরাল নেই। সুরমার সেই নিস্পৃহ, নির্বিকার রূপটি সেখানে বড় বেশী প্রকাশিত।

অত্যন্ত কাছে থেকেও সে যে কত দূরে, রাত্রির নির্জনতায় এই কঠোর সত্যটাই নির্মমভাবে ধরা পড়ে। তারা এক টেবিলে, একসঙ্গে বসে খায় (এবিষয়ে নিজের মত যা-ই থাক, স্বামীর ইচ্ছাকেই মেনে নিয়েছে সুরমা) খাবার পর বারান্দায় পাশাপাশি বসে গল্প করে, সাধারণ সংসারিক গল্প, যার মধ্যে সুরমার স্থান প্রধানতঃ শ্রোতার, তারপর রাত বাড়লে উঠে গিয়ে একই শয্যায় পাশাপাশি শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। তবু বিজনের মনে হয়, তার একান্ত সন্নিকটে যে মেয়েটি শুয়ে আছে, তাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায়, তার উপরে স্বামিত্বের সব ইচ্ছা ও অধিকার অনায়াসে প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু তার নাগাল পাওয়া যায় না। মাঝখানের এই ব্যবধানটুকু সামান্য হলেও অনতিক্রম্য।

অথচ অভিযোগ করবার মত কোথাও কিছু নেই। সুরমা আদর্শ গৃহিণী। প্রতিটি দিকে তার প্রখর দৃষ্টি। রান্নাবান্না, গৃহসজ্জা, যত্ন-পরিচর্যা, সব ত্রুটিহীন। যেটি যখন দরকার, হাতের কাছে উপস্থিত। ওটা নিয়ে এস, সেটা কোথায় গেল—বলবার অবকাশ নেই। সব প্রয়োজন নিরলসভাবে যুগিয়ে চলেছে প্রতিদিন। ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই, মাথাধরা বলেও দু'মিনিট বিশ্রাম নেই। বিজন যদি কখনো বলে, 'এত খাটবার কী দরকার? ঝি রয়েছে চাকর রয়েছে,' সুরমা হয় কোনো জবাব দেয় না, যা করছিল ক'রে যায়, নয়তো সংক্ষেপে জানিয়ে দেয়, তারা অন্য কাজ করছে। সংসারের এই যান্ত্রিক শৃঙ্খলা, গৃহ-কর্ত্রীর এই ত্রুটিহীন নৈপুণ্য উঠতে বসতে বিজনকে পীড়া দেয়। সুরমার দিকে তাকিয়ে মনে হয়, সে যেন একটি সচল পুতুল, ভিতরে কোনো প্রাণ নেই, আছে একটা দম-দেওয়া স্প্রিং। তারই জোরে চলছে ফিরছে। আর মনে হয়, সতত স্বাচ্ছন্দ্যে, পরম আরামে যেখানে তার দিন কাটছে, সেটা তার গৃহ নয়, একটি সুষ্ঠু-পরিচালিত হোটেল, আর ঐ মহিলাটি, যাকে সে তার স্ত্রী বলে জানে, সেখানকার সদা-বংশবদ সুদক্ষ ম্যানেজার। তার বেশী আর কিছু নয়।

তার বেশী আর কিছু যে সে আশা করতে পারে না, সেকথা বিজনের চেয়ে কে বেশী জানে? জানে, কিন্তু কোথায় তার প্রতিকার তা জানে না। মাঝে মাঝে মনে হয়, এভাবে আর চলে না, একটা খোলাখুলি

বোঝাপড়া দরকার। তার ফলে যদি আলাদা হয়ে বাস করতে হয়, সেই পথই বেছে নিতে হবে। সুরমাকে বুঝিয়ে বলবে, তোমাকে আমি সুখী করতে পারিনি, সেটা আমার পরম দুর্ভাগ্য। কিন্তু তোমার সব ইচ্ছা আমি প্রাণপণে মেনে চলবো। তোমার যেখানে থাকতে মন যায়, আমার মায়ের কাছে, কিংবা তোমার মায়ের কাছে, সেখানে গিয়ে থাকো। কারো উপরে নির্ভর করতে হবে না। তোমার সব ভার, সব দায়িত্ব আমারই রইল।

মনে মনে এই সঙ্কল্প নিয়ে কতদিন কলেজ থেকে ফিরেছে, কিন্তু সুরমার সেই নিস্তরঙ্গ চোখদুটোর সামনে দাঁড়িয়ে কিছুই বলতে পারেনি। বাড়ি আসা মাত্র ব্যস্ত হয়ে উঠেছে সুরমা। তারপর যন্ত্রের মত একটির পর একটি করে গেছে তার নিত্য-নির্ধারিত কাজগুলো। কেমন একটা মায়া হয়েছে বিজনের। যেকথা বলবে বলে ভাবতে ভাবতে এসেছিল, তার বদলে বলেছে, বেড়াতে যাবে সুরমা?

—'আমার যে এখনো কাজ সারা হয়নি,' দীপ্তিহীন ক্লান্ত চোখদুটি স্বামীর মুখের উপর তুলে ক্ষীণ কণ্ঠে বলেছে সুরমা।

—কাজ পরে হবে। চল একটু ঘুরে আসি।

সুরমা আর কিছু বলেনি। নিঃশব্দে ধীর পায়ে ঘরে গিয়ে পরনের কাপড়খানা বদলে যাহোক একটা কিছু পরে তখনই ফিরে এসে দাঁড়িয়েছে সেইখানে। রাস্তায় বেরিয়ে বিজন জানতে চেয়েছে, কোন দিকে যেতে চাও?

সেই নিস্পৃহ উত্তর—যেদিকে হোক, চল।

—আচ্ছা, চল ঐ পাহাড়টায় চড়া যাক। পারবে তো?

সুরমা মাথা নুইয়ে জানিয়েছে, পারবে।

খানিকক্ষণ নীরবে পথ চলবার পর মত বদলেছে বিজন, 'নাঃ, পাহাড়ে উঠতে গেলে ফিরতে রাত হয়ে যাবে। তার চেয়ে চল, প্রফেসর সুকুলের বাড়ি যাওয়া যাক। ওরা দুদিন এসে গেছে, আমাদের একবারও যাওয়া হয়নি।'

মনুসরণ সুরমা [illegible]লেনি, এখনো অনেক বেলা আছে, পাহাড় থেকে সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসা যাবে

কিংবা যে জামা-কাপড় পরে বেরিয়েছে, সেটা যে বন্ধুদের বাড়ি যাবার যোগ্য নয়, তার জন্মে তৈরী হয়েও আসেনি, একথাও তোলেনি। কিছুক্ষণ পরে বিজনের নিজেরই খেয়াল হয়েছে, 'এভাবে সেখানে যাওয়া যায় না। চল ফিরি। কী বল?'

সুরমা এবারেও ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছে মাত্র।

একদিন কী কারণে সকাল সকাল কলেজ ছুটি হয়ে গেল। বিজন স্থির করে ফেলল এতদিন অনেকবার যা বলতে গিয়েও পারেনি, আজই তার সুযোগ। এখন সুরমার অবসর। হয় শুয়ে আছে, নয়তো বই কিংবা সেলাই নিয়ে বসেছে। কী ভাবে পাড়বে কথাগুলো; কেমন করে বললে রূঢ় শোনাবে না, সুরমার মনে হবে না, এ শুধু তাকে সরিয়ে দেবার ছল; উত্তরে কী বলবে সে, যদি বলে 'আমি কোথাও যাবো না', তারপর তার কী করবার আছে—ইত্যাদি—বিভিন্ন দিক থেকে সমস্ত ব্যাপারটাকে নানাভাবে ওজন করে, বক্তব্য কথাগুলো মনে মনে সাজিয়ে নিয়ে বাড়ির কাছে এসে পৌঁছল। সদর দরজা খোলা রেখে চাকরটা কী করছিল। কড়া নাড়া বা ডাকাডাকির প্রয়োজন হল না। বসবার ঘর পার হয়ে দক্ষিণের বারান্দায় পা দিয়েই থমকে দাঁড়াল। ঠিক সামনে কয়েক ফুট মাত্র দূরে সুরমা দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে আছে দূরে ঐ শালবনের দিকে। এ ধার থেকে তার সমস্ত মুখখানা দেখা যায় না, কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকবার বিশেষ ভঙ্গিটি চোখে পড়ে। সেদিকে একটি বার তাকিয়েই বিজনের মনে হল 'বিষাদ প্রতিমা' বলে যে কথাটি সে কাব্যে-উপন্যাসে পড়েছে, কখনো উপলব্ধি করেনি, এই হচ্ছে তার জীবন্ত রূপ। বেদনার অবয়ব আছে, একটি নারীদেহের প্রতি অঙ্গে সে সমূর্ত হয়ে উঠতে পারে—এই পরম সত্যটি সে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করল।

কতক্ষণ স্থাণুর মত সেই একই জায়গায় নিষ্পলক দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে ছিল, বিজনের মনে নেই। হয়তো ঐ ধ্যান-মৌন মূর্তির দিকে চেয়ে অনির্দিষ্ট কাল অপেক্ষা করে থাকত। হঠাৎ কী কারণে এদিকে ফিরে তাকাল সুরমা। শ্রান্ত, বিষণ্ণ, জ্যোতিহীন দুটি চোখ। কোলে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে। তার উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে জলধারা।

স্বামীকে দেখেই যেন ব্যাধভীতা ত্রস্তা হরিণীর মত ছুটে গিয়ে শোবার ঘরে ঢুকে পড়ল। বিজন ফিরে গা এলিয়ে দিল বসবার ঘরে সোফার উপর। সেই মুহূর্তে একটি কথাই শুধু মনে হল—নিজের শয়নকক্ষেও তার প্রবেশের অধিকার নেই। সেখানকার শয্যায় ঝরে পড়ছে যে গোপন-সঞ্চিত অশ্রুধারা, তার অমর্যাদা হবে।

সুরমারও মনে হল, স্বামীর কাছে সে ধরা পড়ে গেছে। অন্তরের যে গুপ্ত কক্ষটি সে সযত্নে বন্ধ করে রেখেছিল, একটা অসতর্ক দুর্বল মুহূর্তে সহসা তার দ্বার খুলে গেছে, বেরিয়ে পড়েছে বেদনা-মলিন দীন রূপ। ছিঃ ছিঃ, এর পর সে মুখ দেখাবে কেমন করে? এরপর একে অন্যের সান্নিধ্যটুকু যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলা ছাড়া দুজনের আর পথ রইল না। তাই বা কেমন করে সম্ভব? তিনখানা ঘরের এই ছোট্ট বাসায় সর্বক্ষণ একই সঙ্গে থাকা; মাঝখানে একটু অন্তরাল সৃষ্টি করার মত আর কোনো পরিজন নেই! এই সমস্যা যখন দুজনের কাছেই দুরূহ হয়ে উঠেছে, একদিন আকস্মিকভাবে তার অনেকখানি সমাধান হয়ে গেল। কোনো খবর বার্তা না দিয়ে সকালের গাড়িতে সুরমার ছোট ভাই মোহন এসে উপস্থিত। বিজন ছিল বাইরের ঘরে। বিস্ময়ে আনন্দে কলরব করে উঠল—তুমি! কী আশ্চর্য! একটা খবর দিয়ে এলে তো স্টেশনে যেতে পারতাম।

ফার্স্ট ইয়ারের ছেলের পৌরুষে আঘাত লাগল। বেশ গর্বের সঙ্গে বলল, কেন, আমি বুঝি আর চিনে আসতে পারি না?

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই; তার প্রমাণ তো হাতে-হাতেই পাওয়া গেল। কিন্তু গাড়ি আসে ভোর পাঁচটায়, এখন বেজেছে সাড়ে ছটা। মাইল দুয়েক পথ, রিক্সতে বড় জোর আধ ঘণ্টা লাগবার কথা। কী ব্যাপার বল দিকিন?

—তা কী করবো? যে-দেশে আছেন, রিক্সওয়ালাগুলো একটা কথাও বোঝে না, খালি হাঁ করে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

—'তাই বলো!' বলে, বিজন হো হো করে হেসে উঠল, আচ্ছা এবার সোজা ভিতরে চলে যাও। জামা-কাপড় ছেড়ে মুখ-হাত ধোও।

দিদির সঙ্গে দেখা হতেই মোহন চমকে উঠল এ কি! তোকে যে চেনা যায় না। কী হয়েছিল?

—কী আবার হবে? নে, ঐ ঘাম-জবজবে জামাটা ছেড়ে হাওয়ার মুখে এসে বস। ছেলে একেবারে লায়েক হয়ে উঠেছেন। কেন, একটা খবর দিয়ে এলে কী দোষ হত?···না বলে কয়ে পালিয়ে আসিসনি তো?

মোহনের কানে বোধহয় এর কোনো কথাই ঢুকল না। দিদির কাছে এগিয়ে গিয়ে অনেকখানি উঁচু-হয়ে-ওঠা কণ্ঠার হাড়ে হাত রেখে কোমল কণ্ঠে বলল, সত্যি দিদি, তুই বড্ড রোগা হয়ে গেছিস। নিশ্চয়ই কোনো অসুখ করেছিল। কই আমাদের তো একবারও জানাসনি?

—কী মুস্কিল! অসুখ করলে তো জানাবো?

—করলেই বা জানাবি কেন? এখন তো আমরা কেউ নই। সবচেয়ে যিনি আপন, তিনি—

কথাটা শেষ করবার আগেই সুরমা সস্নেহে ভাইয়ের গালটা টেনে ধরে বলল, খুব ফাজলামো শিখেছিস, দেখছি। কলেজে ঢুকে বুঝি এই উন্নতি হয়েছে?

ঐ দিনই বিকেলের দিকে জানা গেল, মোহনের এতখানি পথ ঠেলে মধ্যপ্রদেশে আসবার আসল উদ্দেশ্য বেড়ানো নয়, দাদার বিয়েতে দিদি ও জামাইবাবুকে নিয়ে যাওয়া। বিয়ের এখনো মাসখানেক দেরী। মাঝখানে কয়েকটা দিন একটু ঘুরে-ফিরে দেশ দেখবে। তাই কলেজ বন্ধ হতে অনেক বলে-কয়ে মা ও দাদাদের মত করিয়ে চলে এসেছে। কবে কোন্ গাড়িতে রওনা হচ্ছে, কখন পৌঁছবে, ইত্যাদি বিবরণ দিয়ে বড়দা বিজনকে যে-চিঠিটা লিখেছিলেন, সেটা ডাকে দেবার ভার ছিল ওরই উপর। সে কাজটি ইচ্ছা করেই সে করেনি। মনে মনে মতলব ছিল—হঠাৎ এসে দিদি ও ভগ্নীপতিকে চমকে দেওয়া। ওখান থেকে ওঁরা ট্রেনে তুলে দিয়েছিলেন, মাঝখানে গাড়ি-বদলের হাঙ্গামা নেই। এখানকার স্টেশন থেকে রিকশ করে বাসায় আসা। সে আর এমন কি কঠিন! তখন কে ভেবেছিল তার এত কষ্টের শুদ্ধ হিন্দী এই

লোকগুলোর মাথায় ঢুকবে না, আর এদের দেহাতী বুলিও তার কাছে 'বিশুদ্ধ গ্রীক্' হয়ে দাঁড়াবে ?

কদিনের মধ্যে মায়ের চিঠিও পেয়ে গেল সুরমা। বিয়ের খবর বিস্তৃতভাবে জানিয়ে কন্যা-জামাতাকে তিনি বেশ কিছুদিন আগেই গিয়ে পৌঁছবার জন্যে অনুরোধ করেছেন। পাঁচজনকে নিয়েই তো যা-কিছু আমোদ-আহ্লাদ। বিজন-সুরমা না গেলে কাজকর্মই বা করবে কে ? চিঠি পড়ে বিজন বলল, সে তো অবশ্যই। কিন্তু আমার কলেজ বন্ধ হতে যে এখনো কদিন দেরী আছে।

তার আগে দিন কয়েকের ছুটি নিয়ে নিন না ? প্রস্তাব করল মোহন।

—তা হয় না। তার চেয়ে এক কাজ কর। তুমি এসেছ, দু'চার দিন থাক, তারপর তোমার দিদিকে নিয়ে চলে যাও। ভাষা-বিভ্রাটের ভয় নেই। আমি গিয়ে তোমাদের গাড়িতে তুলে দেবো।

সুরমার কোন ব্যাপারেই কিছু বলবার নেই। সুতরাং সেই ব্যবস্থাই হল। কয়েকদিনের মধ্যেই সুরমা চলে গেল মোহনের সঙ্গে। কথা রইল, বিজনও ঠিক সময়ে গিয়ে উৎসবে যোগ দেবে। কিন্তু সে কথা সে রাখেনি, কিংবা হয়তো রাখতে পারেনি।

বিয়ের উৎসব মিটে যাবার পর বিমলা লিখেছিল, 'তুমি আসনি বলে ওঁরা দুঃখ করলেন। এবাড়ি-ওবাড়ির প্রত্যেকেরই আশা ছিল, তুমি আসবে। আমি কিন্তু জানতাম, না। সুরমাকে দেখেই বুঝেছিলাম। আশ্চর্য মেয়ে ! ঘুরিরে ফিরিয়ে কত রকম করে কত প্রশ্ন করলাম। কিন্তু আসল কথাটা জানা গেল না। মুখ ফুটে কিছু না বললেও, বুঝতে কি আর পারিনি ? তুমিই বলেছিলে, মেয়েদের একটা তৃতীয় নয়ন আছে, তার কাছে সব ধরা পড়ে যায়। তাই তো ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি, সব জেনে-শুনেও এ কী করলে তুমি ! তুমি এত দুর্বল, এত অবুঝ হবে, যদি জানতাম এত বড় ভুল আমি করতাম না। এই মেয়েটার কাছে মনে মনে কী কৈফিয়ৎ দেবো আমি ?'

বিজন এ প্রসঙ্গের কোনো উত্তর দেয়নি। দেবার মত কিছু ছিল না। অন্ত দু'চারটা বাজে কথা দিয়ে এই সমাধান-হীন তীক্ষ্ণ প্রশ্নটাকে

চাপা দিতে চেয়েছিল। সেটা বুঝতে পেরেই বোধহয় বিমলা সেই ঢাকাটা আর সরাতে চায়নি। ঘটনার গতি তখন অন্য পথ ধরেছে। তার মধ্যে শুভ-সমাধানের ইঙ্গিত পেয়ে নতুন আশা জেগেছিল তার প্রাণে। লিখেছিল, "একটা মস্ত বড় সুখবর আছে। তুমি নিশ্চয়ই জানো। তবু না জানিয়ে থাকতে পারছি না। আমি জ্যাঠাইমা হতে চলেছি। এখনো অবিশ্যি মাস সাতেক দেরি। তবু তুবাড়িতে উৎসব লেগে গেছে। কিন্তু তুমি না থাকাতে পুরোপুরি জমছে না। তোমার কাছে আমাদের অনেক সন্দেশ পাওনা হল। কবে পাচ্ছি জানাও। হাতে হাতে না দিলে নিচ্ছি না কিন্তু।"

শেষের দিকে ছিল—"সুরমার শরীরের কথা ভেবে ওর মায়ের ইচ্ছা এ কটা মাস ওকে নিজের কাছে রেখে দেওয়া। আমাদের মাও মত দিয়েছেন। তার মানে বেশ কিছুদিন শূন্য শয্যায় হা-হুতাশ, আর তার সঙ্গে এ-পাশ ও-পাশ। কেমন জব্দ! রাগ করে আর কী করবে বল? বাপ হতে চলেছ, তার দাম দেবে না? এক দিক দিয়ে ভালই হল। দীর্ঘ বিরহের পরেই মিলনটা জমে বেশী।"

এই সব ব্যাপারে বধূঠাকুরাণীরা ঠাট্টা-পরিহাস করেন, দেবরেরা হাসিমুখে উপভোগ করে। এইটাই সাধারণ রীতি। কিন্তু বিজন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছিল। লিখেছিল, তোমার 'সুখবর' পেয়ে আমি শুধু খুশী নয়, নিশ্চিন্ত হলাম। তুমি যা লিখেছ বা ভাবছ, সে সব কারণে নয়, অন্য কারণে। ধরা-ছোঁয়া যায়, নিঃসন্দেহে নিজের বলে ভাবা যায়, এমন একটা অবলম্বন যে মানুষের, বিশেষ করে মেয়েমানুষের কতখানি প্রয়োজন, গত ছ'মাসে যেমন করে বুঝেছি, তেমন আর কোনোদিন অনুভব করিনি, তারই সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে সত্যিই আমি বাঁচলাম!

শুধু বিজন নয়, সুরমাও ঐ পথ দিয়েই বাঁচতে চেয়েছিল। আলো যেদিন তার কোলে এল, মনে হল, এতদিন তার আকাশে ছিল শুধু অন্ধকার, আজ তারই কোন্ নতুন দিগন্তের দ্বার ভেঙ্গে একটি ক্ষীণ রশ্মি এসে দাঁড়িয়েছে তার কাছে। মেয়ের নামটাও সেই দিয়েছিল। ভেবে-চিন্তে নয়, হঠাৎ বেরিয়ে গিয়েছিল মুখ থেকে। কোনো কোনো অভিভাবিকা তাই শুনে মুখ টিপে হেসেছিলেন। হয়েছে তো একটা

মেয়ে, পেট থেকে পড়তে না পড়তেই তার আবার নামকরণ ! নাম যদি দিতেই হয়, তার দিদিমা, ঠাকুরমা মামা জ্যাঠারা রয়েছে। তা নিয়ে প্রথম পোয়াতীর এই 'আদিখ্যেতা' কে কোথায় শুনেছে। খবরটা এ বাড়িতে যখন পৌঁছল, এঁরাও কেউ প্রসন্ন মনে নিতে পারেননি। শুধু বিমলা বুঝেছিল, নাম সুরমা দেয়নি, তার অন্তরের মধ্যে বসে দিয়েছে তার বিধাতা-পুরুষ। নিঃশ্বাস ফেলে মনে মনে বলেছিল, 'নামটা যেন সার্থক হয় আহা, বেঁচে থাক ; ঐটুকুই তো সম্বল !' দূরে বসে আর একজনও বোধহয় ঐ কামনাই করেছিল।

কিন্তু শুধু সন্তান নিয়ে পরিপূর্ণ হয়েছে কোন্ নারী ? তার আকাঙ্ক্ষা যে অতলস্পর্শী। স্বামীর প্রেমে যে গরবিনী, সেও মাতৃত্বের কামনায় জর্জর, সন্তানসৌভাগ্যে যে অনন্যা, বিগত অথবা বিমুখ স্বামীর জন্যে তারও হাহাকারের অন্ত নেই ! ('বিগতের' মধ্যে তবু একটা সান্ত্বনা আছে, সে শোক সয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু 'বিমুখের' বেলায় শুধু বঞ্চনা। তার যন্ত্রণা দুঃসহ।) এইখানেই শেষ নয়। পত্নী ও মাতার যুগপৎ আসনে বসেও তার তৃপ্তি নেই। তখন সে চায় স্বামীর আত্মীয়-পরিজনের স্বীকৃতি, বধূর সম্মান ও গৃহিণীর শাসন-দণ্ড। সব কিছু অজস্রভাবে লাভ করেও স্বামীর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার অন্যায় অধিকার পায়নি বলে নিজের ও অপরের জীবন বিষময় করে তুলেছে, এ হেন রমণীরও অভাব নেই সংসারে। নারী যখন দেয়, নিজেকে নিঃশেষে উজাড় না করে যেমন সে থামে না ; তেমনি যেখানে সে চায়, আকণ্ঠ পান করেও তার তৃষ্ণার নিবৃত্তি নেই।

সুরমা সব কিছুই পেয়েছিল ; তবু একটা না-পাওয়াকে ঘিরে যে-বঞ্চনা, তারই অন্তর্জ্বালা তাকে তার অজ্ঞাতসারেই ভিতরে ভিতরে ক্ষয় করে দিচ্ছিল। আলো সে পথ রোধ করতে পারেনি। একটা সাময়িক প্রলেপ মাত্র দিয়েছিল সেই পুরনো ক্ষতের মুখে। কিন্তু সামান্য একখানা শিশু-হস্তের সাধ্য আর কতটুকু ! আগুন নেভেনি। ধীরে ধীরে সকলের অলক্ষ্যে গোপন বিষক্রিয়া অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছিল।

মেয়ে হবার পর একবারটি এসে দেখে যাবার জন্যে দুবাড়ি থেকেই অনেক তাগিদ গিয়েছিল বিজনের কাছে। নানা অজুহাত দেখিয়ে আসাটা

সে ইচ্ছে করেই পিছিয়ে দিয়েছে। দিনের পর দিন মনে মনে একটি আশাই শুধু গড়ে তুলেছে—সুরমা সেরে উঠেছে, তার মুখের সেই স্বাস্থ্যোজ্জ্বল লাবণ্য ফিরে এসেছে, আরো মধুর হয়েছে মাতৃত্বের আভায়। তার কাছে যা পায়নি সেই অভাব পূর্ণ করেছে তার আত্মজা। 'আলো' নামের মধ্যেই রয়েছে সেই আশ্বাস। তারও খুব পছন্দ ঐ নামটি।

আলোর বয়স যখন চার মাস, তখন সে দেখতে এল মেয়েকে। ঠিকই লিখেছিল বৌদি। আলো সত্যিই এক ঝলক ভোরের আলো। এক সাজি সদ্য কুড়িয়ে আনা শিউলি ফুল। দোলার উপর ঘুমন্ত মেয়েকে এক পলক দেখেই বিজনের সমস্ত বুকখানা ভরে উঠল। পরক্ষণেই শিউরে উঠে পিছিয়ে গেল কয়েক পা। এ কে এসে দাঁড়াল দোলনার পাশে! সুরমা, না তার প্রেত! কোথায় গেল সে রঙ, সে স্বাস্থ্য, সেই মেঘের মত চুল! সুরমা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করল তার পায়ের কাছে। নিষ্প্রভ চোখ দুটি তুলে ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'ওখানকার খবর সব ভালো তো?' বিজন সে কথার উত্তর দিল না। ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, কী হয়েছে তোমার!

—কিছু না, মাথা নেড়ে মাটির দিকে চেয়ে জানাল সুরমা। তারপর নিঃশব্দে চলে গেল পাশের ঘরে।

বিমলার সঙ্গে দেখা হতেই, বেরিয়ে এল অনুযোগের সুর, সুরমার অসুখের কথাতো আমাকে কিছু লেখনি?

—কী লিখবো? রোগ ব্যাধি ওর তেমন কিছু নেই। সামান্য হজমের গোলমাল। বাচ্চা হবার পর একটু-আধটু সকলেরই হয়ে থাকে। তাছাড়া—

বিজন চোখ তুলতেই যোগ করল বিমলা, ও কিছুই লিখতে দেয়নি; মাথার দিব্যি দিয়ে বারণ করেছিল। মার জবানীতে যে লিখবো, তাও একশবার নিষেধ করেছে।

কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব। তারপর বিমলা বলল, ওকে তুমি নিয়ে যাও, ঠাকুরপো। এখানে থাকলে এ অসুখ সারবে না।

—ওখানে গেলেই কি সারবে?

কঠিন প্রশ্ন। বিমলার মুখে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর যোগায়নি। কিছুক্ষণ

ভেবে নিয়ে বলেছিল, সেটা অনেকখানি নির্ভর করছে তোমার উপর। ভালো করে ভেবে ছ্যাখ।

শুধু ভালো করে নয়, আকাশ-পাতাল ভেবে দেখেছিল অধ্যাপক বিজন ব্যানার্জি। কিন্তু কূল-কিনারা পায়নি। একদিন হয়তো পারত। কুমারী মনের স্বচ্ছতা এবং সামান্য আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রথম এসে যখন দাঁড়িয়েছিল সুরমা, অনায়াসে সেদিন ভরে দিতে পারত তার দুটি সুকুমার শূন্য মুঠি। তারপর অনেক সুসময় বয়ে গেছে। সেই নির্মল আকাশে অনেক মেঘ জমেছে, যাকে উড়িয়ে দেবার মন্ত্র তার জানা নেই। সেই ক্ষীণ মুঠি দুটি বন্ধ হয়ে গেছে, রুদ্ধ হয়ে গেছে দ্বার ; খুলবার যন্ত্রটি তার হাতে নেই। আজ শুধু বাইরে দাঁড়িয়ে ব্যর্থ করাঘাত !

শেষ পর্যন্ত মা-ই আপত্তি করলেন। 'শরীরটা ভালো যাচ্ছে না বৌমার। একটু যত্ন-আত্তি দরকার। বিজু একা পেরে উঠবে কেন ? ওকে কে দেখে তার ঠিক নেই। তার উপরে কচি ছেলের ঝক্কি। যাক আরো ছু'চার মাস। তারপর যাবে।' অতিশয় ন্যায্য কথা। এর পরে আর কার কথা কী বলবার থাকতে পারে? বিজন একাই ফিরে গেল তার শূন্য গৃহে।

মাস দুই পরে বিমানের বদলি হল কানপুর। সম্ভবতঃ 'উপরি'-সংক্রান্ত কোনো ব্যাপার, যার ফলে উপর-ওয়ালারা রুষ্ট হয়েছিলেন। ধরপাকড় করে সুবিধা হল না। ভোজনবিলাসী সুখী মানুষ। কোন্ অজানা খোট্টা মহারাজের 'পুরি-সবজির' উপর নির্ভর করে তার একদিনও থাকা চলে না। সুতরাং বিমলাকে সঙ্গী হতে হল। সেই বা একা থাকে কেমন করে ? চারিদিকে তো শুধু 'যাতা হ্যায়, খাতা হ্যায়'। প্রাণ-খুলে ছুটো কথা বলবে কার সঙ্গে ? সারাদিন করবেই বা কী। কোলে কাঁখে তো কিছু দেননি ভগবান, যে তাই নাড়াচাড়া করে সময় কাটবে। এখানে সে অভাব মিটিয়েছিল আলো। এ বাড়িতে আসবার পর মেয়ের ভার আপনা থেকেই চলে গিয়েছিল 'মেজবৌ'এর হাতে। ঝাড়া হাত-পা মানুষ তার মত আর পারবেই বা কে ? সে প্রয়োজন আরো বড় হয়ে দেখা দেবে দিন দিন। মেয়ে বড় হচ্ছে। তার চেয়েও বড় কথা। এ বাড়িতে সুরমাকে বোঝে শুধু ঐ একজন। তাকে ফেলে যাবে কার কাছে ? মেজদি চলে যাচ্ছে শুনে সেও খুব মুষড়ে পড়েছিল। নিয়ে যাবার প্রস্তাব হতেই

উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সব দিক বিবেচনা করে মা-ও মত দিলেন। বিজনের মতামতের জন্যে অপেক্ষা করা অনাবশ্যক। সে দায়িত্ব বিমলার। সে যে এই ব্যবস্থাতেই নিশ্চিন্ত হবে, বিমলার চেয়ে কে বেশী জানে? কানপুরে পৌঁছে খবরটা জানিয়ে দিলেই হবে। তাই দিয়েছিল। বিজন লিখেছিল, 'এ আর নতুন খবর কী? মেজদার কানপুর বদলির খবর যেদিন পেলাম, সেই দিনই এটা জানতাম। তোমার ঐ নতুন পুষ্যি দুটিকে ফেলে পালাবে কোথায়? পালাতে যদি পারতে, সেইটাই বরং জবর খবর হত।'

বিমলা লিখেছিল, 'লোটা-কম্বল নিয়ে তুমিও চলে এসো না? আমার আর একটি পুষ্যি বাড়ুক। ভয় নেই। বাসাটা বেশ বড়। কূজন গুঞ্জনের অসুবিধা হবে না। সে সময়টা আলোকে আমি সামলাবো।

এ প্রসঙ্গে আর কোনো জবাব আসেনি।

কানপুরে এসে একটা নতুন জীবনের স্বাদ পেয়েছিল সুরমা, এবং তাকেই সর্বতোভাবে আশ্রয় করবার চেষ্টা করেছিল। বিয়ের পরে এই প্রথম যেন একটু উচ্ছলতা দেখা গেল তার কথাবার্তায় চলাফেরায়। সদা-বিষণ্ণ মুখের উপর কারণে অকারণে এক ঝলক হাসি, মেজদির সঙ্গে ছোট-খাট খুনসুড়ি, মেয়েকে নিয়ে খেলা, গল্প, ছুটোছুটি। ভাসুরের কাছ থেকে যথেষ্ট পরিমাণে দূরত্ব রক্ষা করাই ছিল তখনকার দিনের প্রচলিত রীতি। যে-সব পরিবারে সেটা ভাঙ্গতে শুরু করেছিল, ওরা তখনো সে স্তরে গিয়ে পৌঁছতে পারেনি। সুরমা সেদিক দিয়েও খানিকটা এগিয়ে গেল। এ বাড়িতে সে-ই প্রথম 'দাদা' বলে ডাকল ভাসুরকে, মাঝে মাঝে এখানে-ওখানে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার আবদার নিয়ে গিয়ে দাঁড়াল তার কাছে। ছোটখাট ফাই ফরমাস, আগে যেটা চলত শুধু মেজদির উপর, এখন তার কিছু কিছু 'দাদা' পর্যন্ত পৌঁছতে লাগত। বিমান খুশী হল। এই বধূটি যে তাদের সংসারে এসে সুখী হয়নি, তা সে জানত। অথচ করবার কিছু নেই জেনে ভিতরে ভিতরে একটা অস্বস্তি ছিল। এই পরিবর্তনটুকু তার মনের সব ভার তুলে নিল। সবচেয়ে খুশী হল বিমলা। আশা হল মেঘ কেটে যাচ্ছে, এ তারই পূর্বাভাষ। অনুকূল হাওয়া বইতে শুরু করেছে, কানপুর ছাড়িয়ে একদিন সেটা মধ্যপ্রদেশে গিয়ে পৌঁছবে। সেই শুভদিন আসন্ন।

কয়েক মাস যেতেই বিমলা বুঝতে পারল, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই তারা ভুল করেছে। বিমান পুরুষমানুষ; তার চোখে পড়বার কথা নয়, কিন্তু মেয়েমানুষের চোখ নিয়ে সেও তো ধরতে পারেনি। যে-গাছের মূলে কীট এসে বাসা বেঁধেছে, ফাল্গুনের সাড়া পেয়ে সেও নতুন পাতা মেলবার চেষ্টা করে। তারপর ধীরে ধীরে সে ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়ে যায়. শাখা-প্রশাখায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে ক্ষয়ের চিহ্ন। যারা তার ক্ষণিক বিকাশের মধ্যে আনন্দের বার্তা খুঁজে পেয়েছিল তারা তাদের ভুল বুঝতে পারে। আরো বুঝতে পারে, ঐ পাতা মেলার মধ্যে একটা ব্যর্থ-প্রয়াসের করুণ ইতিহাস লুকিয়ে আছে। সে বাঁচতে চেয়েছিল, কিন্তু পারছে না। মূলে বসে বিষ তার জীবনরস শুষে শুষে নিচ্ছে।

সে লক্ষণ বিমানের চোখেও ধরা দিল। স্ত্রীকে বলল, সুরমার শরীরটা তো সারছে না। অসুখটা কী, বল দিকিন?

বিমলা কী একটা করছিল। সেই দিকে চোখ রেখেই সংক্ষেপে জবাব দিল, সে তোমরা বুঝবে না।

বিমান সহজ-বুদ্ধি সরল মানুষ। এ ক্ষেত্রে সাধারণ সমাধান বলে যা তার মনে হল, তাই প্রকাশ করল, 'আলো তো এখন একটু বড় হয়েছে। ওদের এবার বিজুর কাছে পাঠিয়ে দাও। চিঠি লিখে দাও. দু'চারদিনের জন্যে এসে নিয়ে যাক।'

স্ত্রী সাড়া দিচ্ছে না দেখে যোগ করল, তুমিও না হয় ঘুরে এসো ঐ সঙ্গে। দরকার হলে কিছুদিন থেকে—

এবার বিমলা মুখ তুলল। স্বামীর বক্তব্য শেষ হবার আগেই গম্ভীর মুখে বলল, টেলিগ্রামের কাগজ আছে তো?

—টেলিগ্রাম কী হবে? চিঠি লিখে দাও না? দুদিনে পেয়ে যাবে।

—না, না; সেজন্যে নয়, তোমার জন্যে বলছি।

—আমার জন্যে!

—আমাকে যেতে বলছ কিনা! পৌঁছনো পর্যন্ত তর সইবে তো? না, তার আগেই—"কণ্ডিশন হোপলেস্; কাম অ্যাট্ ওয়ান্স"?

বিমান হেসে উঠল। তারপর বলল, তা, আমি কী করবো! আঁচলের তলায় রেখে রেখে অবস্থাটা যে সত্যিই হোপলেস করে তুলেছ

স্বামী যে প্রস্তাব করলেন, সে কথাটা বিমলাও কিছুদিন থেকে মনে মনে ভেবে দেখেছিল। এবার সরাসরি প্রকাশ করল সুরমার কাছে। সে প্রথমটা চমকে উঠল। জা-এর মুখের দিকে চেয়ে বোধহয় বুঝতে চাইল তার মনের কথা। তারপর ম্লান হেসে বলল, তাড়াতে চাইছ বুঝি?

—চাইছিই তো। আর কতদিন জ্বালাবি আমাকে? এবার যার বোঝা, তার ঘাড়ে গিয়ে চাপো।

সুরমা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। বাইরে তখন সন্ধ্যা নেমেছে। বারান্দার রেলিং ধরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিল। আরো কিছুক্ষণ সেইভাবে দূরে কোন অলক্ষ্য বস্তুর দিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে বলল, যেদিন বুঝবো, সত্যিই জ্বালাচ্ছি তোমাকে, আলো আর আমি সত্যিই বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছি তোমাদের কাছে, সেদিন নিজেই চলে যাবো, তোমাকে বলতে হবে না।

বলতে বলতে দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। বিমলা সরে এসে আঁচলের কোণে, মুছিয়ে দিয়ে বলল, ছিঃ ছিঃ ভরসন্ধ্যেবেলা ঐ সব অলুক্ষণে কথা মুখে আনে কেউ?

একটা জিনিস আজ স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করল বিমলা। বিয়ের পরে যে-সুরমা স্বামীর সঙ্গে প্রথম ঘর করতে গিয়েছিল, তার থেকে আজকের এই সুরমার অনেক তফাৎ। সেদিন তার মধ্যে অনীহা ছিল, আগ্রহের অভাব ছিল, কিন্তু অমত বা অনিচ্ছার তীব্রতা এমন প্রবল হ'য়ে ওঠেনি। সেদিন সেটা ছিল ঘটনা-প্রবাহের কাছে অনুৎসুক আত্মসমর্পণ, আজ তাকে রোধ করবার কঠিন সঙ্কল্প।

এর পর কানপুর এবং মধ্যপ্রদেশের মধ্যে যে-সব চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলতে লাগল, তার ভিতরে উভয় পক্ষের মামুলী কুশল-প্রশ্নাদি ছাড়া সুরমার ভবিষ্যৎ গতিবিধি সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ রইল না। কিন্তু দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার ফলে বর্তমান ব্যবস্থাও দীর্ঘদিন স্থায়ী হল না। মায়ের অসুখের খবর পেয়ে সুরমাকে যেতে হল বাপের বাড়ি এবং স্বামীর মৃত্যুর পর বিমলার মা এসে আশ্রয় নিলেন মেজোমেয়ের কাছে। সুরমা আর কানপুরে ফিরে এল না, বিমলাও তাকে আনবার জন্যে

পীড়াপীড়ি করল না। হয়তো তার মূলে তার মায়ের উপস্থিতির খানিকটা যোগ ছিল। কে জানে, সেটা শুধু এ তরফে নয়, ও তরফেও।

আলো চার বছরে পড়ল। এই দীর্ঘ সময়টা সুরমা বেশীর ভাগ মায়ের কাছেই কাটিয়েছে। মাঝে মাঝে দু'চারদিনের জন্যে শাশুড়ীর কাছেও থেকেছে। তাঁর শরীর ভাল নয়, বড়বৌ তার নিজের কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ব্যস্ত। তাই ইচ্ছা থাকলেও ওদের বেশীদিন ধরে রাখতে পারেননি, কখনো দু'এক বেলা রেখে নিজেই গরজ করে পাঠিয়ে দিয়েছেন। নাৎনীটি দিদিমা-অন্ত প্রাণ। সেজন্যে তাঁর মনে একটু গোপন অভিমান ছিল। অথচ করবার কিছু নেই। পুত্র যেখানে থেকেও নেই, সেখানে পৌত্রীর উপর জোর খাটাবেন কার জোরে? বৌকেও তাই আপনার বলে কাছে টেনে নিতে পারলেন না। তার শীর্ণ-মলিন মুখখানার দিকে চেয়ে নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হত। এই মেয়েটার চরম দুঃখের জন্যে তিনিই যেন দায়ী। ছেলের উপর দারুণ অভিমানে বুক ভরে উঠত। মুখ ফুটে বৌকেও কোনোদিন বলতে পারেননি চল বৌমা, তোমাকে বিজুর কাছে রেখে আসি ; তাকেও একবার লিখতে পারেননি, ওদের এসে নিয়ে যা।

এই ক্ষোভ বুকে করেই একদিন তিনি চোখ বুজলেন। টেলিগ্রাম পেয়ে বিজন যখন এসে পৌঁছল, তখনো তাঁর স্পষ্ট জ্ঞান ছিল। ঘরে আর কেউ ছিল না। ছেলের দিকে বারবার ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছিলেন। কী একটা যেন বলবার আছে, কিন্তু বলতে পারছিলেন না।

বিজন বুঝতে পেরে মায়ের বুকের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, আমায় কিছু বলবে, মা?

—বলবার যে আমার মুখ নেই, বাবা। দোষ তোদের নয়, আমার। আমি বুঝতে পারিনি।

—তুমি বিশ্বাস কর মা, ও যদি সুখী হত বুঝতাম, আমি ওকে নিজের কাছে নিয়েই রাখতাম। এখনো আমি তৈরী। কিন্তু—

মায়ের ঠোঁট নড়ে উঠতেই বিজন থেমে গেল। তিনি অত্যন্ত

ক্ষীণকণ্ঠে ধীরে ধীরে বললেন, ছাখ, ও আর বেশীদিন বাঁচবে না। আমি যে রেখে যেতে পারছি, এই আমার পরম ভাগ্যি। সে ছুর্দিন যদি আসে, মেয়েটাকে তুই নিজের কাছে এনে রাখিস। বাড়ুয্যে-বংশের মেয়ে যেন পরের বাড়িতে মানুষ না হয়।

পরদিনই মা মারা যান। তাঁর শেষ সময়ে একঘর লোকের মধ্যে সুরমাও ছিল। তার দিকে হঠাৎ নজর পড়তেই চমকে উঠেছিল বিজন। বুঝেছিল, মায়ের আশঙ্কা হয়তো অমূলক নয়। তবু বছর না ঘুরতেই যে তাঁর শেষ আদেশ পালন করবার প্রয়োজন দেখা দেবে, এতটা সেদিন ভাবতে পারেনি। সুরমার সঙ্গে ছুচারটি মামুলী কথা যা হয়েছিল, তার মধ্যেও এমন কোন লক্ষণ দেখতে পায়নি যে সে এত শীঘ্র চলে যাবে।

একবাড়ি লোকের ভিড়ে নিভৃতে দেখা হবার সুযোগ বড় কম। সে সুযোগ যে করে দিতে পারত সে আসতে পারেনি। তার আগে থেকেই কানপুরের বাসায় টাইফয়েড্-এ শয্যাশায়ী। শুধু বিমান এসেছিল শ্রাদ্ধের আগের দিন এবং ঐ দিনটা থেকেই চলে গিয়েছিল। বৌদির অভাব বিজন সেদিন যেমন তীব্রভাবে অনুভব করেছিল তেমন আর কখনো করেনি। নিজের চেষ্টাতেই স্ত্রীকে কিছুক্ষণের জন্যে একান্তে পেয়ে বলেছিল, আমার সঙ্গে যাবে সুরমা?

সুরমা চোখ তুলে চায়নি। মাটির দিকে চেয়ে আঁচলের একটা কোণ আঙ্গুলে জড়াতে জড়াতে বলেছিল, আলোটা বড় ছুরন্ত হয়েছে। আমি ওকে মোটেই সামলাতে পারি না।

—ওর জন্যে আলাদা ঝি রেখে নিও।

—ঝি-এর কাছে থাকলে তো? 'দিদা' না হলে ওর এক মিনিট চলে না।

—বেশ তো। তাহলে ও দিদিমার কাছেই থাক না?

সুরমা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়নি। কিছুক্ষণ পরে অস্ফুট মৃছু কণ্ঠে বলেছিল, আমি কী নিয়ে থাকবো?

গলাটা কী একটু ধরে এসেছিল? হয়তো এসেছিল, কিংবা ওটা বিজনের শুনবার ভুল। সে আর কোনো কথা বলেনি। অনেক দিন পর মনে হয়েছে, সুরমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর না করে সেদিন

যদি সে দ্বিধাহীন সুরে শুধু বলত, 'তোমাকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি, সুরমা,' হয়তো তাদের জীবনের স্রোত অন্য পথ ধরত ; ঘটনার ধারা বয়ে যেত অন্য খাতে। কিন্তু সুরমার সুমুখে দাঁড়িয়ে একথা সেদিন সে বলতে পারেনি।

সুরমা যখন কানপুরে, বিমলা দেওরকে অনেকবার লিখেছে, 'ও চাকরি তুমি ছেড়ে দাও, ঠাকুরপো। কার জন্যে পড়ে আছ ঐ জঙ্গলে? কোলকাতা কিংবা তার কাছে ধারে কিছু একটা জুটিয়ে নাও। যতদিন না জোটে, বাড়িতে থাকতে বাধা কী?' আজ সেই প্রয়োজন অনিবার্য ভাবে দেখা দিল। মায়ের মৃত্যুশয্যার নির্দেশ তাকে মানতে হবে। কিন্তু ঐটুকু মেয়েকে তো এই নির্বান্ধব দূরদেশে এনে রাখা যায় না। কলকাতায় ফিরে যাওয়া ছাড়া অন্য পথ নেই। তার জন্যে প্রথমেই দরকার একটি চাকরি, এবং আলাদা বাসা। বড়বৌদির একদঙ্গল ছেলে-পিলের মধ্যে সুরমার শিশু অবহেলায় মানুষ হচ্ছে, এ কথা সে ভাবতে পারে না।

চাকরির দরখাস্তের সূত্র ধরেই বেলেঘাটায় পিসতুতো দিদির বাড়িতে তাকে যেতে হয়েছিল। প্রয়োজনটা ছিল ভগ্নীপতির কাছে। যে-কলেজে চাকরি, উনি তার গভর্নিং বডির প্রতিপত্তিশালী মেম্বর। যদি কোনো সুবিধা হয় এই আশায় তাঁর আফিসে গিয়ে দেখা করেছিল। দীর্ঘকাল পরে দেখা বিশিষ্ট কুটুম্বকে তিনি তখনই ছেড়ে দেননি। পরম সমাদরে সঙ্গে করে বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন।

কে জানত, অতবড় নির্মম বিস্ময় সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। ঐখানে ঐ অবস্থায় নির্মলার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে সে সম্ভাবনা মনের কোণেও কোনোদিন ঠাঁই পায়নি।

—দশ—

'সেকেণ্ড স্যরকে' যেদিন ঘটা করে সংবর্ধনা জানানো হল, বর্ষ্টাল স্কুলের ছেলেরা সেদিন স্বপ্নেও ভাবেনি যে তার তিন মাসের মধ্যেই আবার তাদের কলাগাছ আর দেবদারু পাতার প্রয়োজন দেখা দেবে। এবারকার আয়োজন আরো ব্যাপক। মালাটা আরো বড় করে গাঁথতে হবে, গেটটা হবে আরো জমকালো। যে-সে ব্যক্তি নন, স্বয়ং সুপার-সাহেবের বিদায়-অভিনন্দন।

ঘোষ নিজেও এই বদলির জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। কর্তৃপক্ষের মতে এটা শুধু ট্রান্সফার নয়, প্রমোশন; বর্ষ্টাল স্কুলের ক্ষুদ্র পরিসর থেকে সেণ্ট্রাল জেলের বৃহৎ এলাকার খবরদারি। খুদে কয়েদীর ছোটখাট নালিশ-ফরিয়াদ-এর বদলে জাঁদরেল ক্রিমিনাল-এর জটিলতর সমস্যা ও ব্যাপকতর দায়িত্ব। খুশী হবার কথা। অন্য যে কেউ এই পরিবর্তনকে নিজের কৃতিত্বের স্বীকৃতি বলে গ্রহণ করতেন, কৃতজ্ঞতা জানাতেন উপর-ওয়ালার দরবারে। কিন্তু লেফটেনাণ্ট ঘোষ চিরদিনই একটু বেয়াড়া ধরনের মানুষ। পদোন্নতির সুখবর পেয়ে মুখ ভার করে রইলেন। ক্লাব মহলে কেষ্ট-বিষ্টুদের একজন পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দিলেন, ভাবছেন কী, মশাই? কপাল খুলে গেল। ছিলেন বৃন্দাবনের রাখাল-রাজা, এক কলমের খোঁচায় একেবারে মথুরেশ্বর।

ঘোষসাহেব মৃদু হেসে জবাব দিলেন, 'ভাবছি, সেই 'খোঁচাটা' কপালে সইলে হয়। সবাই তো আর কেষ্টঠাকুর নয়।' বলে, বাঁকা চোখে তাকালেন বক্তার মুখের দিকে। আশেপাশে যাঁরা ছিলেন সকলের মুখেই চাপা হাসি। ভদ্রলোক অস্বস্তি বোধ করলেন। কিছুদিন থেকে তিনি শহরের সান্ধ্য ক্লাবে নারী-মেম্বরদের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্যে আন্দোলন করছিলেন। ঐ সম্পর্কে তাঁর যে একটু বিশেষ দুর্বলতা আছে, ক্লাবে এবং তার বাইরে সেটা সরস ও মুখরোচক আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মুখে যাই বলুন, ঘোষসাহেবের মনের কথাটা তাঁর মনেই রইল। বর্ষ্টালের এই ছেলেগুলো, প্রতিকথায় যাদের তিনি 'হতভাগা' বলে উল্লেখ করতেন, এই দীর্ঘদিন ধরে ধীরে ধীরে তাঁর অন্তরের কতখানি স্থান অধিকার করে বসেছিল, তিনি নিজেও বোধহয় জানতে পারেননি। ছেড়ে যেতে গিয়ে সেখানটায় টান পড়ল। সে বেদনাবোধ কাউকে জানতে দিলেন না। আশুবাবু থাকলে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে নিজেই বুঝতে পারতেন। আর একজনও বুঝল। সে দিলীপ। যে-বিশালকায় 'সাহেবের' বাইরেটা দেখে সে একদিন ভয় পেয়েছিল এবং সে ভয় অনেকদিন পর্যন্ত কাটিয়ে উঠতে পারেনি, তাঁর অন্তরের মধ্যে যে তাদেরই মতো একটি শিশু বাস করে, বন্ধু বলে যার দিকে হাত বাড়ানো যায়, সঙ্গী বলে কাছে ডাকলে সাড়া মেলে, দিলীপের কাছে এই গোপন সত্যটি অজানা ছিল না। সাহেবের ঘরে সবসময়েই ভিড়। চলে যাবার মুখে সেটা আরো বেড়ে গেছে। তারই মধ্যে কখন এসে তাঁর কাছে দাঁড়াবে, যখন ভাবছে, এমন সময় তিনিই তাকে ডেকে পাঠালেন।

আশুবাবু চলে যাবার পর দিলীপের পড়াশুনা দুদিক থেকে বাধা পেয়েছিল। প্রথম—সেই অভাবটা কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। তারপরে, তাঁর কাছ থেকে যেটা নিয়মিত পেয়ে আসছিল সেই সাগ্রহ এবং সক্রিয় সাহায্য দেবার মত আর কেউ ছিল না। তাছাড়া, বাহাদুর চলে যাবার পর সেই শূন্য স্থানটা তাকেই পূরণ করতে হয়েছিল। প্রেস-এর কাজও খানিকটা বেড়ে গিয়েছিল। সমস্ত দিনে আসন্ন পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুতি দূরে থাক, সে কথা ভাববার অবসরও থাকত না। প্রেস্-মাষ্টার ওকে ভালবাসতেন। মাঝে মাঝে বলতেন, 'এটা এখন রেখে দাও। খানিকটা নিজের কাজ কর। পরীক্ষা তো এসে গেল।' আবার মিনিট কয়েক পরেই হয়তো ডেকে পাঠাতেন,—'এই ছাখ, দিনাজপুর জেল আবার তাগিদ দিয়েছে। ফর্মগুলো কালকের মধ্যেই ছেপে ফেলতে হবে। ডেপুটিবাবু রাগারাগি করছিলেন, এত দেরি হয় কেন?'

ওকে তখন এ্যালজেব্রা ফেলে 'কম্পোজ'এ বসতে হত।

রাত্রে ব্যারাকে পড়াশুনা অসম্ভব। এক দঙ্গল ছেলে গোলমাল করছে। 'সেল্'-অঞ্চলটা এমন নির্জন যে দিলীপ কেন, কোন বয়স্ক লোকও সেখানে থাকতে সাহস করবে না। তার উপরে সেই ঘরগুলোও শাস্তি দেবার জন্যে, বাস করবার জন্যে নয়। তাই তার থাকবার ব্যবস্থা ছিল হাসপাতালে। অতবড় হলঘর; তিন চারটির বেশী রোগী বড় একটা থাকে না। অনেক জায়গা পড়ে আছে। এককোণে বসে পড়াশুনোর কোনো ব্যাঘাত নেই। সাহেবের নির্দেশেই ডেপুটিবাবু বন্দোবস্তটা করে দিয়েছিলেন, যদিও মনে মনে খুশী ছিলেন না। কিন্তু কম্পাউণ্ডার খুব খুশী। একগাদা খাতাপত্র দিলীপের ঘাড়ে চাপিয়ে প্রায় পেন্সন উপভোগ করছিলেন। রাত জেগে জেগে সেইগুলো ওকে লিখে রাখতে হত। কোনো কিছু বাদ পড়লে তিনি রুষ্ট হতেন। সুতরাং দিলীপের পরীক্ষার পড়া শিকায় উঠেছিল। সুপার এসব জানতেন না, ডেপুটি জেনেও নির্বিকার, (সরকার-নির্দিষ্ট 'শেডিউল্ড্ টাস্ক্' না করে কোনো ইন্মেট্ শুধু পরীক্ষার পড়া নিয়ে থাকবে এটাই বরং তাঁর মনঃপূত হয়নি)। হেড্মাষ্টার এ নিয়ে মাথা ঘামাতেন না, অন্য কারও এটা এলাকার বাইরে। যিনি বলতে পারতেন, প্রয়োজন মত সাহেবের নজরে এনে সবকিছুর প্রতিকার করতে পারতেন, সেই আশুবাবু নেই। অনেক রাত্রে হাসপাতালে হারিকেনের আলোয় বসে মর্ণিং ষ্টেট্মেণ্ট্ কিংবা বেড্হেড্ টিকিট লিখতে লিখতে সেই পরম স্নেহপরায়ণ, একান্ত সুহৃৎ মাষ্টারমশাই-এর কথা তার বার বার মনে পড়ত। চোখ দুটো জলে ভরে উঠত।

সুপারের আরদালী এসে যখন দিলীপকে তাঁর আফিসে ডেকে নিয়ে গেল, তিনি একা বসে কাজ করছিলেন। কিছুক্ষণ পরে মাথা তুলে বললেন, পড়াশুনো কেমন হচ্ছে?

দিলীপ মাথা নেড়ে জানাল, ভালো।

—ভালোভাবে পাশ করতে পারবে তো?

—চেষ্টা করবো।

—শোনো; তোমার খালাসের প্রায় বছর খানেক বাকী রয়েছে। এতদিন তুমি যেভাবে আছ, ক মাস পরেই, মানে টার্ম পুরো হবার আগেই

তোমাকে ছেড়ে দেওয়া যেত। আমি ইচ্ছে করেই সে চেষ্টা করিনি। যাবার আগে যাতে ম্যাট্রিকুটা দিয়ে যেতে পার, সেইটাই চেয়েছিলাম। সে ব্যবস্থা হয়ে আছে। এখন তুমি তৈরী হলেই হল।

দিলীপ মাথা নত করে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। সাহেব আবার বললেন, তোমার মায়ের কোনো চিঠিপত্তর তো পাওনি।

—'না'। বলেই সঙ্গে সঙ্গে সাগ্রহ দৃষ্টি মেলে তাকাল। হঠাৎ সে কথা কেন জানতে চাইছেন সাহেব? তবে কি নতুন কোনো আশার সূত্র দেখা দিয়েছে কোনোখানে? সুপার বোধহয় পড়তে পারলেন ওর চোখের সেই উদ্বেগাকুল নীরব প্রশ্ন। তারই উত্তরে ধীরে ধীরে বললেন, আমাদের পক্ষে যতটুকু সম্ভব আমরা খোঁজ-খবর নিয়েছি। তবে তাকে ঠিক চেষ্টা করা বলে না। সেটা তুমি বেরিয়ে গিয়ে করবে, এবং আমার বিশ্বাস, তোমাকে বেশীদিন অপেক্ষা করতে হবে না। সেদিক দিয়ে আশুবাবু তোমাকে সাহায্য করবেন। উনি এখন কোলকাতাতেই আছেন। তাঁর চিঠি পাওনি?

—পেয়েছি, স্যর।

—খালাসের পর ওঁর ওখানেই চলে যেও। ওঁর তাই ইচ্ছে। আমাকে লিখেছেন তোমাকে বলবার জন্যে। আমিও একদিন যাবো ওঁর প্রেস দেখতে। হয়তো সেখানেই আবার তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।

ঘোষসাহেব এখানে একটু থামলেন, একবার তাকালেন ওর আনত মুখের পানে, তারপর বললেন, জেনেছ নিশ্চয়ই, আমি চলে যাচ্ছি।

'চলে যাচ্ছি' কথাটা হয়তো সহজ সুরেই বলেছিলেন ঘোষসাহেব। কিন্তু দিলীপের কানে সেটা অনেক গভীরতর আবেদন নিয়ে গিয়ে পৌঁছল। সাহেব যে চলে যাচ্ছেন সেকথা তার অজানা ছিল না। তার জন্যে প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। মনে মনে ভেবে রেখেছিল, এর পরে আর হয়তো ওঁর সঙ্গে এমন একান্তে দেখা হবে না, এখানেই সে সাহেবকে তার দীর্ঘ সঞ্চিত কৃতজ্ঞতাটুকু জানিয়ে যাবে। বলবে, 'আপনার স্নেহ আমি কোনোদিন ভুলবো না, যদি কোনো অপরাধ করে থাকি, ক্ষমা করবেন।' কিন্তু ওঁর মুখ থেকে ঐ 'চলে যাচ্ছি' কথাটা উচ্চারিত

হতেই তার সমস্ত বুকের ভিতরটা অব্যক্ত বেদনায় আলোড়িত হয়ে উঠল। কিছুই বলা হল না। শুধু এগিয়ে গিয়ে ওঁর পায়ের উপর একটি নিঃশব্দ প্রণাম রেখে মাথা নত করে বেরিয়ে গেল।

নতুন অধ্যক্ষের নিয়োগ সময়সাপেক্ষ। যতদিন না আসেন, 'অ্যাকটিনি' করবার ভার পড়ল ডেপুটিস্থপার সন্তোষ সেনের উপর। ক্ষমতা হাতে আসতে তিনি, আক্ষরিক অর্থে যাকে বলে, 'রুল অব ল' প্রতিক্ষেত্রে তারই প্রয়োগ ঘোষণা করলেন। সহকর্মীদের ডেকে বললেন, 'রুল্‌স্ আমরা তৈরী করিনি, তার ফলাফল চিন্তা করবার অধিকারও আমাদের দেওয়া হয়নি, আমাদের একমাত্র কাজ তাকে নির্বিচারে মেনে চলা। মনে রাখবেন, এই হচ্ছে আমাদের বেদ, কোরাণ ও বাইবেল,—বলে, বহু-ব্যবহারে জীর্ণ জেলকোড্‌খানা তুলে ধরলেন সকলের চোখের উপর।

সেই সনাতন রুটিনের পুনঃপ্রবর্তন হল—ড্রিল, ব্যাণ্ড্‌, দুঘণ্টা স্কুল, পাঁচঘণ্টা ওয়ার্কশপ, একঘণ্টা খেলা। আট থেকে আঠারো—সব বয়সের একই নিয়ম। বর্স্টাল ও ইনডাস্ট্রীয়াল—দুদল একই আইনে বাঁধা। দিলীপকেও তার মধ্যে পড়তে হল। শেষের দিকে তার ড্রিল মাপ করে দিয়েছিলেন ঘোষসাহেব। সে 'অন্যায় প্রিভিলেজ' প্রত্যাহার করা হল। সুযোগ পেয়ে ড্রিল-মাষ্টার তার পুরনো আক্রোশ মিটিয়ে নেবার আয়োজন করলেন। এতদিনের অনভ্যাসে যা অনিবার্য, ছোটখাটো ভুল-ত্রুটি এখন বড় হয়ে দেখা দিল। শাস্তিস্বরূপ ব্যবস্থা হল নিয়মিত এক্‌সট্রা ড্রিল। পড়ার সময় অন্য সকলের মত সেই দু'ঘণ্টায় এসে দাঁড়াল। তার সঙ্গে পুরো পাঁচঘণ্টার প্রেস-খাটনি। একটা অনিয়ম শুধু বরদাস্ত করে গেলেন নতুন স্থপার। হাসপাতাল থেকে সরিয়ে এনে ওকে ব্যারাকে পুরে দেওয়া হল না। পড়তে চাও তো পড়; পাশ যদি করতে পার, মন্দ কী? স্কুলের নাম হবে। কিন্তু তার জন্যে আইনের পাশ কাটিয়ে কোনো বাড়তি সুবিধা দেওয়া হবে না। এই ব্যবস্থাটুকু নিতান্ত দয়াপরবশ হয়েই বজায় রাখলেন সন্তোষবাবু। সেইসঙ্গে কম্পাউণ্ডার আরও একটু সদয় হলেন। কেরানীগিরির উপর খানিকটা নার্সগিরিও চাপিয়ে দিলেন দিলীপের ঘাড়ে। সন্ধ্যার

পর রোগীদের ওষুধ-পথ্য খাওয়ানো, তাপ পরীক্ষা করা, প্রয়োজনমত মাথায় আইস-ব্যাগ চাপানো এবং এই জাতীয় ফাই-ফরমাস। ওকে বোঝালেন, "সেবার চেয়ে বড় ধর্ম আর কী আছে? তাছাড়া, রাত জেগে বই মুখস্ত করে হবেটা কী? তার চেয়ে এই কাজগুলো শিখে যাও। আখেরে কাজ দেবে।" সুতরাং পরীক্ষার আখের সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে দিলীপকে এই নতুন আদর্শে আত্মনিয়োগ করতে হল।

লেফ্‌টেনান্ট ঘোষের রাজত্বে আর একটা মারাত্মক অনিয়ম চলে আসছিল! উনিই তার প্রবর্তক।

এ প্রতিষ্ঠানের লিখিত আইনে 'ষ্টার' হবার অধিকার শুধু সেইসব ছেলেদের, 'বর্ষ্টাল স্কুলস্ অ্যাক্‌টে' যাদের সাজা, অর্থাৎ যাদের বয়স ষোল থেকে একুশ। 'ইনডাষ্ট্রিয়াল বয়েজ', অর্থাৎ আট থেকে পনর যাদের বয়স, তারা সে অধিকার থেকে বঞ্চিত। 'ষ্টার-বয়' কতগুলো বাড়তি সুবিধা ভোগ করে থাকে; তার মধ্যে প্রধান—সাধারণ খাদ্যতালিকার উপর কিঞ্চিৎ মাছ-মাংস-ডিম দুধের আলাদা বরাদ্দ। নেহাৎ 'কিঞ্চিৎ' নয়, দৈনিক আড়াই ছটাক মাছ বা মাংস, অথবা তার বদলে দুটো ডিম। নিরামিষওয়ালাদের বিকল্প ব্যবস্থা দুধ।

ঘোষসাহেব তখন নতুন এসেছেন। একদিন 'ফীডিং প্যারেড' তদারক করতে গিয়ে তাঁর নজরে পড়ল কয়েকটি বড় ছেলের পাতে মাংসের কারী, আর তাদেরই পাশে বসে ছোটদের দল খাচ্ছে শুধু ডাল ভাত। কেউ কেউ ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে ভাগ্যবান দাদাদের থালার দিকে আর প্রাণপণে পাত চাটছে।

'ওদের মাছ কৈ?' কিঞ্চিৎ রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন চীফ্ অফিসারকে।

—আজ্ঞে, ওরা কাল পাবে। কাল 'জেনারেল ফাইল'।

—এরা যে আজ খাচ্ছে?

চীফ্ অফিসার হাসল। নতুন সাহেবের অজ্ঞতার উপর কিঞ্চিৎ করুণার হাসি। তারপর বলল, আজ্ঞে, হুজুর, এটা হচ্ছে 'ইস্পিশাল'। ওরা 'ষ্টার' কিনা? ওদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা।

—খুব ভালো ব্যবস্থা তো। ধেড়েগুলো গিলবে, আর বাচ্চাগুলো বসে বসে হাত চাটবে!

তখনই আফিসে ফিরে ডেপুটি সুপারকে ডেকে দেখতে চাইলেন কি আছে "রুলস্"। তারপর, দেখা হয়ে গেলে মোটা বইখানা সশব্দে টেবিলের উপর আছড়ে ফেলে বেঁটে ছড়িখানা বগলদাবা করে গটগট করে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু ব্যাপারটা ঐখানেই শেষ হল না। দিনত্বই পরে আবার ডেপুটির ডাক পড়ল। আসতেই, কোনোরকম ভূমিকা বা পরামর্শ না করে সরাসরি বললেন, আপনার 'ষ্টার' প্রভুরা আলাদা মাছ মাংস যেটা পায়, তার সঙ্গে সাধারণ ছেলেদের পাওনাটা যোগ করে এক জায়গায় রান্না করতে বলুন।

ডেপুটি নির্দেশটা ঠিক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তখন বাকী অংশটা পূরণ করলেন সুপার, 'আর, বলে দিন সেটা যেন সক্‌কলকে সমান ভাগে দেওয়া হয়।'

—তা কেমন করে হবে, স্যর?' প্রতিবাদ জানালেন সন্তোষবাবু। 'ষ্টার' বয়দের এক্‌সট্রা অ্যালাউন্স আলাদা রান্না করেই দেবার কথা। গবর্মেণ্ট স্যাংশান আছে।

—তা আছে, কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানের স্যাংশান নেই। ওদের পাওনাটা ওরা সকলের সঙ্গে ভাগ করে খাক, এইটাই আমার ইচ্ছা।

ডেপুটি বলতে পারতেন, 'আপনার ইচ্ছায় তো আর আইন বদলায় না। বললেন না। উপরওয়ালাকে সব কথা বলা যায় না। তবে, এই ব্যাপার নিয়ে 'ষ্টার' ছেলেরা গোলমাল করতে পারে, কর্তব্যের অনুরোধে একথা তিনি স্পষ্টাপষ্টি না জানিয়ে পারলেন না। ঘোষ তার উপরে বিশেষ কোনো গুরুত্ব দিলেন বলে মনে হল না। সংক্ষেপে বললেন, আচ্ছা, সে যখন করবে, তখন দেখা যাবে।

ডেপুটির অনুমান যে অমূলক নয়, প্রথমদিনেই বোঝা গেল। ষ্টার-মহলে একটা চাপা অসন্তোষ দেখা দিল। কয়েকজন মাংস খেল না, একজন পুরোপুরি অনশন অর্থাৎ গোটা একদিন হাঙ্গার ষ্ট্রাইক্ করে বসল। সাহেব ওদের সব কজনকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'তোমাদের অনেকেরই বড় ভাই আছে। কী বল?' কেউ কেউ মাথা নাড়ল।

'আচ্ছা, ধর, একসঙ্গে খেতে বসেছ আর মা কী করলেন? মাছের কালিয়াটা সব তার পাতে ঢেলে দিলেন, আর তোমাকে দিলেন শুধু ডাল চচ্চড়ি। তোমার খুব ভালো লাগবে কি? আর তোমার দাদারও কি লজ্জা করবে না ছোট ভাই-এর সামনে বসে মাছের মুড়ো চিবোতে?

'ষ্টার'এর দল গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এসব 'ইস্কুল মাষ্টারি' উপদেশ কারোই ভালো লাগল না। নীতিবচন শুনবার জন্যে তারা বর্ষ্টাল্ জেলে আসেনি। সাহেব মনে মনে হাসলেন। ভাষাটা মোলায়েম হলেও বেশ দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দিলেন, তার কাছে ছোট বড় সব ছেলেই সমান। সুতরাং খাওয়া পরার ব্যাপারে কোনো ইতর-বিশেষ হতে দেবেন না।

ভিতরে ভিতরে আন্দোলন চলতে থাকল। কর্মীদের ভিতরেও দু'একজন তাতে গোপন ইন্ধন যোগাতে লাগল। স্বয়ং ডেপুটি সক্রিয়-ভাবে সে দলে না থাকলেও, তাঁর মানসিক সমর্থন রইল এদের দিকেই। কিন্তু সাহেবকে কিছুমাত্র বিচলিত দেখা গেল না। পরে আবার যেদিন মাছের পালা, গোটা বরাদ্দটা একসঙ্গে রাঁধিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সমানভাবে পরিবেশন করালেন। এদিন আর না-নেওয়ার দলে কেউ রইল না, শুধু একজন ছাড়া। দিনেশ সরকার; বয়স একুশ ছাড়িয়ে গেছে, সাজাও বর্ষ্টাল-আইনে নয়। কোন্ একটা সেণ্ট্রাল জেলে 'প্রতারণা' মামলায় জেল খাটছিল। সেখানকার সুপারের সুপারিশে এবং ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেলের বিশেষ ক্ষমতা বলে জেলের কয়েদটা বর্ষ্টাল-মেয়াদে পরিণত করা হয়েছে। সেদিনও সে খেতে আসেনি, আজও তাকে খাবার ফাইলে দেখা গেল না। খবর নিয়ে জানা গেল সে এবার রীতিমত নোটিশ দিয়ে হাঙ্গার ষ্ট্রাইক করেছে এবং যতদিন এই বে-আইনী আদেশ বাতিল না হয়, অনশন ধর্মঘট চালিয়ে যাবে।

ঘোষসাহেবের মুখে তাঁর সেই রহস্যময় বাঁকা হাসিটা আরেকবার দেখা দিল। চীফ অফিসারকে ডেকে বললেন, ওকে সেল-এ পাঠিয়ে দাও। সেখানে এক জল ছাড়া আর কিছু থাকবে না। যে-গার্ড থাকবে সে শুধু ওর ওপর নজর রাখবে, কিন্তু কথাবার্তা বলবে না, আর কাউকে ওর ত্রিসীমানায় যেতে দেবে না।

চব্বিশ ঘণ্টা পেরিয়ে যেতেই সন্তোষ সেন একখানা নীল মলাটের পুস্তিকা হাতে করে বিমর্ষমুখে সাহেবের ঘরে দেখা দিলেন। শুষ্ক স্বরে বললেন, রিপোর্টটা এবার পাঠাতে হয়, স্যর, আর দেরি করা চলে না।

—কিসের রিপোর্ট? প্রশ্ন করলেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্।

—হাঙ্গার ষ্ট্রাইকের।

—ও-ও।

—এক কপি আই জি; এক কপি সরাসরি হোম্-সেক্রেটারী।

—হোম্-সেক্রেটারী!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এই দেখুন না? রুল বলছে, টু বি অ্যাড্রেসড্ টু দি হোম্ সেক্রেটারী বাই নেম্। নামে পাঠাতে হবে।

—বেশ, দিন পাঠিয়ে। ঐ সঙ্গে জানিয়ে দেবেন আমার হোম্ আমিই সামলাবো, হোম্ সেক্রেটারীর দরকার হবে না।

সন্তোষবাবু শেষ কথাটায় কান দিলেন না। চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে আবার ফিরে দাঁড়ালেন, চিন্তান্বিত মুখে বললেন, 'হাঙ্গার-ষ্ট্রাইক কেন হল, ওর গ্রীভান্সটা কী, তাও জানাতে হবে। এইখানে বলছে'—বলে নীল মলাটের বইটা খুলতে যাচ্ছিলেন। সাহেব তার জন্যে অপেক্ষা না করে বললেন, বেশ তো সেটাও জানিয়ে দিন, ষ্টার-বয়দের ফালতু খাবারটা অন্য সকলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে বলে ওঁর গোসা হয়েছে। সেইজন্যে খাচ্ছে না।

—সেটা বলা কি ঠিক হবে?

—কেন হবে না? এমনি বললে তো, কত্তারা কান দেন না। হাঙ্গার ষ্ট্রাইক-এর গুঁতোয় যদি—

—আচ্ছা, আজ শুধু প্লেন রিপোর্টটাই চলে যাক। যদি পারসিস্ট্ করে, পরে দেখা যাবে।

সন্তোষবাবু পীড়াপীড়ি করায় প্রাথমিক রিপোর্টে কারণের উল্লেখ রইল না। "ফারদার রিপোর্ট ফলোজ" বলে খবরটাই শুধু পাঠিয়ে দেওয়া হল।

এদিকে দিনেশ যখন দেখল, দলপতি হয়ে সে যেখানে একটি দানা পর্যন্ত মুখে তুলছে না (এক্ষেত্রে তার উপায়ও ছিল না,) সেখানে তার

অকৃতজ্ঞ অনুচরের দল তিন বেলা তিনথালা তাচ্ছল্যের অন্ন খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে, তখন সেই নির্লজ্জ, ভীরু, বেইমানগুলোর জন্যে জীবনদানের সার্থকতা কোথায়? একদিন পরেই তার মনে এই জাতীয় একটি দার্শনিক বিজ্ঞতার উদয় হল। উদয় যে হবে, ঘোষসাহেব সম্ভবতঃ তা জানতেন। তাই পরদিন দেখা গেল, দীনেশের সেল-এ শুধু জলই নয়, তার পাশে কিঞ্চিৎ ফল, দুধ, মিষ্টিও এসে গেছে—একাদশীর পরে যেমন পারণ। সকলের অলক্ষ্যে সঙ্গে সঙ্গে তার সদ্ব্যবহারও হয়ে গেল।

দ্বিতীয় রিপোর্ট গেল টেলিগ্রামে—'হাঙ্গার ষ্ট্রাইক কলড্ অফ্‌ফ। ডেপুটি সুপার নিশ্চিন্ত হলেন।

ঘোষসাহেব চলে যাবার পর অস্থায়ী 'রাজ্যভার' গ্রহণ করেই সন্তোষবাবু ষ্টার বালকদের প্রতি এই দীর্ঘস্থায়ী অবিচারের অবসান ঘটালেন। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! কৃতজ্ঞতা জানানো দূরে থাক, তারা বিশেষ খুশী হয়েছে বলেও মনে হল না। একদিন যারা ন্যায্য পাওনা পায়নি বলে আন্দোলন করেছিল, তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ খালাস হয়ে গেছে, দু-তিনজন তখনো ছিল। আজ সেই হৃত অধিকার ফিরে পেয়ে তারাও ঠিক যেন উপভোগ করতে পারল না। ছোটদের মধ্যে বসে এই বাড়তি খাবারটা মুখে তুলতে চক্ষুলজ্জায় বাধল। বাকি ষ্টার যারা, তারা পরে এসেছে; সুতরাং এই ফালতু বরাদ্দের কথা জানত না। তারা আরো অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। কেউ কেউ ঐ বাড়তি খাবারটা পাতে নিতেই চাইল না, কেউ নিলেও সরিয়ে রেখে দিল। কজন, সবটা একা না খেয়ে পাশাপাশি অন্য ছেলে যারা বসেছে, তাদের থালায় খানিকটা তুলে দিয়ে ভাগাভাগি করে খেয়ে নিল।

নতুন সুপারের কানে যেতেই তিনি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন, তিন দলই বে-আইনী কাজ করছে। সরকারের বরাদ্দ করা খাদ্য পুরোপুরি না-নেওয়া বা না-খাওয়া যেমন অপরাধ, তার চেয়েও গুরুতর অপরাধ তার কোনো অংশ অন্যকে দান করা। কার কী প্রাপ্য, আইনই সেটা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। তার মধ্যে অনুমাত্র তারতম্য করবার অধিকার 'ইমমেট্'দের দেওয়া হয়নি। ভবিষ্যতে এই জাতীয় অবাধ্যতা দেখা গেলে অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে।

এর পরে প্রকাশ্য না-নেওয়াটা বন্ধ হল, কিন্তু পরস্পর আদান-প্রদান চলতে লাগল গোপন পথে। স্বয়ং চীফ্ অফিসার এবং তাঁর কর্মীরা দেখেও দেখলেন না। আইন যা-ই বলুক, ঘোষসাহেবের ব্যবস্থাটাই অনেকের মনোমত ছিল এবং ওতেই তারা অনেকদিন ধরে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। এতদিন পরে আবার একটা জটিলতা সৃষ্টি না করলেই তারা খুশী হত। প্রশাসন-যন্ত্রটা মসৃণগতিতে চলুক, তার ছোট-বড় সকল অঙ্গ সেই কামনাই করে। এখানে-ওখানে আটকে গেলেই বরং অসন্তোষের কারণ দেখা দেয়। যে-চালক সেই অবাধ চালনায় অক্ষম, বিশেষ করে নাট্‌বল্টুরা তাদের প্রীতির চোখে দেখে না। চাপটা যে বেশীর ভাগ পড়ে গিয়ে তাদেরই ঘাড়ে।

সন্তোষ সেন নাটবল্টুগুলোকে আর একটু বেশী 'টাইট দিতে' গিয়ে বিপত্তির সৃষ্টি করলেন। একজন 'স্টার' একটি 'ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল' ছেলের পাতে একটুকরো মাছ চালান করেছিল কিন্তু পাহারায় নিযুক্ত 'পেটী অফিসার' দেখেও বাধা দেয়নি কিংবা চীফ্‌কে রিপোর্ট করেনি, এই অপরাধে তিনি ঐ দুটি ছেলেকে যেমন শাস্তি দিলেন, সেই সঙ্গে সিপাইটিকেও জরিমানা করে বসলেন।

তারপর কোথা দিয়ে কে কী করল, ঠিক বোঝা গেল না। দুদিন বাদে ছিল মাংসের 'ফাইল'; অর্থাৎ যেদিনে এক ফোঁটা ঝোল বা একটুকরো হাড়ের চেয়ে প্রাণের দাম অনেক কম, যেদিনে চোখ বুজে শুকনো হাড় চিবোবার দৃশ্য দেখে ঘোষসাহেব একবার আশুবাবুর কানে কানে বলেছিলেন, চেয়ে দেখুন, একদল মুনি ধ্যানে বসেছে, এই মুহূর্তে দুনিয়া উল্টে গেলেও ওরা জানতে পারবে না, সেই দিনে সেই পরম বস্তুর হাঁড়ির সামনে বসে স্টার বাদে বাকী সবাই অর্থাৎ কচি ও কাঁচার দল গম্ভীর মুখে বলে বসল, 'মাংস খাবো না।' ছোটদের মনে ক্ষোভ দেখা দিলেই সেটা 'না-খাওয়ার' রূপ নেয়। বর্ষ্টালের কর্মীরা তা জানে। সেই সঙ্গে এও জানে, যে-অপগণ্ডের দল নিয়ে তাদের ঘর করতে হয়, তারাও সেই চিরন্তন শিশু ও কিশোর। চারদিকের এই উঁচু পাঁচিল এবং একরাশ আইনকানুনের দড়িদড়ার মধ্যে বসেও এরা যা তাই। সুতরাং এই ধরনের 'না-খাওয়ার' হুমকি যখনই আসে চীফ অফিসার

এবং তাঁর অনুচরদের খানিকটা কাজ বাড়ে। সেটা তাদের সরকারী ডিউটি-রোষ্টারে লেখা থাকে না। কাউকে একটু পিঠে হাত, কাউকে ধমক, কাউকে দুটো মিষ্টি কথা—এইরকম ছোটখাট মুষ্টিযোগ দিয়েই তারা সব গোল মিটিয়ে ফেলে। কর্তৃপক্ষের দরবারে বড়-একটা ছুটতে হয় না। আজ কিন্তু তারা সে-পথে গেল না। 'মাংস খাবে না? বেশ।' ফীডিংশেডে যার ডিউটি, তার কাজ চীফ্‌কে জানানো। চীফের কাজ সাহেবকে রিপোর্ট দেওয়া। সেইটুকু করেই তাদের কর্তব্য শেষ হল।

সাহেব এসে গোটা দলটাকে শাসালেন, কঠোর শাস্তির ভয় দেখালেন, এতদূর পর্যন্ত বললেন যে, আইনের চোখে এই জাতীয় 'মাস্ অ্যাক্‌শন' অর্থাৎ দলবদ্ধ অবাধ্যতার নাম 'মিউটিনি', যার দণ্ড অতি ভয়ানক। সকলে মাথা নীচু করে নিঃশব্দে শুনে গেল। তিন দিন পরে আবার মাছের পালা এলে দেখ গেল, ডাল আর তরকারী দিয়ে সব ভাত শেষ করে সবাই থালা নিয়ে উঠে যাচ্ছে, 'মাছ' বলে যে একটা পদার্থ রয়েছে তাদের খাদ্যতালিকায়, সে-কথা যেন কারো জানা নেই।

সন্তোষবাবু বুঝলেন, রিংলীডারদের আলাদা করতে হবে। চীফ্‌কে ডেকে হুকুম করলেন, পাণ্ডাগুলোকে সেল-এ পাঠিয়ে দাও। চীফ্ পকেট থেকে নোটবুক, আর পাগড়ির ভিতর থেকে পেন্সিল বের করে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করল, কাকে কাকে পাঠাবো, হুজুর?

—'কাকে কাকে, আমায় বলতে হবে?' ঝাঁঝিয়ে উঠলেন সুপার।

—আজ্ঞে, আমি তো জানি না, কে কে ওদের পাণ্ডা।

—বেশ, তাহলে আমিই বলবো।

স্টারদের মধ্যে দু-তিনজনকে গোয়েন্দাগিরির কাজে লাগানো হল। তাদের যারা কোনো কারণে খুশী করতে পারেনি, এমনি কয়েকটা নাম তারা গোপনে এসে সাহেবকে জানিয়ে গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাদের ডাকিয়ে এনে কড়া ধমক দিলেন এবং সেল-এ পুরবার ভয় দেখিয়ে আপাততঃ ছেড়ে দিলেন। দিলীপের নামটা কোনো সূত্রে না পেলেও,

নিজে থেকেই তাকে ডেকে পাঠালেন। ধমকের সুরে বললেন, তুমিও বুঝি আছ এই আন্দোলনের পেছনে?'

সে যখন জানাল, কোনো আন্দোলনের সঙ্গে তার যোগ নেই তখন আরো রুখে উঠলেন, তবে মাছ-মাংস খাচ্ছ না কেন?

—মাছ-মাংস আমি খাই না, স্যর।

—সব চালাকি আমি বুঝি।

দিলীপ আর কোনো কথা বলল না। এখানে আসবার পর সামান্য কিছুদিন সে আমিষ খাবার খেয়েছিল, অনেকটা কেশব ও বাহাদুরের পীড়াপীড়িতে। তারপর ছেড়ে দিয়েছে। মাছ-এর খণ্ড পাতে পড়লেই তার মায়ের কথা মনে পড়ত। তাদের সেই ছোট্ট রান্নাঘরে 'আঁশ'-এর কারবার ছিল না। তবু উঠোনের কোণে তোলা উনুনে মা মাঝে মাঝে তার জন্যে দু-একটুকরো মাঝ রেঁধে দিত। তাকে খাইয়ে আবার স্নান করে তবে হেঁসেলে ঢুকত নিজের জন্যে দুটো ভাত ফুটিয়ে নিতে। জ্ঞান হবার পর থেকেই বিধবার ছেলে; মাছের উপর দিলীপের তেমন কোনো আকর্ষণ ছিল না। বলত, 'আমার জন্যে মাছ রেঁধো না মা। আমার ভাল লাগে না। এর চেয়ে তোমার পাতের ঐ মুগডাল আর ডাঁটাচচ্চড়ি অনেক ভালো।' মা শুনত না। বলত, মাছ না খেলে চোখের জ্যোতি কমে যায়। রোজ তো দিতে পারি না। দু-তিন দিন অন্তর দু-একটা টুকরো খেতে হবে বৈকি?

দিলীপ তর্ক করত, ওসব বাজে কথা। তুমি যে খাও না, তোমার বুঝি চোখ খারাপ হয় না?

মা জিভ কেটে বলত, ছিঃ, ছিঃ, ওকথা বলতে আছে? আমি যে বিধবা।

বর্ষ্টালে যেদিন মাছ আসত, বিশেষ করে সেই দিনগুলোতে এই সব কথা তার মনে পড়ত। মা আজ কোথায় সে জানে না। যেখানেই থাক, 'খোকার' জন্যে মাছ রান্নার পাট তাঁর চুকে গেছে। সেই সঙ্গে তার খাবার পালাও ঘুচে গেছে। মায়ের হাতের স্পর্শই তো একদিন এই তুচ্ছ জিনিসটাকে পরম বস্তু করে তুলেছিল। আজ এর কোনো দাম, কোনো স্বাদ নেই তার কাছে। মুখে তুলতেও ইচ্ছা

করে না। দু-চার মাস কোনো রকমে চালিয়ে সে মাছ-মাংস ছেড়ে দিয়েছিল।

সন্তোষবাবু ওকে চুপ করে থাকতে দেখে স্বর বদলালেন। বললেন, বেশ, তুমি না হয় আগে থেকেই নিরামিষ খাও, কিন্তু ঐ বাঁদরগুলো? ওরা খাচ্ছে না কেন? কাজটা কি খুব ভালো হচ্ছে মনে কর?

—ওদের কথা ওরাই ভালো বলতে পারবে, স্যর। দু-একজনকে ডেকে যদি জিজ্ঞেস করেন,—

—'আমার দায় পড়েছে জনে জনের কাছে গিয়ে হাত কচলাতে!' গর্জে উঠলেন সুপার, 'আমি আর একটা 'ফাইল' দেখবো, তারপর একে একে সক্কলের সব প্রিভিলেজ কাটতে শুরু করবো। চিঠিপত্তর, দেখাশুনো, খেলাধূলো……। দেখি তোমরা কত বাড় বাড়তে পার।'

মিনিটখানেক নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে দিলীপ নমস্কার করে বলল, 'আমি যেতে পারি, স্যর?'

সুপার কিছু একটা ভাবছিলেন। হঠাৎ মাথা তুলে বললেন, শোনো। তুমি লেখাপড়া শিখেছ। দুদিন পরে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেবে। তুমি নিশ্চয়ই বোঝো, গভর্মেণ্ট যে ব্যবস্থা করেছেন, তার বাইরে আমি যেতে পারি না। আমার আগে যিনি ছিলেন, তিনি যদি গায়ের জোরে বে-আইনী হুকুম চালিয়ে গিয়ে থাকেন, আমাকেও কি তাই মানতে হবে?

দিলীপ, যেমন ছিল, তেমনি দাঁড়িয়ে রইল, এ-প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না। সুপার স্বর নামিয়ে বললেন, তুমি ঐ গাধাগুলোকে একটু বুঝিয়ে দাও না? তোমাকে ওরা সবাই মানে।

'আমি চেষ্টা করবো, স্যর' বলে দিলীপ আর একবার নমস্কার করে বেরিয়ে চলে গেল।

সেই রাত্রেই ঘটল এক অপ্রত্যাশিত বিচিত্র ঘটনা, যার ফলে 'বর্ষ্টালের' গোটা জীবনটাই হঠাৎ অন্য দিকে মোড় নিয়ে বসল।

মাসে অন্ততঃ একবার সুপারকে 'নাইট রাউণ্ডে' বেরোতে হয়। আগে থেকে না জানিয়ে গভীর রাতে ঘুরে ঘুরে দেখতে হয়, বিভিন্ন

এলাকার সব 'পেটী অফিসার' ঠিকমত টহল দিচ্ছে, না তৃণশয্যায় সটান হয়েই কাবার করছে তাদের 'তু' ঘণ্টার ডিউটি-মেয়াদ।

সেদিন সন্তোষবাবু যথারীতি নৈশ পরিদর্শনে বেরিয়েছেন। গেট থেকেই তাঁর সঙ্গ নিয়েছেন সহকারী চীফ্—পাহারারত পেটী অফিসারদের সেই সময়কার ভারপ্রাপ্ত সর্দার। ডানদিকের ওয়ার্ডগুলো ঘুরে দেখে, দেবদারু-বীথিকার পাশ দিয়ে, পশ্চিম সীমানার পাঁচিল-পাহারার রিপোর্ট নিয়ে ঢুকে পড়লেন হাসপাতালের হাতায়। ডিউটি-সিপাইকে দেখতে পেলেন না। চারদিকে টর্চ ফেললেন। চার ব্যাটারীর জোরালো আলোয় প্রতিটি কোণ ঝলমল করে উঠল, কিন্তু কোথাও কোনো মনুষ্যকায়ার আভাস পাওয়া গেল না। সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে ডানদিকে মোড় ফিরতেই চোখে পড়ল, জানালার শিকে গা এলিয়ে দিয়ে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছে পেটী অফিসার। এবার টর্চ গিয়ে থামল তার ব্যাদান-বিকশিত মুখের উপর। কিন্তু নাসিকা-গর্জন ছাড়া আর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। সুতরাং এ-পক্ষ থেকে পাল্টা গর্জনের প্রয়োজন। তারই ব্যবস্থা হল। গোটা হাসপাতালের ভিৎসুদ্ধ কাঁপিয়ে দিয়ে ফেটে পড়ল সহকারী চীফ্ বলবন্ত সিং-এর বাজখাঁই হুঙ্কার—'মর গিয়া ?' সিপাইটি চমকে উঠে আরক্ত চক্ষু মেলে তাকাল, কিন্তু প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারল না। হয়তো মনে করে থাকবে ভূমিকম্প। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে আসল ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেই লাফ দিয়ে উঠতে গেল। পারল না; সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়তে হল। দ্বিতীয় লাফ, আবার বসে পড়া। পর পর বারতিনেক নৃত্যের ভঙ্গীতে উত্থানপতনের পর বলবন্ত সিং গর্জে উঠল, 'ঠ্যারো। বুরবক্ কাঁহাকা।' সিপাই তখনো বুঝতে পারেনি, গোলযোগটা ঘটেছে তার পশ্চাদ্দেশে। অর্থাৎ কোমরের বেল্ট বাঁধা পড়েছে জানালার গরাদের সঙ্গে। নিজে থেকে পড়েনি। তার গভীর নিদ্রার সুযোগ নিয়ে কোনো অদৃশ্য হস্ত ওয়ার্ডের ভিতর থেকে কখন তাকে বন্দী করে ফেলেছে। লোকটি কিঞ্চিৎ শীর্ণকায়। চামড়ার বেল্টটা পুরোপুরি এঁটে বসে না। বসলে বা শুয়ে পড়লে ফাঁকটা আরো বেড়ে যায়। তারই ভিতর দিয়ে একটুকরা শক্ত সুতো গলিয়ে বন্ধন কার্যটি সমাধা করতে

কয়েক সেকেণ্ডের বেশী লাগেনি। জানালার ঠিক বাইরে ঐ চওড়া সিমেণ্টবাঁধানো জায়গাটি নিদ্রার পক্ষে মনোরম। সেখানে যে এত বড় বিপদ লুকিয়ে থাকতে পারে, সিপাই মহারাজ কেমন করে জানবে?

সহকারী চীফ-এর সহায়তায় বন্ধনমুক্ত হবার পর সিপাই তার বেশবাস সামলে নিয়ে অন্নদাতা মনিবের সামনে দু কদম এগিয়ে গিয়ে প্রথমেই একটি লম্বা সেলাম ঠুকল, তারপর হাতজোড় করে কাতরস্বরে বলল, 'কসুর হো গিয়া হুজুর; মাপ্ কিজীয়ে। আপ্ মা-বাপ হুয়—।' আরো কি সব বলতে যাচ্ছিল, সুপার ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলেন। তাঁর বর্তমান লক্ষ্য সিপাই-এর এই ঘুমিয়ে পড়ার 'কসুর' নয়, তার চেয়ে অনেক বড় 'কসুর', ঐ ভিতর থেকে কেউ বা কারা যেটা করেছে। কিন্তু সেখানে কোন চাঞ্চল্য বা উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নেই। পাশাপাশি খাটে সাত-আটটি মশারি টাঙানো। তার ভিতরে যারা আছে, তারা সজীব প্রাণী। কিন্তু হাতকয়েক মাত্র দূরে এত বড় একটা বিপর্যয় কাণ্ড ঘটে যাবার পরেও তার কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না।

পরদিন সকাল হতেই শুরু হল তদন্ত। সাহেব নিজেই তার ভার নিলেন। সরেজমিনে পরিদর্শনে পালা শেষ করে, গত রাত্রে ঐ ওয়ার্ডে যারা ছিল, সবাইকে তাঁর অফিসে তলব করলেন। তার মধ্যে তিনজন শয্যাগত রোগী। তাদেরও ষ্ট্রেচারে করে নিয়ে যাওয়া হল। ঘটনাটা যে কত গুরুতর, একজন কর্তব্যরত সরকারী কর্মচারীকে বেঁধে রাখা যে কতখানি মারাত্মক অপরাধ, বিশেষ করে কোনো বন্দীনিবাসের বাসিন্দার পক্ষে, সে সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা দিয়ে তিনি সরাসরি প্রশ্ন করলেন, বল, এ-কাজ কে করেছ?

সকলেই নিরুত্তর।

—'বলবে না?'

এ-প্রশ্নেরও কোনো জবাব পাওয়া গেল না।

সুপার ক্ষণকাল অপেক্ষা করে বললেন, বেশ, তাহলে আমিই তাকে খুঁজে বার করবো এবং আশা করি, তোমাদের মধ্যে যারা নির্দোষ, তারা আমাকে সাহায্য করবে।

এই বলে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন এবং এক-একজনের

কাছে গিয়ে নাকের উপর আঙুল উঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, তুমি জানো, কে করেছে ?' প্রত্যেকেই মাথা নেড়ে জানাল, সে জানে না। লাইনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিল দিলীপ। ঐ ওয়ার্ডেই সে অনেকদিন থেকে আছে। ঐ রাত্রেও ছিল। সুপারের তর্জনী তার উপরে পড়তেই মাথা তুলে বলল, জানি।

—'জানো ?' অনেকটা যেন আশ্বস্ত হলেন সন্তোষবাবু।

আগ্রহের সুরে বললেন, কে, বলতো ?

—আমাকে মাপ করবেন, স্যর। আমি বলতে পারবো না।

—বলতে পারবে না ! বাট্ ডু ইউ নো, অন্যায় করার চেয়ে তাকে সমর্থন করা আরো বড় অপরাধ ?

—জানি।

—তবে ?...কী জন্যে তাকে বাঁচাতে চাইছ ? বন্ধু বলে ?

—না।

—তাহলে তোমার স্বার্থটা কী ?...বল।

দিলীপ অনুনয়ের সুরে বলল, এবারকার মতো তাকে মাপ করুন, স্যর। ব্যাপারটা যে কতখানি দোষের, ও ঠিক বুঝতে পারেনি। ঐ নিয়ে একটু মজা করবে বলে—

—'মজা !' গর্জে উঠলেন সুপার। তারপর চাপা গলায় কিন্তু দৃঢ়ভঙ্গিতে বললেন, 'আচ্ছা ; মজা কাকে বলে তোমরাও টের পাবে।'

বিচার আপাততঃ মুলতবী রইল। কিন্তু তার ফলটা যে রীতিমত কঠোর হয়ে দাঁড়াবে, এ বিষয়ে কারো সন্দেহ রইল না। এখানে-সেখানে ছোট ছোট দলের মধ্যে চাপা সুরে সারাদিন সেই আলোচনাই চলল। শুধু ছেলেদের মহলে নয়, মাষ্টার, ইনষ্ট্রাকটর, কেরানী এবং সিপাই-মহলেও। দিলীপকে কেউ বাহবা দিল, সাবাস ছেলে ! কী রকম মনের জোর ! কেউ আবার মুখ বেঁকিয়ে মন্তব্য করল, ওসব বাহাদুরির কোনো মানে হয় না। বলে দিলেই তো চুকে যায় বাপু। কোনো কোনো শুভানুধ্যায়ী ওকে ডেকে নিয়ে সেই পরামর্শই দিলেন। সে শুধু শুনে গেল, আর কিছু বলল না।

পরদিন স্কুলের কাজ শেষ হলে দিলীপ যখন বেরিয়ে যাচ্ছিল,

হেড মাষ্টার বললেন 'একটু দাঁড়িয়ে যাও। তোমার সঙ্গে কথা আছে।' তারপর সকলে চলে গেলে বললেন, তুমি কি কাউকে ঐ সুতোটা বাঁধতে দেখেছিলে?

—না, স্যর। পরে সব শুনেছি।

—তাহলে বলতে গেলে কেন তুমি জানো?

—প্রথমটা আমি আন্দাজ করেছিলাম, তারপর সে নিজেই আমার কাছে স্বীকার করেছে।

—তাকে ঠিক 'জানা' বলে না। শোনা কথা সত্যি হলেও তোমার চেপে যাওয়া উচিত ছিল।

দিলীপ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। হেড মাষ্টারমশাই বললেন, 'জানি' যখন বলে ফেলেছ, নামটা জানিয়ে দিতে বাধা কিসের?

—তাকে আমি কথা দিয়েছি, স্যর। তাছাড়া—

—কী, বল।

—এখন নয়, কদিন পরে আমি সব আপনাকে খুলে বলবো।

—কিন্তু তোমার নিজের দিকটা একবার ভেবে দেখেছ?

—দেখেছি। যে-কোনো পানিশমেণ্টের জন্যে আমি প্রস্তুত।

—শুধু পানিশমেণ্ট নয় তার পরে আরেকটা ব্যাপার আছে, যেটা তোমার পক্ষে সত্যিই সিরিয়স্।

হেড মাষ্টার কিসের ইঙ্গিত করছেন, বুঝতে না পেরে দিলীপ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তিনি বললেন, আমি নিজে থেকে বলছি না, সন্তোষবাবুই তোমাকে জানাতে বললেন। তুমি বোধহয় জান না, তোমার পরীক্ষার দরখাস্তের সঙ্গে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের একটা সার্টিফিকেট লাগবে। গুড কণ্ডাক্টের সার্টিফিকেট। এখন যদি তোমার কোনো বড় রকমের শাস্তি হয়, সেটা যে হবেই তুমি বুঝতে পারছ, ঐ সার্টিফিকেট তোমাকে দেওয়া হবে না। তার মানে—

বাকীটা হেড মাষ্টার অনুক্ত রাখলেও দিলীপ নিজেই পূরণ করে দিল। সুমুখের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে অনেকটা যেন আত্মগতভাবে বলল, পরীক্ষা দেওয়া হবে না।

—অথচ এত বড় একটা সংকট তুমি ইচ্ছা করলেই এড়াতে পার। শুধু একবার বলে দেওয়া, কে। এখানে আমার কাছেও বলতে পার। কেউ জানতে পারবে না।

—সে হয় না, স্যর।

হেড মাষ্টার বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালেন তাঁর এই দীর্ঘ-পরিচিত নিরীহ, শান্ত, নম্র, লাজুক ও ক্ষীণকায় ছাত্রটির মুখের পানে। এতখানি দৃঢ়তা সেখানে আর কখনো দেখেননি, এই স্থির সংকল্পের অবিচল কণ্ঠও কোনোদিন শোনেননি। প্রায় সারা জীবন এদের মধ্যে কাটিয়েও তিনি বোধহয় জানতেন না কিংবা জেনেও মনিবের নির্দেশে চেপে রেখেছিলেন যে, কিশোরমন বিধাতার এক আজব সৃষ্টি। ভুলিয়ে, মিষ্টি কথা দিয়ে, স্নেহের স্পর্শ বুলিয়ে তাকে সহজেই নোয়ানো যায়। কিন্তু ভয় দেখালেই সে কঠিন ইস্পাত। শাসনের আঘাত সেখানে ঘা খেয়ে ফিরে আসে, ভবিষ্যৎ শুভাশুভের আবেদন সাড়া জাগায় না। কৈশোর সবকিছু মেনে নিতে পারে কিন্তু 'ভীতি প্রদর্শন' নামক মহাস্ত্রের কাছে নতি স্বীকার করা তার ধর্ম নয়।

হেড মাষ্টার শেষ চেষ্টা করলেন। বললেন, তুমি বুঝতে পারছ না দিলীপ, একটা জিদের জন্যে তোমার সমস্ত ভবিষ্যৎ নষ্ট হতে চলেছে। ভালো করে আর একবার ভেবে ছাখ। এতদিনের এত চেষ্টা, এত পরিশ্রম সব ব্যর্থ হয়ে যাবে। তোমাকে দিয়ে যে আমাদের অনেক আশা।

মাষ্টারমশাই থেমে যাবার পরেও দিলীপ কিছুক্ষণ জানালার বাইরে লক্ষ্যহীন দৃষ্টি মেলে নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সহসা বলে উঠল, আমি পারবো না, স্যর। বলেই আর দাঁড়ালো না, বিদায় পর্যন্ত নিল না, বইগুলো বুকে চেপে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

হেড মাষ্টারকে না বললেও, আর একজনের কাছে দিলীপ তার মনের কথাটা চেপে রাখতে পারেনি। তিনি প্রেস-মাষ্টার, বিনোদবাবু। পরদিন কাজের ফাঁকে এক সময়ে ওকে একান্তে পেয়ে বললেন, ছেলেটা কে, আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তুমি তার জন্যে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনছ কেন? তার সঙ্গে তো তোমার বিশেষ ভাবও নেই।

কদিন আগেই সে তোমার নামে কত কী লাগিয়েছে চীফ্ অফিসারের কাছে।

দিলীপ মৃদু হেসে বলল, জানি।

বিনোদবাবু বিরক্তির সুরে বললেন, জানো যদি, তাহলে তার ওপরে এত দরদ কিসের? তোমার যে শুধু পরীক্ষা বন্ধ করেই ছেড়ে দেবে সন্তোষ সেন, তা মনে করো না। আরো একটা বড় ছোবলের জন্যে তৈরী থেকো। ভিজিটিং কমিটিতে তোমার নাম যাবে না। পুরো টার্মটি খেটে তবে যদি বেরোতে পার।

দিলীপকে হঠাৎ অন্যমনস্ক মনে হল। কিছুক্ষণ কী ভেবে নিয়ে বলল, সে-ক্ষতি আমার সইবে, ওর সইবে না।

—কার?

—যাকে আপনি সন্দেহ করছেন। শচীন। ভিজিটিং কমিটির আসছে মিটিং-এ ওর নাম যাচ্ছে। সাহেব ওর বাবাকে কথা দিয়েছেন। এই সময়ে যদি একটা পানিশমেণ্ট হয়, সব ভেস্তে যাবে। খালাস পেতে অনেক দেরি হবে বেচারার। তদ্দিন ওর মা বোধহয় বাঁচবেন না। অনেক দিন থেকে অসুখ। কাল আমাকে তাঁর চিঠি দেখিয়েছে।

বিনোদবাবু বলতে যাচ্ছিলেন, তোমার মা-ও তোমার জন্যে পথ চেয়ে আছেন। কোথায় আছেন, তা-ও তুমি জানো না। তোমাকে গিয়ে তাঁকে পথে পথে খুঁজে বেড়াতে হবে। ঐ ভিজিটিং কমিটির অনুগ্রহ যে তোমারও চাই। শচীন বা আর কারো চেয়ে সে-প্রয়োজনটা কিছুমাত্র কম নয়।

বলতে গিয়েও থেমে গেলেন প্রেসমাষ্টার। ওর চোখের দিকে চেয়েই বুঝলেন, সে-কথা ওকে মনে করিয়ে দেবার মত বাহুল্য আর কিছু হতে পারে না। সেটা কি ও জানে না? হয়ত জানে বলেই যাকে কখনো দেখেনি, তেমনি আর একজন রোগশয্যাশায়িনী মায়ের কথা ভেবে আজ এতখানি চঞ্চল হয়ে উঠেছে। শচীন এখানে কেউ নয়, সে শুধু উপলক্ষ।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা শচীন ব্যানার্জি তিনচারবার ব্যর্থ চেষ্টার পর হাসপাতালের পাঁচিলের ধারে গোপনে দেখা করল দিলীপের সঙ্গে। বলল, আমার জন্যে তোমার কেন সাজা হবে? সবাই বলছে তোমার

পরীক্ষা দেওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। তুমি আমার নাম বলে দাও। তা না হলে আমি নিজেই গিয়ে—

'পাগলামো করো না শচীন', তিরস্কারের সুরে বাধা দিল দিলীপ। 'চুপ করে থাকো। কখ্খনো ভুলো না, তোমাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে হবে।'

—তাই বলে, এমনি করে?

দিলীপ আবার কি বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় অন্য দুতিনটি ছেলে এসে পড়ল। তারপরেই শোনা গেল চীফ অফিসারের হাঁকডাক। অবিলম্বে যার যার নিজের 'হাউস্'এ গিয়ে 'গুনতি' দিতে হবে। ওদের আর কোনো কথা হল না। দিলীপ তাড়াতাড়ি তার ওয়ার্ডে গিয়ে ঢুকল, শচীন চলে গেল মেইন ব্যারাকের দিকে। ঐদিন সকালেই তাকে হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ করা হয়েছে।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছবার আগে সুপার দিলীপকে তার একগুঁয়েমির ফলাফল সম্বন্ধে আর একবার সাবধান করে দেবার প্রয়োজনবোধ করলেন। আরো স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন, ঐ ব্যাপারে কঠোর শাস্তি অনিবার্য। তাছাড়া পরীক্ষা সম্পর্কে যে কথা কদিন আগে হেডমাষ্টারকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছিলেন, এবারে ঐ সঙ্গে নিজেই তার আভাস দিলেন। বললেন কী করবো বল? আমি নিরুপায়।

দিলীপের কোনো ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না। অধ্যক্ষ যখন উত্তরের জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, তখন আগে যা বলেছিল তারই পুনরুক্তি করে বলল, প্রথম দিন যা জানিয়েছে তার উপর তার আর কিছু বলবার নেই।

বর্ষ্টাল-ইন্‌মেট্‌দের বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ থাকে, (রোজই আসে কিছু না কিছু), অধ্যক্ষ তাঁর আফিসে বসেই তার বিচার করেন। সাধারণ ক্ষেত্রে ঐটাই তাঁর কোর্টরুম্। এই মামলাটি অসাধারণ। একজন কর্তব্য-নিরত সরকারী কর্মচারীকে বেঁধে রাখা হয়েছে। সে-ও মাষ্টার বা কেরানী জাতীয় লোক নয়, প্রশাসন-ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে পাহারাকার্যে নিযুক্ত কর্মী, এ গার্ড্ অন্ ডিউটি। বর্ষ্টাল স্কুলের মত পিনাল ইন্‌ষ্টিটিউশন, অল্পবয়স্ক ক্রিমিনাল্‌দের চরিত্র সংশোধন যার

একমাত্র লক্ষ্য, সেখানকার একটি ইন্‌মেটের পক্ষে এটা অতি গুরুতর অপরাধ। সে অপরাধ যে করেছে, এই চরম ইন্‌ডিসিপ্লিন এবং উচ্ছৃঙ্খল আচরণ যে দেখাতে পারে, তার সম্বন্ধে এখানকার সাধারণ অধিবাসীদের মধ্যে একটা বিরূপ মনোভাব দেখা দেবে, তাকে ধরিয়ে দেবার জন্যে অন্যান্যেরা নিজে থেকে এগিয়ে আসবে, এইটাই আশা করেছিলেন অধ্যক্ষ। কিন্তু তা হয়নি। উপরন্তু, একজন বিশিষ্ট ইন্‌মেট্‌ দোষী কে, জেনেও তার নাম প্রকাশ করতে বারংবার অস্বীকার করেছে। তার অপরাধ আরো গুরুতর, এবং সেজন্যে এমন একটি শাস্তি তাকে দেওয়া দরকার, অন্য সকলের কাছে যেটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। যাকে বলে, এ সিভিয়র অ্যাণ্ড এগজেম্‌প্লারী পানিশ্‌মেণ্ট। সে শাস্তি সকলের সামনে ঘোষণা করা প্রয়োজন। অপরাধের গুরুত্ব এবং তার সঙ্গে এইসব নানা বিষয় বিবেচনা করে সুপার স্থির করলেন, আফিস-রুম নয়, স্কুলের মাঠই এ মামলার বিচারের উপযুক্ত স্থান। চীফ্‌ অফিসারকে ডেকে সেইমতো ব্যবস্থা করতে আদেশ দিলেন। স্কুল, ওয়ার্কশপ, কিচেন, হাসপাতাল সব জায়গা থেকে প্রতিটি ছেলেকে ডেকে এনে দেবদারু গাছের ছায়ায় অর্ধচন্দ্রাকারে দাঁড় করানো হল। সামনের দিকে অধ্যক্ষের চেয়ার, টেবিল, তাঁর দুপাশে অন্যান্য কর্মচারী,—টিচার, ইনস্ট্রাকটর এবং কেরানীবাবুদের বসবার আসন। একে একে তাঁরা এসে সেগুলো অধিকার করলেন। সকলের শেষে এলেন সুপার তার পিছনে হেড্‌মাষ্টার, হাতে একখানা ছোট্ট বাঁধানো খাতা—যার নাম হিষ্ট্রী-টিকেট। চোখের উপর সেই খাতাটা খুলে ধরে ডাকলেন, দিলীপকুমার ভট্টাচার্য। অর্ধবৃত্তের কোনো একটা ধার থেকে দিলীপ এসে নতমুখে দাঁড়াল অধ্যক্ষের টেবিলের ওপাশে। ছেলেদের মধ্যে এতক্ষণ যে চাপা গুঞ্জরন শোনা যাচ্ছিল সব একমুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল। সকলের চক্ষু একটি বিন্দুতে নিবদ্ধ। সকলের মুখেই রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা।

সুপার উঠে দাঁড়ালেন। ভূমিকাস্বরূপ একটি ছোট্ট বক্তৃতায় বর্ষ্টাল স্কুলের সাম্প্রতিক অধঃপতনে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। বর্তমান আসামীর অপরাধ এবং অনমনীয় মনোভাবের (যাকে তিনি ঔদ্ধত্য বলে মনে করেন) বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে, এখানকার আইনানুসারে

কঠোরতম শাস্তিই তার প্রাপ্য, এই পর্যন্ত আসতেই হঠাৎ একটি অতিশয় বেঁটে, মোটা কালো ছেলে লাইন থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে বলল, দিলীপের কোন দোষ নেই, স্যর। সুতো আমি বেঁধেছিলাম।

তুমি! বিস্ময়ের এবং খানিকটা কৌতুকের সুরে বললেন সন্তোষবাবু। কেশব তেমনি দৃঢ়ভাবে বলল, হ্যাঁ, স্যর।

'কেশো'কে দেখলেই ছেলেমহলে হাসির ধুম পড়ে যায়। এই প্রথম তার ব্যতিক্রম দেখা গেল। চারদিকে, ছোট বড় সকলের মুখেই কেমন একটা থমথমে মেঘ। বিদ্যুৎঝলকের চিহ্নমাত্র নেই। স্যুপার কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় বেরিয়ে এল আরেকজন। বুকের উপর আঙুল রেখে জোরের সঙ্গে বলল, কেশব মিছে কথা বলছে। দড়িটা আমি বেঁধেছিলাম।

—ও নয়, আমি। বলে উঠল আর একটি ছেলে। সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে উঠল তার প্রতিধ্বনি—আমি, আমি, আমি।

'চুপ করো' ধমকে উঠলেন অধ্যক্ষ। 'যে যার জায়গায় গিয়ে দাঁড়াও।'

সামনে যারা এগিয়ে এসেছিল আবার লাইনে মিশে গেল। কিন্তু ক্ষোভটা চাপা রইল না। তারই একটা অনুচ্চ কিন্তু উত্তপ্ত গুঞ্জন বৃত্তার্ধের এ কোণ থেকে ও কোণ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। সন্তোষবাবু হাত তুলে থামাতে চেষ্টা করলেন, বিশেষ ফল হল না, গোলমাল চলতে লাগল। তখন হেডমাষ্টার উঠে দাঁড়ালেন। গলার পরদা যথাসাধ্য উঁচুতে তুলে কিন্তু অনেকটা আবেদনের সুরে বললেন, 'উনি কী বলতে চাইছেন শোনো। তারপর তোমাদের কিছু বলবার থাকে, আমরা অবশ্যই শুনবো।'

এবারে গোলমালটা একটু থিতিয়ে আসতেই স্যুপার বললেন, তোমরা ভুল করছ। তোমাদের মধ্যে কে দোষী আমি জানি না। যে-ই হোক, সে এসে দোষ কবুল করলেই, তোমাদের এই বন্ধুকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। যায়, যদি ও নিজেও তাকে অর্থাৎ আসল অপরাধীকে দেখিয়ে দেয় কিংবা তার নামটা প্রকাশ করে। এবার বলতে পার কে একাজ করেছ?

—'আমি, স্যর।' ধীরপায়ে এগিয়ে এল শচীন ব্যানার্জি।

দিলীপ এতক্ষণ একটিবারও মাটি থেকে চোখ তোলেনি। এবার হঠাৎ চমকে উঠে তাকাল শচীনের দিকে। পরক্ষণেই যেমন ছিল, তেমনি আবার চোখ নামিয়ে নিল। সুপার তার দিকে ফিরলেন। ক্ষণকাল তার আনত মুখের দিকে দৃষ্টি ফেলে বললেন, শচীন যা বলছে, সত্যি?

এই কঠোর প্রশ্নের রূঢ় আঘাতে বিব্রত, বিপন্ন দুটি নিরুপায় ক্লান্ত চোখ ধীরে ধীরে একবার অধ্যক্ষের মুখের উপর গিয়ে থামল। কয়েকটিমাত্র মুহূর্তের ব্যবধান। তারপরেই শোনা গেল, মৃদু কিন্তু সুস্পষ্ট কণ্ঠে সেই একই উত্তর—আমার যা বলবার, আমি আগেই বলেছি স্যর।

—আর কিছু বলবে না?

দিলীপ একথার আর কোনো উত্তর দিল না। মুহূর্তকাল অপেক্ষা করে সন্তোষ সেন সেই ছোট্ট বাঁধানো খাতাখানা যেন ছিনিয়ে নিলেন হেডমাষ্টারের হাত থেকে, ক্ষীপ্রবেগে কলম চালালেন তার উপর, তারপর গভীর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—solitary confinement for one month. একমাস তোমাকে নির্জন সেল্-এ কাটাতে হবে।······ দুঃখের বিষয় এর চেয়ে কঠোরতর শাস্তি আমার হাতে নেই। থাকলে তা-ই দিতাম।

জেল-প্রাঙ্গণের প্রান্তসীমায় ঘন-গাছপালার অন্ধকারে, তিনদিকে নিরেট দেয়াল আর একদিকে একটিমাত্র গরাদে দেওয়া বন্ধ দরজার অন্তরালে 'সেল'-নামক সেই জনমানবহীন, ঠাণ্ডা-কনকনে খুপরিগুলোর কথা মনে করে এই শীতের সন্ধ্যায় শুধু ছেলেদের নয়, তাদের রক্ষীদের মুখেও আতঙ্কের ছায়া ফুটে উঠল। কিন্তু দীর্ঘ একটি মাস সেই নিঃসঙ্গ নির্বাসনে যাকে কাটাতে হবে, তার চোখেমুখে কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। দুহাত তুলে যথারীতি সুপারকে নমস্কার জানাল। তারপর চীফ্ অফিসারকে অনুসরণ করে নিঃশব্দে পা বাড়াল তার নতুন আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে। তার কাছে নতুন হলেও, জেলখানার সেই চির পুরাতন 'ডিগ্রি', যার নামে একদিন কত দুর্দান্ত ডাকাত ও দুর্ধর্ষ খুনীরও রীতিমত

হৃৎকম্প হত, যেখানে ফেলে কত বেপরোয়া 'স্বদেশী' কয়েদীকে শায়েস্তা করবার ব্যবস্থা করতেন তখনকার দিনের ডাকসাইটে জেলনায়কেরা।

সেইসব নামের লিষ্টিওয়ালা 'গ্যাঙ্-বুক' যদি খুঁজে পাওয়া যায়, শেষদিকের শূন্য পাতায় তাদের সঙ্গে আর একটা নাম যোগ করা হবে—একশ বার নম্বর ইনডাসট্রীয়াল বয়, দিলীপ ভট্টাচার্য।

প না ?’

খোয়া-ওঠা রাস্তার ধারে ভেঙে ফেলা বস্তির জঞ্জাল—টুকরো টিন, ভাঙা খাপরা আর ইঁটপাটকেল। সেইদিকে চেয়ে দিলীপ অন্যমনস্ক হয়ে পথ চলছিল। হঠাৎ চমকে উঠল। এখানে তাকে ডাকবে কে! এইমাত্র একখানা লরী চলে গেছে। চারদিক ধূলোয় অন্ধকার। তারই ভিতর দিয়ে যে যুবকটি এগিয়ে আসছিল, প্রথমটা তাকে ঠিক চিনতে পারল না। পরক্ষণেই প্রায় ছুটে গিয়ে দুহাতে তার হাত চেপে ধরল—কী আশ্চর্য! তুমি এখানে!

—এখানেই তো থাকি আমি। ঠিক এখানে নয়, এই অঞ্চলে ঃ মানে ঐ দিকটায়।

—কোথায়?

—ট্যাংরার নাম শুনেছিস?

—জায়গার নাম? তা শুনিনি। তবে ‘ট্যাংরা’ বলে একরকম মাছ আছে জানি। দেখেওছি। মনে আছে, বর্ষ্টালের কণ্ট্রাক্টর একবার নিয়ে এসেছিল, পচা বলে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন ঘোষসাহেব? কী বিচ্ছিরি গন্ধ!

সামসুল হেসে উঠল। বলল, খুব মনে আছে। ঐ নিয়ে কত হৈ চৈ না করেছিলাম সেদিন! তখন কি জানতাম, পচা ট্যাংরার চাইতেও বিচ্ছিরি জিনিস আছে ঐ ট্যাংরায়, আর তাই একদিন ঘাঁটতে হবে।

কথাটার শুরুতে যে সুর ছিল, শেষের সুরটা তার চেয়ে অনেকখানি ভারী। দিলীপের চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল। লক্ষ্য করে সামসুল নিজেকে সামলে নিল। আগেকার হাল্কা সুরে ফিরে গিয়ে বলল, ভাবছিস, সেটা আবার কী। সেই আজব বস্তুটির নাম ট্যানারি। আমার বর্তমান আশ্রয়।

—তুমি সেখানে কি কর!

—কাজের কি আর অন্ত আছে? কাঁচা চামড়া শুকোই, শুকোলে ভিজতে দিই। ভিজলে আবার শুকোই। তারপর—থাক, শুনেই তোর বমি আসছে। এবারে তোর সব খবর বল। কোথায় আছিস? এদিকে কোথায় যাচ্ছিলি?

প্রশ্নগুলো দিলীপের কানে গেলেও মনে পৌঁছল না। একদৃষ্টে সামসুলের দিকে তাকিয়ে রইল। সে যে ভালো নেই, সুখে নেই, চেহারা দেখেই অনুমান করা গিয়েছিল, এই কটি সামান্য কথায় তার পূর্ণ সমর্থন পাওয়া গেল। প্রচুর বিত্তশালী ও বনেদী ঘরের ছেলে সামসুল চৌধুরী। কলুটোলায় বিরাট কারবার তার বাবার। দিলীপ সবই শুনেছিল। মনে পড়ল বর্স্টালে যেদিন প্রথম দেখা। যেমনি স্বাস্থ্য, তেমনি গায়ের রং। আজ তার কোনোটাই নেই। আর একটু কাছে সরে এসে মৃদু অন্তরঙ্গ সুরে বলল, বর্স্টাল থেকে বেরিয়ে বাড়ি যাওনি?

—'বাড়ি!' কথাটা যেন হেসে উড়িয়ে দিল সামসুল। 'আরো গোটাকয়েক খড়মের গুঁতো খাবার জন্যে?'

—মার সঙ্গে দেখা হয়েছে এর মধ্যে?

—মা নেই।

দিলীপ চমকে উঠল। 'মা নেই!'—এ যেন তার নিজেরই অন্তরের প্রতিধ্বনি। এই বস্তিগুলোর আনাচেকানাচে যখন ঘুরে বেড়ায়, ঐ দুটো কথা তার মনেও মাঝে মাঝে মাথা তুলে ওঠে। যত দিন যাচ্ছে, ততই যেন তারা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। মা নেই। তবে কিসের জন্যে এই অন্তহীন ব্যর্থ সন্ধান? এই মিথ্যা আশায় পথে পথে ঘুরে মরা? কী লাভ?

কখনো কখনো এই চিন্তাধারাকেই দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করে। কিন্তু মন মানে না। রবিবার এলেই একটা অলক্ষ্য আকর্ষণ তার পা-দুটোকে টেনে আনে এই বেলেঘাটার কোন্ নাম-না-জানা বস্তির পানে। শেয়ালদ ষ্টেশন বাঁ দিকে রেখে, রেলের উপরকার পুল পার হয়ে বড় রাস্তা ছেড়ে আশেপাশের অলিগলির মধ্যে ঢুকে পড়ে, কোনো কোনো দিন আরো পূবদিকে চলে যায়, যেখানে বিশাল এলাকা

জুড়ে তৈরী হচ্ছে লেক। কত খোলার ঘর আর টিনের চালা ভেঙে দিয়ে বেরিয়ে গেছে নতুন নতুন রাস্তা। ভারী ভারী ষ্টীম রোলার চলছে তার বুকের উপর। তবে কি এরই কোনোখানে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের সেই ছোট্ট কুঁড়েখানা? সামনে এক চিলতে বারান্দা, একফালি উঠোন, তারপরেই রাস্তা; একটুখানি এগিয়ে এক পাশে জলের কল, আরেক পাশে সেই ঝাঁকড়া আম গাছে,—তার স্বপ্নভরা শৈশবদিনের সাক্ষী। ভাবতে গিয়ে বুকের ভিতরটা শিউরে ওঠে। তাই যদি হয়, সব যদি ভেঙেচুরে একাকার হয়ে গিয়ে থাকে, কোথায় গেল মা? তবে কি—

কী ভাবছিস? বললি না তো এদিকে কোথায় যাচ্ছিলি?

দিলীপের চিন্তাসূত্রে ছেদ পড়ল। বলল, বিশেষ কোথাও না। ঘুরছিলাম।

—ঘুরছিলাম! এখানে কেউ ঘুরতে আসে?……কটা বেজেছে মশাই?

শেষ প্রশ্নটার লক্ষ্য একজন পথচারী ভদ্রলোক। তিনি হাতঘড়ির দিকে চেয়ে বিরক্তির সঙ্গে বললেন, আটটা দশ।

—সর্বনাশ! আটটা বেজে গ্যাছে! আর তো আমার দাঁড়াবার উপায় নেই, ভাই। তুই আছিস কোথায়?

—শেয়ালদর কাছে, সার্পেণ্টাইন্ লেন।

—দাঁড়া ঠিকানাটা লিখে নিই। কত নম্বর?

দিলীপ নম্বরটা জানিয়ে দিল। সামসুল পকেট থেকে নোটবুক আর পেন্সিল বের করে লিখতে লিখতে বলল, আসছে রবিবার বিকেলের দিকে যাবো। থাকবি তো?

— থাকবো। নিশ্চয়ই যেও কিন্তু।

সামসুল কথা রেখেছিল। পরের রবিবারই এসেছিল দিলীপের আস্তানায়। দরজা খোলা ছিল। নম্বর মিলিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকে প্রথমটা মনে হল ভুল হয়নি তো? ঘরে ঘরে প্রেসের সাজসরঞ্জাম। লোক নেই। বোধহয় ছুটির দিন বলে কাজ বন্ধ। এখানে কোথায় থাকে দিলীপ? হঠাৎ চোখে পড়ল একটা কালো রং-এর পিপে গড়িয়ে

গড়িয়ে আসছে। আরে এ যে কেশো! কেশবও ওকে দেখতে পেয়েছিল। দেখেই এক বিকট চিৎকার—সামস্থল এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে পিলপিল করে বেরিয়ে এল এক ক্ষুদ্র পঙ্গপাল। বেশীর ভাগই চেনা, কয়েকটি অচেনা মুখ। কিন্তু উল্লাসের বহরটা তাদেরও কম নয়। বোঝা গেল, প্রথম এবং সন্থ সন্থ পা দিলেও এখানে সে আগে থেকেই পুরনো হয়ে বসে আছে। 'আসাটা' কোনো খবর নয়, 'এসে পড়েছে, সেইটুকু ঘিরেই ঐ হুল্লোড়। সবাই যখন তারস্বরে চেঁচিয়ে চলেছে, কে কী বলছে কেউ শুনছে না, তখন হঠাৎ পিছন দিক থেকে ভিড় ঠেলে অর্থাৎ দুচারটিকে ভূমিসাৎ করে এগিয়ে এল একটি পাহাড়ী যুবক। ব্যায়াম-পুষ্ট, দৃঢ়, সবল পেশী; বিশাল বুকের ছাতি, শক্ত চাকার মত মুখ। বিরাশি ওজনের থাবাটা সামস্থলের কাঁধে রাখতেই সে বেশ খানিকটা নুয়ে বলল, উঃ, ঘাড়টা মোষের নয়, দাদা, মানুষের।

বাহাদুর একবার তার সর্বাঙ্গে সস্নেহ দৃষ্টি বুলিয়ে বলল, মানুষ না হাড়গিলে? ঈস, কি করেছিস শরীরটাকে! একেবারে চেনা যায় না। চল, ওপরে চল।

সামস্থল প্রসঙ্গটা চাপা দেবার উদ্দেশ্যেই বোধহয় অন্য কথা পাড়ল। চলতে চলতে চারিদিক তাকিয়ে বলল, ব্যাপার কী বলতো? গোটা বর্ষ্টালটাই দেখছি উপড়ে এনে ফেলেছ এই গলির মধ্যে।

বাহাদুর কোনো জবাব দেবার আগেই কে একটি অচেনা ছেলে বলে উঠল, ঠিকই বলেছ; তবে এটা আমাদের নতুন বর্ষ্টাল। দেখছ, না? সেই ভুতুড়ে পাঁচিলটা নেই।

'শুধু পাঁচিল?' যোগ করল আরেকজন, 'সেই সিপাইদের রুলের গুঁতো, হেডমাষ্টারের চোখরাঙানি, কাঠমাষ্টারের কানটানা, ড্রিলমাষ্টারের জুতোর ঠোক্কর—'

—তার চেয়ে বল, উঠতে বসতে রোজ সাতবার করে শুঁটকো সন্তোষবাবুর সেই 'রুলস'—

ঠোঁট বেঁকিয়ে 'রুলস' কথাটা এমনভাবে উচ্চারণ করল কেশব, যে, চারদিকে হাসির রোল পড়ে গেল। সামস্থল আড়চোখে একবার

দেখে নিয়ে বলল, কেশো তো খুব কথা বলতে শিখেছে, দেখছি। তখন তো জানতাম একটা বিশেষ কম্মো ছাড়া—

কথাটা অসম্পূর্ণ রেখে সকৌতুকে তাকাল ওর সুগোল ভুঁড়িটার দিকে। ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে সকলের মুখেই কৌতুক-হাসি ছড়িয়ে পড়ল। কেশবের মুখেও কিছুমাত্র অপ্রতিভ হবার লক্ষণ দেখা গেল না। উন্মুক্ত এবং প্রসারিত উদরের উপর হাত বুলোতে বুলোতে বলল, তারও এখানে দেবার ব্যবস্থা। এসেছ যখন, থেকে যাও না দুচারদিন? নিজের চোখেই দেখতে পাবে।

'দু'চারদিন নয়', সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে যোগ করল বাহাদুর, 'একেবারে চলে আয়। তোকে আমাদের দরকার। তাছাড়া, দিলীপের কাছে আমি সব শুনেছি।'

—দিলীপ কোথায়? তাকে তো দেখছি না।

—মাষ্টারমশাই কোথায় বেরিয়েছেন তাকে নিয়ে। এখনি এসে পড়বে।

—কোন মাষ্টারমশাই?

—আশুবাবু।

সামসুলের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি লক্ষ্য করে বলল, যা কিছু দেখছিস, উনিই তার মূল। বসবি চল, চা-টা খা। তারপর সব বলছি।......কেশো।

—ইয়েস, স্যর?

—সামসুলের 'অনারে' আজ তোর বিশেষ প্রোগ্রামটা কী?

—মাৎ ঘাবড়াও। সিঙ্গাড়া ভাজা হচ্ছে।

—গুড্। জলদি লেয়াও।

দিলীপ ফিরবার আগেই এখানকার মোটামুটি ইতিহাস সামসুলের জানা হয়ে গেল। সেই সঙ্গে নিজের কথাও বলল বাহাদুর। বর্ষ্টাল থেকে পালাবার অপরাধে এস-ডি-ও সাহেব পুরো ছটি মাস জেল ঠুকেছিলেন, সে খবর সামসুল ওখান থাকতেই পেয়েছিল। রণমায়া ওর বোন বলে, বাকী চার্জগুলো আর চালানো যায়নি। সেজন্যে তিনি ক্লাবের বন্ধুদের কাছে দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন, এবং সেটা ঘোষসাহেবের কানে এসেছিল। কথাটা তিনি হেডমাষ্টারমশাইকে বলে ফেলেছিলেন।

তারপর আর চাপা থাকেনি। জেল থেকে খালাস পাবার পর সেইদিনই বাহাত্বর দিলীপের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। ঘোষসাহেব তখন চলে গেছেন। সন্তোষবাবু তার মোলাকাতের দরখাস্ত না-মঞ্জুর করেছিলেন। কারণ দেখিয়েছিলেন, 'তুমি তো দিলীপের কোনো আত্মীয় নও।' আশুবাবুর ঠিকানা জানবার চেষ্টা করেছিল, কেউ বলেনি, অথবা বলতে পারেনি।

পরের ইতিহাস বিশেষ সুখ-শ্রাব্য নয়। একটানা রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের কাহিনী। এমন কাজ নেই, যা সে না করেছে। শুধু নিজের জন্যে হলে অতটা না করলেও চলত। কিন্তু 'মায়া'কে আর কিছু না হোক, একটা ভদ্র আশ্রয় এবং একটুখানি স্বাচ্ছন্দ্য না দিয়ে সে পারে কেমন করে? সেটুকু সংগ্রহ করতে তাকে অনেক ঘাটের জল খেতে হয়েছে। তারপর জুটেছিল এক কাগজের দোকানের দারোয়ানি। সেইখানেই আশুবাবুর সঙ্গে দেখা। উনি প্রেসের জন্যে কাগজ কিনতে গিয়েছিলেন; সঙ্গে দিলীপ। ও তখন সবে বর্ষ্টাল থেকে বেরিয়ে এসে ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্যে তৈরী হচ্ছে।

—'পরীক্ষা ওখান থেকে দিয়ে আসেনি?' বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞাসা করল সামসুল।

—না। সে অনেক কথা। আরেকদিন শুনিস।

—আচ্ছা, তারপর?

—এই প্রেস-এর কাজ তখন রোজ বেড়ে যাচ্ছে। স্যর-এর একার সাধ্যি নয় সামলানো। এক দিলীপ ছাড়া এমন কেউ নেই যার ওপরে খানিকটা ছেড়ে দেওয়া যায়। ওর আবার পরীক্ষার পড়া। কাজেই বুঝতে পারছিস। আমার ওপর হুকুম হল, কালই চলে এসো। এলাম। ......বলে বাহাত্বর হেসে উঠল তার সেই প্রাণখোলা হাসি। তারপর বলল, এসেই দিলীপকে সব ঝঞ্ঝাট থেকে সরিয়ে দিলাম। বললাম, 'ইউ আর এ ষ্টুডেন্ট; চুপচাপ বসে বসে পড়। ও আবার কী চীজ জানিস তো। বললে, "বাঃ, আমি বুঝি তোমাদের ঘাড়ে বসে খাবো?"

"আচ্ছা, তাহলে রোজ তুঘণ্টা করে প্রুফ ছাখ। ব্যস্; আর তোমাকে কিছু করতে হবে না।"

—এখন কী করছে ও? জানতে চাইল সামস্থল।

—ওকে আমরা পড়া ছাড়তে দিইনি। আই, এস-সি পাশ করে মেডিক্যাল কলেজে ঢুকেছে। এবার থার্ড ইয়ার। ওরকম ছেলে হয় না।······বলতে বলতে বাহাত্বর কেমন আনমনা হয়ে পড়ল। সামনেকার জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল পাশের বাড়ির ছাদের দিকে। কিছুক্ষণ তুজনেই নীরব। আবার এদিকে ফিরে বলল, আমরা বলি, স্থর বলেন, তুমি যে পড়ছ এইতো সবচেয়ে বড় কাজ। এতে আমাদের সকলেরই স্বার্থ আছে। পাশ করে যখন বেরোবে, কাছাকাছি একটা ডিসপেনসারি দিয়ে বসে পড়বে, আমাদের আর বাইরের ডাক্তারের ফি গুনতে হবে না। কে শোনে কার কথা? রোজ অন্ততঃ ঘণ্টাচারেক করে প্রেসের জন্যে না খাটলে ওর চলে না। তবে বেশীর ভাগ আফিসেই বসতে হয়। মাষ্টারমশাই বড্ড বুড়ো হয়ে পড়েছেন।······কিন্তু কেশোটা কী করছে বল তো? দাঁড়া, একবার দেখে আসি।

—থাক না? ঠিক লোক ঠিক জায়গায় আছে। তুমি বসো। বোনের খবর কী?

বাহাত্বর উঠতে যাচ্ছিল; বসে পড়ে বলল, ভালো আছে। বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। ওর বর পুলিশে কাজ করে। এখন বর্ধমানে আছে। ক মাস হল বাসা পেয়েছে। ছেলেটা বড় ভাল।

বলতে বলতে ছোট ছোট চোখ তুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, একটা তৃপ্তির আনন্দ ছড়িয়ে পড়ল মুখময়। সামস্থলের মুখেও খুশির আভা দেখা দিল। ঐ নিয়েই বোধহয় কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই বাহাত্বর দরজার দিকে চেয়ে কলরব করে উঠল, এই যে এতক্ষণে আমাদের ডাক্তারবাবুর ফেরা হল। এদিকে যে বন্ধু এসে বসে আছে, সে খেয়াল নেই।

—'বন্ধু তো মাঠে বসে নেই', ঘরে ঢুকতে ঢুকতে হাসিমুখে বলল দিলীপ।

—মাঠে বৈকি? কার এমন দায় পড়েছে, তোমার বন্ধুকে নিয়ে বক্‌বক্ করতে?

—সবচেয়ে যার বড় দায়, তাকেই তো দেখছি।

—বটে? দিলীপ আর সে মুখচোরা দিলীপ নেই; বুঝলি

সামসুল ? আচ্ছা, তোরা কথা বল। আমি একবার দেখি কেশো হতভাগার মতলবটা কী। এক কড়া সিঙ্গাড়া বোধহয় একাই সাবড়ে দিলে।

বলতে বলতে বাহাত্বর উঠে গেল। এতক্ষণ ফাঁকা আফিস-কামরায় বসেই কথা হচ্ছিল। দিলীপ বলল, চলো, আমার ঘরে গিয়ে বসি।

—আশুবাবু আসেননি ?

—না; উনি ওঁর গুরুদেবের ওখানে চলে গেলেন। কাল ফিরবেন।

দোতলার সিঁড়ি যেখানে ছাদে গিয়ে পড়েছে, তার পাশে এক ফালি চিলেকোঠা। ওটি দিলীপের নিজস্ব। পড়াশুনোর সুবিধার জন্যে শুরু থেকেই আশুবাবু ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। একজন কোনো-রকমে শুতে পারে এমনি একখানা তক্তপোষ। তার পাশে দেয়াল ঘেঁষে ছোট্ট একটি কেরোসিন কাঠের টেবিল। সামনে একখানা হাতল-বিহীন চেয়ার। টেবিলের উপরেই একটি জানালা। খুলে দিলে গলির ওপারে দোতলা বাড়ির ছাদটা চোখে পড়ে। দিলীপের পরম ভাগ্য, এ হেন ঘরেও একটি দেয়াল-আলমারী আছে। কাঁচের পাল্লা; বর্তমানে কাঁচ নেই, আছে শুধু ফ্রেম। তিনটি তাক। উপরের হুটোতে ওর বই থাকে, আর নীচেরটায় কিছু হাড়গোড়।

ছোট্ট তক্তপোষ জুড়ে সতরঞ্চি পাতা। হুজনে গিয়ে তার উপরে বসল। দিলীপ হাত বাড়িয়ে টেবিলের উপরকার জানালাটা খুলে দিয়ে বলল, অনেকক্ষণ এসেছ, না ?

—অনেকক্ষণ কোথায় ? এই তো এলাম।

—আমি জানতাম, তুমি আসবে। কি করবো ? স্যর-এর সঙ্গে বেরোতে হল। কিছু কেনাকাটা ছিল। আমার হাতে দিয়ে উনি হুগলীতে ওঁর গুরুদেবকে দেখতে চলে গেলেন।

—ওখানে থাকতে মাঝে মাঝে যাঁর কাছে যেতেন, সেই গুরু ?

—হ্যাঁ, তিনিই। তখন কি জানতাম, মানুষটা কত বড় ? আমরা তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করতাম, আর তিনি বসে বসে আমাদের কথা ভাবতেন। এখানে যা কিছু দেখছ, সব তাঁর জন্যে।

—তাঁরই প্রেস বুঝি ?

—না ; প্রেস আমাদের। আমরাই এর মালিক। এখানে যার কাজ করছে, সকলেরই সমান স্বার্থ, সমান স্বত্ব। এমন কি মাষ্টারমশাই, যিনি এটা গড়ে তুললেন, তিনিও আমাদের মত একজন শেয়ার-হোল্ডার মাত্র।

সামসুল কৌতূহলী হয়ে উঠল। দিলীপ তখন গোড়া থেকে শুরু করে এই সমবায় প্রতিষ্ঠানের গোটা ইতিহাসটা তাকে খুলে বলল আশুবাবুর গুরুদেব যে-টাকাটা দিয়েছিলেন, সে শুধু ধার এবং এতদিনে তার মোটা অংশটাই শোধ দেওয়া হয়ে গেছে, এ কথাও ঐ সঙ্গে জানিয়ে দিল। প্রেসএর প্রসার যে রকম গতিতে চলেছে, রোজ তাদের নতুন নতুন কর্মী দরকার, সে তুলনায় বর্ষ্টাল থেকে যারা বেরোচ্ছে, যথেষ্ট নয়, এবং আপাততঃ দু-একজন ট্রেণার ছাড়া বাইরে থেকে লোক নেবার ইচ্ছা নেই, সেটা এখানকার উদ্দেশ্যও নয়—ইত্যাদি তথ্য বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করে, এতক্ষণে যেন আসল প্রসঙ্গে আসবার ফুরসত হল, এমনিভাবে বলল, যাক্‌গে ; তারপর তুমি কবে আসছ, বল।

সামসুল তন্ময় হয়ে শুনছিল। এই আকস্মিক প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। একটু যেন থতমত খেয়ে বলল, আমি ?······আমাকে আসতে হবে ? মানে, তুইও আসতে বলছিস ?

—বলছি কি রকম ? সবাই মিলে আমরা একেবারে স্থির করে ফেলেছি। মাষ্টারমশাই তো তোমাকে আটকে রাখতে বলে গেছেন। গুরুদেবের বাড়াবাড়ি অসুখ না হলে উনিই তোমাকে বলতেন।

সামসুল কিছু বলবার আগেই, কলরব করতে করতে কেশব এবং তার সঙ্গে আরো তিন-চারটি ছেলে এসে ঢুকল। তাড়া দিয়ে বলল, চল, চল, সিঙ্গাড়া ফুরিয়ে গেল।

—শুধু সিঙ্গাড়া, না আরো কিছু আছে ? জানতে চাইল দিলীপ। কেশব চোখে একটা বিচিত্র ভঙ্গি করে বলল, আছে, আছে। নাম শুনলেই জিব দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়বে।

—কী সেটা ?

—চল না ! গেলেই দেখতে পাবে।

একতলার খাবারঘরে সবাই গিয়ে জড় হল, বর্ষ্টালের ডাইনিং শেডে অনেকদিন আগে যেমন হত। তফাৎ অবশ্য অনেক। প্রাণ খুলে হৈ-রৈ করবার স্বাধীনতা ছিল না। গলাটা একটা বিশেষ পর্দা ছাড়িয়ে পেলেই চীফ অফিসারের বিকট ধমক। সেখানে গোনাগুনতি যার যেটুকু বরাদ্দ তার বাইরে হাত বাড়ানো ছিল অপরাধ। এখানে সে সব বাধা-নিষেধ কোনোটাই নেই। কেশব এবং আরো দুটি ছেলে মিলে সিঙ্গাড়া পরিবেশন করল। জনপ্রতি ৪টা; খাইয়ে বুঝে দুটো একটা বেশীও পেল কেউ কেউ। চা আসবার ঠিক আগেটায় কেশব ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পল্টনের সেনাপতির মত উচ্চকণ্ঠে নির্দেশ জারী করল—'তোমরা সক্‌কলে চোখ বোজো। না বললে খুলবে না কিন্তু।'

সবাই চোখ বুজল। কেশবের এসব পুরোনো পেটেণ্ট খেলা; এদের অভ্যাস আছে। মিনিট তিনেক পরে দ্বিতীয় আদেশ দিলেন সেনাপতি, আচ্ছা, এবার খোলো।

প্রত্যেকের পাতে একটি করে জয়নগরের মোয়া। খুশির ঝলকে গোটা পল্টনটা ঝলমল করে উঠল। দু-তিনজন উঠে পড়ে নাচতে শুরু করল। বাহাদুর এক কামড়ে অর্ধেকটা মোয়া মুখে পুরে বলে উঠল, বাঃ, এবারে আরো ভালো করেছে। বুড়োকে একটা মেডেল দেওয়া উচিত।

—ও মোটেই নিজে করে না। ভিড়ের ভিতর থেকে বলল কে একজন।

—তবে কে করে?

—ওর মা।

—মা! ঐ থুত্থুড়ে বুড়োর আবার মা আছে নাকি?

একটা অট্টহাসির রোল উঠল। তার মধ্যে সামসুলের হঠাৎ নজরে পড়ল, দিলীপ মাথা নীচু করে বসে মোয়াটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, তখনো মুখে দেয়নি।

—কী হল! খাচ্ছিস না যে?

—'খাচ্ছি' ম্লান, হেসে মাথা তুলল দিলীপ। তারপর অন্যমনস্কের মত খানিকটা ভেঙে মুখে দিল।

গোটা পল্টন জুড়ে তখন ভীষণ সোরগোল শুরু হয়েছে। কে একজন দেখতে পেয়েছে কেশবের বাঁ হাতে আর একটি মোয়া। সঙ্গে সঙ্গে সরব প্রতিবাদ—ও কি! তুমি দুটো খাবে কেন?

—বাঃ, আমি এত কষ্ট করে বাঁটলাম, তার বুঝি মজুরি নেই?

কে বলেছিল তোমাকে কষ্ট করতে? ও সব চলবে না। দাও, ভাগ দাও।

খাবার জিনিসের ভাগ দেওয়া কেশবের কোষ্ঠীতে লেখা নেই। তার বদলে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এগিয়ে দিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে পিটটান। গোটা পল্টন হুল্লোড় করতে করতে ছুটল তার পেছনে।

দিলীপকে একান্তে পেয়ে সামসুল তার মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে বলল, ব্যাপার কী বল তো? হঠাৎ এরকম গম্ভীর হয়ে গেলি কেন?

—ও কিছু না। চলো, ওপরে যাই।

—কিছু—না বললে শুনবো কেন? না বলতে চাস সে আলাদা কথা।

বন্ধুর কণ্ঠে অভিমানের আভাস পেয়ে দিলীপ কুণ্ঠার সুরে বলল, সত্যি বলছি বলবার মতো কিছু নয়। হঠাৎ মার কথা মনে পড়ে গেল। ছেলেবেলায় একদিন ঐ মোয়ার জন্যে ভীষণ কান্নাকাটি করেছিলাম। জানতাম না, সেদিন মার হাতে একটিও পয়সা নেই।...যাক গে। তুমি কাল থেকেই আসছ তো?

সামসুল সে প্রশ্নের জবাব দিল না। বলল, মার খোঁজ পাসনি এখনো?

—না; সেইজন্যই ওখানে ঘুরছিলাম সেদিন। আরো অনেকবার গিয়েছি। ঠিক জায়গাটা কিছুতেই বের করতে পারছি না।

—ওদিকটা যে আগাগোড়া বদলে গেছে। অনেক পুরনো বস্তি ভেঙে ফেলেছে। আচ্ছা, এবার যেদিন যাস, আমি তোর সঙ্গে থাকব।

দিন কয়েক পরে সামসুল আবার যখন এল, তখন আশুবাবু অফিসে ছিলেন। এই প্রেস-এর প্রতিষ্ঠা এবং তার ভিতরকার আশা ও উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হল। সেই প্রসঙ্গে তিনি

বললেন, ব্যাপারটাকে শুধু জীবিকার দিক থেকে দেখো না। তাহলে তুমি যেখানে আছ, সেখান থেকে চলে আসা ঠিক হবে না। শিল্প হিসেবে ট্যানারির ভবিষ্যৎ অনেক বড়। টিঁকে থাকলে একদিন অনেক উপরে উঠবার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু বৈষয়িক উন্নতি ছাড়াও মানুষের জীবনে আর একটা দিক আছে—সার্ভিস বা সেবার দিক। শুধু নিজের জন্যে নয়, অন্যের জন্য কী বা কতটুকু করলাম—এ প্রশ্নের জবাবও তাকে দিতে হয়।

সামসুল ছাড়া দিলীপ এবং আরো দু-একজন পুরনো আমলের বর্ষ্টাল-ফেরত ছেলে সেখানে উপস্থিত ছিল। সকলের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে আশুবাবু আবার বললেন, সে 'অন্যের' মধ্যে প্রথমেই আসে আপনজন। বড় ভাই একদিকে যেমন নিজেকে বড় করবার, ক্রমশঃ আরো উঁচুতে তোলবার চেষ্টা করবে, তেমনি তার পরে যারা এসেছে, তাদেরও টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দেওয়া শুধু কর্তব্য বলবো না, তার একটি বিশেষ দায়। সেজন্যে যদি তার নিজের গতি কমাতে হয়, যতটা ওপরে সে যেতে পারত, তার কয়েক ধাপ নীচুতে পড়ে থাকতে হয়, ছোটোর মুখ চেয়ে সে ক্ষতি তাকে সইতে হবে।······তোমরা যারা বর্ষ্টাল থেকে আগে বেরিয়েছ, তারা এক ধাপ এগিয়ে আছ। পরে যারা এসেছে এবং আরো পরে যারা আসবে, সকলেরই একটা দাবি আছে তোমাদের ওপর, বড় ভাই-এর কাছে ছোট ভাই-এর যে দাবি। তাদের জন্যে তোমাদের কিছু দেবার আছে, যার যতটুকু শক্তি, তা সে যত সামান্যই হোক।

একজন বাইরের ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। আশুবাবু তাঁকে বসতে বলে ক্ষণকাল সামসুলের দিকে চেয়ে বললেন এর বেশী আমার আর কিছু বলবার নেই। বাকীটা তুমি ভেবে ছাখো।

দিন তিনেক পরেই সামসুল একটি টিনের সুটকেস এবং সতরঞ্চি-জড়ানো ছোট্ট বিছানাটি নিয়ে সার্পেন্টাইন লেনের 'নতুন বর্ষ্টালে' এসে উঠল।

—বার—

মানুষের জীবনকে যদি দীর্ঘপথের সঙ্গে তুলনা করা যায়, সেই সঙ্গে একথাও মেনে নিতে হবে, সে পথ জ্যামিতিক সরলরেখা নয়। সেখানে অনেক বাঁক, অনেক মোড়। শুধু তাই নয়। সে পথ কখনো সমতল কখনো বন্ধুর। তার দুধারে যে দৃশ্যপট সেও কোথাও শ্যামল, কোথাও ঊষর। একদিকে শস্য-সমৃদ্ধ প্রান্তর, আরেকদিকে রুক্ষ, রিক্ত বন্ধ্যাভূমি। পথের বাঁকে বাঁকে একটি করে তোরণ। তার এপারের সঙ্গে ও পারের মিল নেই। যেন দুটি আলাদা রাজ্য, আলাদা জগৎ। একটা স্তর পেরিয়ে আর একটা স্তরে প্রবেশ। আত্মভোলা শৈশবের পর সদ্যো-জাগ্রত কৈশোর। তারপর সহসা মোড় ফিরে স্বপ্নবিভোর প্রাণচঞ্চল যৌবনের স্বর্ণদ্বার পার হয়ে পথ চলে যায় নির্লিপ্ত ধূসর বার্ধক্যের পানে।

একদা সন্ধিক্ষণে দিলীপ এসে দাঁড়াল সেই স্বর্ণ-তোরণের দ্বার-প্রান্তে। তার দুচোখ ভরা 'একুশ বছর'-এর স্বপ্ন। এতদিন যে জগতে, যে গণ্ডির মধ্যে তার দিন কেটেছে—এই প্রেস, মেডিক্যাল কলেজ, বন্ধু-বান্ধব, মাষ্টারমশাই এবং সকলের অন্তরালে ফল্গুধারার মত বহমানা বেদনাময় মাতৃস্মৃতি—সেইটুকু যেন যথেষ্ট নয়। সেই সংকীর্ণ সীমানায় তার সবখানি আর ধরছে না। তার বাইরে যে জগৎ, যার সম্বন্ধে এতকাল তার কোনো কৌতূহল ছিল না, যার জন্যে কোনো অভাব কখনো বোধ করেনি, সে আজ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সঙ্গে সঙ্গে কিসের এক অপূর্ণতার বেদনা থেকে থেকে তার চেতনাকে চঞ্চল করে তুলছে। মনে মনে শঙ্কিত হল দিলীপ। এ তার কী হল? এই স্বপ্নবিলাস তো তাকে মানায় না। ঐশ্বর্যের অধিকার নিয়ে সে জন্মায়নি। কঠোর কঠিন বাস্তবের পথ ধরে এগিয়ে গিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। তার মত নিঃস্ব, রিক্ত, স্বজন-বান্ধবহীন হতভাগ্যের জীবনে এগুলো শুধু বাধা, শুধু অবাঞ্ছিত উপদ্রব। এই মোহপাশ তাকে কাটিয়ে উঠতে হবে।

এই সঙ্কল্প নিয়ে তার বর্তমান জীবনযাত্রার দৈনন্দিন রুটিনের মধ্যেই নিজেকে ডুবিয়ে রাখবার চেষ্টা করল। প্রেস-এর কাজে এতদিন যে সময়টা দিয়ে এসেছে, তার উপরে আরো একঘণ্টা জুড়ে দিল। বাড়িয়ে দিল ল্যাবরেটরীর দৈনন্দিন কাটা-ছেঁড়ার পালা। কঙ্কাল আর কেতাবের শুকনো জগৎটাকে আরো বেশী করে আঁকড়ে ধরল। তাতে যখন মন বসতে চাইত না, কিংবা করবার মত আর কোনো কাজ খুঁজে পেত না, তখন কিছুক্ষণের জন্যে বসত গিয়ে মাষ্টারমশাই-এর কাছে, কখনো বা ছেলেদের আড্ডায়। চারদিকে এত করে আটঘাট বেঁধেও কিন্তু জানতে পারল না, হাতের কাছেই একটি রন্ধ্র রয়ে গেছে। জানা যায় না। আজ পর্যন্ত কেউ কোনোদিন জানতে পারেনি। দিলীপও বুঝতে পারেনি, টেবিলের উপরকার ঐ নিরীহ জানালাটাই তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসবে।

সবচেয়ে বিস্ময়কর,—জেনেও ঐ জানালাটাকে সে বন্ধ করে দিল না। প্রতি মানুষের মত তার মধ্যেও যে দুটি মানুষ বাস করে, তার একজন হাত বাড়ালেও আর একজন এসে সেই হাত চেপে ধরল। একজন বলল, 'ওখানে কোনো কল্যাণ নেই', 'কিন্তু সুখ আছে'—উত্তর দিল দ্বিতীয় জন।

—'সুখের চেয়ে অনেক বেশী বেদনা।'

—'হোক; তবু ভালো লাগে।'

বর্ষা বিদায় নিয়েছে, শরৎ এখনো পুরোপুরি এসে আসর জমিয়ে বসেনি। মেঘের গতি মন্থর, দেহ নবনী-শুভ্র। তারই ফাঁকে ফাঁকে দেখা দিয়েছে সদ্যঃস্নাত আকাশের গাঢ় নীলাঞ্চল। চারদিকে ঝলমল করছে মেঘমুক্ত রোদ। মন আপনিই উদাস হয়ে ওঠে, কাজের বন্ধন, আর অক্ষরের বাঁধ পেরিয়ে উধাও হয়ে যেতে চায়। দিলীপ তার ঘরে বসে পড়ছিল। একটা জটিল জিনিসের মধ্যে নিবিষ্ট হবার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল সামনেকার খোলা জানালায়। গলির ওপারে খোলা ছাদের রেলিং-এর পাশে, তার মুখোমুখী এসে যে দাঁড়াল, তারও পরনে নীল শাড়ি। মনে হল একমুঠো আকাশই যেন মেঘলোক থেকে নেমে এসে দাঁড়িয়েছে তার চোখের উপর। যে-দুটি আঁখিপল্লব পলকের

তরে খুলে গিয়েছিল চকিতে তখনই আবার ঢাকা পড়ে গেছে, সেখানেও দেখা গেল নীলাঞ্জন-রেখা। দিলীপ চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। ক্ষণকাল পরে যখন তুলল, ওপারে তখনো কাপড় শুকোতে দেবার সংক্ষিপ্ত কাজটুকু শেষ হয়নি। হয়তো এইমাত্র তার স্নান সারা হয়েছে। একরাশ ভিজে চুলের গোছা ছড়িয়ে পড়েছে পিঠের উপর। একটুখানি নুয়ে পড়ে ছড়িয়ে দেওয়া ডুরে শাড়ির একটা কোণ বেঁধে দিচ্ছে রেলিং-এর শিকের সঙ্গে। বাঁধতে বাঁধতেই সহসা কি মনে করে চোখ দুটি আবার পাঠিয়ে দিল এপারের খোলা জানালায়। কে জানে, কেন? কী ছিল সেই চোখে? শুধু কৌতূহল? না, তার সঙ্গে—

পেছন থেকে দুখানা হাত হঠাৎ বেরিয়ে এসে জানালাটা সশব্দে বন্ধ করে দিল। দিলীপ চমকে উঠে ফিরে তাকাল, এবং সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিল, যেন কোনো অপরাধ হাতে হাতে ধরা পড়ে গেছে। সামস্নুলের চোখে বিরক্তির ভ্রূকুটি। কপাল কুঞ্চিত করে বলল, মেয়েটা কে রে?

—জানি না।

—আমি জানি।

—কে বলতো? সাগ্রহে চোখ তুলল দিলীপ।

—ওকে চিনি না, তবে ঐ জাতটাকে চিনি।

দৃঢ় গম্ভীর সুর, মুখের উপর যেন কোন দূরাগত আক্রোশের ছায়া। দিলীপ নিঃশব্দে চেয়ে রইল। বর্ষাকালের সামস্নুলকে মনে পড়ল। বুঝল, এতগুলো বছর পার হয়ে এসেও সে একতিল বদলায়নি। ব্যাপারটাকে একটু লঘু করে দেবার উদ্দেশ্যেই বোধহয় মৃদু হেসে বলল, তুমি দেখছি আজও তেমনি ছেলেমানুষ রয়ে গেছ।

—ছেলেমানুষ! গভীর বিস্ময়ে ঘুরে দাঁড়াল সামস্নুল।

—তা বৈ কি? একজনকে দিয়ে তুমি গোটা জাতের বিচার করবে!

—একটা ভাত টিপলেই গোটা হাঁড়ির খবর পাওয়া যায়।

—ওসব মেয়েলী উপমা। ওতে কিছুই প্রমাণ হয় না। তাছাড়া, সেই একজনকেও হয়তো তুমি ভুল বুঝে বসে আছ। শেষদিকে সে যা

বলেছিল, বা করেছিল নিশ্চয়ই কোনো চাপে পড়ে ; ইচ্ছে করে করেনি। জানো না, ওরা কত অসহায় ?

—জানি। তাব চেয়েও অসহায় আমরা। একটা চাওনির ভার সইতে পারি না। ফিক্ করে একটু হাসল তো কথাই নেই। সঙ্গে সঙ্গে ঢলে পড়লাম। না, দিলীপ, আমি যতক্ষণ আছি ঐ ফাঁদে তোকে পা দিতে দেবো না। তোর জীবনটা এত খেলো নয়। তাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলে না।

শেষ হবার পরেও সামস্থলের শেষের কথাগুলো যেন ঘরময় গমগম করে বেড়াতে লাগল। দিলীপ মাথা নত করে পলকহীন দৃষ্টিতে মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে চোখ তুলে বলল, তোমার কোনো ভয় নেই। আমি ঠিক আছি।

এতক্ষণে সামস্থলের মুখে প্রসন্নতার আভাস দেখা দিল। হেসে বলল, এই ছাখো, যে জন্যে এসেছিলাম, তাই ভুলে গেছি। মাষ্টারমশাই তোকে একবার ডাকছেন।

—কেন বল দিকিনি ?

—কে একজন ভদ্দরলোক এসেছেন। তোর সঙ্গে বোধহয় আলাপ করিয়ে দিতে চান।

—কে ভদ্দরলোক ?

অত সব জানিনে, বাপু। ডাকছেন, চল।

দিলীপ বই বন্ধ করে উঠে পড়ল।

ওদিকে গলির ওপারকার রেলিং-ঘেরা ছাদের পাশে ছুটি কালো চোখের তারায় যে বিদ্যুৎ ঠিকরে পড়ল, তার খবর এরা কেউ জানল না। তার একটা তীক্ষ্ণ শিখা শুধু ছুটে এসে আছড়ে পড়ল এদিকের রুদ্ধ জানালার গায়। এ কোন্ দেশী ভদ্রতা ? অমনি করে তার মুখের উপর কপাট ছুটো বন্ধ না করলে বুঝি পড়ার ব্যাঘাত হত ? ভারী তো পড়া ! পড়ার নাম করে একটা মড়ার মাথার খুলি আর কতগুলো হাড়গোড় নিয়ে খেলা করা। তার দায় পড়েছে সেদিকে তাকাতে। ওগুলো দেখলেই তার গা ঘিনঘিন করে। যারা ডাক্তারি পড়ে তাদের সে ছচক্ষে দেখতে পারে না।

ঠোঁট উলটে এমনি একটা অবজ্ঞার কটাক্ষ কপাটের উপর ছুঁড়ে দিয়ে তাচ্ছিল্য-ভরে চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ কী মনে করে থমকে দাঁড়াল। বন্ধ জানালার দিকে চেয়ে চোখছুটো যেন জ্বলে উঠল। না, না, এ শুধু অভদ্রতা নয়, এ অপমান! কিন্তু কেন? কিসের জন্যে এ অপমান? কী করেছে সে? কথাগুলো মনে মনে বলতে গিয়েও গলাটা ধরে এল। এইমাত্র যে-চোখে ছিল আগুন, এক নিমেষে তারই ভিতরে দেখা দিল জলের আভাস! অর্থহীন অভিমানে ফর্সা মুখখানা লাল হয়ে উঠল। ছুমদাম করে পা ফেলে তখনই সে নীচে চলে গেল এবং নিজের ঘরে ঢুকে সজোরে দরজা বন্ধ করে দিল।

পরদিন এই সময়ে আবার তাকে দেখা গেল ছাতের উপর। পিঠময় এলিয়ে পড়া ভিজে চুল, হাতে নিংড়ানো ভিজে শাড়ি। আজ আর এদিকে নয়, সিঁড়ি-দরজার ভিতর দিয়ে বেরিয়েই দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল ঐদিকে। রেলিং-এর উপর দিয়ে কাপড়খানা নীচে ছড়িয়ে দিয়ে, আঁচলের একটা ধার কোনো রকমে শিকের সঙ্গে বেঁধে, তাড়াতাড়ি নেমে চলে গেল, যেন কত কাজ পড়ে আছে সেখানে। একবার এদিকে ফিরেও তাকাল না। তাকালে দেখতে পেত সেই জানালাটি আজ খুলে গেছে। আরো দেখতে পেত, তার পাশে যে মানুষটি বসে আছে, তার দুচোখভরা ভীরু প্রতীক্ষা। তার পরেই নেমে এল নৈরাশ্যের অন্ধকার। এতক্ষণ তার দৃষ্টি ছিল কখনো বই-এর পাতায়, কখনো জানালার বাইরে। এবার সে সোজা হয়ে বসে একটানা চেয়ে রইলো শূন্য ছাদের দিকে। এ কী হল! কী অপরাধ করল সে, যার জন্যে এই দিকবদল! এইদিকের রেলিংটাই বা কী দোষ করল যে, কাপড় শুকোতে দেবার এই সামান্য কাজটাও সেখানে চলতে পারে না? এতদিন যে চলছিল? আকাশ-পাতাল ভেবে সারা হল দিলীপ। কিন্তু একটা কথা তার মাথায় কিছুতেই ঢুকল না—অপরাধ সে করেনি, করেছে তার জানালার ঐ পাল্লা-ছুটো, বড় অসময়ে বন্ধ হয়ে গিয়ে। একজনের অপরাধের ফল আরেকজনকে ভুগতে হয়—এ দৃষ্টান্ত সংসারে বিরল নয়। 'দশাননো হরেৎ সীতাং, বন্ধনং স্যাৎ মহাদধেঃ।' সীতাহরণ করল রাবণ, তার জন্যে বাঁধা পড়ল মহাসাগর। হিতোপদেশ

পড়া থাকলেও এরকম একটা সম্ভাবনা দিলীপের মনে এল না। মানুষ বড় আত্মসার। সে শুধু নিজের দিকটা দেখে, নিজের কথা ভাবে—আমি কি করলাম। কিছু না করেও যে অনেক কিছুর জন্মে দায়ী হতে হয়, সেটুকু সংসার-জ্ঞান তখনো তার হয়নি।

অনেকক্ষণ ঐ দিকে চেয়ে চেয়ে চিন্তাটা অন্য পথে মোড় নিল। মনে হল, যে কারণেই হোক, এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো শুভ ইঙ্গিত আছে। কিছুদিন ধরে থেকে থেকে নিজেকে সে কোথায় যেন হারিয়ে ফেলছিল। না কাজে, না পড়াশুনায়—কোথাও ঠিক মন বসাতে পারছিল না। কতদিন এইখানে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেছে, একটি পাতাও পড়া হয়নি। সারা মন একাগ্র হয়ে অপেক্ষা করেছে, ঐ ছাতের পাশটিতে কখন ঘটবে সেই রমণীয় আবির্ভাব, অন্তর-দুয়ারে কখন শোনা যাবে সেই নিত্যপ্রত্যাশিত লঘু চরণ-ধ্বনি। সে এসেছে, চলে গেছে, যাবার আগে ফেলে গেছে একটি ক্ষণিকের চকিত দৃষ্টি। সেইটুকু সম্বল করে কৃপণের ধনের মত নাড়া-চাড়া করে সমস্ত সকালটা সে কাটিয়ে দিয়েছে। কখনো বা ঐ নিঃশব্দচারিণীকে আশ্রয় করে একটির পর একটি স্বপ্নের জাল বুনে বুনে চলেছে, শূন্যের উপর রচনা করেছে প্রাসাদের পর প্রাসাদ।

তারপর সহসা এক সময়ে এই মূঢ়তা তার নিজের কাছেই ধরা পড়ে গেছে। নিজের সম্বন্ধে দিলীপ চিরদিন অতি-সচেতন, নিজের পাবিধি সম্বন্ধে অতি-সজাগ। বাইরের পৃথিবীর কাছে কী তার পরিচয় তা সে ভালোভাবেই জানে, সেই সঙ্গে একথাও জানে, জ্ঞান ফুটবার আগেই যে মসী-লাঞ্ছিত ললাটলিপি সম্বল করে সে সংসারের পথে পা দিয়েছে, সমাজের প্রখরদৃষ্টি শুধু সেইদিকেই চিরনিবদ্ধ! নিজের শক্তি ও চেষ্টা তাকে যেখানেই নিয়ে যাক, কেবলমাত্র ঐ রেখাটাই হবে তার মূল্যায়নের মাপকাঠি। সুতরাং জানালার ওপারে ঐ রাজ্যটি তার নিষিদ্ধ জগৎ। ওখানে তার প্রবেশের অধিকার নেই। ওখানকার আকাশে যে আলোকরশ্মি তাকে টানছে, তার কাছে সেটা আলেয়ার আলো; একটি মনোহর বিভ্রম, বিপথে নিয়ে যাবার মধুর সঙ্কেত। ঐ কিশোরী মৃগনয়না অন্যের কাছে যত সত্যই হোক, তার কাছে শুধু মোহ-

সঞ্চারী মায়ামৃগ। সে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, যে অপ্রাপনীয়, তাকে ঘিরে কী লাভ এই স্বপ্নরচনায় ?

সুতরাং এ ভালোই হল। ও যে আপনা থেকেই সরে গেছে. ধীরে ধীরে যে মোহজাল বিস্তার করে তার দিকে এগিয়ে এসেছিল, নিজে থেকেই সেটা গুটিয়ে নিয়ে তাকে মুক্তি দিয়ে গেছে, এজন্যে তার কোনো ক্ষোভ নেই। বরং মনে মনে সে সত্যিই কৃতজ্ঞ। এবার সে নির্বিবাদে, নিশ্চিন্ত মনে তার কাজ করে যাবে। ঠিকই বলেছে সামসুল। কঠিন কঠোর মাটির পথ ধরে তাকে এগোতে হবে। সেখানে আকাশ-কুসুমের স্থান নেই।

গা-ঝাড়া দিয়ে নড়েচড়ে শক্ত হয়ে বসল দিলীপ। অনেকখানি হালকা মনে হল নিজেকে। সারা দেহ থেকে যেন একটা শক্ত বাঁধন খুলে পড়ে গেছে। আকাশ-জোড়া অলস কল্পনার জগৎ থেকে বিক্ষিপ্ত মনটাকে কুড়িয়ে এনে অ্যানাটমির অতিবাস্তব সঙ্কীর্ণ সীমানার মধ্যে বদ্ধ করবার চেষ্টা করল। সে মেডিক্যাল ষ্টুডেন্ট্। মানুষের মনের অদৃশ্য গোপন সূক্ষ্ম অলি-গলির গোলকধাঁধায় ঘুরে ঘুরে তার কী লাভ ? তার চেয়ে সত্যিকার উপকার হবে যদি মানুষের এই দেহটার মধ্যে অস্থি, মজ্জা, শিরা-উপশিরার যে প্রকাশ্য অথচ দুর্বোধ্য জটাজাল জড়িয়ে আছে, তার সন্ধান পাওয়া যায়। একটা মেয়ের সামান্য একদিনের সামান্য একটা খেয়ালের রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা না করে, হাজার হাজার মেয়ে চিরদিন যে অসংখ্য দৈহিক যন্ত্রণায় ভুগে ভুগে মরে তার যে-কোনো একটির কারণ নির্ণয় করতে পারলে ঢের বেশী কাজ হবে।

ঘণ্টাখানেক নিবিষ্ট মনে পাঠাভ্যাস-প্রয়াসের পর দিলীপ হঠাৎ আবিষ্কার করল, বিশাল গ্রন্থের যে নতুন অধ্যায়টি শুরু করেছিল, তার প্রথম পাতা কোনো রকমে পার হয়ে দ্বিতীয় পাতায় এসে সে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরপাক খাচ্ছে। বৃহত্তর নারীসমাজের ব্যাধিমুক্তির দুর্ভাবনা ঠেলে দিয়ে, একটিমাত্র নিটোলস্বাস্থ্য কিশোরী মেয়ের সেই তুচ্ছ 'খেয়ালটাই' তার ডাক্তারি-চিন্তার সব পথ জুড়ে বসে আছে। ঘুরে ঘুরে কেবলই মনে হচ্ছে, একটা দিনের মধ্যে কী কারণ ঘটল, যার জন্যে কাপড় শুকোবার এই এত দিনের পুরনো জায়গা ছেড়ে দিয়ে তাকে অন্য দিকে

সরে যেতে হল। বেশ, যাক; কিন্তু ক্ষণেকের তরে একটিবার এদিক পানে তাকালে কী দোষ হত? যাবার সময় সেই আশা নিয়ে দিলীপ এক দৃষ্টে চেয়েছিল, কিন্তু পলকের জন্যে মুখের একটা দিক ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়েনি। যেটুকু দেখা গেল, সবটাই যেন কেমন থমথমে, ভার-ভার। সে মুখ নয়, প্রতি প্রভাতে প্রথম সূর্যালোকের সজীব প্রসন্নতা দিয়ে যে এসে তার বিগত রাত্রির সব মালিন্য মুছে নেয়। এ অন্য মুখ—বিষণ্ণ, ম্লান, হয়তো কোনো আহত অভিমানে ক্ষুব্ধ। কার উপরে, কিসের জন্যে অভিমান, দিলীপ অনুমান করতে পারল না। কিন্তু নিমেষের তরে দেখা সেই ক্ষোভক্লিষ্ট মুখখানা অ্যানাটমির শুষ্ক আবরণ ভেদ করে বারংবার তার চোখের উপর ভেসে উঠতে লাগল।

॥ তের ॥

'শহরতলী' কথাটার ধাতুগত অর্থ যা-ই হোক, আসল অর্থ 'শহরের তাঁবেদার'। তার মুখ্য কাজ শহরের অসংখ্য প্রয়োজনের যোগান দেওয়া। তার বুক জুড়ে এত যে আকাশচুম্বী চিমনিওয়ালা কল-কারখানার সমারোহ, তাদের মালিক থাকেন শহরে, এবং যে সম্পদ সেখানে তৈরী হয় তাও ভোগ করে শহরের মানুষ। এখানকার মানুষ যে কিছুই পায় না, তা নয়। পায় ওদের ঐ অজস্রধারায় উগরে-ফেলা ধোঁয়া আর কালি। আর একটা মূল্যবান পদার্থ এদের ভাগে পড়ে—একরাশ খোলা ও খাপরার জঞ্জাল, তার ভিতরে কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে কিলবিল করছে একপাল কুলী, রাজনীতির খাতায় যাদের নতুন দেওয়া ছদ্মনাম—মজদুর বা মেহনতী মানুষ। তাছাড়া মানুষ পদবাচ্য আর যারা এখানে থাকে, তাদেরও বলা যেতে পারে শহর-জীবনের ফ্যাঁকড়া। শহরকে আশ্রয় করেই তাদের অস্তিত্ব। ভোর হতে না হতেই দলে দলে ঊর্ধ্বশ্বাসে সেই দিকেই এরা ছুটতে শুরু করে, আবার সন্ধ্যার অন্ধকারে তেমনি পঙ্গপালের মত ছুটতে ছুটতে ফিরে আসে। বিচিত্রবেশী মিছিল। কারো হাতে কলম, কারো কাঁধে গাঁইতি, কারো মাথায় ঝাঁকা। কেউ বাবু, কেউ মিস্ত্রী, কেউ ফেরিওয়ালা। বৃত্ত বিভিন্ন, কিন্তু লক্ষ্য এক—শহরের তাঁবেদারি, তার জীবনধারাকে সচল ও সবল রাখা, তার বিলাস ও স্বাচ্ছন্দ্যের পরিপোষণ।

কিন্তু পরিপুষ্টির একটা সীমা আছে। সেটা যখন পেরিয়ে যায়, তখন সে ব্যাধি। প্রাণধারণের জন্যেই ভোজন, কিন্তু আকণ্ঠ-ভোজনে সেই প্রাণ নিয়ে টানাটানি। শহরের বেলাতেও তাই। জীবনযাত্রার উপকরণ বাড়তে বাড়তে এমন এক স্তরে তাকে নিয়ে যায়, যেখানে জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজন যে নিশ্বাস-বায়ু, তারই জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে। কোলকাতারও একদিন সেই অবস্থা দেখা দিল। একদিকে 'ইঁটের পরে ইঁট', আরেক দিকে মানুষের পর মানুষ—দুদিক থেকে ছুটো

ফুসফুস চেপে ধরেছে। 'সিটি অব প্যালেসেস্' এই গর্বে এককালে যার মাটিতে পা পড়ত না সে-ই তখন হাঁসফাঁস করছে—কোথায় যাবে, কোথায় গিয়ে একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে।

দেখা গেল, তার সব আছে—ধনবল, জনবল, ভোগ্য বস্তুর বিপুল সম্ভার,—অভাব শুধু ঐ এক জায়গায়, হাঁপ ছাড়বার মত একটুখানি ফাঁকা। নিছক বেঁচে থাকবার তাগিদে ঐটিই তখন তার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। কে মেটাবে সেই প্রয়োজন? শহরতলী; তার সব চাহিদা মেটানোই যার একমাত্র দায়। এবার আর কলকারখানা নয়, শুধু খানিকটা খোলা জমি, যেখান থেকে আসবে তার অক্সিজেন, তার প্রাণ-বায়ু। খোঁজ পড়ল, কোথায় আছে সেই জায়গা? উত্তরে হাত দেবার উপায় নেই। সেখানে বিরাট বিরাট কারখানা ফাঁদিয়ে এক-একটা রাজ্য জুড়ে বসে আছেন এ যুগের দুর্যোধন, চেঙ্গিস খাঁ, নাদির শাহের দল। সেখানকার 'সূচ্যগ্র মেদিনী'ও 'বিনাযুদ্ধে' পাবার কথা ভাবা যায় না। যুদ্ধ করতে গেলে তাদেরই জয় অনিবার্য। পশ্চিমে গঙ্গা, তার ওপারেও ঐ একই ইতিহাস। দক্ষিণে খানিকটা ফাঁকা পাওয়া গেল,--কতগুলো খানাখন্দ, পড়ো ডোবা, পাঁক, দাম আর মশকবাহিনীর স্থায়ী আস্তানা,—ঢাকুরিয়া এবং তার আশ-পাশের লোকগুলো যাদের দাপটে বছরের ছ'মাস কাঁথা মুড়ি দিয়ে হিহি করে কাঁপে। তারই উপর কোদাল চালিয়ে সব মিলিয়ে, একটা ভদ্রগোছের জলাশয়ের আকার দেওয়া হল। পৌর-কর্তারা তার পোষাকী নাম দিলেন 'লেক্'। (স্বরাজোত্তর যুগে ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের রবীন্দ্রভক্ত চেয়ারম্যান্ তার আবার নতুন নামকরণ করেছেন—'রবীন্দ্র-সরোবর'।)

কিন্তু এ আর কতটুকু! এতবড় শহরের রাক্ষুসে প্রয়োজনের সিকিভাগও ঐ পুকুরটাতে মিটল না—হলই বা তার নাম রবীন্দ্র-সরোবর। তখন নজর পড়ল পূব দিকে—শেয়ালদা ষ্টেশন ছাড়িয়ে বেলেঘাটার বিস্তৃত এলাকা। সেখানে কলকারখানা নেই, শুধু বস্তির পর বস্তি। তারও তো মালিক আছে। তারা সহজেই রাজী হয়ে গেল। দুটাকা চারটাকা ভাড়া আদায়ের ঝামেলা অনেক। তার চেয়ে একসঙ্গে মোটা হাতে দাঁও মারা। খোলা, টিন আর খাপরার কুড়ে ভেঙে দিয়ে

আর একটা লেক, আর তার চারিদিক ঘিরে বসতি পত্তনের আয়োজন করলেন ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট্। বস্তির ঘরে ঘরে গিজ-গিজ করছে লোক—কারখানার মজতুর নয়, ছানা-পোনাওয়ালা গৃহস্থ। তাদের উপর হুকুম হল—উঠে যাও। কোথায় যাবে? সে প্রশ্নের জবাব দেবার দায় জমিদার বা সরকার কারো নয়। যাও, যেখানে খুশি।

তাদের কথাই বলছিল গোকুল দাস। মাথা থেকে প্রায়—খালি, হালকা ঝাঁকাটা নামিয়ে রেখে রাস্তার ধারে তার অনেকদিনের চেনা এই বটগাছটার শিকড়ের উপর চেপে বসে বিড়ে খুলে খানিক হাওয়া খেল। তারপর বলল, এতগুলো মানুষ, বৌ-ছেলে নিয়ে রাত্তিরটা কাটাতে পারে এমন একটা গাছতলাও খুঁজে নেবে, সে সময়টুকু দিল না। ঘর ছাড়বার আগেই পশ্চিমা কুলীগুলো এসে মেঝের ওপর গাঁইতি মারতে শুরু করল।

—বল কি! বিস্ময়ের সুরে প্রশ্ন করল দিলীপ।

—তবে কি মিথ্যে বলছি? আমি যে নিজের চক্ষে দেখেছি বাবু।

—তারপর? তারা সব গেল কোথায়?

—যেখানে যাবার; এসব মানুষ চিরদিন যেখানে গিয়ে থাকে। এবার উত্তর দিল সামসুল। 'ইতিহাসই তার খোঁজ রাখে না, ও কেমন করে জানবে?'···যাক; এবার আমাদের উঠতে হয়।

বলল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উঠবার উদ্যোগ করল না। গোকুল বোধ হয় মনে মনে একটু লজ্জিত হ'ল। আসন্নসন্ধ্যার ছায়া-ঢাকা মাঠের পানে দু-একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, বুড়ো হলে মানুষ একটু বেশী বকবক করে। তোমরা কিছু মনে করো না, বাবু।

—'না না, মনে করবার কী আছে। প্রতিবাদ জানাল সামসুল। এমনিই বলছিলাম, এবার উঠলে হয়। অনেকটা পথ যেতে হবে তো। তাছাড়া, এসব শোনা মানে মন খারাপ করা। করতে তো কিছুই পারছি না।

—তা না পার, শুনলে; এতেই আমাদের ভালো লাগে। সেইটুকু বা কজন করে বাবু?

দিলীপের উঠতে ইচ্ছা করছিল না। একদিকে ভেঙে ফেলা আরেক দিকে কোনো রকমে টিঁকে থাকা এই বহু-বিস্তৃত বস্তিগুলোর উপর কেমন একটা অলক্ষ্য আকর্ষণ অনুভব করছিল। উঠি উঠি করেও যেন উঠতে পারছিল না।

কী একটা পর্ব উপলক্ষে আজ কলেজে ছুটি ছিল। প্রেসের কাজও বন্ধ। রোদটা একটু কম পড়তেই সামসুলকে ডেকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। অনেক দিন এদিকে আসা হয়ে ওঠেনি। যদিও জানে, আসা বৃথা, এ রকম এলোপাতাড়ি খোঁজারও কোনো মানে হয় না, তবু মন মানতে চায় না। ঘুরতে ঘুরতে বড় রাস্তা থেকে নেমে অনেকদূর ভিতরে চলে এসেছিল। সেই ঝাঁকড়া আমগাছটা যদি আজও দাঁড়িয়ে থাকে। এই বটগাছের কাছাকাছি হঠাৎ গোকুলের সঙ্গে দেখা। ওরা লক্ষ্য করেনি। কত লোকই তো আসছে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে, যদিও এই লোকটি, এবং তার ঝাঁকা ও তার ভিতরকার লোভনীয় বস্তুটির সঙ্গে ওদের পরিচয় কম দিনের নয়, বিশেষ করে দিলীপের। গোকুলও প্রথমটা খেয়াল করেনি। কয়েক পা গিয়ে নজর পড়তেই কলরব করে উঠল, কী সব্বোনাশ! বাবুরা এখানে কী করছ? 'নেক্' দেখতে এয়েছ বুঝি? এই তো সবে মাটি কাটা শুরু হল গো। এখন কি? বছরখানেক যাক, তখন এসো হাওয়া খেতে। কত লোক আসবে। হাঁটতে হবে না এক পা-ও। শহর থেকে সোজা হাওয়া গাড়ি ছুটিয়ে চলে আসবে।

গোকুল গল্প জমাতে জানে। দু-একটা অন্য কথার পর অজানতে কখন চলে এসেছিল সেই পুরনো কথায়—তার নিজের চোখে দেখা এই ভাঙা বস্তির ইতিহাস এবং তারই সঙ্গে জড়িত একদল নিরাশ্রয় মানুষের প্রতিকারহীন দুর্দশা। শুনতে শুনতে সামসুল ও দিলীপ কখন যে সেই একটানা কাহিনীর মধ্যে নিজেদের হারিয়ে ফেলেছিল বুঝতে পারেনি। এক ফাঁকে সামসুল হঠাৎ প্রশ্ন করল, তুমি এখানে কোথায় থাকো?

গোকুল তার ডান হাতটা ভ্রূর উপর রেখে বলল, উই যে দেখছ জোড়া তালগাছ, ওর ঠিক পাশেই আমার ঘর।

—তাহলে তোমাকেও তো একদিন উঠতে হবে।

—সেজন্যে ভাবি না। তার কিছুটা দেরিও আছে। ভাবনা

আমার মার জন্যে। কাল আবার নুটিশ দিয়ে গ্যাছে ব্যাটারা। এদিকে মা কিছুতেই বাসা ছাড়তে চাইছে না।

—'তোমার মা!' একটু বোধহয় বিস্ময়ের সুর লাগল দিলীপের প্রশ্নে। 'তিনি বুঝি তোমার সঙ্গে থাকেন না?'

—'না গো। আমার সঙ্গে থাকবে কেমন করে? মা আমার বামুনের মেয়ে!' বলে, সসম্ভ্রমে যুক্তকর কপালে ঠেকাল। তারপর বলল, আমার গভভোধারিণী মা নয়, তবে তার চেয়েও বেশী। যার হাতের মোয়া খেয়ে খুব তারিফ করছিলে তোমরা। মাকে আমি বলেছি সে কথা। শুনে কী খুশী! আরো বলেছি, জানো মা? ওখানে একজন বাবু আছে; ডাক্তারি পড়ে। সে-ই তোমার মোয়ার সবচেয়ে বড় ভক্ত। ......ঠিক বলেছি কিনা?

বলে দিলীপের দিকে এমন একটি বিশেষ ইঙ্গিত করে হেসে উঠল যেন তার মনের কথাটা ফাঁস করে দিয়েছে। সামসুল সে হাসিতে যোগ দিতে যাচ্ছিল; হঠাৎ বন্ধুর মুখে নজর পড়তেই থেমে গেল। সেখানে যে শুষ্ক ম্লান বেদনার ছায়া ফুটে উঠেছিল, সন্ধ্যার অন্ধকারে সে অস্পষ্ট নয়। কিসের সে ছায়া তাও তার অজানা নয়। এই মোয়ার সঙ্গে যে তার মায়ের স্মৃতি জড়িয়ে আছে, প্রথম দিনই শুনেছিল।

গোকুল ওদের দুজনের মুখের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বিশেষ করে দিলীপকে লক্ষ্য করেই বলল, যাবে নাকি আমার মাকে দেখতে? এই তো কাছেই। মা কিন্তু ভা-রী খুশী হবে তোমাদের দেখলে। আমি সব বলেছি কিনা।

'না থাক', বলে উঠে দাঁড়াল দিলীপ। সামসুলও তাকে সমর্থন করল—হ্যাঁ, আজ আমরা উঠি! আবার যদি আসি, তখন্ তোমার মার সঙ্গে দেখা করে যাবো।

ফিরবার পথে অনেকক্ষণ পাশাপাশি নিঃশব্দে চলবার পর সামসুলই প্রথম কথা পাড়ল! আজকের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই। একেবারে আলাদা প্রসঙ্গ। বলল, সেই ভদ্দরলোকের সঙ্গে আলাপ করলি?

—কোন্ ভদ্দরলোক?

—সেই যে মাষ্টারমশায়ের ঘরে যিনি বসেছিলেন সেদিন? আমিই তো তোকে ডেকে নিয়ে গেলাম।

—ও, সেই প্রফেসর? আলাপ আর কি? উনি এটা ওটা জিজ্ঞেস করলেন, আমি উত্তর দিলাম।

—আমাদের গলির ঠিক ওপারে যে বাড়িটা, ঐখানেই তো থাকেন উনি?

—তাই তো বললেন।

ঐ মেয়েটা তাহলে ওঁরই মেয়ে। কোনো মতলব-টতলব নেই তো? সে রকম কোনো আঁচ পেলি?

দিলীপ হেসে উঠল। সামসুল গম্ভীরভাবে বলল, ব্যাপারটা মোটেই হেসে উড়িয়ে দেবার মত নয়। কিচ্ছু বলা যায় না। আমাদের স্যর তো ঐ মানুষ। বোলচাল দিয়ে কাৎ করে ফেলতে কতক্ষণ!

—তুমি দেখছি দিনের বেলাতেও ভূত দেখতে শুরু করেছ।

—হয়তো তাই। তবে ভূতকে আমার যত না ভয়, তার চেয়ে অনেক বেশী ভয় করি পেত্নীকে। তাদের যে চেনা যায় না। পেশাই হল ছলা-কলা। কখন যে ভুলিয়ে নিয়ে ঘাড় মটকাবে, কেউ জানতে পারবে না। আমার বলবার শুধু ঐটুকু—ওদের সম্বন্ধে হুঁশিয়ার থেকো!

দিলীপ হাসিমুখে বলল, তুমি মিছেমিছি ভয় পাচ্ছ। যা ভাবছ, ওসব কিছুই নয়। নিতান্ত সাধারণ একটা ব্যাপার। ভদ্রলোক প্রফেসর মানুষ, প্রাণে কিছু দয়া-মায়া আছে। যাকে ভাববাদ বলে, তার খানিকটা ছোঁয়াচও হয়তো একেবারে এড়াতে পারেননি। কতগুলো ছেলে-ছোকরা মিলে কী করছে এই গলির মধ্যে—খোঁজ-খবর নিতে গিয়ে যখন জানতে পেরেছেন আমরা কারা, তখন পাড়ার বেশীর ভাগ লোকের মত নাকে কাপড় দিয়ে না পালিয়ে এগিয়ে এসেছেন স্যরকে খানিকটা বাহবা দিতে।

—আর স্যর অমনি গলে গিয়ে তোমাকে নিয়ে হাজির করেছেন, এই দেখুন কি-সব ছেলে আমরা তৈরি করেছি—

খানিকটা ব্যঙ্গের সুরে যোগ করল সামসুল। দিলীপ মনে মনে একটু আহত হল। তবু সহজ সুর বজায় রেখেই বলল, জিনিসটাকে

ওভাবে দেখছ কেন? মাষ্টারমশাই-এর ইচ্ছা, বর্ষ্টাল থেকে বেরিয়ে এসেও আমরা যেন চিরদিন তার লেজুড় হয়ে না থাকি, আমাদের গায়ে যে ছাপ লেগেছিল, সেটা যেন মুছে যায়, বাইরের সমাজের কাঠামোর সঙ্গে নিজেদের যেন খাপ খাইয়ে নিই, যাতে করে একদিন সংসারের অন্য দশজনের মত আমরাও কাজ বা বৃত্তি দিয়েই পরিচিত হতে পারি। অবিশ্যি উনি আমাদের আসল পরিচয়টা কখনো কারো কাছে গোপন করেন না। ঐ প্রফেসরের কাছেও করেননি। ওঁর বিশ্বাস, আমরা যদি মানুষ হতে পারি, সংসারের চোখে আমাদের সে-পরিচয় একদিন লোপ পেয়ে যাবে। ঐখানেই ওঁর ভুল।

বলতে বলতে দিলীপের মুখে একটা ম্লান হাসি ফুটে উঠল।

তখনো ওরা মাঠ ছেড়ে বড় রাস্তায় পড়েনি। নির্জন পথে পাশাপাশি যেমন চলছিল, তেমনি চলতে চলতেই সামসুল দৃঢ়স্বরে বলল, না; অন্য সকলের কথা জানি না। তবে একজনের বেলায় স্যর ভুল করেননি, এটা খুব জোরের সঙ্গে বলতে পারি—বলে, ওর একটা হাত সবলে চেপে ধরল।

দিলীপ ক্ষীণ একটা কাতর শব্দ করে বলল, সে জোরটা মুখেই থাক না বাপু, রোগা মানুষের কব্জির ওপর কেন?

জানিস দিলীপ, সেই হাতে এবার রীতিমত ঝাঁকানি দিয়ে বলল সামসুল, সেই জন্যেই তোকে নিয়ে আমাদের ভয়। তোকে যে অনেক ওপরে উঠতে হবে। সোজা পথ তো নয়। পদে পদে কত বাধা, কত বিপদ। তার চেয়েও বড় ভাবনা কে এসে কখন বাগড়া দেয়। ঐ প্রফেসর একা হলে চিন্তা ছিল না। যত খুশি বাহবা দিন, পিঠ চাপড়ান, ক্ষতি নেই। ওঁকে আমরা ঠেকাতে পারবো। কিন্তু ওঁর মনের মধ্যে যদি আর কিছু থাকে, মানে, সেদিন ওঁর ছাত্রের ওপর যা দেখলাম, সেই জাতীয় কিছু, তাহলে আমাদেরও রুখে দাঁড়াতে হবে।

বলে, সে হঠাৎ থেমে গিয়ে ডান হাতে ঘুষি বাগিয়ে সত্যিই যেন রুখে দাঁড়াল। সেই মূর্তি দেখে দিলীপ হো হো করে হেসে উঠল। তারপর তার ঘুষিপাকানো হাতটা ধরে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, চলো,

চলো। 'ছায়ার সাথে কুস্তি করে' কা হবে? লাভের মধ্যে খালি 'গাত্রে হবে ব্যথা।' লড়তে হয় তো মুখোমুখী লড়বে চল।

কয়েক পা গিয়ে হাতটা ছেড়ে দিয়ে বলল, তবে জেনে রেখে দাও, তার দরকার হবে না। সে রকম কিছু ওঁর মনে নেই। থাকতে পারে না।

—আছে কিনা, তুই কি করে জানবি?

উনি একজন প্রফেসর; শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তোমার আমার ওপর ওঁর মতো লোকের খানিকটা দয়া বা দরদ থাকতে পারে, অধঃপাতে না গিয়ে আমরা একটা কিছু ধরে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছি দেখে মনে এবং মুখে কিছুটা খুশিভাবও দেখাতে পারেন। ব্যস, ঐ পর্যন্ত। তার বেশী আর কী আশা কর তুমি?

—আশা আবার কী করবো! আমি যা করি সেটা আশঙ্কা। সেও শুধু ঐ এক জায়গায়—বলে চোখের ভঙ্গিতে একটা বিশেষ ইঙ্গিত করল সামসুল।

দিলীপের মুখে একটি সলজ্জ আভা ছড়িয়ে পড়ল। মৃদু হেসে বলল, নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর সত্যিই পারা যায় না। ইউ আর ইন্‌করিজিবল্।

বাহাদুর বড় একটা বাইরে যেত না। প্রেস ছুটির পর চাএর পাট মিটিয়ে ওদের আড্ডা জমে। মাঝে মাঝে আশুবাবু এসে বসেন মাঝখানে। গল্প হয়, আলোচনা হয়, কোনো কোনোদিন কোনো সাময়িক পত্র বা বই থেকে সময়োপযোগী কিছু হয়তো পড়ে শোনানো হয়। সন্ধ্যার পর নাইট-স্কুল। লেখাপড়ায় যারা অনগ্রসর, সেই সব ছেলেদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে, ওদের মধ্যে যাদের বিদ্যা একটু বেশী, তারা নিয়মিত ক্লাস করে। সে-সব বিলি-ব্যবস্থার ভার বাহাদুরের হাতে। 'হেড্‌মাষ্টারি' কাজটা তাকেই করতে হয়। পড়ানো, এবং কে কাদের কী পড়াবে তার বন্দোবস্ত করে দেওয়া।

ইদানিং কদিন সন্ধ্যার পর সে অন্য কারো উপর এইসব কাজের ভার দিয়ে ঘণ্টাকয়েকের জন্যে কোথায় যেন যাচ্ছিল এবং মাঝে মাঝে

রাতের খাওয়াটাও বাইরে থেকেই সেরে আসছিল। সেদিন একটু রাত করে ফিরে দিলীপের ঘরে গিয়ে বসল। দিলীপ পড়ছিল। বই থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করতে যাবে কদিন ধরে তাকে পাওয়া যাচ্ছে না কেন, তার আগেই বাহাদুর নিজেই বলল, ওরা আবার কোলকাতায় এসেছে।

—কারা ?

—রণমায়া আর পদম্।

—বদলি হয়ে এসেছেন বুঝি ?

—হ্যাঁ; হা[illegible]দার হয়ে এল আলীপুর পুলিশ লাইনে। কোয়ার্টার এখন খালি নেই। কাছাকাছি একটা বাসা ঠিক করে দিয়েছি। সেই জন্যেই কদিন ঘোরাঘুরি করতে হল। বেশ ভালো বাসা পাওয়া গেছে। মায়ার খুব পছন্দ হয়েছে। তোকে যেতে বলেছে কাল।

—আমাকে। (একটু যেন অবাক হল দিলীপ) কেন ?

—কেন আবার ? এমনিই। তোকে দেখতে চায়। কতবার বলেছে আমাকে। এতদিন বাইরে বাইরে ছিল। এবার এসেই জোর তাগিদ, দিলীপকে নিয়ে এসো।

দিলীপের মুখে একটা সঙ্কোচের ছায়া পড়ল। আমতা আমতা করে বলল, আমি, মানে আমাকে......কদিন পরে বরং......।

—আরে বোকা, মায়ার কাছে তোর লজ্জাটা কী--তুই ওকে দেখিসনি; মেয়েদের দিকে চোখ তুলে চাইলে তো দেখবি? ও তোকে দেখেছে।

—কোথায় ? আরো যেন সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ল দিলীপ। প্রশ্নটা করেই সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিল।

—বর্ষ্টালে থাকতে। ও যখন ছিল, কতবার আমরা দল বেঁধে বাইরে পিকনিক টিকনিক করতে গেছি। তখন দেখেছে। আমি যে তোর সব কথাই ওকে বলেছি। কাল তোর কটা পর্যন্ত কলেজ ?

—চারটা।

—বেশ, তাহলে ঠিক সাড়ে চারটায় বেরোনো যাবে। কেমন ?

উত্তরের অপেক্ষা না করেই বাহাদুর বেরিয়ে গেল।

দিলীপের চেয়ে সামান্য কিছু বড় হবে রণমায়া। আত্মীয় বা

অনাত্মীয় এই বয়সী কোনো মেয়ের সংস্পর্শে দূরে যাক, সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ ওর কখনো ঘটেনি। প্রথমটা তো মাথা তুলতেই পারল না। কথা বলতে গিয়ে ঘেমে উঠল। নিজে থেকে কিছু জিজ্ঞাসা করা পড়ে মরুক সাধারণ প্রশ্নের জবাবগুলোও আটকে আটকে গেল। কিন্তু মেয়েটির কথাবার্তা এমন সহজ, ব্যবহার এমন স্বচ্ছন্দ যে শেষের দিকে দিলীপও তার আড়ষ্টতা অনেকখানি কাটিয়ে উঠল।

একটু আগেই নিজের হাতে পরোটা আর আলুর চোখা করে রেখেছিল রণমায়া। স্বামীকে দিয়ে দু-তিন রকমের মিষ্টিও আনিয়ে রেখেছিল। ঘরের মেঝেতে আসন বিছিয়ে পাশাপাশি ওদের দুজনকে খেতে বসিয়ে দিল। 'খাইয়ে' বলতে যা বোঝায়, দিলীপ তা একেবারেই নয়। তার উপরে এই অনভ্যস্ত পরিবেশের বাধা। দুখানা পরোটা শেষ করতেই তার অনেকক্ষণ লেগে গেল। ততক্ষণে বাহাদুর প্রায় ডজনে গিয়ে পৌঁছেছে এবং 'আরো আরো' করে বোনকে উদ্‌ব্যস্ত করে তুলেছে। এবারে আবার চাইতেই সে তাড়া দিয়ে উঠল, দাঁড়াও; একটু আস্তে আস্তে খাও। তোমার তাড়াহুড়োর জন্যে এ বেচারী মোটেই খেতে পারছে না।

—তা, আমি কি করবো? আমি তো আর কুটুম আসিনি তোর বাড়ি।

—আর ও-ই বুঝি কুটুম? তুমিও যা ও-ও তাই।

—'শুনলি তো?' দিলীপের দিকে ফিরে বলল, বাহাদুর। 'মাথাটা একবার তোল। নাঃ, তুই দেখছি নতুন জামাইকেও হার মানালি। অতো খুঁটছিস কী? খেয়ে নে।

—'তুমি থামো তো'—ঝঙ্কার দিয়ে উঠল রণমায়া তোমার মতো পেটুক নাকি সবাই?

দিলীপের দিকে চেয়ে সস্নেহ সুরে বলল, থাক, তুমি আস্তে আস্তে খাও। ওটা খেতে হবে না; ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আমি দুখানা গরম পরোটা নিয়ে আসি।

দিলীপ ঘন ঘন হাত নেড়ে বলল, না না; আমি আর খেতে পারছি না, বড্ড পেট ভরে গ্যাছে।

—"সে কি! এরই মধ্যে পেট ভরে গেল? তা বললে শুনবো না। আর দুখানা খেতে হবে। আচ্ছা, তরকারীটা ভালো না লাগে, মিষ্টি দিয়ে খাও।"—বলে বড় বড় দুটো মিষ্টান্ন তুলে দিল পাতের উপর।

নিজের হাতে খাবার সাজিয়ে এমনি করে সামনে বসে খাওয়ানো, তাকে উপলক্ষ্য করে এই সস্নেহ অনুযোগ, 'এটা ফেলে রাখলে কিছুতেই শুনবে না' বলে এই জিদ ও জুলুম—তার সবটুকু মাধুর্য নিয়ে দিলীপের স্মৃতির মধ্যে সুপ্ত হয়ে ছিল। আজ দীর্ঘকাল পরে তারই নতুন স্পর্শ সমস্ত অন্তরময় ছড়িয়ে পড়ল। ফিরবার পথে বাহাদুরের সঙ্গে যে দু-একটা কথা হল, সে যেন স্বপ্নের ঘোরে। আগাগোড়া সব পথটাই আচ্ছন্নের মত কেটে গেল। যখন চলে আসে, রণমায়া ওর পিছন পিছন দরজার বাইরে এসে বলেছিল, আবার কবে আসবে?

দিলীপ কী উত্তর দেবে ভেবে না পেয়ে বাহাদুরের মুখের পানে তাকাতেই হেসে ফেলেছিল, দাদার দিকে কী দেখছ? তুমি বুঝি একা আসতে পার না?

বাহাদুর আড় চোখে ওর দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বলল, বোধহয় সাহস করছে না। যদি হারিয়ে যায়?

প্রায় সমবয়সী একটি তরুণীর সামনে এই 'অপমানজনক' উক্তিতে দিলীপ রীতিমত অপদস্থ বোধ করল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানাল, হারিয়ে যাবো মানে? কী বলছ তার ঠিক নেই।

বাহাদুর হো হো করে হেসে উঠল। প্রতিবাদের বহর দেখে রণমায়ারও ভীষণ হাসি পেয়েছিল। কোনরকমে সেটা চেপে রেখে বলল, ওর কথা শুনো না। ও আসুক না-আসুক তোমার যখন সময় হবে, চলে এসো। তোমার কাছে ওখানকার সব গল্প শুনবো। দাদা আমাকে কিছু বলতে চায় না।

'বলতে চাইলেই বা বলি কখন?' জবাব দিল বাহাদুর, 'যতক্ষণ থাকি, তোর বকবকানি শুনেই তো কান ঝালাপালা।'

'বেশ, শুনতে হবে না তোমাকে আমার বকবকানি', চোখ পাকিয়ে তেড়ে উঠল রণমায়া, 'আমি দিলীপ-ভাইয়ের সঙ্গে গল্প করবো। তুমি শীগগিরই আসবে তো?'

দিলীপ ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিল, 'আসবো'। ভারী মিষ্টি লেগেছিল প্রাণচঞ্চলা পাহাড়ী মেয়ের মুখে এই অদ্ভুত সম্বোধন। প্রথম পরিচয়ের দিনে শুধু 'দিলীপ' হয়তো একটু বেমানান হত, শুধু 'ভাই' নিতান্ত মামুলী, দুটো মিশিয়ে এই 'দিলীপ-ভাই' যেন একটা মধুর আবিষ্কার। তার স্বাদটুকু মনে লেগে রইল।

পথে যেতে যেতে বাহাদুর বলেছিল, এখানে এসে বড্ড একা পড়ে গেছে বেচারা। পদম্‌এর একেবারে ফুর্সত নেই, গোটা দিনটাই কেটে যায় পুলিশ লাইনে। দুটো কথা বলতে না পারলে মেয়ের আবার পেট ফুলে ওঠে। তুই মাঝে মাঝে আসিস ভাই। বিকেলটা তো তোর ফাঁকা।

দিলীপ কথা রেখেছিল। সঙ্কোচের বাধা কাটিয়ে 'শীগগিরই' এসেছিল রণমায়ার বাসায়। বাহাদুরের কাজ ছিল, আসতে পারেনি। ও একটু ইতস্ততঃ করছে দেখে তাড়া দিয়ে উঠেছিল, তুই কি চিরদিনই কনেবৌ থেকে যাবি? মায়ার কাছে তোর লজ্জা কিসের?

লজ্জার জড়তা সেদিনও পুরোপুরি কাটেনি। তবে কথাবার্তায় অনেকটা সহজ হয়ে এসেছিল। সে কাজটি অবশ্য বেশীর ভাগই চালিয়েছিল অপর পক্ষ। ভগিনীর এই গুণটি সম্বন্ধে বাহাদুর বিশেষ অত্যুক্তি করেনি। কথন পর্বটা বেশ কিছুক্ষণ একতরফা চালাবার পর হঠাৎ বোধহয় খেয়াল হল, এ বিষয়ে অতিথিকেও কিঞ্চিৎ সুযোগ দেওয়া দরকার। যেন নিজের আচরণে নিজেই অবাক হয়ে গেছে এমনিভাবে ডান গালের উপর তর্জনী রেখে বলে উঠল, ও মা? আমি করছি কী! সেই তখন থেকে নিজেই কেবল বকে মরছি। তুমি তো কিছুই বলছ না?

—'আমি শুনছি', মৃদু হেসে বলল দিলীপ।

—শুনছো না আরো কিছু। আমার কাণ্ড দেখে মনে মনে হাসছ।

—না, না, হাসবো কেন? বেশ লাগছে; বিশেষ করে আপনার এই বাংলা বলার ধরণটা।

—'কী করবো ভাই', হতাশার সুরে বলল রণমায়া, 'বাংলাদেশে

জন্ম, চিরটাকাল সেখানেই আছি, তবু এই পাহাড়ী টানটা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারলাম না।'

—সেই জন্যেই বোধহয় আরো মিষ্টি লাগে। নেপালীর মুখে বাংলা কথা আমি এর আগেও শুনেছি। কেমন যেন কানে লাগে। বাহাদুরদার কথা বলছি না। ও বাঙালীর চেয়েও ভালো বাংলা বলে। আপনার টানটা একটু আলাদা, কিন্তু অপূর্ব।

কথাটা বলে ফেলেই দিলীপ লজ্জিত হল। অজ্ঞাতসারে একটু বেশী উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে ফেলেছে। নিজের কানেই সেটা অশোভন মনে হল, বিশেষ করে যেখানে মাত্র দুদিনের পরিচয়। ক্ষমা চাইবে কিনা ভাবছে, এমন সময় রণমায়া বলল, আমাদের সম্বন্ধে তুমি গোড়াতেই একটু ভুল করে বসে আছ, ভাই। আমরা নেপালী নই, বাঙালী। কয়েক পুরুষ আগে হয়তো নেপাল থেকে এসেছিলাম। চেহারায় তার ছাপ রয়ে গেছে। কিন্তু আসলে আমরা বাংলা দেশের লোক। দার্জিলিংএর কাছেই আমাদের দেশ।

দিলীপ বড়ই অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। কী বললে যে তার ভুল ধারণার ত্রুটি স্বীকার করা হবে সহসা ভেবে পেল না। রণমায়া হাসি মুখেই বলল, এবার বুঝেছি ; এই জন্যেই তুমি আমাকে পরপর মনে করছ ; কথা বলতে গিয়ে বাধো বাধো ঠেকছে।

—না, না ; তা নয়। আপনি বোধহয় জানেন না, বাহাদুরের চেয়ে আপনারজন আমার আর কেউ নেই।

—'জানি ভাই', এবারে একটা গাম্ভীর্যের ছায়া পড়ল রণমায়ার মুখের উপর, 'জানি বলেই তো তোমার ওপর আমার এত জোর। তোমরা যখন বর্স্টালে ছিলে, দাদার কাছে আমি সব শুনেছি। সেই দুঃসময়ে ওরও এক তুমি ছাড়া আপনজন কেউ ছিল না।'

ক্ষণকাল দুজনেই নীরব। হয়তো দুজনেরই চিন্তা-স্রোত একই ধারায় বয়ে গিয়ে সেই বহু ঘটনাসঙ্কুল পুরানো দিনের পারে গিয়ে লাগল। তারপর যেন অকস্মাৎ এক ঝটকায় নিজেকে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল রণমায়া। যেতে যেতে বলল, বসো, তোমার জন্যে চা নিয়ে আসি।

দিলীপের চা-এর অভ্যাস ছিল না। মিনিট কয়েকের মধ্যে রণমায়া খাবারের ডিস আর চা-এর পেয়ালা নিয়ে এঘরে যখন দেখা দিল, দ্বিতীয় বস্তুটি সম্বন্ধে মৃদু আপত্তি জানাতেই সে সঙ্গে সঙ্গে সেটা নাকচ করে দিল। বলল, একবার খেয়েই ছাখ না। আমার শ্বশুরমশাই চা-বাগানে চাকরি করেন। আমার জন্যে দু-একটা বিশেষ রকম বাছাই-করা স্যাম্পল প্যাকেট পাঠিয়ে থাকেন মাঝে মাঝে। সেই চা। হালকা করে বেশী দুধ দিয়ে করেছি। খেলে কোনো অপকার হবে না। তাছাড়া—

একটুখানি থেমে আবার বলল, দিদি হাতে করে দিলে খেতে হয়।

দিলীপ আর কোনো কথা না বলে হাসিমুখে পেয়ালা তুলে নিল।

মাস কয়েক পরে একদিন বিকাল বেলা ঠিক ঐখানটিতে বসেই চা-এর কাপে প্রথম চুমুক দিয়ে দিলীপ অপ্রসন্ন মুখে বলে উঠল, উঁ; আজও তুমি অনেক দুধ দিয়ে ফেলেছ মায়াদি। এমন সুন্দর চা-টাই মাটি।

—ও—ও; তার মানে এরই মধ্যে বেশ খোর হয়ে উঠেছ, দেখছি।

—তবে কি চিরটাকাল দুগ্ধপোষ্য শিশু বানিয়ে রাখতে চাও?

—আসলে তো তুমি তা-ই।...হাসি-হাসি মুখে বলল রণমায়া।

—কী রকম? দিলীপের কণ্ঠে তীব্র প্রতিবাদের সুর।

—তা বৈকি? একটা এক ফোঁটা মেয়ের ভয়ে জড়সড়। শুধু দূর থেকে হাহুতাশ, কাছে গিয়ে দাঁড়াবার কিংবা একটা কথা বলবার সাহস নেই।

—নাঃ; আজই ফিরে গিয়ে বাহাদুরের সঙ্গে একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলতে হবে।

—ওমা, সে কী! সে বেচারা আবার এর মধ্যে এল কোত্থেকে?

—সে-ই তো কি সব আজেবাজে খবর দিয়ে তোমার মাথাটা ভর্তি করে রেখে গ্যাছে।

—ভুল করছ। সে যা বলেছে, সে আর কতটুকু। তার চেয়ে অনেক বেশী বলেছ তুমি।

—'আমি বলেছি!' রীতিমত আকাশ থেকে পড়ল দিলীপ

—মুখ ফুটে কিছু বলনি, বলেছে তোমার চোখ, তোমার মুখের ওপরকার ছায়া। সেটা লুকোতে পারনি। আমার যে মেয়েমানুষের চোখ, ভাই।

—তাহলে বলবো, ওসব মেয়েমানুষের কল্পনা।

রণমায়া মুখে কোনো প্রতিবাদ করল না, শুধু একটু হাসল। তারপর বললে, যাক গে, গলির ওপারের নতুন খবর কি, বল।

—জানি না।

—জানো না!

—আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর জেনে কী লাভ? অনধিকার-চর্চা বৈতো নয়।

—কে বললে তুমি আদার ব্যাপারী? কে বললে ওখানে তোমার অনধিকার?

—বলবে আবার কে? আমি নিজেই জানি। কোথায় কতটুকু আমার প্রাপ্য, কদ্দুর পর্যন্ত আমার সীমানা, আমি না জানলে জানবে কে?

—আবার তোমার সেই পুরনো বাজে কথা। জানো, ওগুলো আমি একেবারেই সইতে পারি না?

—তবু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওগুলো তুমিই তো টেনে আনো।...যাক গে; এবার অন্য কিছু বল। কোথায় গিয়েছিলে সেদিন? আমরা দুজনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফিরে গেলাম।

রণমায়ার কানে বোধহয় এ কথাগুলো পৌছল না। কিছুক্ষণ একটানা জানালার বাইরে তাকিয়ে থেকে এদিকে ফিরে বলল, তোমার ঐ কথাগুলো আমি মনে মনে ভেবে দেখেছি দিলীপ। আমার কী মনে হয় জানো?

—কী?

—ওটা তোমার অহঙ্কার।

দিলীপের বিস্ময়ের সীমা রইল না। প্রতিবাদ করবার শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলল। যন্ত্রচালিতের মত শুধু আবৃত্তি করল, অহঙ্কার!

—হ্যাঁ; নিজের দাম নিজে কষবার, নিজের বিচার নিজে করবার অহঙ্কার।

দিলীপ এবার হেসে ফেলল। তারপর বলল, মাষ্টারমশাই ঠিক উল্টো কথা বলেন। তাঁর ধারণা নিজেকে আমি বড় ছোট করে দেখি, আমার আত্মবিশ্বাস নেই।

—কী জানি? আমার যা মনে হয়েছে, তাই বললাম। আমি তো তোমাদের মত ইস্কুলে যাইনি, লেখাপড়াও জানি না। তবে এই বয়সে অনেক দেখেছি, অনেক ঘা খেয়েছি। তার থেকে একটা জিনিস শিখেছি। নিজের সম্বন্ধে কোনো অভিমান রাখতে নেই। তাতে শুধু কষ্ট পাওয়াই সার, আর কোনো লাভ হয় না।

দিলীপ দুচোখ ভরা বিস্ময় নিয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল। এই স্বল্প-শিক্ষিতা পাহাড়ী মেয়েটিকে যেন আজ আবার নতুন করে আবিষ্কার করল। এর অগাধ স্নেহের পরিচয় সে আগেই পেয়েছে, কিন্তু নানা অবস্থাবিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে, নানা ঘাটের জল খেয়ে, বিপদ, দুঃখ, অভাব ও লাঞ্ছনার পাঠশালায় যে কঠোর শিক্ষা ওকে এতদিন ধরে সঞ্চয় করতে হয়েছে, তার দামও কম নয়।

দিলীপের একাগ্র বিস্মিত দৃষ্টির দিকে নজর পড়তেই রণমায়া মনে মনে লজ্জিত হল। ওর চোখে পাছে সেটা ধরা পড়ে যায়, তাই হালকা সুরে অন্য কথা পাড়ল। বলল, চুপ করে গেলে যে? ভাবছ, কী লেকচারটাই না দিতে পারে মায়াদি।

—সেটা আবার নতুন কথা কী হল, যে ভাবতে হবে? কী বল দিলীপবাবু?

বলতে বলতে ঘরে ঢুকল পদম্ বাহাদুর। অন্য সময় হলে রণমায়া এর একটা উপযুক্ত জবাব না দিয়ে ছাড়ত না। কিন্তু এই মুহূর্তে, স্বামীর এই অসময়ে ঘরে ফেরার মধ্যে যে চমক ও আনন্দ ছিল, সব মনটা সেইদিকেই চলে গেল, তার ঐ ফোড়নটা আর গায়ে মাখল না। খুশি ও বিস্ময়ের সুরে বলে উঠল, তুমি! আজ এত সকাল সকাল যে?

পদম তার কারণটা না ভেঙে স্ত্রীকে তাড়া দিয়ে বলল, 'নাও, নাও, শীগগির তৈরী হয়ে নাও। দিলীপবাবু, তুমিও চল।' বলে, সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ে ব্যস্তভাবে হাতঘড়ির দিকে তাকাল।

—কোথায়? জানতে চাইল দিলীপ।

—কোথায়, এখনো বুঝতে পারছ না? মড়া ঘেঁটে ঘেঁটে মনটাকেও মরার দাখিল করে তুলেছো, দেখছি। মাঝে মাঝে একটু টনিক-ঠনিক দিও বেচারাকে।...চল, একটা খুব ভালো ছবি এসেছে পিকচার প্যালেসে। তিনখানা পাশ পাওয়া গেল।

—আপনারা যান, আমার নাইট ডিউটি আছে।

—আহা, নাইট ডিউটি তো নাইটে। এটা হচ্ছে ইভনিং শো, ছটা থেকে নটা।

সিনেমার নামে রণমায়ার চোখে মুখে তখন খুশির জোয়ার উপচে পড়ছে। সে-ও স্বামীর সঙ্গে যোগ দিয়ে দিলীপকে দলে টানবার চেষ্টা করল—চল না? একটা দিন নাইট ডিউটি না করলে আর কী ক্ষতি হবে?

—'ক্ষতি তো নয়ই', মাথা নেড়ে জোর দিয়ে বলল পদম্ বাহাদুর, 'অন্ততঃ কয়েকটা লোকের উপকার হবে। যে-রুগীগুলো নির্ঘাৎ মরত, তারা আর একটা দিন বেঁচে থাকবে।'

দিলীপও হাসি মুখে সায় দিল, তা মন্দ বলেননি, তবে আমরা এখনো অতটা উঁচুতে উঠতে পারিনি। যাক, আমি এবার চলি।

পদম্ বাহাদুর স্ত্রীর দিকে চেয়ে তারস্বরে কলরব করে উঠল, এ কি? তুমি এখনো দাঁড়িয়ে আছ? বিলকুল বরবাদ করবে দেখছি। এদিকে টাইম রয়েছে কুল আধঘন্টা, আর শাড়ির ভাঁজ ঠিক করতেই তো লেগে যাবে তিন কোয়ার্টার।

রণমায়া পেছপাও হবার পাত্রী নয়। জোড়া ভ্রূ বাঁকিয়ে দুচোখে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে তেড়ে উঠল, কবে আমার তিন কোয়ার্টার লেগেছে, শুনি?

'ঠিক!' স্বর নামিয়ে গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলল পদম্, 'আমারই ভুল হয়েছে। তিন কোয়ার্টার নয়, একঘন্টা।'

'যাও! আমি কখ্খনো যাবো না।' বলে, এখান থেকেই চাবির গোছা বাঁধা আঁচলটা হাতে নিয়ে দুমদাম করে পা ফেলে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

পিছনে মিলিত কণ্ঠের হাসির রোল।

—চৌদ্দ—

ঋতুচক্রের বিরাম নেই। বছর ঘুরে শরৎ আবার ফিরে এল। সার্পেনটাইন লেনের গলির মধ্যেও যথানিয়মে পৌঁছল এসে তার নিঃশব্দ পদসঞ্চার। আকাশে বাতাসে 'পুজো' 'পুজো' গন্ধ। ছাপাখানার একটানা ঘর্ঘর শব্দ ছাপিয়ে ছেলেদের মনে মনেও সেই আসন্ন উৎসবের সুর বেজে উঠেছে। অন্য বছরের তুলনায় এবার উৎসাহের মাত্রাটা কিছু বেশী। গঙ্গার ওপারে 'গুরুদেবের' আশ্রমে ঘটা করে পুজোর আয়োজন চলেছে। উদ্যোক্তা ওখানকার জেলেরা। মা গঙ্গা তাদের উপর মুখ তুলে চেয়েছেন। ইলিশের মরসুমটা খুব ভালভাবে উৎরে গেছে। 'বাবাঠাকুর'-এর নতুন ব্যবস্থায় তার পুরো লাভটাই ওদের হাতে এসেছে, আগেকার দিনে যার মোটা অংশ চলে যেতে মহাজনের কবলে। কমিটি সর্ব-সম্মতভাবে সমবায় তহবিল থেকেই কিছু টাকা পূজা-ভাণ্ডারে দান করেছে।

বারোয়ারী দুর্গোৎসব। বাবাঠাকুরের আশ্রমের আঙিনায় হোগলাপাতার ছাউনি দিয়ে মন্দির তৈরী হবে। এখন থেকেই তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে। গান-বাজনার ব্যবস্থাও আছে। গ্রামেই একটা পুরানো যাত্রার দল ছিল। এককালে নাম-ডাকও কম ছিল না। পুজোপার্বনে, বিয়ে, পৈতা অন্নপ্রাশনে এখানে সেখানে বায়না হত। বেশ কিছুদিন ধরে তাদের আর সাড়াশব্দ নেই। একরকম উঠে যাওয়ার মত। দেশব্যাপী অভাব—অন্নবস্ত্রের, স্বাস্থ্যের, আনন্দের। জীবনযাত্রার তাড়না 'যাত্রার' প্রেরণাকে টিঁকে থাকতে দেয়নি। আজ জেলেপাড়ার অবস্থা কিছুটা ফিরে যাওয়ায় তারাই এগিয়ে এল, সেই মুমূর্ষুকে যদি আবার বাঁচিয়ে তোলা যায়।

তখনকার দিনের সেই সব বাঘা বাঘা অভিনেতারা—ভীম, মেঘনাদ, জনা ও মহিষাসুরের দল—প্রায় সকলেই অকালেই বিদায় নিয়েছেন। দু-চারজন যাঁরা এখনো টিঁকে আছেন, তাঁরাও দুর্যোধনের

মত ভগ্নউরু, কিংবা ভীষ্মের মত শরশয্যায় শয়ান। সেদিনের গ্রামীণ সংস্থায় এরা ছিল পল্লবিত পরগাছা। সমাজবৃক্ষের স্কন্ধে ভর করে তারই দেহ থেকে যথেচ্ছ রস আহরণ করে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটিয়ে দিত। জীবিকার ভাবনা ভাবতে হত না। কিন্তু পরনির্ভর হলেও সে জীবনে কোনো অমর্যাদা ছিল না। যা পেত, তার বিনিময়ে তারাও কিছু দিত। তাদের প্রধান কাজ ছিল সেই আশ্রয়দাতা বনস্পতির অলঙ্করণ, নানাভাবে তার আনন্দবিধান। কালক্রমে এবং অবস্থা বৈগুণ্যে পরগাছা একদিন জঞ্জাল হয়ে দাঁড়াল। গাছ তাদের কাঁধের উপর থেকে মাটিতে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলল, চরে খাওগে যাও। সে বিদ্যা তারা শেখেনি। তাই তিল তিল করে শুকিয়ে মরে গেছে।

জেলেপাড়ার সব সমস্যাতেই বাবাঠাকুর ভরসা। এ ব্যাপারেও ছেলে-বুড়ো সবাই মিলে তাঁর কাছে গিয়ে ধর্ণা দিল। মুখপাত্র অর্জুন মালো বিরষমুখে জানাল, সবই ঠিক ছিল, শুধু এক 'মোশন মাষ্টারের' অভাবে যাত্রার আয়োজন পণ্ড হতে বসেছে।

মৈত্রমশাই হেসে বললেন, 'ও বিদ্যে তো আমার জানা নেই। তোমাদের পাল্লায় পড়তে হবে জানলে না হয় শিখে আসতাম।'

কমবয়সীর দল হো হো করে হেসে উঠল। এক-ধমকে থামিয়ে দিল অর্জুন। তারপর দাঁতে জিভ কেটে জোড়হাত করে নিবেদন করল, বাবাঠাকুরকে দিয়ে মোশন-মাষ্টারি করাবার উদ্দেশ্য নিয়ে তারা আসেনি, তাঁর এখানে কত রকম বাবু আসেন; তাদের মধ্যে দু-একজন থিয়েটারওয়ালা কি জুটবে না? নেহাৎ না পাওয়া গেলে তাঁরা কেউ বাইরে থেকেও জুটিয়ে আনতে পারনে। রোজ না হলেও চলবে। মাঝে মাঝে দু-চারদিন এসে গলাটা, হাত-পা-চোখ-মুখের ভঙ্গিগুলো কোথায় কি রকম হবে, দেখিয়ে-শুনিয়ে দিলে বাকী সব তারা ঠিক করে নিতে পারবে।

মৈত্রমশাই একটু ভাবলেন। তারপর যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এমনিভাবে বললেন, হ্যাঁ, লোক আছে আমার হাতে। একেবারে পাকা লোক। তোমাদের কিছু ভাবতে হবে না।

সেইদিনই আশুবাবুর ডাক পড়ল। জরুরি ডাক। তিনি হন্তদন্ত

হয়ে ছুটে এলেন। গুরুদেবের শরীরটা ইদানিং ভাল যাচ্ছিল না। সেই রকম কোনো আশঙ্কাই ছিল তাঁর মনে। ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকতেই গুরু বললেন, ওহে মাষ্টার, তুমি তো এককালে বর্ষ্টালে বাঁদর নাচাতে শুনেছি।

আশুবাবু এ জাতীয় প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। খানিকটা থতমত খেয়ে বললেন, আজ্ঞে?

—আহা তোমার সেই ছেলেগুলোকে নিয়ে কি সব নাটক-টাটক করতে না?

—আজ্ঞে হাঁ। তা করতাম মাঝে মাঝে।

—এবার এই বুড়োগুলোকে নিয়ে কর।...কই হে কোথায় গেলে তোমরা?

দলের পাণ্ডাদের আগেই খবর দেওয়া ছিল। বাইরে অপেক্ষা করছিল। এবার হুড়মুড় করে ঢুকে পড়তেই বললেন, এই নাও তোমাদের মোশন মাষ্টার।

ঘোষসাহেবের আমলে বর্ষ্টালে বছরে দু-তিনবার ছোটখাটো নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হত। সেখানেও ছেলেদের 'সেকেণ্ড স্যর'কে না হলে চলত না। এ বিষয়ে ওঁর খানিকটা দক্ষতাও ছিল। জেলেপাড়ার যাত্রার দলে এবার তার পরীক্ষা দেবার প্রয়োজন দেখা দিল। সপ্তাহে দুদিন এসে ওদের তালিম দিতে শুরু করলেন।

'প্রেস'-এ যখন খবরটা পৌঁছল, ছেলেরা মাষ্টারমশাইকে ধরে বসল, আমরা দেখতে যাবো না স্যার?

—'যাবি বৈকি? খালি পুজো আর যাত্রা শোনা নয়, অষ্টমীর দিন দুপুরবেলা আমাদের সকলের'—বলে চোখ টিপে মাথা নেড়ে একটা বিশেষ ইঙ্গিত করলেন।

'তাই নাকি!' হৈ হুল্লোড় করে বেরিয়ে গেল দলটা। যারা জানে না, এতবড় খবরটা তাদের তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দেওয়া দরকার।

ফার্ষ্ট এম-বি পরীক্ষার ফল অন্য সকলের মনঃপূত হলেও দিলীপ নিজে তেমন খুশী হতে পারেনি। আরো ভালো করবার ইচ্ছা ছিল।

তার জন্যে যতটা পড়াশুনোর প্রয়োজন তা সে করেনি। ইচ্ছা করে করেনি, তা নয়, করতে পারেনি। বাদ সেধেছে তার মন। পাশের বাড়ির ছাদের উপরকার ঐ নিষিদ্ধ এলাকায় সেই অবাধ্য মনের গোপন আনাগোনা অনেকবার চোখ রাঙিয়েও সে বন্ধ করতে পারেনি। অথচ কিছুদিন থেকে সেখানে কেউ নেই। তবু সেই একদা নিঃশব্দচারিণী শূন্য ছাদের উপর থেকে ছুটে আসা দমকা হাওয়ার মত অলক্ষ্যে কখন এসে তার ভাবনা-চিন্তাগুলোকে এলোমেলো করে দিয়ে যায়, সে জানতেও পারে না।

গলিপথ দিয়ে যেতে আসতে ঐ বিশেষ বাড়িটির দিকে রোজই তার নজর পড়ে। রোজই দেখতে পায় ভিতর থেকে দরজা বন্ধ। ভাবতে গিয়ে তার মধ্যেও সে একটা বিশেষ তাৎপর্য আবিষ্কার করেছে। এগিয়ে যেতে যেতে অনেক দিন মনে হয়েছে ঐ রুদ্ধকপাট, অন্যের কাছে যা-ই হোক, তার কাছে একটা অলঙ্ঘ্য নিষেধের প্রতীক। ওর উপরে অদৃশ্য অক্ষরে লেখা আছে—'না'। ভাবতে ভাবতে আবার নিজের মনেই হেসে ফেলেছে। একি অদ্ভুত ছেলেমানুষি তাকে পেয়ে বসল! ঐ একটা বাড়ি তো নয়, সব বাড়িতেই দরজা বন্ধ। কোলকাতা শহরে এটাই সাধারণ নিয়ম। কতরকমের অচেনা লোক চলেছে রাস্তা দিয়ে। চুরি ডাকাতির ভয় আছে। সদর খুলে রেখে কোনো গৃহস্থই নিশ্চিন্ত হতে পারে না। তার প্রয়োজনটাই বা কী?

চিন্তাটা তখন অন্য পথ ধরত। দেখতে দেখতে যেত, কোনো বাড়ির বাইরের দরজা খোলা আছে কিনা। একটা দুটো যে চোখে না পড়ত তা নয়। সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা ম্লান ছায়া পড়ত মনের উপর।

একদিন সকাল সাড়ে নটায় কলেজ যাবার পথে ঐ সতের বাই চার নম্বর বাড়ির সামনে আসতেই দিলীপ নিজের অজানতে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। কপাটের গায়ে একটা মস্ত বড় তালা ঝুলছে। বুকের ভিতরটা নড়ে উঠল। কোথায় গেলেন এঁরা! অন্য কোথাও উঠে গেলেন, না এ শুধু কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে যাওয়া? হয়তো এখনই এসে পড়বেন। কিন্তু এই সহজ সম্ভাবনাটা মন কিছুতেই মেনে নিতে

পারল না। চলে গেছেন, এই বিশ্বাসই দৃঢ় হয়ে দেখা দিল। তার জানালার ওপারে যে আকাশ, সেখানে আর কোনোদিন ঊষার উদয় ঘটবে না। আগাগোড়া সবখানি জুড়ে রইল শুধু অন্ধকার। এতদিন তার চোখের সুমুখে দাঁড়িয়ে ছিল যে স্বপ্নলোক, সেখানে আর তার প্রবেশের পথ রইল না। সে সিংহদ্বার চিরদিনের তরে রুদ্ধ হয়ে গেল। তারই অক্ষয় সাক্ষী ঐ তালাটা। আজ থেকে প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় ঐখানে বসে সেই রূঢ় সত্য তাকে নীরবে স্মরণ করিয়ে দেবে।

প্রথমে গভীর নৈরাশ্যে তারপর দুরন্ত অভিমানে দিলীপের সমস্ত অন্তর মথিত হয়ে উঠল—যাবার আগে একটি বার জানিয়ে গেলে কী দোষ ছিল? সে তো পথরোধ করে দাঁড়াত না। সে অধিকার তার নেই, সে অন্যায় দাবি সে কোনোদিন জানাতে যায়নি। শুধু ঐ ছাদের কার্ণিসের পাশে দাঁড়িয়ে শেষবারের মত বলে যাওয়া—আমি যাচ্ছি। মুখ ফুটে যদি না-ও বলত, তবু ঐখানটিতে এসে একবার দেখা দেওয়া। এর বেশী আর কোনো আকাঙ্ক্ষা তার নেই, আর কোনো প্রত্যাশাও মনে মনে কখনো পোষণ করেনি।

এই অর্থহীন অভিমানে যখন দুচোখ ফেটে জল আসতে চাইছিল, তখন একথা একবারও মনে হয়নি, কার উপরে এই অভিমান, কী সম্পর্ক তার সঙ্গে, তার কাছ থেকে এইটুকুই বা সে আশা করে কোন্ অধিকারে।

চলে গেছে—মনে মনে স্থির জেনেও সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে, পারছে কৈ? মাঝে মাঝে তারই মধ্যে আবার একটু ক্ষীণ আশা দেখা দেয়, হয়তো কোথাও বেড়াতে গেছে, কদিন পরে আবার আসবে। কে বলতে পারে কোথায় গেছে, কবে আসবে? কাকে জিজ্ঞাসা করা যায়? মাষ্টারমশাই নিশ্চয়ই সব জানেন। ঐ প্রফেসর ভদ্রলোক তো মাঝে মাঝে আসতেন ওঁর কাছে, উনিও কদিন গেছেন। পাড়া ছেড়ে চলে যাবার আগে পরিচিত প্রতিবেশীকে জানিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও করা হল না। কী মনে করবেন স্যর? যদি হঠাৎ প্রশ্ন করে বসেন, 'কেন, ওঁদের খবর জানতে চাইছ কেন?' কী উত্তর দেবে সে?

রণমায়ার কাছেও অনেকদিন যাওয়া হয়নি। নিজের এই বিক্ষত হৃদয়টাকে নিয়ে কোথাও আর তার যাবার মুখ নেই। ঐ মেয়েটার তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টির সামনে কিছুক্ষণ বসতেও সে ভয় পায়। ধরা পড়ে যাবার ভয়। কে জানে, যে বেদনা শুধু তারই, যাকে সে সংগোপনে লালন করে চলেছে আপন অন্তরের অন্তঃস্থলে, তারই ছাপ হয়তো ফুটে উঠেছে মুখের উপর। মায়াদি যদি বুঝতে পারে, সে লজ্জা সে রাখবে কোথায়? কিন্তু দিনের পর দিন এই নিঃশব্দ বহনের যন্ত্রণাও কম নয়। এর চেয়ে সামান্য একটু আভাসও যদি কারো কাছে দিতে পারত, হয়তো এ গুরুভার এত দুঃসহ মনে হত না। একথা মুখ ফুটে না হলেও, নীরবে যাকে বলা যায়, এমন একজন মানুষই তার জানা আছে। সে রণমায়া।

পৌঁছনোমাত্রই দীর্ঘ অনুযোগের রাশ খুলে দিল রণমায়া—এতকাল পরে দয়া করে চোখের দেখাটা না দিলেই হত, মুখ্যু দিদির বকবকানি লেখাপড়া-জানা ভাইয়েরা কবে আর সহ্য করে থাকে, সে অভাগীরও যে মন বলে একটা বালাই আছে, সেটা আবার খারাপ হতে পারে ইত্যাদি। আরও খানিকক্ষণ চলত। দিলীপ তার আগেই ধমকের সুরে বলল, এবার থামবে না উঠবো?

—আচ্ছা, ঝগড়াটা এখনকার মতো ধামাচাপা দিলাম। কিন্তু ব্যাপারটা কী বল দিকিন? অসুখ-বিসুখ যে করেনি সে খবর দাদার কাছ থেকেই জেনেছি। তবে অসুখটা তো শুধু শরীরের নয়। কি বল?

চাপা হাসিভরা একটি অর্থপূর্ণ অপাঙ্গ দৃষ্টি দিলীপের মুখের উপর গিয়ে থামল। উত্তরে যে সলজ্জ মৃদু হাসিটি আশা করা গিয়েছিল তা পাওয়া গেল না। রণমায়ার মুখেও এবার দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ল। আর একটু কাছে সরে এসে ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে বলল, আমাকে বলবে না?

—কী বলবো, মুখ তুলে ম্লান হাসি হেসে উত্তর দিল দিলীপ।

—ও বাড়ির খবর কী?

—কোন্ খবর জানতে চাও?

—'সব খবর'। সব কথাটায় বেশ খানিকটা জোর দিয়ে বলল রণমায়া।

—'সব'এর প্রথম নম্বর হল, সদরে তালা বন্ধ।

—ও, এই ব্যাপার? তা কদিনের জন্যে হয়তো কোথাও গেছে।

—হবে।...নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল দিলীপ।

—কিন্তু কোথায় গেছে, কবে ফিরবে, এসব কিছু জানতে পারনি?

—দরকার? বাজে খবর নেবার মতো যথেষ্ট সময় আমার হাতে নেই।

রণমায়া মুখ টিপে হাসল। পরক্ষণেই উঠে পড়ে বলল, আচ্ছা, সে খোঁজ আমি দাদাকে দিয়ে নেওয়াচ্ছি।

—কেন, তোমারই বা এত গরজ কিসের?...তিক্তকণ্ঠে বলল দিলীপ। তার মধ্যে উষ্মার সুরও চাপা রইল না।

গরজ আছে বৈকি? তুমি একটু মাথা ঠাণ্ডা করে বসো। আমি চা করি। এবারে খুব ভালো চা পাঠিয়েছেন শ্বশুরমশাই।

বলতে বলতে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

একে অতি উৎকৃষ্ট জাতের সুগন্ধি চা, তার উপরে রণমায়ার হাতের তৈরী। কয়েক চুমুকে, কোনো রকমে গলাধঃকরণ করবার বস্তু নয়। একটু একটু করে উপভোগ করতে হয়। কতকটা সে জন্যেও বটে এবং বিশেষ করে তার ব্যক্তিগত কারণে দিলীপের চা-পান ধীর ও নিঃশব্দ গতিতে চলেছিল। রণমায়াও অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলেনি, এবারে হাতের মগটা (পেয়ালায় তার কুলাত না) নামিয়ে রেখে বলল, আচ্ছা, তোমরা আর ওরা তো এক জাত, তাই না?

হঠাৎ এই অসংলগ্ন প্রশ্নে দিলীপ একটু চমকে উঠল। বলল, কাদের কথা বলছ?

—বুঝতে পারছ না? তোমাদের ঐ প্রফেসর গো।

—কে বললে এক জাত?

—বাঃ, ওঁরাও তো বামুন।

—হ্যাঁ, সেদিক দিয়ে এক। কিন্তু 'জাত' কথাটার অন্য মানে আছে। ওঁদের আর আমার মধ্যে আকাশ পাতাল তফাত।

—সেটা আবার কী?

—তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমায় কপালের এই কালো দাগটা। তাতেই আমি ওঁদের থেকে, ওঁদের কেন, সৎ এবং ভদ্র মানুষের জাত থেকে আলাদা হয়ে গেছি।

রণমায়া সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গেল। শুষ্ক এবং কিছুটা রুক্ষ স্বরে বলল, থাক; ওসব কথা আমি শুনতে চাই না।

—'জানি' ম্লান হাসির সঙ্গে ধীরে ধীরে বলল দিলীপ। 'এতে তুমি কষ্ট পাও। তাই আমিও বলতে চাই না। কিন্তু যা সত্য তাকে আর কদিন ঠেকিয়ে রাখবে। একদিন না একদিন মেনে নিতে হবেই।'

—না, আমি কোনোদিন মেনে নেবো না। সকলের কথা আমি জানি না, জানতে চাইও না। আমি আমার দাদাকে জানি, আর জানি তোমাকে। সেই সঙ্গে একথাও জানি তোমাদের কপালে কোনো দাগ লাগেনি, লাগতে পারে না।

দিলীপ প্রতিবাদ করল না। মৃদু হেসে চুপ করে রইল।

পরের সপ্তাহে বিকালের দিকে দিলীপ কলেজ থেকে ফিরছিল। বাড়ির কাছাকাছি পেঁ ৗছে পিছনে মোটরের হর্ণ শুনে রাস্তার ধার ঘেঁষে চলতে চলতে লক্ষ্য করল, গাড়িটা আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে সতেরর চার বাড়ির সামনে সশব্দে ব্রেক্ কষল। কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে এগিয়েই চমকে উঠল। এত কাছে একেবারে মুখোমুখী দেখা হয়ে যাবে, এক মুহূর্ত আগেও ভাবতে পারেনি। গাড়ি থেকে বেরিয়ে সেও থমকে দাঁড়িয়েছিল। চকিত দৃষ্টিতে এক পলক তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। দিলীপের বুকের ভিতরে তখন যে তোলপাড় শুরু হয়েছে, তাতে করে, কোন্ পথে পালাবে তৎক্ষণাৎ স্থির করে উঠতে পারল না। ততক্ষণে প্রফেসর নেমে পড়েছেন। ওর দিকে নজর পড়তেই বিস্ময় ও আনন্দের সুরে বললেন, আরে, দিলীপ যে? কী খবর তোমাদের?

দিলীপ ঘাড় নেড়ে কোনো রকমে উচ্চারণ করল—'ভালো', কিন্তু আওয়াজ এত ক্ষীণ যে তার নিজের কান অবধিও বোধহয় পেঁ ৗছল না। ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'কলেজ থেকে ফিরছ বুঝি?' তেমনি ক্ষীণ কণ্ঠে 'হ্যাঁ' বলে চোখের পাতা একটু তুলতেই আরেকজনের সঙ্গে

চোখোচোখি হয়ে গেল। মনে হল, পাতলা ঠোঁট দুখানিতে যেন চাপা হাসি ফুট্‌ব ফুট্‌ব করছে।

প্রফেসর তখন মালপত্রের দিকে নজর দিয়ে বললেন, তুমি একদিন এসো, বুঝলে? যখন তোমার সুবিধে। আমার তো এখন ছুটি চলছে।

'আচ্ছা' বলে তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হয়ে এ পক্ষও যেন পালিয়ে বাঁচল। ফিরে তাকাবার দুর্দম লোভ মনেই চেপে রাখতে হল। একবার ভাবল, গুরুজন-স্থানীয় ব্যক্তি, ডেকে আলাপ করলেন, একটা প্রণাম কিংবা অন্ততঃ নমস্কার করে আসা উচিত ছিল। কিন্তু সেজন্যে এখন আর ফিরে যাওয়া যায় না। সে সাহসও মনের মধ্যে খুঁজে পেল না।

আশুবাবুর ঘরে যেদিন প্রথম আলাপ, দিলীপ তখনই বুঝেছিল, প্রফেসর লোকটি সহৃদয় ও স্নেহশীল। সেইদিনই ওকে যেতে বলেছিলেন। আজ আবার বললেন। কিন্তু পিতার আহ্বানে কন্যার সমর্থন আছে কি? থাকবেই যে এমন কোনো কথা নেই। না-থাকাই স্বাভাবিক। এ তার পক্ষে নিতান্ত দুরাশা মাত্র। উন্মুখ মনের কোনো পরিচয়ই তো সেখান থেকে পাওয়া যায়নি। ছাতের এদিকটা সে যেমন করে এড়িয়ে গেছে, তার মধ্যে বরং বিমুখ রূপটাই প্রকাশ পেয়েছে বেশী। তারপর দীর্ঘদিন কেটে গেছে। আজ অকস্মাৎ ঐ চমকিত এবং তারপরে ঐ অধরলগ্ন স্নিগ্ধ হাসিটি কোনো নতুন বার্তা নিয়ে এল কিনা কে জানে? কিংবা, ঐ দুটোই হয়তো অর্থহীন। চোখের তারায় ছিল শুধু হঠাৎ-দেখার বিস্ময়, আর হাসির রেখায় নিছক কৌতুক।

আসলে যাই থাক, অনেক দিন পরে পাওয়া ঐ দুটি দুর্লভ বস্তু, যে মন যুক্তি মানে না, তর্ক করে না, তারই একটা গোপন কোণে অকাতরে মধুবর্ষণ করতে লাগল।

দু'তিন দিন পরে দিলীপ প্রেস্‌-এর অফিস ঘরে বসে কাজ করছিল। মাষ্টারমশাই একটু আগে বেরিয়েছেন। বাহাদুর এসে বলল, কলেজ থেকে কাল একটু সকাল সকাল আসিস। সন্ধ্যে লাগিয়ে দিসনে যেন।

—কেন? কী করতে হবে? খাতা থেকে মাথা না তুলেই বলল দিলীপ।

—মায়ার ওখানে যেতে হবে। রাত্তিরে যেতে বলেছে, তোকে আমাকে আর সামসুলকে।

দিলীপ এবার মুখ তুলল, 'একেবারে তিনমূর্তি একসঙ্গে? ব্যাপার কী বল দিকিন?'

—সে সব কিছু ভাঙ্‌লে তো? খালি বলল, সকাল সকাল এসো। কাজ করতে হবে।

—সামসুলকে বলেছ?

—এখন যাচ্ছি বলতে।

বেরোবার একটু আগে তৈরী হবার তাগিদ দিতে দিয়ে দেখা গেল সামসুল নেই। নানাজনকে জিজ্ঞাসা করা হল। কোথায় গেছে কেউ বলতে পারল না। এদিকে সময় হয়ে গেছে। আর দেরি করলে রণমায় রণমূর্তি ধরবে। অগত্যা তাকে রেখে যাওয়াই স্থির হল। কেশবের উপর ভার রইল, যখনই ফিরুক যেন সঙ্গে সঙ্গে রওনা করে দেয়। এক টুকরা কাগজে ঠিকানাটা লিখে দিয়ে বাহাত্তুর চিন্তান্বিত মুখে চিলেকোঠায় দিলীপের ঘরে গিয়ে বলল, চল, আর দেরি করা যায় না।

দিলীপ জামাটা টেনে নিয়ে পরতে পরতে বলল, ও রাজী হয়েছিল তো?

প্রথমটা হয়নি। তারপর যখন বুঝিয়ে বললাম, না গেলে বোন কী মনে করবে, তখন বলল, আচ্ছা।

—মায়াদিকে সব বলেছ ওর কথা?

—'সব' আর কি? মেয়েছেলের কথা শুনলেই ও যে-সব লেকচার দেয়, তাই একদিন কথায় কথায় বলে ফেলেছিলাম। তখন থেকেই মায়ার ইচ্ছা, ওকে একদিন নিয়ে যাই।

চুল আঁচড়াতে গিয়ে হাত-আরশিটা তুলতে যাবে হঠাৎ দিলীপের নজরে পড়ল একখানা চিঠি; উপরে বাহাত্তুরের নাম। ওর হাতে দিয়ে বলল, এই নাও।

—কী ওটা? বলে, বাহাত্বর ভাঁজ করা কাগজখানা খুলে পড়ে ফেলল। তারপর নিঃশব্দে এগিয়ে ধরল দিলীপের দিকে। দিলীপ মনে মনে পড়ল—

ভাই বাহাত্বর,

আমার কথা তুমি হয়তো সব জান না। দিলীপ জানে। ঘটনাটা সামান্য, কিন্তু আমার জীবনে তার ফলাফল, এবং যে শিক্ষা তার থেকে পেয়েছি, কোনোটাই সামান্য নয়।

ছেলেবেলায় যে আমাকে হাত ধরে পাপের পথে নামিয়েছিল, সে একটি মেয়ে। তারপর সুযোগ বুঝে সে দিব্যি হাত-পা ধুয়ে উপরে উঠে গেল, আর আমি পাঁকের মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খেতে লাগলাম। আমার বাপ মা, আত্মীয়স্বজন থানা আদালত এবং পেছনে দাঁড়িয়ে গোটা ত্বনিয়াটা সেইখানেই আমাকে চেপে রেখে দিল। তাকে ভুলতে পারিনি, সেই সঙ্গে তার জাতটাকে। পথে, ঘাটে, ঘরে, বাইরে যেখানে যত মেয়ে দেখি, সকলের মুখেই আমি সেই একটা মুখ দেখতে পাই। যুক্তি দিয়ে বুঝি, এ আমার ভুল দেখা। একজনকে দিয়ে সকলের বিচার হয় না। কিন্তু আমার এ চোখ ত্বটোকে তো উপড়ে ফেলতে পারি না। তারা আমার যুক্তি মানে না।

সেই চোখ নিয়ে আর যেখানেই হোক্ তোমার বোনের সামনে দাঁড়ানো যায় না।

তোমরা আমাকে ক্ষমা ক'রো।

তোমাদের সামসুল।

চিঠিটা শেষ করে নিজের টিনের সুটকেসের মধ্যে বন্ধ করতে করতে দিলীপ বলল, ও যে যাবে না, আমি আগেই জানতাম।

—কিন্তু মায়াকে কী বলবো!

বললেই হবে, অসুখ করেছে। আর আসলেও তো তাই। এখানে আমরা যারা আছি তার মধ্যে ও-ই বোধহয় সব চেয়ে অসুখী।

নিমন্ত্রণের আসল উপলক্ষ্যটা ওখানে পৌঁছেই বোঝা গেল! ঐ দিনটা ছিল ভাইফোঁটা। তারই আয়োজন করেছিল রণমায়া। আগে থেকে বললে 'চমক' চলে যায়, তাই বলেনি।

কাছাকাছি দুতিনটি বাঙালী পরিবারে রণমায়ার যাতায়াত ছিল, এবং ওর মত মেয়ের পক্ষে ভাব জমাতে দেরি হয়নি। কথাপ্রসঙ্গে তাদেরই কারো কাছ থেকে কদিন আগে এই অনুষ্ঠানের নাম ও বিবরণ সে জানতে পারে। এই উৎসবের অন্তর্নিহিত সুরটি তার মনে দোলা দিয়েছিল। ভাইবোনের সম্পর্ক যে কত গভীর তার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি রণমায়ার জীবনে যেমন করে ঘটেছে, তেমন কজনের ঘটে? আজ তার চারদিকে যা কিছু, সকলের মূলে ঐ একটি মাত্র মানুষ—তার দাদা। মাকে সে দেখেনি বললেই হয়। যে-মেয়ে শিশুকালেই মাতৃহারা, তার কাছে বাপ একটা অস্তিত্ব মাত্র, শুধু ভরণপোষণের উৎস, তাও অনেক সময় নিশ্চিত নয়। এ নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। মাকে হারাবার পর বাপকে আরো বেশী করে পেয়েছে, তেমন মেয়েও নিতান্ত দুর্লভ নয়। তারা পরম ভাগ্যবতী। রণমায়া সে ভাগ্য নিয়ে জন্মায়নি। বরং বিমাতার অন্তরালে পিতার অস্তিত্বটাও তার কাছে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। সেই দুর্দিনে চরম সর্বনাশের কবল থেকে যে তাকে রক্ষা করেছিল সে তার দাদা, যার নিজের অবস্থা তখন বোনের চেয়েও অসহায়। কিন্তু সে কথা সে একবারও ভাবেনি। অন্ধের মত কোনো দিকে না তাকিয়ে দুস্তর সঙ্কটের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সে বিপদসঙ্কুল আবর্ত কাটিয়ে তীরে পৌঁছবার সম্ভাবনা সেদিন একবারও দেখা যায়নি। তারপর দিনের পর দিন বহু ঝড়ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়ে একদিন এই নিরাপদ তটরেখার সাক্ষাৎ মিলেছিল। এর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে একটি সহায়-সম্বলহীন ছেলের একটানা একক সংগ্রাম। সব দুঃখ সে একা বুক পেতে নিয়েছিল, বোনের গায়ে তার আঁচটুকুও লাগতে দেয়নি।

সেই দাদার জন্যে সে কিছুই করতে পারেনি। কীই বা করবে? মনে মনে অনেক কিছু ইচ্ছা থাকলেও সামর্থ্যে কুলায় না। বোন না হয়ে ভাই হলেও না হয় পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারত। পরঘরী মেয়ের সে সুযোগও নেই। মাঝে মাঝে ডেকে পাঠিয়ে ও যা ভালবাসে তেমন দুএকটা জিনিস রান্না করে খাওয়ানো, ঐ নিয়ে একটু হৈচৈ করা—এর বেশী আর সে কী করতে পারে? কদিন আগে তার নতুন পাতানো সই ও-বাড়ির ঐ বৌটির কাছে ভাইফোঁটার গল্প শুনে হঠাৎ মাথায় চাপল

সেও ওদের মত ভাইফোঁটার উৎসব করবে। নতুন জামা কাপড় পরিয়ে বাঁহাতের কড়ে আঙুলে চন্দন দিয়ে তিলক পরিয়ে দেবে দাদার কপালে, বলবে, যমের তুয়ারে পড়ল কাঁটা। তারপর শাঁখ বাজাবে, উলু দেবে, মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে নত মুখে ধীরে ধীরে তুলে নেবে তার পায়ের ধুলো। এমন সুন্দর, কাব্যময়, মধুর অনুষ্ঠান! ভাবতেও আনন্দে বুক ভরে ওঠে। একটি একটি করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে কিসের পর কি করতে হবে সব কিছু জেনে নিয়েছে সই-এর কাছে। তাতেও খুশী নয়; দরজা বন্ধ করে তার সামনে বসে মহড়ার আয়োজন করল একদিন, 'আচ্ছা সই, ধর তুমিই যেন আমার দাদা। ত্মাখ তো ঠিক মতো হচ্ছে কিনা।'

এই উদ্ভট প্রস্তাব শুনে 'সই' তো হেসেই অস্থির। কিন্তু রণমায়া ছাড়বার পাত্র নয়। তখন বলল, দাঁড়াও; ঠিক ঠাক হয়ে বসি আগে?

কথা হচ্ছিল রণমায়ার শোবার ঘরে খাটের উপর বসে। এক লাফে উঠে পড়ল মেয়েটি, আঁচলটা শক্ত করে কোমরে জড়াল। তারপর মেঝের উপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসে, বুক ফুলিয়ে তু হাতে গোঁফে তা দিতে দিতে গলাটা যদ্দুর সম্ভব গম্ভীর করে বলল, জলদি কর।

তুই সখীর মিলিত কণ্ঠের উচ্চ হাসিতে ঘর ভরে উঠল।

উৎসবের আয়োজন করতে গিয়ে রণমায়ার মনে হল, ফোঁটা শুধু দাদার প্রাপ্য নয়, ছোট ভাইও সমান অধিকারী। তাছাড়া, দিলীপকে বাদ দিয়ে কোনো উৎসবই কল্পনা করা যায় না। তার সঙ্গে ওর যে সম্পর্ক সে শুধু আজকের নয়, বর্ষ্টালের বাসায় সেই চরম তুঃখের দিনে এই ছেলেটিকে তুএকবার দূর থেকে দেখেই মনে মনে অন্তরঙ্গ আপনজন বলে গ্রহণ করেছিল। দাদার মুখে তার কথা এত শুনেছে যে, তখন থেকেই নিজেকে তার দিদির আসনে বসিয়ে রেখেছিল। তার পর এখানে এসে আস্তে আস্তে সে একান্ত কাছটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। আজ 'মায়াদি' শুধু তার দিদি নয়, নিকটতম বন্ধু। ওর ঐ বুদ্ধি-দীপ্ত প্রশস্ত কপালে চন্দন পরিয়ে চিরদিনের তরে সেই সম্পর্কের স্বীকৃতি দেবে রণমায়া।

ঐ সঙ্গে আরেকজনকে ডাকতে হবে। সামসুল। ওদেরই বন্ধু,

কিন্তু তার কাছে কখনো আসেনি। ছেলেটির সম্বন্ধে সে বিশেষ কিছু জানে না। কথায় কথায় দাদা একদিন বলেছিল, মেয়েমানুষ জাতটা ওর দুচক্ষের বিষ। কথাটা নেহাৎ ঠাট্টাচ্ছলেই বলেছিল বাহাদুর। তার থেকে রণমায়ার মনে হয়েছিল, হয়তো কোনো সর্বনাশী বিষ-পাত্র হাতে করেই এসেছিল ওর কাছে। সে রকম মেয়ের তো অভাব নেই সংসারে ও বেচারা কিছু না জেনে সরল মনে সেই বিষ সুধা বলে পান করেছিল সেই জ্বালা ওর চোখ দুটোকে ঝলসে ধাঁধিয়ে দিয়ে গেছে। এই অদেখা অচেনা ছেলেটির জন্য ভারী মমতা হল রণমায়ার। ওকে একবার কাছে পেলে চেষ্টা করে দেখত, ঐ দৃষ্টিটাকে বদলে দেওয়া যায় কিনা, ওর ঐ বিষজর্জর মনের উপর একটুখানি স্নিগ্ধ প্রলেপের স্পর্শ কতখানি কাজ করে। একদিন দুদিনে হবে না; সময় লাগবে। রণমায়ার মনে হল, এ যেন তারই কাজ। শুধু বাহাদুরের বোন, দিলীপের দিদি বলে নয়, নারী হিসেবে এটা তার বিশেষ দায়। একটি মেয়ে যে ক্ষতি রেখে গেল, আর একটি মেয়েকেই তার পূরণের ভার নিতে হবে। এই ভাইফোঁটা দিয়েই হোক তার শুভারম্ভ।

দাদাকে বলল, ওকে কিন্তু আনা চাইই।

বাহাদুরের মুখে সন্দেহের সুর, 'সে কি আসবে?'

—আসবে না মানে? বলো, আমি তাকে বিশেষভাবে নেমন্তন্ন করছি।

বাহাদুর ও দিলীপ ঘরে ঢুকতেই রণমায়া ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, এই বুঝি তোমাদের সকাল সকাল! তারপরই রাস্তার দিকে চেয়ে বলল, সামসুল আসেনি?

বাহাদুর জবাব না দিয়ে খানিকটা বিব্রত দৃষ্টিতে দিলীপের দিকে তাকাল। সে ভারী গলায় বলল, তার শরীরটা তেমন ভালো নেই।

রণমায়া সঙ্গে সঙ্গে কেমন গম্ভীর হয়ে গেল, তার সঙ্গে একটু যেন অন্যমনস্ক। এ প্রসঙ্গে আর কোন কথা তুলল না। শরীর ভালো নয় শুনেও কোনো উদ্বেগ প্রকাশ করল না। ভিতরে যেতে যেতে বলল, তোমরা জামাটামা খুলে ভালো হয়ে বসো। আমি এখনি আসছি।

ভিতরের বারান্দায় পাশাপাশি তিনখানা আসন পেতে রেখেছিল, তার একখানা তুলে ফেলল। রান্নাঘরে তিন প্রস্থ থালাবাটি নামানো হয়েছিল। একটা থালা এবং কয়েকটা বাটি সেখান থেকে সরিয়ে রেখে বাকীগুলোয় খাবার সাজাতে বসেছে, এমন সময় বাহাদুর এসে পিছনে দাঁড়িয়ে বলল, হঠাৎ এত খাওয়াবার ধূম যে? মামা হচ্ছি নাকি আমরা?

—যাও, তোমার তো খালি ঐ ভাবনা……বলতে বলতে লাল হয়ে উঠল রণমায়া। ঠিক সেই সময়ে দই মিষ্টি হাতে পদম্ এসে দাঁড়াতেই বাহাদুর চোখের ইঙ্গিতে তাকেও ঐ একই প্রশ্ন করল, ব্যাপার কী পদম্?

—না হে, না। সে-সব কিছু নয়।

—তবে?

—এটা হচ্ছে তোমাদের ব্যাপার। মানে—

—এই, এখন বলবে না, তর্জনী তুলে চোখ পাকিয়ে স্বামীকে তাড়না করল রণমায়া।

—বেশ, বলবো না। এগুলো নেবে, না হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকবো?

রণমায়া হাসিমুখে উঠে এসে ওর হাত থেকে জিনিসগুলো নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, লিষ্টি মতো সব এনেছ তো?

—একটা জিনিস বেশী এনেছি।

—কী?

— বলবো কেন?

—না বললে। আমি যেন আর খুলে দেখতে পারি না।

—'দাদার খুব পছন্দ হবে।' বস্তুটি যেন অত্যন্ত লোভনীয় এমনিভাবে বলল পদম্।

—কী, বল না?

—লাড্ডু।

—দিল্লীকা? বলে, উল্লসিত হয়ে উঠল বাহাদুর।

—নেহি, দার্জিলিংকা।

দুজনের উচ্ছ্বসিত হাসি। রণমায়া সে হাসিতে যোগ দিল না। মুখ বেঁকিয়ে বলল, দূর, আজকের দিনে ও সব বাজে জিনিস ওদের পাতে দিতে আছে?

—কী আজকে, তাই তো বলছিস না—এবারে রীতিমত অসহিষ্ণুভাবে বলে উঠল বাহাদুর।

—এখ্খনি দেখতে পাবে। যাও, দিলীপকে নিয়ে এসো।

তার নির্দেশমত বাহাদুর ও দিলীপ পাশাপাশি আসনে বসবার পর, রণমায়া পিলসুজের উপরে সাজানো ঘিয়ের প্রদীপটা জ্বেলে দিল, ধুনচিতে আগুন দিয়ে খানিকটা ধুনো আর গুগ্গুল ফেলে দিল তার মধ্যে। তারপর উঠে গিয়ে শোবার ঘরের ভিতর থেকে দু-প্রস্থ ধুতি ও চাদরের জোড় হাতে করে ফিরে এসে প্রথমে দাদার কাছে গিয়ে বলল, 'হাত পাতো।' বাহাদুর হতভম্বের মত তাকিয়ে রইল। রণমায়া ধমকে উঠল, 'নাও না?' তখন ভয়ে ভয়ে হাত বাড়াল। চোখ দেখে মনে হল, এ রকম ধাঁধার কবলে সে কখনো পড়েনি। দিলীপের হাতে জোড়টা তুলে দিতেই সে বলল, আজ বুঝি তোমার ভাইফোঁটা? আগে বলনি কেন?

—আগে আবার কী বলবো!

—কিন্তু ভাইদের যে খালি হাতে আসতে নেই।

—বেশ তো, বড় হও, মানুষ হও। তখন দিও না কত দেবে? আমার পাওনা তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না।

পদম্ বাহাদুর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। এবার বলল, আমি যতদূর শুনেছি, এ ব্যাপারে দেবার কথা শুধু বোনেরই। ভায়েরা নিয়েই খালাস।

—তাই কি? সন্দেহের সুরে বলল দিলীপ, 'ছেলেবেলায় একবার মাত্র দেখেছি আমার এক বন্ধুর বাড়ি। ঠিক মনে নেই।'

—'যা আছে, তাই একটু আমাকে বুঝিয়ে দেতো ভাই। অসহায়ভাবে বলল বাহাদুর, 'কী যেন বললি? ভাইফোঁটা?'

—হ্যাঁ; এবার চুপ করে বসো দিকিন, শাসনের সুরে বলল রণমায়া, একটুও নড়বে না কিন্তু।

বাহাদুর আর দ্বিরুক্তি না করে ধ্যান-মৌন বুদ্ধের মত নিশ্চল হয়ে বসে রইল। রণমায়া একে একে দুজনের কপালে চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দিল। দিলীপ ওর পায়ের দিকে হাত বাড়াতেই ছিটকে পিছিয়ে গেল। জিভ কেটে বলল, ছিঃ ছিঃ, তুমি যে ব্রাহ্মণ।

—হোলামই বা। তুমি তো দিদি।

রণমায়া কোনো উত্তর দেবার আগেই বাহাদুর বলে উঠল, আমি তো বাবা ব্রাহ্মণ নই। আমাকে ওর পায়ে হাত দিতে হবে নাকি?

সকলে সরবে হেসে উঠল। রণমায়া কাছে সরে এসে তিরস্কারের সুরে বলল, কী কথার ছিরি? ওতে আমার পাপ হয়, জানো না? দাও, পাটা বাড়িয়ে দাও।

বাহাদুর এক গাল হেসে সাড়ম্বরে পা দুটো বাড়িয়ে দিল। রণমায়া নত হয়ে প্রণাম করতেই সস্নেহে তার পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, হয়েছে, হয়েছে। এবার যা; খাবার-টাবার কি করেছিস নিয়ে আয়। চন্দনের ফোঁটায় তো আর পেট ভরে না।

আর এক দফা হাস্যরোলের মধ্যে রণমায়া রান্নাঘরের দিকে পা বাড়িয়ে বলল, পেটুক কোথাকার!

ভোজের আয়োজন একটু ব্যাপক ধরণের ছিল বলে ভোজনপর্বটা মিটতে সময় লাগল। পদম্ বাহাদুর আর দাঁড়াল না। পরদিন সকালে তার আই-জি'র ইনসপেকশন, ব্যস্তভাবে বিদায় নিয়ে চলে গেল। বাহাদুর বসে বসে হাঁসফাঁস করছিল। এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল—'একটু গড়িয়ে নিতে পারলে হত।' রণমায়া মুখ টিপে হেসে বলল, যাও না? বিছানা তো করাই আছে।

বাহাদুর দিলীপের দিকে ফিরে বলল, তুই কী করবি?

—বসবো; আমার ঠিক তোমার মত অবস্থা নয়। মায়াদি, তুমি খেয়ে এসো। ততক্ষণ আমি এই ছবির বইএর পাতা ওলটাচ্ছি।

—তার চেয়ে ও পাশে চল না? খেতে খেতে গল্প করা যাবে।

—বেশ, তাই চল।

বাহাদুর আগেই 'গড়াতে' চলে গিয়েছিল। দিলীপ গিয়ে বসল ভিতর দিকের বারান্দার কোণে।

রণমায়া একটা ছোট মত কাঁসিতে সামান্য কিছু ভাত তরকারি নিয়ে এসে তার কিছুটা দূরে মেঝের উপরেই বসে পড়ল। দিলীপ সেই পাত্রটার দিকে এক নজর চেয়ে নিয়ে বলল, ওকি! ঐটুকুন খাও নাকি তুমি?

—আর কত খাবো?

—তার মানে, আমার সামনে বসে খেতে লজ্জা করছে।

—নিশ্চয়ই; অত বড় একজন কত্তাব্যক্তির সামনে লজ্জা করবে না? ওসব বাজে কথা রেখে ও-বাড়ির খবর কী, বল।

—এমন কী খবর আছে যা তুমি জানো না? হ্যাঁ; একটা নতুন খবর আছে। ওঁরা ফিরে এসেছেন।

—'বল কি!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রণমায়া, 'এত বড় ঘটনাটা চেপে যাচ্ছিলে?'

দিলীপ নীরবে হাসতে লাগল। রণমায়া নিজের মনে খানিকটা কি ভেবে নিয়ে বলল, ভাবছি, আমি একদিন ওর সঙ্গে আলাপ করে আসবো।

—তুমি!

—হ্যাঁ; দোষ কি? গিয়ে কী পরিচয় দেবো, ভাবছ তো? বলবো, আমি দিলীপের দিদি।

—তাহলে তো খুব চিনবে!

—চিনবে না মানে? গেলে দেখা যাবে, শুধু নাম নয়, সেই সঙ্গে নাড়ি-নক্ষত্র পর্যন্ত তার জানা হয়ে গেছে।

দিলীপের আনত মুখের উপর মুহূর্তের তরে একটা অস্পষ্ট ম্লান ছায়া ঘনিয়ে এল। পরক্ষণেই মাথা তুলে বলল, ওসব কথা থাক। তোমার মাথায় এই ভাইফোঁটা চাপল কি করে বল দিকিন।

—সে এক মজার ব্যাপার।······বলে, রণমায়া তার সই-ঘটিত কাহিনীটি সবিস্তারে বর্ণনা করল। বলতে বলতে এই হৃদয়স্পর্শী অনুষ্ঠানটির সমস্ত মাধুর্য তার কণ্ঠে এবং চোখে-মুখে ফুটে উঠল। তারপর এক সময়ে থেমে গিয়ে আনমনা অপলক চোখে তাকিয়ে রইল দিলীপের মুখের পানে। দিলীপও শুনতে শুনতে খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। সহসা সজাগ হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কী ভাবছ?

—ভাবছি না ; দেখছি, কী চমৎকার মানিয়েছে তোমাকে। চন্দন আর কপালের রং এক হয়ে মিশে গেছে ।

দিলীপ লজ্জিত হল এবং প্রসঙ্গটা তাড়াতাড়ি চাপা দিয়ে বলল, কই, তুমি খাচ্ছ কই ?

রণমায়া সে প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না। হয়তো শুনতেই পায়নি। সেই একই ভাবে তাকিয়ে থেকে বলল, নিজের সম্বন্ধে কী মিথ্যা ধারণাই না করে বসে আছ ভাই। ঐ কপালে কখনো কালির দাগ লাগতে পারে ?

দিলীপ হাসল ; মৃদু কিন্তু অবিশ্বাসের হাসি। এই অগাধ-বিশ্বাসপরায়ণা স্নেহময়ী মেয়েটির উপর হয়তো কিছুটা অনুকম্পাও প্রকাশ পেল তার মধ্যে। রণমায়ার চোখে তার কোনোটাই পড়ল না। নিজের দৃঢ় প্রত্যয়ে অটল থেকে খানিকটা যেন আপন মনে বলে গেল, এ তো শুধু একটা চন্দনের ফোঁটা নয় ; দেবতার নাম নিয়ে আঁকা মঙ্গল-চিহ্ন। কালির স্পর্শ যদি লেগেও থাকে কোনোদিন, ওরই তলায় তা ঢাকা পড়ে গেছে।

এমন কিছু ছিল সেই ভাবগভীর ধীর কণ্ঠস্বরে, দিলীপের কানে যেতেই তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। তর্ক বা প্রতিবাদের কথা ভুলে গিয়ে সে শুধু নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল।

—পনেরো—

সন্ধ্যা হতে কিছুটা দেরি আছে। কলেজ থেকে ফিরবার পর আর কোথাও না বেরিয়ে দিলীপ আফিসে গিয়ে বসেছিল। কিছু প্রুফ্ জমে গিয়েছিল। সেগুলো শেষ করে মুলতবী চিঠিপত্রের ফাইলটা টেনে নিতেই আশুবাবু বললেন, ওসব থাক না? সারাদিন খেটে-খুটে এলে. রাত্রে আবার পড়া আছে। এখন খানিকটা ঘুরে এসো।

—আজ আর ঘুরতে ইচ্ছে করছে না।

—কদিন থেকেই তো দেখছি, কলেজ সেরে এসেই কাজ নিয়ে বসছ। বিকেলবেলাটা একটু না বেরোলে শরীর টিকবে কেন?

'এই এবার উঠবো', বলে, দিলীপ ঐ প্রসঙ্গে আর কোনো কথাবার্তার সুযোগ না দিয়ে দত্ত এণ্ড সুর কাগজ কোম্পানীর একটা চিঠি সম্পর্কে কয়েকটি দরকারী বিষয় উত্থাপন করল। আশুবাবু ফাইলটা দেখতে চাইলেন, এবং খানিকক্ষণ আলোচনার পর মীমাংসার পথ বাৎলে দিলেন। সে-ও সেই অনুসারে উত্তরের খসড়া তৈরী করতে বসল।

আরো কিছুক্ষণ পরে তখনকার মত কাজ শেষ করে যখন উঠবার আয়োজন করছে, আশুবাবু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, প্রফেসর ব্যানার্জির ওখানে গিয়েছিলে?

দিলীপ দৃশ্যত চমকে উঠল। কোথায় যাওয়া যায় ভাবতে গিয়ে এই মুহূর্তে ওঁদের কথাই তার মনে হয়েছিল। রণমায়া নেই। কিছুদিন হল শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে। সেখানে তার শাশুড়ীর অসুখ। কদিন থেকে মার কথা বারবার মনে পড়ছিল। ভেবে রেখেছিল, মোয়াওয়ালা গোকুল দাস এলে, তার সঙ্গে বন্দোবস্ত করে ঐ অঞ্চলটা আরেক বার ঘুরে দেখবে। যে-মহিলাটিকে সে 'মা' বলে, যাঁর কাছে ওকে নিয়ে যাবার জন্যে সেদিন অত করে পীড়াপীড়ি করেছিল, তাঁর জন্যেও মনের কোণে কেমন একটা অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করছিল। ভাবছিল, আবার যদি বলে, বুড়োর 'মা'কে একবার দেখে আসবে। কিন্তু অনেকদিন

হয়ে গেল গোকুল আসেনি। এটা মোয়ার সময় নয়। এদিকটায় খৈ-মুড়ির চাহিদাও হয়তো তেমন নেই। কিংবা বুড়ো মানুষ, অসুখ-সুখও করে থাকতে পারে।

মনটা যখন ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল, ধরবার মত সামনে কিছু পাচ্ছিল না, তখন হঠাৎ পাশের বাড়িটা তার স্মৃতিপথে ভেসে উঠল। প্রফেসর ব্যানার্জি নিজে থেকে যেতে বলেছিলেন, না যাওয়া উচিত হয়নি কিন্তু 'যাব' বললেই কি যাওয়া যায়? প্রফেসর তো একা থাকেন না। যদি আর কারো সামনে পড়তে হয়? ছিঃ ছিঃ, কী মনে করবে! নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করল, মনে করার কী আছে? সে তো আর কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে যাচ্ছে না। যাচ্ছে একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে। তাও সেধে যেচে নয়, গৃহকর্তার অনুরোধে।

তবু, যুক্তির জোর যতই থাক, পা দুটোয় ঠিক ততটা জোর পাচ্ছিল না। উঠতে গিয়েও ভাবছিল, আজ থাক।

এই দোটানার ভিতর থেকে মাষ্টারমশাই তাকে টেনে তুললেন। বললেন, এখনই একবার ঘুরে এসো না?

—এখনই?

—দোষ কি? কদিন থেকে ওঁর শরীরটাও ভালো নেই। প্রতিবেশী হিসেবে আমাদের খোঁজ-খবর নেওয়া উচিত।

সদর দরজা যথারীতি বন্ধ। দু'একবার ইতস্ততঃ করে কড়া নাড়তেই একটি বয়স্ক গোছের চাকর এসে খুলে দিল এবং দিলীপ কোনো কথা পাড়বার আগেই বলে উঠল, ওপরে চলুন; বাবু শুয়ে আছেন।

—ওপরে যাবো!

—তাতে কি হয়েছে? বাবু যে নীচে নাবছেন না।

—তাহলে তুমি বরং একবার জিজ্ঞেস করে এসো। আমি—।

—বলতে হবে না। আমি চিনি। আপনি তো ও-বাড়ির ডাক্তারবাবু।

দিলীপ হেসে ফেলল, কে বললে আমি ডাক্তারবাবু?

—আমি জানি। দিদিমণি বলেছেন।

দিলীপের মুখের উপর কে যেন একমুঠো আবীর ছিটিয়ে দিল। তারপর কী হল কে জানে? রক্তাভ স্নিগ্ধতা মিলিয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে ফুটে উঠল কঠিন গাম্ভীর্য। চোয়ালের পেশীগুলো হঠাৎ যেন শক্ত হয়ে গেল। এটা কি বিদ্রূপ না উপহাস? কিংবা তাকে নিয়ে চাকরের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিহাস-কৌতুক! ইচ্ছা হল, তখনই ফিরে যায়। হঠাৎ নজরে পড়ল চাকরটা তার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। এই লোকটার সামনে নিজের এই অসংযত ভাবান্তরে মনে মনে লজ্জিত হল. তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বলল, চল।

প্রফেসর তাঁর শোবার ঘরে একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে ছিলেন দিলীপ ঢুকতেই খানিকটা সোজা হয়ে বসে খুশির সুরে বললেন, 'দিলীপ এসেছ! বসো।' এই সামান্য নড়াচড়াতেই তাঁর মুখে যে যন্ত্রণার রেখা ফুটে উঠেছিল, অন্য কেউ হয়তো লক্ষ্য করত না, কিন্তু দিলীপের অভ্যস্ত চোখ এড়াতে পারল না। সে সামনের চেয়ারটায় বসে ওঁর দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে উদ্বেগের সুরে বলল, কী অসুখ আপনার?

প্রফেসর মৃদু হেসে অনেকটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, তা তো ঠিক বলতে পারবো না। সে সব তোমরা বুঝবে। তবে প্রেশারটা বেশ বেড়েছে, মনে হচ্ছে।

বলেই ঘাড় ফিরিয়ে ভয়ে ভয়ে তাকালেন পিছনের দরজার দিকে তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করতেই দিলীপের চোখে পড়ে গেল চৌকাঠের ওপাশে একটুকরা পরিচিত আঁচলের কোণ। প্রফেসরের প্রৌঢ় চক্ষু সম্ভবতঃ সেটা দেখতে পেল না। স্বর নামিয়ে বললেন, মেয়েটা শুনে ফেললেই মুস্কিল। এমনিতেই ভীষণ ঘাবড়ে গেছে। ছেলেমানুষ তায় একেবারে একা।

শেষের কথা কটির মধ্যে তাঁর স্বরটা কেমন উদাস শোনা গেল একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসের মৃদু শব্দও দিলীপের কানে এসে লাগল। মুহূর্ত পূর্বে তার বুকের ভিতরে যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল, জোর করে সংবরণ করে বলল, ওষুধপত্তর খাচ্ছেন না?

—কী হবে! নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললেন ব্যানার্জি, এ রোগ তো সারবার নয়। চিরদিনের সাথী। যে কটা দিন চ চলুক

—একেবারে না সারলেও, রিলিফ দেওয়া চলে। তা না হলে হয়তো—

কথাটা শেষ না করেই থেমে গেল দিলীপ। মনে হল, প্রেশারের রোগীকে অপ্রীতিকর কিছু না বলাই উচিত। কিন্তু ব্যানার্জি তার অসমাপ্ত অংশটা নিজেই পূর্ণ করে দিলেন। বললেন, মারাত্মক কিছু ঘটতে পারে, বলতে চাও তো? তার জন্যে তৈরী হয়ে আছি।

দিলীপ ওসব কথায় কান না দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, প্রেশারটা কবে নিয়েছিলেন?

—ঠিক মনে নেই। তা, বেশ কিছুদিন হবে।

—আরেকবার নেওয়া দরকার। কে দেখছেন আপনাকে?

—আমার এক বন্ধু ডাক্তার। শ্যামবাজারে থাকে। সে-ই মাঝে মাঝে এসে দেখে যায়। এবারে অনেক দিন আসেনি। আমাদের ফিরে আসবার খবরটা বোধ হয় পায়নি।

—তাঁকে একবার ডাকলে হয়। ওঁর বাড়িতে কিংবা চেম্বারে ফোন্ আছে কি?

—তা আছে।

—তাহলে আমি বরং তাঁকে একটা খবর দিয়ে দিই। তাঁর নাম আর নম্বরটা—

—না, না, এরই মধ্যে উঠবে কী? এতক্ষণ তো খালি আমার রোগের ফিরিস্তি শুনলে। তোমার কোনো কথাই তো শোনা হল না। প্রথম এলে একটু চা-টা—রঘু আছিস?

দিলীপ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, আজ্ঞে না। আরেক দিন এসে খাবো। আজ উঠি।

—কিন্তু ডাক্তারের জন্যে এত তাড়া কিসের? খারাপ কিছু দেখছ কি?

—না, না। খারাপ কেন হবে? এমনিই একবার তাঁর আসা দরকার

—কিন্তু একগাদা ওষুধপত্তর আর খেতে চাই না।

—ওষুধপত্তর বিশেষ কিছু দেবেন বলে মনে হয় না। দুটো

একটা পিল্ হয়তো খেতে হবে। তাতে আপনার মাথার যন্ত্রণাটা চলে যাবে।

—আমার মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে, তোমাকে তো বলিনি। অনেকটা কৌতুকের সুরে বললেন প্রফেসর। দিলীপ উঠে পড়েছিল। মাথা নত করে মৃদু হেসে বলল, না বললেও আমি বুঝতে পেরেছি।

রঘু এসে দাঁড়িয়েছিল। ব্যানার্জির হঠাৎ নজরে পড়তেই বললেন, তোর দিদিমণিকে বল, একটুকরো কাগজে হীরেন ডাক্তারের নাম আর ফোননম্বরটা লিখে দিক।

মিনিটখানেকের মধ্যেই রঘু একটা স্লিপ এনে দিলীপের হাতে দিল। গোটা গোটা ইংরেজি অক্ষরে সুন্দর, পরিচ্ছন্ন দুটি লাইন—ডকটর এইচ্ এন্ বোস, এম-বি। তার নীচে একটা টেলিফোন নম্বর। কাগজখানা হাতে নিয়ে লেখাটার দিকে একবার তাকিয়েই দিলীপের বুকের ভিতরটা নড়ে উঠল। ভাঁজ করে বুকপকেটে রেখে, যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে আবার ফিরে দাঁড়াল। নত হয়ে ব্যানার্জির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই তিনি ওর হাতখানা ধরে বললেন, থাক, থাক; আবার কবে আসবে, বাবা?

—কাল সকালে এসে একবার খবর নিয়ে যাবো।

সেই চাকরটি পিছন পিছন নেমে এসে দরজার মুখে দাঁড়িয়ে গেল। একটু বেশী কথা বলা বোধ হয় ওর স্বভাব। বলল, বাবুকে কেমন দেখলেন? দিলীপ কোনো উত্তর দেবার আগেই যোগ করল, দিদিমণি বড় মুষড়ে পড়েছে। মা নেই তো। জ্যাঠা-জ্যেঠী আছে। তাও কি ধারেকাছে? সেই পশ্চিমে কোথায় কানপুর না কি শহর আছে, সেইখানে থাকেন। তাঁদের কাছেই তো থেকে এল এক মাস। জ্যেঠী বড্ড ভালোবাসে। হলে কি হবে? একেবারে বাপ-অন্ত প্রাণ। আর বাবুরও তো ঐ সবেধন নীলমণি, একদণ্ড কাছছাড়া হবার যো নেই। ঐ কলেজ আর বাড়ি, বাড়ি আর কলেজ।

বন্ধ দরজার ভিতর দিকে ফালিমত পথটায় দাঁড়িয়ে দিলীপ নিঃশব্দে শুনছিল। না শুনে উপায় নেই। হাতের কাছে নিরীহ গোছের শ্রোতা পেয়ে রঘুরও বোধ হয় উৎসাহ বেড়ে গিয়েছিল।

মুখখানা বিকৃত করে বলল, মামারা এদিকে মস্ত বড় লোক! এই তো ভবানীপুরে নিজেদের বাড়ি। মেয়েটার একবার খোঁজও নেয় না। বাবুর সঙ্গে—বলে, দুহাতের তর্জনী আড়াআড়ি ভাবে জড়িয়ে চোখে ও ভ্রূতে একটা বিরোধ-সূচক ইঙ্গিত করে দেখাল।

যাক; আপনার আবার দেরি হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে একটু খোঁজ-খবর নেবেন বাবু।

রঘুর এই একটানা কাহিনী শুনতে শুনতে দিলীপের সমস্ত মনটা কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। প্রফেসর ব্যানার্জি তখন নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, মেয়েটা একেবারে একা। কথাটা তার অন্তর স্পর্শ করেছিল। কিন্তু তাঁর মর্মস্থলে যে এত বড় মর্মান্তিক অর্থ নিহিত ছিল, কেমন করে জানবে? এই মুহূর্তে সেটা তীব্রভাবে অনুভব করল। ঐ 'একা' কথাটার বিষণ্ণ ম্লান রিক্ত রূপ তার চোখের সুমুখে মূর্ত হয়ে উঠল। দরজার বাইরে পা দিয়ে আপনার অজ্ঞাতসারে একবার উপরের দিকে তাকাল। দোতলার বারান্দায় রেলিং-এর পাশে সে দাঁড়িয়ে আছে। যেন একটি বেদনার প্রতিমূর্তি। ঘনায়মান সায়াহ্নের স্বল্পালোকে যেটুকু দেখা গেল, সমস্ত মুখখানা পরিম্লান বিষাদে ঢাকা। চোখোচোখি হতেই দিলীপের মনে হল, ওষ্ঠ দুখানি যেন একটু ফাঁক হল। হয়তো কিছু বলবার ছিল। না শুনেই সে চলে যাচ্ছে! মুহূর্তের তরে পা দুখানা আপনা হতেই থেমে গেল। কিন্তু কোনো ডাক এসে পৌঁছল না।

পকেটের কাগজখানার কথা মনে পড়তেই সে দ্রুতবেগে পা চালিয়ে দিল। রাস্তার মোড়ে তার একটা জানাশুনো ওষুধের দোকান আছে। সেখান থেকে ডাক্তার বোসকে ফোন করতে হবে।

কিছুক্ষণ আগে এগারোটা বেজে গেছে। প্রেস-বাড়ির কোথাও কোনো সাড়া-শব্দ নেই। সব ঘুমে বিভোর। নটার সময় ওদের খাওয়া-দাওয়া মিটে যায়। তারপর ঘণ্টাখানেক গল্পগুজব চলে। দশটা বাজতে না বাজতেই সারাদিনের শ্রম-ক্লান্ত চোখগুলো আপনিই বুজে আসে। সব আলো নিভে যায়। গোটা বাড়িটা অন্ধকারে ঢাকা পড়ে। একটিমাত্র আলো শুধু জ্বলতে থাকে—দিলীপের চিলেকোঠার

ছোট্ট ঘরে। প্রেস-এর পেছনে সারা দিনমানে যে সময়টা তাকে
দিতে হয়, রাত্রির কাছ থেকে তার প্রায় সবখানিই সে আদায়
করে নেয়।

অন্যদিনের মত আজও সে পড়াশুনো নিয়ে ব্যস্ত ছিল, যদিও
মনটা ঠিক নিরুৎকণ্ঠ ছিল না। সমস্ত পাড়াটা নিঝুম হয়ে গেছে।
এতক্ষণ মাঝে মাঝে দু-একখানা চলন্ত গাড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। এখন
তাও নেই। হঠাৎ কোথা থেকে একটা কোমল স্বর ভেসে এল—'শুনুন।'
দিলীপ চমকে উঠল—কে ডাকে? তারপর নিজের মনেই হাসল
একটুখানি। এ ডাক বাইরে থেকে আসেনি, এসেছে তার উদ্বিগ্ন
অবচেতনার ভিতর থেকে। তবু কান খাড়া করে রইল এবং কয়েক
সেকেণ্ড পরেই আবার শোনা গেল সেই সানুনয় ব্যাকুল কণ্ঠ—
'শুনছেন?' তার জানালার ওপার থেকেই যেন আসছে বলে মনে হল
ধড়মড় করে উঠে পড়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে ছাদের দিকে তাকাল। না, ভুল
নয়। আবছায়া অন্ধকারে তাকেই দেখা গেল আলসের উপর ঝুঁকে
পড়ে বলল, একটিবার শুনুন না?

—'আমাকে ডাকছেন?'

—হ্যাঁ; বাবা যেন কী রকম করছেন। ডাকলে সাড়া দিচ্ছেন
না। একবার আসবেন?

—এখ্‌খনি যাচ্ছি।

—আমি গিয়ে রঘুকে নীচে পাঠিয়ে দিচ্ছি; দরজা খুলে দেবে।

বলতে বলতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। দিলীপ ক্ষণকাল সেই
দিকে চেয়ে তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে গলিয়ে এক রকম ছুটতে ছুটতে
নেমে পড়ল।

দারোয়ানকে ডেকে তুলে সদর বন্ধ করবার নির্দেশ দিয়ে
ও-বাড়িতে গিয়ে যখন পোঁছল, তার আগেই রঘু এসে দরজা খুলে
দাঁড়িয়ে আছে। দিলীপ ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করল, বাবু কেমন
আছেন রঘু?

—জ্ঞান নেই। তাড়াতাড়ি আসুন। এ রকম আরেকবার
হয়েছিল বছরখানেক আগে।

—'আরেকবার হয়েছিল!' অনেকটা যেন আপন মনে বিড়-বিড় করে বলল দিলীপ। তারপর উপরে উঠতে উঠতে জিজ্ঞাসা করল ;ডাক্তার আসেননি?

—এইতো একটু আগে দেখে চলে গেলেন। তারপরেই—

দিলীপ ততক্ষণে কয়েক লাফে সিঁড়িগুলো পার হয়ে রোগীর ঘরে পৌঁছে গেছে। বাবার মাথার কাছে খাটের ঠিক পাশটিতেই সে দাঁড়িয়ে আছে। তু'চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে জলের ধারা। দিলীপ এক পলক সেদিকে তাকিয়েই রোগীর হাতটা তুলে নিয়ে নাড়ী পরীক্ষা করল, চোখের পাতা টেনে দেখল। আরো যা যা দেখবার ক্ষিপ্রগতিতে শেষ করে মুখ তুলতেই ও পাশ থেকে ফেটে পড়ল আর্তস্বর—কী দেখলেন? বাবা নেই?

—না, না; সে কি কথা! হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছেন। এখ্‌খনি ভাল হয়ে যাবেন। ডাক্তারবাবুকে খবর দেওয়া দরকার। তার ফোন্ নম্বরটা—

—তাঁকে তো এখন পাওয়া যাবে না।

—কেন? কোথায় গেছেন?

—এখান থেকে আরো কোথায় যেন যেতে হবে বলে গেলেন। বাড়ি ফিরতে দেরি হবে।

—আমি তাহলে অন্য ডাক্তার নিয়ে আসছি।

ব্যস্তভাবে বেরিয়ে যাবার মুখে পেছন থেকে শুনতে পেল, 'শুনুন'। থমকে ফিরে দাঁড়াল দিলীপ।

'বেশী দেরি করবেন না। আমার বড্ড ভয় করছে।'

—ভয় কি? আমি এখ্‌খনি আসছি।

রোগীর অবস্থা যে আশঙ্কাজনক, পুরোপুরি ডাক্তার না হলেও দিলীপের সেটা বুঝতে বাকী ছিল না। অবিলম্বে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা না হলে, সর্বনাশ ঘটতে পারে, সে বিষয়েও সে নিঃসন্দেহ। ঘটনাচক্রে সে ব্যবস্থার ভার এই মুহূর্তে তারই উপর এসে পড়েছে। এই গুরুদায়িত্ব মাথায় নিয়ে সে ছুটে চলেছিল তার একজন প্রফেসরের কাছে। তিনি বড় ডাক্তার, এই জাতীয় ব্যাধি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ এবং

কাছেই থাকেন। রোগীর অবস্থা সম্পর্কে তিনি কি কি প্রশ্ন করতে পারেন, তার কী উত্তর দেবে, সেইগুলো মনে মনে স্থির করতে করতে সে নির্জন রাস্তা ধরে দ্রুতবেগে এগিয়ে যাচ্ছিল। রোগ, তার সম্ভাব্য চিকিৎসা এবং আনুষঙ্গিক ব্যাপারের মধ্যেই সে নিবিষ্ট হয়ে পড়েছিল।

কিছুক্ষণ পথ চলবার পর হঠাৎ এক সময়ে সে থমকে দাঁড়াল। এ কী ভাবছে সে! রোগ এবং রোগীকে ঘিরে যে-উদ্বেগ তার সমস্ত মন এতক্ষণ অধিকার করে রেখেছিল, তার থেকে স্খলিত হয়ে অবাধ্য চিন্তা-ধারা কখন কোন্ গোপন পথ ধরে অজানতে ডুবে গেছে সেই রোগশয্যার পাশে উচ্চারিত একটি মধুর করুণ অশ্রুজড়িত কণ্ঠের ব্যাকুল আহ্বানে। পেছন থেকে বলা সেই সামান্য দুটি কথা—তাড়াতাড়ি ফিরে আসবার অনুরোধ। কিন্তু তার মধ্যে যে একান্ত নির্ভরতাময় অন্তরঙ্গ সুরটি জড়িত ছিল, তারই স্পর্শে দিলীপের সমস্ত বুকখানা বারবার ভরে উঠছিল। সহসা চকিত হয়ে মনে মনে লজ্জা বোধ করল। মাথার উপর যে কর্তব্যের ভার নিয়ে সে এই গভীর রাত্রে পথে বেরিয়েছে, সেইটাই এখন তার একমাত্র ধ্যান, জ্ঞান, ধারণা। তাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে এ কোন্ আত্মসুখময় মোহাবেশ তাকে পেয়ে বসল। নিজেকে বড় ছোট মনে হল নিজের কাছে।

দিলীপ তখনো জানত না, মানুষের মন নামক যে বিচিত্র বস্তু, ঐ ধরনের বিরুদ্ধ-নীতিই তার ধর্ম। নিবিড় সুখের মধ্যে বসেও সহসা কোন্ অর্থহীন বেদনায় সে ম্লান হয়ে ওঠে। চরম আত্মত্যাগের গৌরব-মুহূর্তে অন্ধ স্বার্থ এসে তার পথরোধ করে দাঁড়ায়। দীর্ঘ রোগভোগের পর দরিদ্র সংসারকে শেষ ধাপে নিয়ে গিয়ে প্রাণাধিক সন্তান যখন চলে যায়, তার মৃত্যুশয্যায় বসে পিতামাতার মনে যে চিন্তাস্রোত বইতে থাকে, তার একদিকে যন্ত্রণা আরেক দিকে স্বস্তি। তাদের বুকের ভিতর থেকে যে দীর্ঘশ্বাস তখন বেরিয়ে আসে তার সবখানিই কি জ্বালা? না, তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মুক্তির আরাম।

—ষোল—

খাটে শুয়ে দেয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে প্রফেসর ব্যানার্জি মনে মনে হিসাব করে দেখছিলেন, আজ কতদিন হল,—কবে থেকে তিনি এই বিছানা আঁকড়ে পড়ে আছেন। সেই রাত্রিটি তাঁর স্পষ্ট মনে আছে, কিন্তু তারিখটা মনে পড়ছে না। জ্ঞান ফিরে পাবার দু-তিন দিন পর একটু যখন সুস্থ হয়ে উঠলেন, মেয়েকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ; উত্তর পাননি। উল্‌টে বকুনি খেতে হয়েছিল—'আবার ঐসব ভাবছ ?' ভারী মিষ্টি লেগেছিল এই সস্নেহ তিরস্কারটুকু। মেয়েকে রাগিয়ে দেবার জন্যে বলেছিলেন, আসলে তোর মনে নেই।

—হুঁ ; মনে নেই বৈকি ?

—তবে বলছিস না কেন ?

—আমাকে বারণ করে গেছেন।

—ডাক্তাররা ওরকম কত কি বারণ করে। সব কথা শুনতে গেলে কি চলে ?

—ডাক্তার কেন হবে ?

—তবে ? আবার কে বারণ করল ?

—মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। মুখখানা হঠাৎ রাঙা হয়ে উঠল। নীচের দিকে চেয়ে, অকারণে আঁচলের খুঁটটা সোজা করতে করতে সলজ্জ মৃদু কণ্ঠে বলল, দিলীপবাবু। সেই আরক্ত নতমুখের দিকে চেয়ে ব্যানার্জির মনে একটা ম্লান ছায়া ঘনিয়ে এল। এই মাতৃ-হারা, নিতান্ত সরল, স্নেহ-পিপাসু মেয়েটির কথা ভেবে ভিতরে ভিতরে তিনি শঙ্কিত হলেন। সে তো জানে না সে কোন্ পথে চলেছে। তারপর ? কোথায় কিভাবে কোন্ পরিণামের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াবে, তিনিও বলতে পারেন না। যদি একদিন সহসা কোনো বাঁকের মুখে ছেদ টেনে তাঁকে অন্য পথ ধরতে হয়, সে আঘাত সইতে পারবে কি ? বিদ্যুৎঝলকের মত নিজের দীর্ঘ জীবনটা চোখের উপর ভেসে উঠল।

মনে মনে শিউরে উঠলেন। না; আর নীরব দর্শকের মত বসে থাকা যায় না। হয় অগ্রসর, নয়তো এইখানেই রাশ টেনে দিতে হবে।

মেয়েকে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলেন, দিলীপ আজ আসেনি; দেখলেন সে ঘরে নেই। অনেকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন, সেই ফাঁকে কখন চলে গেছে।

এই কদিনের মধ্যেই দিলীপ ছেলেটি তাঁর মনের অনেকখানি স্থা জুড়ে বসেছিল। তাঁর জন্য কী না সে করেছে এবং এখনো করে চলেছে! সেই গভীর রাত্রে অতবড় খ্যাতিমান চিকিৎসক, ডাক্তার দাশগুপ্তকে নিয়ে সে যদি ঠিক সময়ে এসে না পৌঁছত, হয়তো এ যাত্রা তিনি রক্ষা পেতেন না। অবশ্য পুরোপুরি রক্ষা তিনি পাননি। প্রাণটা রেখে গেলেও দুর্জয় ব্যাধি প্রচণ্ড আঘাতে তাঁর দেহের একটা দিক প্রায় অচল করে দিয়ে গেছে। তারপর থেকে চলেছে এই অক্লান্ত সংগ্রাম। তিনি আর কী করেছেন? চুপ করে শুয়ে আছেন। সমস্ত ধকল সইছে ওরা—ঐ দিলীপ আর তার কজন বন্ধু। যেমন করে হোক তাঁকে টেনে তুলবেই, এই ওদের পণ। কী আশ্চর্য কটি ছেলে তৈরী করেছেন আশুবাবু! কোথাকার কোন বর্ষ্টাল জেলের সেকেণ্ড মাষ্টার! পদে, মানে, সামাজিক মর্যাদায় অতি নগণ্য! কিন্তু মনটা কত বড়! তিনি একজন অধ্যাপক। এই পাড়ায় ওদের চেয়েও পুরাতন বাসিন্দা। এপাশে ওপাশে অনেক সম্ভ্রান্ত প্রতিবেশীর সঙ্গে পরিচয় আছে। রাস্তাঘাটে দেখা হলে নমস্কার ও মামুলী কুশল প্রশ্নের বিনিময় হয়ে থাকে। ছোটখাট অসুখ-বিসুখে মৌখিক উদ্বেগ প্রকাশে কখনো ত্রুটি হয় না। কিন্তু তাঁর এই ঘোর সঙ্কটের দিনে তাঁদের একজনও তো দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াননি। দাঁড়ালেও ভাসা ভাসা খবর নিয়ে চলে গেছেন। যা কিছু করেছে ঐ ছেলেগুলো আর তাদের 'মাষ্টারমশাই'। অথচ এরা সব দিক দিয়েই তাঁর কাছে ছোট, এবং ছোট করেই দেখে এসেছেন বরাবর। সবচেয়ে তাজ্জব কথা—এরা সমাজবিরোধী জীব, অ্যান্টিসোস্যাল এলিমেণ্টস। পুলিশ এদের উপর কড়া নজর রাখে। পাড়ার সৎ এবং ভদ্রগৃহস্থেরা শুধু যে সযত্নে ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলেন তাই নয়, এরা কখন কি করে বসে, সেই আশঙ্কায় সদাসন্ত্রস্ত।

প্রেস-এর ছেলেরা এসেছে, বাহাদুরের তৈরি রুটিনমত পালা করে রোগীর সেবা করেছে, আশুবাবু দুবেলা এসে নিয়মিত তদারক করে গেছেন, রোগীর অবস্থা এবং ডাক্তারের নির্দেশ প্রতিকূল না হলে কিছুক্ষণ বসে বসে গল্পগুজব করে তাঁর মনটাকে খানিকটা হালকা করবার চেষ্টা করেছেন। এ বাড়ির সঙ্গে ঐ পর্যন্ত তাদের যোগ। কিন্তু দিলীপ সেখানে থেমে যেতে পারেনি। যখন-তখন তার তাগিদ এসেছে ভিতরবাড়ি থেকে। কখনো কখনো রঘু গিয়ে সরাসরি হানা দিয়েছে ওবাড়ির চিলেকোঠায়। দিলীপ ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, কী খবর রঘু?

—দিদিমণি ডাকছেন।

এ ডাকের সঙ্গে রোগের অবস্থার কোনো সম্পর্ক নেই, রঘুর কথা বলবার ধরনেই তা সুস্পষ্ট। তবু উদ্বেগের ভান করেছে দিলীপ, কেন? বাবুর শরীরটা কি কোনো রকম—

—আজ্ঞে না; বাবু সেই রকমই আছেন; ঘুমুচ্ছেন দেখে এলাম।

—আচ্ছা, তুমি যাও। আমি একটু বাদে যাচ্ছি।

এই 'একটু বাদে'র আবরণ দিয়ে ভিতরকার চাঞ্চল্যকে ঢেকে রাখতে গিয়ে মাঝে মাঝে তাকে যে কি কঠোর ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়েছে, সে শুধু সে-ই জানে। গিয়ে হয়তো দেখেছে, ডেকে পাঠাবার কারণ নিশ্চয়ই ছিল, তবে তার মধ্যে যাকে বলে আশু প্রয়োজন, তেমন কিছু নেই। তবু সেই তুচ্ছ কারণটাকেই দু তরফ থেকে জরুরী করে তোলা হয়েছে—যেন এই সময়ে একজন যদি বুদ্ধি করে না ডাকত, এবং আরেকজনকে যদি সঙ্গে সঙ্গে না পাওয়া যেত, কী যে হত বলা যায় না। অন্তরালে যে মধুর ছলনা, দুজনের কারো কাছেই সেটা গোপন থাকেনি। উভয়েই মনে মনে উপভোগ করেছে, কিন্তু বাইরে ধরা দেয়নি।

এমনি একদিন বিকালবেলা দিদিমণির দৌত্য সেরে রঘুর প্রস্থানের পর পাঁচটা মিনিট কোনো রকমে পার করে দিয়ে এ বাড়িতে ছুটে এসে দিলীপ হঠাৎ থ' হয়ে দাঁড়াল। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে উৎকণ্ঠাভরা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছে! শোবার ঘরের বারান্দায় একটা চৌকি দখল করে গালের উপর হাত রেখে বিমর্ষ মলিন মুখে যে বসে ছিল তার কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। আর একটু কাছে সরে

গিয়ে সস্নেহ অনুনয়ে প্রশ্নটার পুনরুক্তি করতেই সে ব্লাউজের ভিতর থেকে একখানা চিঠি বের করে এগিয়ে ধরল। দিলীপ মুহূর্তকাল ইতস্ততঃ করে হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা নিয়ে বলল, কার চিঠি ?

'পড়ে দেখুন।' চাপা কান্নায় জড়ানো ভাঙাভাঙা মৃদু কণ্ঠস্বর।

দিলীপ আড়চোখে একবার সেই ফুলো ফুলো চোখদুটোর দিকে চেয়ে, ভয়ে ভয়ে চিঠিটা খুলে ফেলল।

চিঠি এসেছে কানপুর থেকে, লিখেছেন ওর 'বড়মা'। অতবড় অসুখের খবর পেয়ে প্রথমে খানিকটা দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ-প্রকাশ। পরের কটি লাইনে অনুযোগ ও সস্নেহ তিরস্কার—সঙ্গে সঙ্গে তাদের জানানো হয়নি কেন। তারপর জানিয়েছেন, ওর জ্যাঠামশাই ছুটির অপেক্ষায় আছেন। পাওয়া মাত্র কোলকাতায় রওনা হবেন এবং ওদের দুজনকে নিয়ে যত শীঘ্র সম্ভব কানপুরে ফিরবেন। আর যদি রোগীর পক্ষে বর্তমান অবস্থায় অতটা নড়াচড়া এবং এই দীর্ঘ রেলভ্রমণ সম্ভব না হয়, তাহলে তাঁকে আপাততঃ একজন পরিচিত ডাক্তারের নার্সিং হোমে রেখে জ্যেঠামশাই শুধু ওকে নিয়ে চলে যাবেন। সে যেন তৈরী হয়ে থাকে।

চিঠিখানা পড়ে ভাঁজ করতে করতে দিলীপ উদাস দৃষ্টিতে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। হঠাৎ মনে হল, এতবড় শহরটা তার অসংখ্য বাড়িঘর, গাছপালা, গাড়িঘোড়া মানুষজন নিয়ে কয়েক পলকের মধ্যে তার চোখের উপর থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে। অনাগত জীবনের যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধু অবিচ্ছিন্ন অন্ধকার, একটা ক্ষীণ আলোকরশ্মিও চোখে পড়ে না। বুকের ভিতরটাও কেমন যেন ফাঁকা হয়ে গেছে—বেদনা-বোধহীন, অসাড়।

কতক্ষণ এমনি নিজের মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তার মনে নেই। হঠাৎ একটা বাষ্পরুদ্ধ কোমল স্বর কানে যেতেই চমকে উঠল— আসুন না জ্যাঠামশাই, আমি কখখনো যাবো না। বাবাকে ফেলে আমি কোথাও গিয়ে থাকতে পারবো না।

বলতে বলতে সেই রুদ্ধ অশ্রু গলে গলে ঝরে পড়তে লাগল। এতক্ষণে যেন সাড় ফিরে এল দিলীপের। তীব্র বেদনায় বুকের ভিতরটা

মুচড়ে উঠল। দুর্দম্য ইচ্ছা হল, ছুটে গিয়ে শিশিরসিক্ত পদ্মের মত ঐ অশ্রুলাঞ্ছিত মুখখানা তুলে ধরে বলে, তোমাকে কোথাও যেতে হবে না। আমি তোমাকে যেতে দেবো না।

কিন্তু কে সে? একথা বলবার তার কী অধিকার? এতটা ভরসা দেবার মত জোরই বা সে পেল কোথা থেকে? বলবার মত কিছুই তার নেই। সামান্য একটু সান্ত্বনা দেবে, তেমন কোনো ভাষাও সে খুঁজে পেল না। এই কটা দিন পিতা ও কন্যা উভয়ের কাছে এমন অনেক আচরণ সে পেয়েছে, যা শুধু নিতান্ত আপনজনের প্রাপ্য। সেই স্বীকৃতির গর্বে ও আনন্দে তার বঞ্চিত হৃদয় ভরে উঠেছিল। আজ বুঝতে পারল, সে সব অলীক, অসার। কয়েকটা দিন যেন ডানা মেলে কোন স্বপ্নাকাশে বিচরণ করছিল। একখানা মাত্র চিঠির আকস্মিক আঘাত তাকে সংসারের কঠিন মাটিতে ফেলে দিয়ে গেল।

'আপনি বলুন তো, এই অবস্থায় বাবাকে রেখে আমি চলে যাবো?' আবার চমকে উঠল দিলীপ। দুটি ক্ষুব্ধ সপ্রশ্ন চক্ষু তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। উত্তর না দিয়ে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। একটিমাত্র উত্তর আছে—এ ক্ষেত্রে যা সঙ্গত, বাস্তব এবং হয়তো সব দিক দিয়ে সমীচীন। কিন্তু সে উত্তর দেওয়ার চেয়ে নিজের হৃৎপিণ্ড উপড়ে দেওয়াও বোধ হয় সহজ। তবু এদের পারিবারিক কল্যাণের দিকে চেয়ে সেই কথাই তাকে বলতে হবে। সেই চোখদুটি তখনও তার মুখের উপর নিবদ্ধ। তারা কী চায় তা কি সে জানে না? কিন্তু সব জেনেশুনেও সে বলে ফেলল, কিন্তু আপনার জ্যাঠাইমা যখন বলছেন,—

"ও, তাহলে আপনিও তাই চান?" কথাটা শেষ করবার সময়টুকুও দিল না। দুচোখে একরাশ আগুন ছড়িয়ে চিঠিখানা যেন ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ঝড়ের মত বাবার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

প্রফেসর ব্যানার্জি চোখ বুজে শুয়ে ছিলেন। পায়ের শব্দে ফিরে তাকালেন, এবং মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে উদ্বেগের সুরে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে, মা?

—কিছু না। বড়মার চিঠি এসেছে।

—ওদের খবর সব ভালো তো?

—হ্যাঁ ; জ্যাঠামশাই আসছেন, তোমাকে নার্সিং হোমে রেখে আমাকে কানপুর নিয়ে যাবার জন্যে।

—সে কি ! তুই বুঝি আমার এইসব অসুখের কথা লিখেছিলি ওখানে ?

মেয়ে জবাব দিল না। তিনিও তার জন্যে অপেক্ষা করলেন না নিজের মনে বলতে লাগলেন, না লিখেই বা তুই স্থির থাকবি কেমন করে ? তবু একটিবার যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে লিখতিস, আমি এসব খবর দিতে বারণ করতাম।......যাক্ ; যা হয়ে গেছে তার তো আর চারা নেই। দেখি চিঠিখানা ?

নিঃশব্দে পড়া শেষ করে কাগজখানা মেয়ের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে অনেকক্ষণ তেমনি চুপ করে পড়ে রইলেন, তারপর ধীরে ধীরে বললেন, ঠিকই লিখেছে বৌদি। কতদিন এভাবে শুয়ে থাকতে হবে কে জানে ? তুই ছেলেমানুষ, পেরে উঠবি কেন ? তোকেই বা কে দেখে ? তার চেয়ে বরং মেজদার সঙ্গেই চলে যা। বড়মা তো তোকে কোনোদিন অনাদর করেননি। ভালোই থাকবি তাঁর কাছে। তারপর যদি সেরে উঠতে পারি—

মেয়ে চলে যাচ্ছিল। প্রফেসর ডেকে ফেরালেন, শোন : থাকতে পারবি তো ?

—কেন পারবো না ? তোমরা সবাই যখন চাও আপদ বিদেয় হোক, তখন—

আর বলা হল না। সহসা স্বর রুদ্ধ হয়ে গেল।

—'আয়, এদিকে আয়'—ডান হাতখানা তুলে মেয়েকে কাছে আসবার ইঙ্গিত করলেন প্রফেসর। সে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে তাঁর বুকের উপর মাথাটা লুটিয়ে দিল।

মেঘের মত এক বোঝা চুল। কদিন বোধহয় তাতে তেল পড়েনি, চিরুনিও পড়েনি। রুক্ষ, বিবর্ণ। মাঝে মাঝে জট পাকিয়ে গেছে। তারই উপর হাত বুলোতে বুলোতে ব্যানার্জির বুকের ভিতরটা টনটন করে উঠল। চিরদিন তাঁকেই এসব দেখতে হয়েছে। আজ তিনি পড়ে আছেন। কে দেখবে ? মনে পড়ল, এই সেদিনও এমনি করে বুকের

উপর শুইয়ে চুলের ভিতর আঙুল চালিয়ে চালিয়ে তিনি দুরন্ত মেয়েকে ঘুম পাড়াতেন। আজও তেমনি কোঁকড়া চুলগুলো চিরে চিরে দিতে লাগলেন। সেই স্নেহস্পর্শে মেয়ের চোখের জল আর বাধা মানল না। বুক ভাসিয়ে অঝোরে ঝরে পড়তে লাগল।

এই প্রশস্ত বুকখানাই তার আজন্মের আশ্রয়। হঠাৎ তাকে ছেড়ে যাওয়া কি এতই সহজ?

দিলীপ কিছুক্ষণ হতভম্বের মত সেই বারান্দার কোণে দাঁড়িয়ে রইল। একবার ভাবল, চলে যায়। তারপরেই মনে হল, এখনই হয়তো সে ফিরে আসবে। তখন সুযোগ বুঝে তার নিজের অবস্থাটা বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করবে। কিন্তু সে এল না। অগত্যা বাসায় ফিরে যাবার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে অধ্যাপকের ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ভিতরে নজর পড়তেই পা দুটো যেন হঠাৎ অচল হয়ে গেল। বুঝতে পারল, এর আগে পর্যন্ত ঐ চিঠিখানার পরিপূর্ণ অর্থবোধ তার হয়নি। এই মুহূর্তে আর একটা আশঙ্কা তার মনের কোণে ছায়া ফেলল। অধ্যাপক যদি তাঁর সর্বনাশা ব্যাধির এই দ্বিতীয় আক্রমণ কাটিয়ে উঠতে না পারেন? পরের কথাটা কল্পনা করতেও সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে!

হঠাৎ মনে পড়ল, আজই তো সন্ধ্যার পর ডাক্তার দাশগুপ্তের আসবার কথা। এখনো সময় আছে। তবু বেশ কিছুক্ষণ আগেই তার চেম্বারে পৌঁছানো দরকার। আবার কে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে। ভাবতে ভাবতে দ্রুতবেগে নেমে চলে গেল।

সন্ধ্যার দিকে আশুবাবু এলেন, রোজ যেমন এসে থাকেন। দ্রুত আরোগ্যের ভরসা দিলেন। তাঁর দীর্ঘ এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে দুচারটি সরব কাহিনীর হালকা হাওয়া দিয়ে রোগশয্যার গুমোট খানিকটা কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। মেয়েকেও ডেকে এনে বসালেন অধ্যাপক। ঐটুকু মেয়ের মনের উপরে আজ অনেক মেঘ জড়ো হয়েছিল। এই আপন-ভোলা সদাশিব বৃদ্ধের প্রাণখোলা দন্তহীন হাসি তার কিছুটা অন্তত: উড়িয়ে দিতে পারবে।

বর্ষালের বাসায় বাসায় সেই নোটিশ দিয়ে ব্রাহ্মণ-ভোজনের

প্রসঙ্গ উঠতে অধ্যাপক হেসে বললেন, আপনি তো দেখছি তাহলে দ্বিতীয় কমলাকান্ত?

—আজ্ঞে, এক জায়গায় সে মহাপুরুষের ধারেকাছেও যেতে পারিনি।

—কোন্ জায়গায় বলুন তো।

সেই মোক্ষম মৌতাতটা ধরা হয়নি। মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন আশুবাবু।

ব্যানার্জি হেসে উঠলেন। তারপর মেয়ের উদ্দেশে বললেন. ব্যাপারটা বুঝলি তো? একদিনও ওঁকে নেমতন্ন করে লাউঘন্ট আর পায়েস খাওয়ানো হয়নি, তার জন্যে কথা শোনাচ্ছেন।

—বেশ তো; কালই তার ব্যবস্থা করছি। কথা শুনতে যাবো কোন্ দুঃখে?

—না, মা-মণি, ও-সব হাঙ্গাম এখন থাক। তোমার বাবা আগে সেরে উঠুন, তারপর একসঙ্গে বসে খাওয়া যাবে তোমার হাতের লাউঘন্ট আর পায়েস।

—বাবার কথা বলবেন না। ওর কোনোটাই ওঁর পছন্দ নয়।

—আমার পাশে বসিয়ে দিও; তারপর পছন্দ না করে কোথায় যান দেখবো। সঙ্গদোষ বলে একটা জিনিস আছে তো?

মেয়ে উঠে যাবার পর অধ্যাপক দিলীপের কথা পাড়লেন। আশুবাবুর হালকা সুর কোথায় ভেসে গেল। তাঁর এই পুত্রাধিক প্রিয় ছাত্রটির প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। প্রধানতঃ বর্ষ্টাল-জীবন এবং তারপর এখানকার এই প্রতিষ্ঠানে যে পরিচয় তার পেয়েছেন, একটির পর একটি তারই অনেক কাহিনী শুনিয়ে গেলেন। তার আগের ইতিহাস তিনি স্পষ্টভাবে জানেন না। যেটুকু জানেন, তাও বলবার অবসর হল না। ডাক্তার নিয়ে দিলীপ এসে পড়ল।

এর আগের বারে রোগীকে যখন পরীক্ষা করছিলেন, ডাক্তার দাশগুপ্তের একাগ্র তন্ময় মুখের উপর একটা দুশ্চিন্তার কালো ছায়া, আর কেউ হয়তো লক্ষ্য করেনি, কিন্তু দিলীপের অভ্যস্ত চোখে ধরা পড়েছিল, যদিও মুখে তিনি ভরসার কথাই বলেছিলেন। আজও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে

ঐদিকেই চেয়েছিল। সে মলিন ছায়াটাকে দেখতে পেল না। তার জায়গায় বরং একটা আশ্বাসময় ঔজ্জ্বল্যের আভাস পেয়ে সেও মনে মনে হয়ে উঠল। পরীক্ষা শেষ করে ডাক্তার রোগীর মুখের দিকে চেয়ে উৎফুল্লকণ্ঠে বললেন, আর কি? ফাঁড়া কেটে গেছে। you are completely out of danger. অল্পের ওপর দিয়েই গেল বলতে হবে। তবে এবার থেকে কিন্তু খুব সাবধান। কোনো রকম অনিয়ম চলবে না।

'কদিনে টেনে তুলতে পারবেন, মনে হয়?' রোগীর কণ্ঠেও নতুন-পাওয়া ভরসার সুর।

'টেনে আমরা তুলি না', মৃদু হেসে মাথা নেড়ে বললেন চিকিৎসক, 'ব্যাধি মহাশয় যেদিন দয়া করে ছেড়ে দেবেন, সেদিন আপনি নিজে থেকেই উঠে বসবেন। তার জন্যে উতলা হলে চলবে না। ওঁর যেটুকুন দরকার সে সময়টা ওঁকে দিতেই হবে।'

বলতে বলতে বুক দেখবার রবারের নলটা গলায় ঝুলিয়ে দিলীপের দিকে হাত বাড়ালেন। দিলীপ তৈরী হয়েই ছিল। তাড়াতাড়ি কলম ও প্যাডটা এগিয়ে ধরল। তিনি যখন লিখছেন, সেই ফাঁকে সে ভিতরে চলে গেল। দরজার ঠিক ওপাশেই যার শাড়ির পাড়টা দেখা যাচ্ছে তার আঁচলের খুঁটে বাঁধা আছে ডাক্তারের ফী। এই মুহূর্তে সেটি সংগ্রহ করতে হবে। দু-একটা প্রশ্নেরও হয়তো জবাব দিতে হবে।

যাওয়া মাত্র নোট কখানা ওর হাতে তুলে দিয়ে সে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করল, কী বললেন ডাক্তারবাবু? কেমন দেখলেন? প্রশ্নটা যে অধিকন্তু, অর্থাৎ ডাক্তারের প্রতিটি কথা আগেই তার কানে গিয়ে পৌঁছেছে, প্রশ্নকর্ত্রীর মুখের প্রফুল্ল ভাবটাই দিলীপকে সে কথা জানিয়ে দিল। তবু সে খুশী গলায় বলল, অনেক ভালো। কানপুর বোধহয় আর যেতে হল না।

—হলেই বা আপনার তাতে কী এসে যায়? —ক্ষুব্ধ অভিমানের সুর, কিন্তু ছদ্ম। মুখের উপরকার ভার ভার ভাবটাও টেনে আনা। দিলীপের মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, ঠিক জানো? কিচ্ছু এসে যায় না?

বলেই চমকে ল। যার উদ্দেশে বলা তার চোখেও সচকিত

', যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। ঠিক সেই মুহূর্তে এঘর থেকে ভেসে এল ডাক্তার দাশগুপ্তের রাসভারী গলার গম্ভীর ডাক- কৈ? দিলীপ কোথায় গেলে?

—'যাই, স্যর।' বলে ছুটে চলে গেল। তারপর ব্যাগটা তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে টাকাটা ওঁর হাতে গুঁজে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে গাড়িতে পৌঁছে দিল।

ফিরে এসে প্রেস্‌ক্রিপশনটা নিয়ে বেরোতে যাচ্ছে, প্রফেসর ব্যানার্জি বাধা দিলেন, আবার কোথায় যাচ্ছ?

—ওষুধটা নিয়ে আসি।

—ওষুধ রঘু গিয়ে নিয়ে আসবে। তুমি বসো। সেই বিকেল থেকে তো এক মিনিট বিশ্রাম নেই।

আশুবাবু বললেন, ওটা আমাকে দাও। আমি আনিয়ে দিচ্ছি।

—আপনি আবার কষ্ট করবেন? প্রফেসর ব্যানার্জির ক্ষীণ প্রতিবাদ শোনা গেল।

—তা একটু করতে হবে। কাগজখানা যে কোনো একজনের হাতে ধরে দিলে চলবে না। বাকী সবাই মুখ ভার করবে—মাষ্টারমশাই ওকেই বেশী ভালোবাসেন। কাজেই আমাকে গিয়ে একটি লটারী করতে হবে। যার নাম উঠবে তিনিই যাবেন ওষুধ আনতে। কম জ্বালায় পড়েছি!

বলে, দিলীপের হাত থেকে প্রেসক্রিপশন ও টাকা নিয়ে হাসতে হাসতে প্রস্থান করলেন।

প্রফেসর পিছন থেকে বললেন, বেশ আছেন ভদ্রলোক। ...বসো বাবা।

দিলীপ ওঁর পায়ের দিকটায় একটা টুলের উপর বসে পড়ে বলল, এই স্টেজে কিন্তু আপনাকে আরো সাবধানে থাকতে হবে। নড়াচড়া, বেশী কথা বলা—

—তোমার ঐ ডাক্তারি এখন রাখো তো। দিনরাত কেবল অসুখ আর অসুখ। আর ভালো লাগে না বাপু। এবার দু-একটা তোমার কথা বলো, শুনি।

—আমার কথা! রীতিমত বিস্মিত হল দিলীপ।

—হ্যাঁ। কোথায় তোমাদের দেশ, বাড়িতে কে কে আছেন? কিছুই তো শুনিনি এতদিন।

দিলীপের মুখের উপর ম্লান ছায়া ঘনিয়ে এল। বলল, দেশ শুনেছিলাম কাটোয়ার কাছে কী একটা গ্রাম। সেখানে কেউ নেই।

—তোমার বাবা যখন মারা যান, তখন তুমি কত বড়?

—খুব ছোট। আমার কিছুই মনে নেই।

—মা আছেন তো?

—জানি না।

—জানো না!

—না; আপনি এবার বিশ্রাম করুন। আর কথা বলা ঠিক হবে না।

কথাগুলো ব্যানার্জির কানে পৌঁছল কিনা সন্দেহ। পৌঁছলেও আমল দিলেন না। আগেকার সূত্র ধরেই বললেন, বর্স্টালে যাবার আগে কার কাছে ছিলে?

—মার কাছে।

—তারপর?

—একদিন রাগ করে চলে গিয়েছিলাম। তারপর পড়লাম পুলিশের হাতে।

—তারপরের সব ঘটনা আমি আশুবাবুর কাছে মোটামুটি শুনেছি। কোথায় থাকতে তোমরা?

—বেলেঘাটায় একটা বস্তিতে।

—বেলেঘাটায়! আর একটু কাছে এসো।

দিলীপ অবাক হয়ে তাকাল এবং টুলটা টেনে নিয়ে আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বসল। অধ্যাপক ওর মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে কী যেন খুঁজতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন, মায়ের নামটা বলতে আপত্তি আছে?

—আপত্তি কিসের? কিন্তু আমি জানি না।

—সে কি কথা! মায়ের নাম জানো না?

—জানবার সুযোগ হয়নি। পাড়ার লোকেরা 'খোকার মা' বলে ডাকত। আমিও তাই জানতাম! নাম জানবার দরকার কোনোদিন দেখা দেয়নি।

ব্যানার্জি মনে মনে কী ভাবলেন। তারপর বললেন, বাবার নাম বলতে পার?

—তা পারি। সেটা শিখতে হয়েছিল। পাঠশালায় ভর্তি হবার সময় মা একটা কাগজে লিখে দিয়েছিলেন।

—কী বল দিকিন?

—ঈশ্বর নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

—'কী বললে!' একটা অস্বাভাবিক চিৎকার করে মাথা তুলে উঠবার চেষ্টা করলেন অধ্যাপক। দিলীপ চেঁচিয়ে উঠল, 'না, না আপনি উঠবেন না, উঠবেন না।' বলতে বলতে ছুটে গিয়ে দু কাঁধে হাত দিয়ে জোর করে শুইয়ে দিল।

রোগীর অবস্থা সবে মাত্র ভালোর দিকে মোড় নিয়েছিল। এই আকস্মিক উত্তেজনার প্রবল আঘাত সইবার মত স্নায়ুবল তখনো ফিরে আসেনি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে নির্জীবের মত এলিয়ে পড়লেন। বাবার চিৎকার শুনে মেয়েও এসে দাঁড়িয়েছিল তাঁর শিয়রের কাছে। কিন্তু কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। দিলীপও প্রথমে খানিকটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। কে ইনি? তার বাবার সঙ্গে ওঁর কী সম্বন্ধ যে নামটা শুনেই এতখানি বিচলিত হয়ে পড়লেন! কিন্তু তার এই বিহ্বলতা বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সহজ কর্তব্য-জ্ঞান ফিরে এল। এই মুহূর্তে প্রয়োজনীয় ওষুধ বা ইনজেকশনের ব্যবস্থা না করলে অবস্থা আরো জটিল হয়ে দাঁড়াবে, বুঝতে পেরেই ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিল। পেছন থেকে কানে এল চকিত ত্রস্ত স্বর—কোথায় যাচ্ছেন!

—এখনই আসছি। ওঁর কাছ থেকে নড়বেন না। যদি জ্ঞান আসে, একটু দুধের সঙ্গে সেই ওষুধটা খাইয়ে দেবেন। কোন্‌টা মনে আছে তো?

'আছে'। বলে ঘাড় নাড়ল।

দিলীপ আর দাঁড়াল না।

কিছুক্ষণ পরে বিজন চোখ মেলে তাকালেন। বললেন কে, আলো? দিলীপ কোথায়?

—এখ্খনি আসছেন। এখন কেমন লাগছে বাবা?

এদিকে ঘুরে এসে বাবার বুকের উপর হাত রাখল। বিজন তার উপর সস্নেহ মৃদু আঘাত করে বললেন, একটা কাজ করতে পারবি মা?

—ও, দাঁড়াও আমি আসছি। বলে, ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেল, এবং দুমিনিটের মধ্যে ফিডিং কাপ হাতে করে ফিরে এসে বলল, এই দুধটুকুন খেয়ে ফেল।

—আবার দুধ কী হবে?

—শীগগির নাও। এখ্খনি খাওয়াতে বলে গেছেন। দেরি হলে রাগ করবেন।

একজন কি বলে গেছে, না হলে সে রাগ করবে—তাই ভেবে মেয়ের মুখে যে আশঙ্কাকুল মাধুর্যটুকু ফুটে উঠেছিল, স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে ক্ষণকাল সেই দিকে চেয়ে বিজন ধীরে ধীরে বললেন, আচ্ছা দে।

ওষুধ সমেত দুধটা মুখে ঢেলে দিতে দিতে আলো পাকা গিন্নীর মত বলল, ব্যস; এর পরে কিন্তু আর একটি কথাও বলতে পারবে না।

—বেশ, তাই হবে। তার আগে আমার একটা কাজ করে দাও। ডান দিকের ড্রয়ার খুলে আমার নোটবুকটা নিয়ে এসো।

—এখন আবার নোটবুক দিয়ে কী করবে?

—দরকার আছে।···দেরি করিসনে, মা, নিয়ে আয়।

আলো ওঘর থেকে নোটবুক নিয়ে এল। কিন্তু সে যে নিতান্ত অনিচ্ছায় তা তার হাব-ভাব এবং চলন-ভঙ্গিতে অস্পষ্ট রইল না। বিজন বললেন, 'বইটা আমার চোখের সামনে ধরে রাখ।' তাই করল আলো, এবং তিনি ডান হাতের দুটো আঙুল দিয়ে একটি একটি করে পাতা উলটে চললেন। কিছুক্ষণ পরে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, এই তো পেয়েছি। দু নম্বর সরকার বস্তি। মধু মিস্ত্রী লেন, বেলেঘাটা।

—কার ঠিকানা ওটা?

—পরে বলবো। তার আগে তোকে যে আর একটা কাজ করতে হবে, মা।

—না, এখন আর কোনো কাজ-টাজের দরকার নেই। আলো নিবিয়ে দিচ্ছি। চুপ করে শুয়ে থাকো। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।

—'আর ঠিক পাঁচটা মিনিট।' ডান হাতের আঙুলগুলো দেখিয়ে অনুনয়ের সুরে বললেন ব্যানার্জি। 'তারপর তুই যা বলবি তাই শুনবো

—বলো কি করতে হবে।

—আমার রাইটিং প্যাড্ আর কলমটা নিয়ে আয়।

—ও মা! এখন আবার চিঠি লিখতে বসবে নাকি?

—আমি কি আর লিখতে পারি রে পাগলী? আমি বলে বলে দেবো, তুই লিখবি।

প্যাড্ আর কলম নিয়ে আলো এসে বসল ওঁর খাটের পাশে সেই টুলটার উপর। বিজনের কোনো সাড়া নেই। যেন কতদূরের কোন্ বিস্মৃত দিনের অতল অন্ধকারে ডুবে গেছেন। সেই শান্ত তন্ময় নিমীলিত চোখদুটির পানে চেয়ে আলো নিঃশব্দে অপেক্ষা করে রইল। মনে হল, এই মৌন প্রশান্তির মধ্যে এমন কিছু আছে যার কাছে চপলতা প্রকাশ করা অপরাধ। আরো কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর গভীর আবেশময়, শ্লথ কণ্ঠে উচ্চারিত একটি নাম তার কানে এসে লাগল—নির্মলা…। আলো হঠাৎ ভয় পেয়ে চমকে উঠল—বাবা কি আবার অজ্ঞান হয়ে গেলেন? রোগের ঘোরে ভুল বকতে শুরু করলেন? কিংবা হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছেন; স্বপ্নে দেখা কাউকে বোধহয় ডাকছেন ঐ নাম ধরে। দিলীপই বা এত দেরি করছে কেন?

ক্ষণিক বিরতির পর বিজন আরো কয়েকটা কথা যোগ করতেই আলো বুঝতে পারল, ভুল নয়, যে-চিঠি তাকে লিখতে বলা হয়েছে এ তারই শ্রুতলিপি। বিজন তখন বলে চলেছেন—"তোমার শেষদিনের সেই নিষেধ আমি ভুলিনি। তবু হয়তো সেটা অমান্য করে তোমার খোকাকে সঙ্গে করে তোমার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসতাম। কিন্তু আমি আজ নিতান্ত অশক্ত ও অসহায়। তাই তাকে একাই যেতে হল।

অনেক দিন হয়ে গেল। মাঝখানে এতগুলো বছর তোমার কোনো খবরই রাখতে পারিনি। তবু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তুমি ওখানেই আছ। তোমার দীর্ঘ প্রতীক্ষা এতদিনে সফল হল।"

লেখা শেষ হলে মেয়েকে বললেন, প্যাড্‌টা আমার সামনে এনে ধর, আর কলমটা দে।

নির্দেশমত মেয়ে শক্ত করে লেটারপ্যাড্‌টা ধরে রইল। বিজন তার হাত থেকে কলম নিয়ে কোনো রকমে নামটা সই করে দিলেন। আলো দুর্জয় কৌতূহল দমন করতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল, ইনি কে বাবা ?

—দিলীপের মা।

—ওর মা ! তুমি তাঁকে চেনো !

থেমে থেমে আপন মনে এই কটি কথা আউড়ে গেল আলো। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময় ও আনন্দে জড়ানো কী এক ধরনের মধুর লজ্জার আভা তার মুখখানি অপরূপ করে তুলল।

গলির মোড়ে সেই ওষুধের দোকান থেকে দিলীপ প্রথমে ডাক্তার দাশগুপ্তকে টেলিফোনে ধরবার চেষ্টা করল। কিন্তু তাঁকে বাড়িতে বা চেম্বারে কোথাও পাওয়া গেল না। ঐ ডিস্‌পেনসারীতে একজন ডাক্তার বসেন। তিনিও তখন বাইরে। অগত্যা অপেক্ষা করতে হল, এবং তিনি ফিরে আসতেই রোগের অবস্থা জানিয়ে তাড়াতাড়ি কিছু ওষুধপত্র, ইনজেকশনের সরঞ্জাম ইত্যাদি সংগ্রহ করে তাকে নিয়ে এ বাড়িতে এসে যখন পৌছল, তখন দেখল রোগী বিশ্রাম করছেন। ঘরের আলো নেভানো এবং চারদিকটা নিঝুম—এই থেকে বাইরের লোকের পক্ষে সেই ধারণা করাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁর অন্তর্লোকের চেহারাটা যদি কেউ দেখতে পেত, দেখত সেখানে চলেছে অবিশ্রাম আলোড়ন।

এতদিন পরে একি আশ্চর্য যোগাযোগ !—এই কথাটাই নানা দিক থেকে বিজন ব্যানার্জির সারা মনে আন্দোলন তুলেছিল। দীর্ঘ দিন আগে যার নিষিদ্ধ চিন্তাকে মন থেকে জোর করে মুছে ফেলে দিয়ে অন্য দশজন সাধারণ মানুষের মত সংসারের স্বাভাবিক পথে পা দিয়েছিলেন, আজ এত বিপর্যয়ের পর এই অপরাহ্ণ বেলায় সেই আবার তাঁর জীবনে মূর্ত হয়ে উঠবে কে ভেবেছিল ? নিজে আসেনি ; আসতে চায়ওনি। তিনিও কি চেয়েছিলেন ? না। তবু একমাত্র সন্তানের ভিতর দিয়ে

তার এই অপ্রত্যাশিত পুনরাবির্ভাব। এর থেকে একটা সত্য স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হল—জীবনে কিছুই হারায় না। তাকে যদি দর্পণ বলে ধরা যায়, সেখানে যে রেখাই পড়ুক, কোনোদিন একেবারে মুছে যায় না। বিলুপ্তি হয়তো ঘটে, কিন্তু সেটা সাময়িক। আবার কখন কেমন করে কার একখানা অদৃশ্য হাত সহসা কোথা থেকে এসে সেই পুরানো রেখা নতুন করে টানে, সে রহস্য কে ভেদ করবে?

কিন্তু তাই বলে আজকের বিজন ও নির্মলা আর সেদিনের বিজন ও নির্মলা এক নয়। দুজনের জীবনেই অনেক ঝড় বয়ে গেছে। তারই প্রচণ্ড তাড়নায় তারা একে অন্য থেকে দূরে সরে গেছে। সেই দূরত্ব ঘুচে যাবে, এমন প্রত্যাশা নিশ্চয়ই তিনি করেন না। সেটা সম্ভবও নয়। আজ তাঁর একমাত্র কামনা—যা ছিল অলঙ্ঘনীয়, সেই শূন্য স্থান জুড়ে একটি সুন্দর সেতু রচিত হোক। সে ভার নিক ওদের সন্তানেরা—দিলীপ আর আলো।

খোলা দরজার সামনে একসঙ্গে কয়েক জোড়া জুতোর শব্দে বিজনের তন্দ্রা ভেঙে গেল। বললেন, কে? 'আমরা, বলে সাড়া দিয়ে দিলীপ ঘরে ঢুকে আলো জেলে দিল। ডাক্তার রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করলেন, বুক দেখলেন, দিলীপকেও দু-একটা প্রশ্ন করলেন। তারপর কম্পাউণ্ডারকে বললেন, ইনজেকশন রেডি করতে। যন্ত্রটা চোখে পড়তে বিজন দিলীপের দিকে চেয়ে অপ্রসন্ন মুখে বললেন, আবার কেন খোঁড়াখুঁড়ি করছ? এখন তো আমার কোনো কষ্ট নেই।

দিলীপ কিছু বলবার আগেই ডাক্তার বলে উঠলেন, 'আপনি কথা বলবেন না।'

তারপর মিনিট কয়েকের মধ্যেই তাঁর সূচিকার্য সম্পন্ন হল।

ডাক্তারকে নীচে পৌঁছে দিয়ে দিলীপ ফিরে আসতেই বিজন তাকে ডাকলেন এবং কাছে এলে বললেন, কোলকাতায় এসে মায়ের খোঁজ করবার চেষ্টা করেছিলে?

—ওসব কথা কাল হবে। আপনি একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন। ঘুম না হলে—

—যা বলছি, তার উত্তর দাও। অসহিষ্ণু কণ্ঠে কিঞ্চিৎ রূঢ়তার

আভাস। দিলীপ প্রথমটা আশ্চর্য হল, তারপর সন্ধ্যাবেলার কথা মনে হতেই ধীরে ধীরে বলল,—অনেক করেছি। এখনো সে চেষ্টা ছাড়িনি, যদিও জানি, মা নেই।

—"আছে।" প্রত্যয়পূর্ণ দৃঢ় স্বর।

—আপনি জানেন কোথায় আছে মা? আপনি তাঁকে চেনেন?

বিজন এই ব্যাকুল প্রশ্নের সরাসরি জবাব দিলেন না। শুধু বললেন, আমার বালিশের নীচে একটা চিঠি আছে। বের কর।

দিলীপ ক্ষিপ্রহস্তে কিন্তু সাবধানে খামটা বের করতেই তিনি বললেন, ওখানে যে ঠিকানা রয়েছে অনেক দিন আগে ঐ বাড়িতে আমার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। আমার বিশ্বাস, আজও সে ওখানেই আছে। তার যে আর কোথাও যাবার উপায় নেই। ঐ চিঠিটা তাকে দিও।

দিলীপ অধীর হয়ে উঠল—আমি এখনই যাচ্ছি।

—এত রাত্রে কোথায় যাবে একা একা! তার চেয়ে বরং কাল সকালে—

—না; আমি আজই যাবো। আজই আমাকে যেতে হবে।

বলতে বলতে ছুটে বেরিয়ে গেল। বিজন আর বাধা দিলেন না। বুঝলেন, দেওয়া বৃথা। সম্ভব-অসম্ভব, উচিত-অনুচিতের বিবেচনা এই মুহূর্তে ওর কাছে আশা করা যায় না।

—সতেরো—

চারদিকটা ভাঙাচুরো ; আলো নেই, রাস্তা নেই, জনমানবের সাড়া পর্যন্ত নেই। একমাত্র সম্বল আকাশে দশমী বা একাদশীর চাঁদ। তারই আলোয় যতটা দেখা যায়, এক বস্তির পর আর এক বস্তি অতিক্রম করে দিলীপ এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছল, যেখানে ডাইনে বাঁয়ে আর কোনো পথের চিহ্ন চোখে পড়ে না। সামনে যে গলিটা আছে তার নাম জানবার উপায় নেই, নেম-প্লেটটা হয় ভেঙে গেছে, নয়তো কেউ খুলে নিয়ে গেছে। অগত্যা যে দিক থেকে এসেছে, সেই দিকেই ফিরতে হল। খানিকটা গিয়ে একটা ঝুরি-নামা বটগাছ। তলাটা বেশ পরিষ্কার। ইচ্ছা হল, ওখানে বসে খানিকটা জিরিয়ে নেয়। পা দুটো আর চলতে চাইছে না।

কিছুক্ষণ বসতেই প্রতি অঙ্গে নেমে এল ক্লান্তির বোঝা। সেই কোন্ সকালে নাকে-মুখে দুটো ভাত গুঁজে কলেজে ছুটেছিল। বিকালে জলখাবারের সময়টা বাইরে বাইরেই কেটে গেছে। সারা দিন পেটে কিছু পড়েনি। এতক্ষণ খেয়াল ছিল না। এবার পেটের ভিতরটা জ্বালা করে উঠল। ছুটোছুটিতে গলাটা শুকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখানে জল কোথায়? ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রান্তি ও অবসাদে চোখ দুটো জড়িয়ে এল। তারপর কখন যে সেই বটের কোলে ধূলি-শয্যায় এলিয়ে পড়েছিল, মনে পড়ে না।

লোকজনের ডাকাডাকিতে যখন ঘুম ভাঙল, সমস্ত মাঠময় সূর্যের আলো ঝলমল করছে। ধড়মড় করে উঠে বসতেই তাদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে বলল, 'আপনার লিবাস কোথায় বাবু?' দিলীপ বুঝল, এরা পাড়াগাঁয়ের লোক, অচেনা পথচারী সম্বন্ধে অতিমাত্রায় কৌতূহলী, এবং ভদ্রবেশী মানুষ দেখলে সাধু ভাষায় প্রশ্ন করে থাকে। এদের আগ্রহের প্রথম এবং প্রধান কেন্দ্র—'লিবাস'। অন্যান্য তথ্য ক্রমশঃ জিজ্ঞাস্য। একে একে তাদের ডজন খানেক প্রশ্নের উত্তর দেবার পর

সে যখন তার নিজের গন্তব্যস্থলের নিশানাটা জানতে চাইল, তারা বিশেষ কিছু হদিশ দিতে পারল না। বোঝা গেল, তারা ওখানকার বাসিন্দা নয়, দূরের কোন গ্রাম থেকে শহরের দিকে চলেছে চাকরির সন্ধানে। ও অঞ্চলে ব্যাপক অজন্মার দরুণ ঘরে ধান-চালের অভাব দেখা দিয়েছে, কল-কারখানার কাজ না পেলে অনশন ছাড়া গতি নেই, তা না হলে 'দেশ' ছেড়ে শহরে আসবার প্রয়োজন ছিল না, সেটা তাদের ইচ্ছাও নয়—ইত্যাদি বিষয় একটু সবিস্তারে বুঝিয়ে বলবার আয়োজন করতেই দিলীপ উঠে পড়ে জানাল, তাকে তখনই যেতে হবে। লোকগুলো মনে মনে ক্ষুণ্ণ হল এবং পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে কাঁধে কয়েকটা ছোট পোঁটলা এবং হাতে হুঁকো-কলকে নিয়ে পশ্চিম দিকে রওনা হল।

বটগাছ ছাড়িয়ে খানিকক্ষণ চলবার পর এবার যাদের সঙ্গে দেখা হল তাদের জামা-কাপড় এবং সে সব পরবার ধরণ দেখে দিলীপের বুঝতে অসুবিধা হল না—এরা স্থানীয় লোক। দু' নম্বর সরকার বস্তি তারা চেনে। কিন্তু সেটা তো কদিন আগে ভেঙে ফেলা হয়েছে।

'—ভেঙে ফেলা হয়েছে!' ওদের কথাটাই কোনোরকমে আউড়ে গেল দিলীপ। কিন্তু সে আওয়াজ এত ক্ষীণ যে নিজের কানেই পৌঁছল না। একজন বলল, সবটা এখনো ভাঙেনি। কাকে চাই আপনার?

দিলীপ সে কথার জবাব না দিয়ে তাকেই অনুরোধ করল, জায়গাটা আমাকে একটু দেখিয়ে দিতে পারেন?

লোকটি হাত তুলে দূরে কতগুলো খোলার ঘর দেখিয়ে, কিভাবে কোন পথে যেতে হবে বুঝিয়ে দিল। দিলীপ আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে ছুটে চলল, যেন একটু দেরি হয়ে গেলেই মাকে আর সে দেখতে পাবে না।

কাছাকাছি এসে সামনের দিকে চেয়েই তার সমস্ত শরীরে যেন রোমাঞ্চ খেলে গেল। ঐ না সেই ঝাঁকড়া আম গাছ। হাঁা; এই তো। ছুটে কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ইচ্ছা হল, দীর্ঘকাল পরে ফিরে পাওয়া পুরানো বন্ধুর মত গাছটাকে সে দুহাতে জড়িয়ে ধরে। মনে পড়ল প্রথম ইংরেজি লিখতে শিখে একদিন হারুর ছুরি দিয়ে কেটে কেটে একটা মস্ত বড় 'D' লিখে রেখেছিল এই গাছের গায়ে—তার নামের আদ্যক্ষর।

আজও সেটা আছে কি? খুঁজে দেখল, নেই। অকৃতজ্ঞ মহাকাল রূঢ় হস্তে কত স্মৃতিভরা সেই শৈশব-স্বাক্ষরটুকু মুছে ফেলে দিয়েছে। গাছটাও যেন কত বুড়ো হয়ে গেছে। সেই জলের কলটা? ঐ তো। তারও দেহে ধ্বংসের চিহ্ন। প্রথমেই বিনুদের বাড়ি। কই? এ যে শুধু ইট কাঠের ভগ্নস্তূপ। দিলীপ থমকে দাঁড়াল। হঠাৎ নজরে পড়ল স্তূপীকৃত জঞ্জালের আড়ালে সেই পরিচিত খোলার ঘর। টিনের বারান্দাটা যেন অন্য রকম ছিল। তবু ঢুকে পড়ল। না, ভুল হয়নি। এই সেই উঠোন। কিন্তু জিনিসপত্র এমন তছনছ করে ছড়িয়ে রাখল কে?

ঘরের ভিতর থেকে কে একজন বলে উঠল—কে? এ কণ্ঠ যে তার সমস্ত চেতনার সঙ্গে এক হয়ে মিলে আছে। দিলীপ চিৎকার করে বলতে গেল, আমি। কিন্তু স্বর ফুটল না। সাড়া না পেয়ে নির্মলা বেরিয়ে এল। নীচে নেমে থমকে দাঁড়াল। কপাল কুঞ্চিত করে আর একবার সেই একই প্রশ্ন করল —'কে?'

দিলীপের বুকের ভিতরটা হাহাকার করে উঠল। তার সেই সোনার প্রতিমার মত মা এ কী হয়ে গেছে! ছুটে গিয়ে মাটিতে হাঁটু গেড়ে দুহাত দিয়ে প্রাণপণে কোমরটা জড়িয়ে ধরল। অস্ফুট কণ্ঠে বলল, মা!

খোকা! বলে, নির্মলা ওর মাথাটা বুকের উপর চেপে ধরল।

অনেকক্ষণ কারো মুখে আর কোনো কথা সরল না।

কত কথা ছিল! একটি নয় দুটি নয়। কথার পাহাড় জমে আছে দুজনের মনে। বলতে হবে, শুনতে হবে। কিন্তু এ কী হল! কারোই যেন কিছু বলবার নেই। একজন ভাবছে, মাকে পেয়েছি, সেইখানেই সব কিছুর শেষ। আর একজন ভাবছে, খোকা ফিরে এসেছে, তারপরে আর কী থাকতে পারে?

জয়নগরের মোয়ার সময় এটা নয়। ঐ বস্তুটির যে একটি বিশেষ তার আছে, সেটি আনতে হলে চাই প্রথম শীতের নতুন খেজুর গুড়। তাই শীত ছাড়া অন্য ঋতুতে এর চলন নেই। কিন্তু গোকুল দাসের একটি বহুদিনের বৃদ্ধ খদ্দের আছেন বৌবাজারে; সব ঋতুতেই তাঁর 'জয়নগর' চাই। নাই বা রইল নলেন গুড়। আর সব উপাদানের তো আকাল

পড়েনি। ভুর-ভুর করবে এলাচদানার গন্ধ, তার সঙ্গে আলগোছে একটু-খানি কর্পূরের সুবাস। চিনির পাকটি এমন হবে যে, খৈ-এর দানাগুলো মুখে ফেলা মাত্র টপ করে মিলিয়ে যাবে। তার কাছে কোথায় লাগে ভীমনাগের সন্দেশ? তবে হ্যাঁ; সবটাই হল কারিগরের হাতের যাদু। গোকুলের মোয়ায় নাকি সেই যাদু আছে। তাই ওখানে তার নিয়মিত যোগান লেগে আছে সারা বছর।

আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় নিজের হাতে তৈরী সেই টাটকা জিনিস, ছেলেবেলায় যে কাঁসিখানায় করে খোকা ভাত খেত, তার উপর সাজিয়ে নির্মলা ছেলের সামনে ধরে দিয়েছিল। দিলীপ তার থেকে একটা তুলে ধরে মাকে দেখিয়ে হাসতে হাসতে বলল, মা তোমার মনে আছে—

বাকীটুকু না শুনেই মাও হাসতে হাসতে বলল, তা আর নেই? গোটা সকালটা আঁচল চেপে ধরে পেছন পেছন ঘুরেছিলি।

—আর কী বকুনিটা দিয়েছিলে তুমি?

এবারে মা আর হাসতে পারল না। গলাটা ধরে এল। নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তখন কি জানতাম সেই জিনিস একদিন নিজে হাতে কড়া-ভর্তি তৈরী করতে হবে আর প্রতি মুহূর্তে জ্বলে-পুড়ে মরতে হবে?

দিলীপ বলতে যাচ্ছিল, গোকুল বুড়োর মোয়া হাতে করে তার মনটাও জ্বালা করে উঠত। বলল না। মা তা শুনলে আরো কষ্ট পাবে। তাই চুপচাপ খেয়ে যেতে লাগল। নির্মলা পরম তৃপ্তির সঙ্গে সেদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, বাসা চিনতে তোর কষ্ট হয়নি? যা ভাঙাচুরো চলছে এদিকটায়।

—ও! সেই চিঠিটাই তো তোমাকে দেওয়া হয়নি। এই নাও।

—কার চিঠি? হাত বাড়াতে বাড়াতে বলল নির্মলা।

—প্রফেসর ব্যানার্জির।

—কে প্রফেসর ব্যানার্জি!

—চিনতে পারছ না! তিনিই তো তোমার ঠিকানা দিলেন। আমার কি মনে ছিল নাকি? কত বছর ধরে—

মায়ের দিকে চোখ পড়তেই থেমে গেল। নির্মলার সমস্ত সত্তা

যেন ঐ ছোট্ট চিঠিটার মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলে বলল, কী হয়েছে ওঁর?

—খুব কঠিন অসুখ—স্ট্রোক্!

—কি বললি?

—একটা দিক প্রায় অচল হয়ে গেছে।

নির্মলার গলা থেকে একটা ভীতি-সূচক ক্ষীণ শব্দ বেরিয়ে এল। তারপর বলল, তুই ওঁকে কোথায় পেলি?

—আমি যেখানে থাকি, তার ঠিক সামনেই যে ওঁর বাড়ি।

—আমাকে একবার নিয়ে যেতে পারিস?

—কেন পারব না? এখনই চল না?

—এখন! কিন্তু গোকুল-কাকা যে এসে ফিরে যাবে। মোয়াগুলো এবেলাই নিয়ে যাবার কথা।

—গোকুল-কাকা! মানে, সেই মোয়াওয়ালা বুড়ো?

—তুই চিনিস নাকি?

—বাঃ চিনি না? সে তোমার কাকা হয়?

—সম্পর্কে কাকা নয়, তবে তার চেয়ে অনেক বেশী। ভগবান তাকে জুটিয়ে দিয়েছিলেন বলেই তো তোকে ফিরে পেলাম। তা না হলে হয়তো—এই যে নাম করতে করতেই এসে গেছে। তুমি অনেকদিন বাঁচবে গোকুল-কাকা।

গোকুলের কানে বোধহয় সে কথা গেল না। দিলীপের দিকে কিছুক্ষণ হতভম্বের মত তাকিয়ে থেকে বলল, কী সব্বোনাশ! তুমি এখানে কী করছ?

দিলীপ উত্তর না দিয়ে হাসতে লাগল। নির্মলাও মৃদু হেসে বলল, আমার খোকা।

"অ্যাঁ"—গোকুলের মাথার ভিতরটা যেন তালগোল পাকিয়ে গেল। খানিকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে নির্মলার মুখের পানে চেয়ে থেকে বলল, এই তোমার খোকা! যে হারিয়ে গিয়েছিল? আর যার পথ চেয়ে—এবার বুঝলাম, কেন তুমি কিছুতেই বাসা ছাড়তে রাজী হওনি।

নির্মলা অভিভূতের মত বসে রইল। গোকুল বলল, হবে না?

তোমার যে পুণ্যির শরীর মা। ঠিক জানতে একদিন না একদিন খোকা তোমার এখানেই ফিরে আসবে। আর, কী কাণ্ড ছাখ। দুটো দিন দেরি হলে বাবু এসে তোমার দেখা পেত না।

—'অবাক হয়ে শুধু সেই কথাই ভাবছি'—তন্ময় সুরে বলল নির্মলা। 'আবার কোথায় চলে যেতাম!'

—যাবার জো থাকলে তো যাবে? ঐ ওপরে বসে একজন কলকাঠি নাড়ছে না? সে সব জানে। ঠিক সময় বুঝে কলটা টিপে দিয়েছে।

গোকুলের দার্শনিক আলোচনা কতক্ষণ চলত, বলা যায় না দিলীপ অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। মাকে বলল, তুমি তাহলে কখন যাচ্ছ, বল।

—'গোকুল-কাকা যখন এসে গেছে, এখনও যেতে পারি। কিন্তু এত কাল পরে তুই এলি'—বাকীটা অসম্পূর্ণ রইল।

কোথায় যাবার মতলব করছ তোমরা? জিজ্ঞাসা করল গোকুল।

—তুমি তো চেন। আমাদের ঠিক উল্টোদিকে প্রফেসরবাবু আছেন না?

—যেনার অসুখ?

—হ্যাঁ; ওঁকে দেখতে।

—উনি বুঝি তোমাদের কেউ হন?

দিলীপ মায়ের মুখের দিকে তাকাল। নির্মলা জবাব দিল, একেবারে আপনা আপনির মধ্যে।

—মানুষটা বড় ভালো। এখন ভালোয় ভালোয় কাটিয়ে উঠলে তবে তো? যা ভারী ব্যামো। মেয়েটার কী কষ্ট! আহা, মা নেই, বাপ পড়ে আছে বিছানায়। যেমন দেখতে, তেমনি স্বভাব। তোমার 'জয়নগরের' আরেক ভক্ত গো।

বলতে বলতে বৃদ্ধের শীর্ণ মুখখানা হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দিলীপের পা থেকে মাথা পর্যন্ত সস্নেহ দৃষ্টি বুলিয়ে একগাল হেসে বলল, তোমার খোকার সঙ্গে বেশ মানায়।

দিলীপ চমকে উঠল। গোকুলের দিকে চেয়ে মুখখানা প্রথমে একটু ফ্যাকাশে এবং সঙ্গে সঙ্গে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। এই ভাবান্তর পাছে মায়ের চোখে ধরা পড়ে যায়, কিংবা কাণ্ডজ্ঞানহীন বৃদ্ধ আবার কী বলে বসে, এই ভয়ে ব্যাপারটাকে তৎক্ষণাৎ চাপা দেবার জন্যে রীতিমত ধমকের সুরে বলে উঠল, আচ্ছা, তুমি এবার থামো দিকিন। খুব হয়েছে।

গোকুল সমান তালে জবাব দিল, কেন? অন্যায়ডা কী বললাম! বেশ তো, মা যখন যাচ্ছে, নিজের চোখেই দেখতে পাবে। তুমিও তো বাপু ওদের জন্যে কম করনি। সব্বাই বলছে, তুমি না হলে বাবুকে বাঁচানোই যেত না। জানো মা, ছেলে তোমার এরই মধ্যে বেশ ভালো ডাক্তার হয়ে উঠেছে।

'ডাক্তার! তুই ডাক্তার হয়েছিস খোকা?' বিস্ময় ও আনন্দের সুরে বলল নির্মলা।

—তুমি ক্ষেপেছ! বুড়ো আমাকে ঠাট্টা করছে।

'ঠাট্টা কী রকম!' সগর্জন প্রতিবাদ জানাল গোকুল দাস. 'ডাক্তারি পড় না তুমি? তবে, ঐ মড়ার হাড়গুলো দিয়ে কী কর?'

'খেলা করি', বলে হো হো করে হেসে উঠল দিলীপ, এবং মায়ের মুখে চোখ পড়তেই হঠাৎ থেমে গেল। নির্মলার চোখ দুটো কখন সজল হয়ে উঠেছে, ওরা কেউ দেখতে পায়নি। কাছে সরে এসে ছেলের গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ধরা-ধরা গলায় বলল, তুই ডাক্তার হবি. ওঁর মনেও সেই সাধ ছিল। কতদিন বলেছেন, খোকা যদি বাঁচে ওকে ডাক্তারি পড়াবো। পাশ করে গাঁয়ে গিয়ে বসবে। ও-তল্লাটে একজনও ভালো ডাক্তার নেই। কত লোক বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। খোকা তাদের বাঁচিয়ে তুলবে।

বলতে বলতে যেন সেই বহু দূর পিছনে ফেলে আসা দিনগুলোর মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে পড়ল। কয়েক সেকেণ্ড পরে আবার শোনা গেল সেই ভাঙা ভাঙা মৃদু স্বর—'ঐ গাঁ ছাড়া যেন আর কোনো কথা নেই। একটি দিনের তরেও সে জীবনটাকে ভুলতে পারেননি। সেখান থেকে টেনে এনে আমিই তো এতবড় সর্বনাশটা ঘটালাম। আজ যদি থাকতেন,—'

দুচোখের জল আর বাধা মানল না। চারদিকের সমস্ত আব-হাওয়াটাই বদলে গেল। সব কথা ভুলে শুধু সেই অশ্রুসিক্ত সকরুণ মুখখানার পানে চেয়ে দুটি অসমবয়সী দর্শক স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

আগে চেপে রাখলেও শেষ পর্যন্ত দিলীপকে বলতে হল, গত রাত্রে সে না বলে হঠাৎ চলে এসেছে, এবং এ বেলায় ফিরে না গেলে মাষ্টারমশাই হয়তো পুলিশে খবর দিয়ে বসবেন। নির্মলা চমকে উঠল, বলিস কি! সারারাত ছিলি কোথায়?

দিলীপ এ প্রশ্নের উত্তর দিল না। মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। গোকুল দাস বুঝল, এ অবস্থায় ছেলেকে না খাইয়ে ছেড়ে দেওয়া নির্মলার পক্ষে অসম্ভব। তাই মুস্কিল-আসানের ভারটা নিজের হাতে নিয়ে নিল। বলল, আচ্ছা, সেজন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি তো ঐ দিকেই যাচ্ছি। বুড়ো মাষ্টারবাবুকে খবরটা দিয়ে দেবো। তুমি খেয়েদেয়ে একটা ঘুম দিয়ে নাও।

নির্মলাকে বলল, তোমার ভাঁড়ার কী বলে? বাজার-টাজার কিছু করতে হবে না?

--আর সব আছে। শুধু যদি একটু মাছ—

—'মাছ-টাছ লাগবে না', বাধা দিয়ে বলে উঠল দিলীপ।

--তাহলে খাবি কি দিয়ে?

—কেন, আর যা রাঁধবে? মাছ অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি!

—ওমা! সে কি কথা! মাছ ছেড়েছিস কেন?

—যেখানে ছিলাম, তোমার মত কেউ রাঁধতে পারলে তো।

নির্মলার মুখে একটা ম্লান ছায়া পড়ল। 'যেখানে ছিলাম' কথাটার মধ্যে যে দীর্ঘ ইতিহাস চাপা দেওয়া আছে, তার কিছুই এখনো সে জানে না। তবু ঢাকাটা খুলতে কেমন ভয় ভয় লাগে। কে জানে হয়তো তার সবখানিই দুঃখ-বেদনায় ভরা।

—আঠারো—

কপালের উপর একখানা অচেনা হাতের মৃদুস্পর্শ লাগতেই তন্দ্রা ভেঙে গেল। বিজন চোখ মেলে প্রথমটা যেন ঠিক ঠাহর করতে পারলেন না। পরক্ষণেই রোগ-ম্লান মুখে একটুখানি হাসির দীপ্তি ফুটে উঠল। বললেন, কখন এলে ?

'এই আসছি,' শান্ত মৃদু-স্বরে বলল নির্মলা।

—দিলীপ কোথায় ?

—নীচে কোথায় গেল।

—তুমি তাহলে সেই বাড়িতেই ছিলে ? খুঁজে বের করতে ওর অসুবিধে হয়নি ?

—খানিকটা ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে।

কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে কেটে যাবার পর আবার বিজনের গলা শোনা গেল, আমি জানতাম, তুমি আসবে।

নির্মলা বলতে যাচ্ছিল, আপনি তো আমাকে আসতে বলেননি। থেমে গেল। যে দিনগুলো কবে কোন্ বিস্মৃতির অন্ধকারে তলিয়ে গেছে, এই ছোট্ট একটুখানি অভিমানের ছোঁয়া দিয়ে তার ঘুম ভাঙিয়ে কী লাভ ? তাই অন্য কথা পাড়ল। বলল, আপনার কাছে আমি চিরদিনের তরে ঋণী হয়ে রইলাম।

—ঋণী! আমার কাছে! কী বলছ তুমি ?

—আপনি আমার খোকাকে এনে দিয়েছেন।

—এবার তুমি হাসালে নির্মলা। এর মধ্যে আমার অংশ কোনখানটায় ? আমি কী করলাম ?

—আপনার হাতেই তো আমি তাকে ফিরে পেলাম।

—সবটাই আকস্মিক! কিন্তু কী অদ্ভুত যোগাযোগ! তাই নয় ?······বলে একটু হাসলেন। সে হাসি বাঙ্ময়। অতীত দিনের অনেক কথা তার মধ্যে ফুটে উঠল। নির্মলা চুপ করে রইল।

বিজন আবার বললেন, তুমি নিজে থেকে না এলে আমি তোমাকে ডেকে পাঠাতাম।……তোমার কাছে আমার যে একটি ভিক্ষা আছে, নির্মল।

ভিক্ষা! নির্মলা সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। তার জানা আছে, অসুস্থ মানুষের সংযমের জোড়গুলো আলগা হয়ে যায়। সেই ফাঁক দিয়ে মনের তলাকার কোন্ নিগূঢ় কথা এতকাল পরে এই প্রৌঢ় মানুষটির মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে কে জানে? তাই বলে বাধা দিতেও মন সরল না। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করে রইল। কিন্তু না; মিথ্যা আশঙ্কা করেছিল নির্মলা। বিজন সেদিক দিয়ে গেলেন না। অসুস্থ হলেও বিগত দিনের রঙীন স্মৃতি যেখানে তোলা আছে সে কক্ষের অর্গল আজও অটুট রয়ে গেছে। এ আবেদন পিছনের দিকে চেয়ে নয়, ভাবীকালের দিকে চেয়ে। চোখের কোণটা অন্দরের দিকে ফিরিয়ে মেয়েকে ডাকলেন, আলো……

কাছেই কোনোখানে বোধহয় সে অপেক্ষা করছিল, ধীরে ধীরে খাটের পাশে এসে মাথা নীচু করে দাঁড়াল।

"দিলীপের মা। তোমারও মায়ের মত। তোমার বড়মার ছোট বোন। প্রণাম কর।"

আলো চকিতে একবার নির্মলার মুখের পানে চেয়ে এগিয়ে গিয়ে মাটিতে বসে পড়ে পায়ের ধূলো নিল। নির্মলা ওকে দুহাতে তুলে বুকে চেপে ধরল। তারপর চিবুকে হাত দিয়ে বলল, বাঃ, মুখখানা তো ভারী সুন্দর। আলো তো সত্যি আলো।

বিজনের হঠাৎ মনে পড়ল, নামটা ওর মায়ের দেওয়া। হয়তো অবিচ্ছিন্ন অন্ধকারের মধ্যে এই আলোর রশ্মিটুকু আশ্রয় করেই সে বাঁচতে চেয়েছিল। পারেনি। একটা উদ্গত নিঃশ্বাস বুকে চেপে নিয়ে বললেন, ওকে আমি তোমার হাতে দিতে চাই নির্মলা। ওর মা নেই। তুমি ওর সেই অভাব পূরণ কর।

নির্মলার বুকের রক্ত হঠাৎ বুঝি দোলা দিয়ে উঠল। বিস্মৃতির মর্মস্থল ভেদ করে কতদিনের কত কথা যেন মাথা তুলে ছুটে এল। জোর করে তাদের ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সহজ সুরে বলল, বেশ তো; ওর জন্যে

আপনাকে ভাবতে হবে না। আপনি সেরে উঠুন; আমার খোকা মানুষ হয়ে দাঁড়াক। তারপর—

কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই আলোর আনত মুখের উপর সস্নেহ দৃষ্টি রাখল। ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে আলোও তৎক্ষণাৎ তার লজ্জারুণ মুখখানা নির্মলার বুকে লুকিয়ে ফেলল। বিজন তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমার অন্তরের সব চেয়ে গুরুভার তুমি নামিয়ে দিলে, নির্মলা। ওকে আমি নিজে হাতে করে অত বড় করে তুলেছি। আশা কার, তোমার স্নেহের মর্যাদা রাখতে পারবে। আর...বলে আড় চোখে মেয়ের দিকে এক পলক তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, যদ্দূর জানি, তোমার ছেলেও ওকে পছন্দ করেছে।

লজ্জায় মরে গিয়ে আলো তার মুখটা আরো জোরে চেপে ধরল নির্মলার বুকে। নির্মলা তাকে জড়িয়ে ধরে প্রতিবাদের সুরে বলল. আর ও? মেয়ে বলে ওর বুঝি পছন্দ অপছন্দ নেই?

—আমি তো ছেলের দিকটাই দেখবো। মেয়ের ভার তোমার। ইচ্ছে করলে জিজ্ঞেস করতে পার।

—জিজ্ঞেস করতে হবে কেন? আমার কি চোখ নেই?

এরপরে আলোর পক্ষে আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হলনা। নির্মলার হাত ছাড়িয়ে ছুটে পালিয়ে গিয়ে বাঁচল।

বাইরের বারান্দায় ভারী গলার আওয়াজের সঙ্গে লাঠি ঠোকার শব্দ কানে যেতেই নির্মলা তাড়াতাড়ি ভিতরের দরজা দিয়ে অন্দরের দিকে প্রস্থান করল। দুজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক কথা বলতে বলতে ঢুকলেন। ঘরের মাঝামাঝি এসেই একজন বেশ জোরে হেঁকে উঠলেন, কেমন আছেন, প্রফেসর ব্যানার্জি?

—'আসুন; আছি একই রকম।' বলে বিজন ডান হাতটা কপালে ঠেকালেন। ওঁরা দুখানা চেয়ার দখল করলেন। যিনি এই মাত্র কুশল প্রশ্ন করছিলেন, এবার মুখখানা বিকৃত করে মাথা নেড়ে বললেন, হুঁ-উ; সেকেণ্ড অ্যাটাক তো। যাকে বলে দ্বিরাগমন। সহজে নিষ্কৃতি পাওয়া শক্ত। প্রাণটা রেখে গেলেও একটা অঙ্গ না নিয়ে ওরা ছাড়েন না। তা', বাঁ দিকটা এবার নাড়তে-চাড়তে পারছেন?

বিজন মাথা নেড়ে জানালেন, 'না।' এই সময় দ্বিতীয় ব্যক্তি বক্তার দিকে চেয়ে ভ্রূকুটি করলেন। বোধ হয় খেয়াল করিয়ে দিলেন যে, এই সব রোগীর মুখের উপর ঐ ধরনের অপ্রিয় সত্য প্রকাশ না করাই সমীচীন। ইঙ্গিতটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল। তিনি আগের মতই উচ্চকণ্ঠে রায় দিলেন, আমার তো মনে হয় না, ইউ উইল গেট ব্যাক্ ইউর নর্ম্যাল মুভ্‌মেন্টস্। এই দেখুন না, আমার ভায়রা ভাই-এরও ঠিক আপনার অবস্থা। ছমাস হয়ে গেল। নো ইম্প্রুভ্‌মেন্ট।

—'তা হতে পারে' ভরসার স্বরে বললেন দ্বিতীয় ভদ্রলোক, 'তবে ওঁর কেস্ আলাদা। ডাক্তার দাশগুপ্ত যখন বলছেন'—

—আরে রেখে দিন আপনার ডাক্তার দাশগুপ্ত। ওরা কী জানে? কতগুলো মুখস্থ বুলি আউড়ে যায়। আমার তো মনে হয়, প্রফেসর, আপনি একজন ভালো কবরেজ দেখালে পারেন।

—'কবরেজ কী করবে?' এবার দ্বিতীয়ও বেশ জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন, 'এসব হচ্ছে নতুন রোগ। আয়ুর্বেদে উল্লেখ পর্যন্ত নেই।'

—আছে, আছে। এরই নাম সন্ন্যাসরোগ। ডাক্তারবাবুরা নতুন নাম দিয়েছেন থ্রম্বসিস্।

—না, মশাই, সন্ন্যাস আলাদা জিনিস।

তর্ক তুমুল হয়ে উঠল। দুজনেই সম্ভ্রান্ত এবং প্রবীণ প্রতিবেশী। কিন্তু স্থান, কাল, পাত্র—কোনো জ্ঞানেরই পরিচয় পাওয়া গেল না। বিজন অসহায় নীরব শ্রোতা। মনে মনে প্রবলভাবে অনুভব করলেন, এই মুহূর্তে এদের ঘর থেকে বের করে দেওয়া উচিত। কিন্তু সভ্য ও শিক্ষিত মানুষের সৌজন্যবোধ তাঁর কণ্ঠ চেপে ধরল। ভদ্রসমাজে বাস করে এই সব ভদ্রতার দণ্ড দুঃসহ হলেও না মেনে উপায় নেই।

ভিতরের দিকের বারান্দায় একখানা জলচৌকি ছিল। নির্মলা গিয়ে দাঁড়াতেই আলো তার উপরটা আঁচল দিয়ে মুছে নিয়ে বলল, বসুন।

—এটা বুঝি তোমার ঘর? পাশের কামরাটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল নির্মলা।

—হ্যাঁ।

ভিতরে ঢুকে ভারী খুশী হল। সব কিছু গোছানো-সাজানো, ছিমছাম। তার ঠিক পাশেই আর একখানা ঘর; খালি, কিন্তু ঝাড়া-পোছা পরিষ্কার। পেরিয়ে গেলে আর একটা ছোট্ট বারান্দা। নির্মলা ওকে নিয়ে সব দিকটা ঘুরে দেখল। এদিকের বারান্দায় ফিরে আসতেই আলো ছুটে গিয়ে ভাঁড়ার ঘরে কাঠের বাক্স খুলে একখানা নতুন পশমের আসন নিয়ে এসে পেতে দিল। তারপর তাকের উপর থেকে শ্বেত পাথরের ডিস্ ও গ্লাস পেড়ে আনতেই নির্মলা হাসিমুখে বলল, এ সব আবার কিসের আয়োজন হচ্ছে শুনি?

—আয়োজন কিচ্ছু নয়।

—ও সব রেখে আমার কাছে এসে একটু বসো। এ সময়ে আমি কিছু খাই না।

—শুধু এই ডাবের জলটুকু খেয়ে নিন।

বসে পড়ে ছুরি দিয়ে ডাবের মুখটা ছাড়াতে ছাড়াতে বলল, আর তার সঙ্গে—

—ওরে দুষ্টু মেয়ে! আবার 'তার সঙ্গে'ও আছে?

—একটা সন্দেশ। বলে, ডান হাতের তর্জনীটা তুলে ধরল।

নির্মলার ভারী ভাল লাগল। এইটুকু মেয়ের এই শুচি, নিষ্ঠা ও সশ্রদ্ধ আচার-জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে মনে মনে বিস্মিত হল। এসব একে কে শেখাল! তারপর মনে হল, যার হয় তার আপনা থেকেই হয়। হাতে ধরে শেখাতে হয় না। ওর অনুরোধের মধ্যেও একদিকে যেমন মিষ্টি ছেলেমানুষি আর একদিকে তেমনি এমন একটা আপনজনের প্রাণের স্পর্শ ছিল, যাকে উপেক্ষা করা যায় না।

নির্মলা উঠে গিয়ে সেই পশমের আসনে বসল। আলোকে পাশে বসিয়ে একটি মিষ্টি ওর হাতে তুলে দিয়ে বলল, মাকে হারিয়েছ কদ্দিন হল?

—অনেক দিন। আমি তখন খুব ছোট। কিছুই বিশেষ মনে নেই।

—তারপর বুঝি মামাবাড়ি গিয়ে ছিলে?

—খুব অল্প দিন। একটু বড় হতেই বাবা গিয়ে নিয়ে এলেন।

তারপর বাবাকে ছেড়ে কোথাও যাইনি। মাঝে মাঝে শুধু কানপুরে গেছি বড়মার কাছে। তাও বাবার সঙ্গে।

ভদ্রলোকেরা তখন চলে গেছেন। নির্মলা যাবার আগে বিদায় নিতে গিয়ে দেখল, বিজন চোখ বুজে নিস্পন্দের মত পড়ে আছেন। গলায় একটু শব্দ করতেই চোখ মেলে তাকালেন। নির্মলা শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, সন্ধ্যা হয়ে এল। আজকে তাহলে আসি?

—আবার কবে আসবে?

—দেখি, কবে পারি।

—শুনলাম, কয়েক দিনের মধ্যেই তোমাকে বাসা বদল করতে হবে। সি, আই, টি নোটিশ দিয়েছে।

—আপনাকে এ খবর কে দিলে?

—আমার অনেক গোয়েন্দা আছে, জানো না?

—বুঝেছি, এ নিশ্চয়ই গোকুলকাকার কাজ।

—লোকটি বড় ভালো। এদিকে যখনই আসে, আমার সঙ্গে দেখা না করে যায় না।······বাসা কি ঠিক হয়ে গেছে?

—সে-ই একটা মোটামুটি ঠিক করে রেখেছে। আমি এখনো দেখিনি।

বিজন একবার নির্মলার মুখের পানে তাকালেন, ক্ষণকাল বোধহয় একটু ইতস্ততঃ করলেন; তারপর বললেন, আর একটা অনুরোধ ছিল, কিছু মনে করবে না তো?

নির্মলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল, দৃষ্টিটা আস্তে আস্তে উদাস হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ পরে সেই দিকে চেয়েই বলল, আমি জানি, আপনি কী বলবেন। কিন্তু সে হয় না, বিজনদা।

—'কেন হয় না নির্মল?' গাঢ় স্বরে বললেন বিজন, 'আমার আলোকে যখন তুমি বুকে স্থান দিয়েছ, তখন এ বাড়ি-ঘর সবই তো তোমার; তোমার ছেলেমেয়ের। আমি একটা অচল পদার্থ মাত্র। অকেজো আসবাবের মত এক পাশে পড়ে থাকবো।

নির্মলার মুখে কতকগুলো যন্ত্রণার রেখা ফুটে উঠল। এদিকটায় আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল বলে বিজনের চোখে পড়ল না। আগেকার

সূত্র ধরে আরো কি যেন তিনি বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, আমি এখন যাই।

অস্ফুটে এই কটি কথা বলেই সে একরকম ছুটে বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে। বারান্দায় কোনো লোক ছিল না। সেইখানে দাঁড়িয়ে মনে হল, এই মুহূর্তে পালিয়ে না এলে সে হয়তো নিজেকে আর শক্ত করে ধরে রাখতে পারত না। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইল; অনেকক্ষণ। মনে হল, এতক্ষণে পা দুটো তাদের হারানো জোর ফিরে পেয়েছে।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। দিলীপ এসে কখন কাছে দাঁড়িয়েছে, বুঝতে পারেনি। 'মা' বলে ডাকতেই চমকে উঠল। বলল, গাড়ি এসেছে?

—এসেছে; চল।

নীচে নামতেই বাহাদুর এসে প্রণাম করল। নির্মলা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দিলীপের মুখের পানে তাকাতে সে বলল, আমার বাহাদুরদা। আমরা দুজনেই যাচ্ছি তোমাকে পৌঁছে দিতে। ওখানে গিয়ে সব কথা বলবো।

—চল বাবা, বাহাদুরকে বলল নির্মলা। 'আমিও তোমাদের সব কিছু শুনবার জন্যে ছটফট করে মরছি। ওরা কারা?'

রাস্তার ঠিক ওপারে প্রেস-এর ছেলেরা ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। দিলীপ বলল, ওরা আমার বন্ধু।

—ওখানে দাঁড়িয়ে আছে কেন?

বাহাদুর বলল, আপনার কাছে আসতে চায়, কিন্তু ঠিক সাহস পাচ্ছে না।

—কেন?

—বষ্টালের ছেলে কিনা?

—কার ছেলে?

—বষ্টাল,...মানে...জেলে ছিল এক সময়ে।

'জেলে ছিল?' অনেকটা আপন মনে এই দুটি কথা উচ্চারণ করে বিস্ময় ও আগ্রহভরা চোখ মেলে নির্মলা সেই ছেলেগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। কেমন যেন মায়া হল চেয়ে চেয়ে। ধীরে ধীরে চোখ দুটোও করুণ হয়ে উঠল। বাহাদুরের দিকে ফিরে বলল, তা আমার কাছে আসতে

ভয় কি? যেখানেই থাক আমার খোকার বন্ধুরা আমার ছেলের চেয়ে কম কিসে? তুমি ওদের আসতে বল।

বাহাদুর ইশারা করতেই সমস্ত দলটা হুড়মুড় করে এবাড়িতে এসে উঠল। একে একে এগিয়ে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল তাদের দিলীপের মাকে। নির্মলা কাউকে মাথায় হাত দিয়ে, কারো চিবুক স্পর্শ করে আদর করল। বলল, আমি আরেক দিন এসে, তোমরা যেখানে থাক, দেখতে যাবো। অনেক গল্প করবো তোমাদের সঙ্গে। আজ আসি, কেমন?

কেশব দাঁড়িয়েছিল সামনের দিকে। বলল, শুধু গল্প নয়, আমাদের একদিন খাওয়াতে হবে, মা-মণি। দিলীপের কাছে শুনেছি, আপনার হাতের রান্না একবার খেলে আর ভোলা যায় না।

সকলে হেসে উঠল। নির্মলাও হাসিমুখে বলল, বেশ তো, সে আর বেশী কথা কী। কদিন যাক; তারপর একদিন তোমাদের রান্না করে খাওয়াবো।

রঘু এসেছিল দরজা বন্ধ করতে। নির্মলার পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে বলল, আপনি এসেছেন মা, আর বাবুর অসুখ আদ্ধেক ভালো হয়ে গেছে। আবার কবে পায়ের ধুলো দেবেন?

—আসবো, বাবা। শীগগিরই আসবো। তোমরা খুব সাবধানে থেকো। ওঁর দিকে সব সময়ে নজর রেখো।

ঘোড়ার গাড়ির পেছনের সীটে বসল নির্মলা, সামনে ওরা দুজন। যেতে যেতে বাহাদুর বলল, মায়াটা এখানে থাকলে কত আনন্দ করত! কালই তাকে লিখে দেবো তাড়াতাড়ি চলে আসতে।

—মায়া কে?

—আমার বোন।

—আমার দিদি, সঙ্গে সঙ্গে যোগ করল দিলীপ। পুরো নাম শুনলে তুমি চমকে উঠবে। রণ-মায়া।

নির্মলা সকৌতুকে বলল, কেন, কথায় কথায় রণ-মূর্তি ধরে বুঝি?

ওরা দুজনে হেসে উঠল। নির্মলা বলল, তা হোক। আমার কাছে একদিন এলেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

—উনিশ—

প্রাতর্ভ্রমণ আশুবাবুর চিরদিনের অভ্যাস। বর্দ্ধমানে থাকতে ছিল নদীর ধারের বাঁধ। বছরের আট মাস শুকিয়ে কুঁকড়ে পড়ে থাকলেও তবু গঙ্গা। ইদানিং প্রায়ই হুগলীর 'আশ্রমে' কাটাতে হয়। সেখানে গঙ্গার আর এক রূপ—পূর্ণাঙ্গী, প্রশস্ত-হৃদয়া। তীর ধরে যতদূর ইচ্ছা চলে যেতে কোনো বাধা নেই। এখানে নদী নেই, আছে গোলদীঘি। ভ্রমণ এখানে পরিভ্রমণ। তাও পদে পদে সঙ্ঘর্ষ। তবু তারই মধ্যে কয়েক চক্কর ঘুরে না এলে চলে না।

সম্প্রতি অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় অসুখে পড়বার পর ফিরবার পথে একবার ওঁর খবর নিয়ে যাওয়া প্রায় দৈনন্দিন রুটিনে দাঁড়িয়েছিল। নির্মলা যেদিন এসেছিল সেদিন ভোরেই ওঁকে হুগলী যেতে হয়েছিল। দুদিন পরে কাল একটু বেশী রাত্রে ফিরেছেন।

ভোরে উঠেই 'পাক দিতে' বেরিয়েছিলেন। ফিরে এসে নিজের আস্তানায় ঢুকবার আগে ও-বাড়ির খোলা দরজা দিয়ে আস্তে আস্তে উপরে উঠে গেলেন। রঘু ধুনো দিচ্ছিল। ফিস্‌ফিস্ করে জিজ্ঞাসা করলেন, বাবু উঠেছেন?

—বাবুর আর ওঠাউঠি কি? সারা রাত তো জেগেই কেটেছে।

আশুবাবুর মুখে উদ্বেগের ছায়া পড়ল। ধীরে ধীরে কোন রকম শব্দ না করে ঘরে ঢুকলেন। তবু বিজনের কান এড়াল না। বললেন, কে, আশুবাবু? আসুন।

আশুবাবুর বুকের ভিতরটা নড়ে উঠল। কথাগুলো কেমন জড়ানো জড়ানো। এ রকম তো ছিল না। মুখের চেহারাও আগের চেয়ে অনেকটা থমথমে। তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এসে রঘুকে ডেকে বললেন, ও-বাড়ি থেকে দিলীপবাবুকে এখনই একবার ডেকে নিয়ে এসো তো। তাড়াতাড়ি আসতে বলো।

দিলীপ ছুটতে ছুটতে এসে পৌঁছল। আশুবাবু তখনো বারান্দার

উপরেই অপেক্ষা করছিলেন। ওকে কাছে টেনে নিয়ে প্রায় কানে কানে বললেন, রুগীর অবস্থা তো তেমন ভাল মনে হচ্ছে না। তুমি একবার ছাখ দিকিন

—সে কি! কালও তো বেশ ভালোই দেখে গেলাম।

ঘরে ঢুকে সামান্য যেটুকু দেখা দরকার, দেখে দিলীপের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। আশুবাবুকে গিয়ে বলল, আপনি একটু বসুন স্যর। আমি একবার ডাক্তার দাশগুপ্তকে ফোন করে আসি। হয়তো গিয়ে নিয়ে আসতে হবে।

—তাই বরং যাও। আমি আছি। তুমি না আসা পর্যন্ত কোথাও যাবো না।

ঐখানেই একটা চেয়ার ছিল; তার উপরে বসলেন আশুবাবু। ঘরে গেলে রোগী নিশ্চয়ই কথা বলবার চেষ্টা করবেন। এ অবস্থায় সেটা একেবারে বাঞ্ছনীয় নয়। বারান্দার আর এক প্রান্তে আলো কোনো কারণে বেরিয়েই সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে চলে গেল। আশুবাবুর সামনে এর আগে দু-এক দিন বেরোলেও আজ কোথা থেকে এক রাশ লজ্জা এসে পা দুটোকে জড়িয়ে ধরল। অথচ পালিয়ে যাবার লজ্জাটা যে আরো বড়, তাও সে বোঝে। আশুবাবুও একটু অপ্রস্তুতে পড়লেন। এমনিতেই মেয়েদের সামনে তিনি ততটা সহজ বা সড়গড় বোধ করেন না, তা তারা যে বয়সেরই হোক, এবং ওঁর সঙ্গে যত ঘনিষ্ঠ স্নেহের সম্পর্কই থাক। এখানে যখন আসেন, প্রফেসর ব্যানার্জির সঙ্গেই কথাবার্তা চলে, তাঁর এই মেয়েটিকে নিজে থেকে কখনো ডাকেন না, সামনে পড়লে কুশল প্রশ্নাদি করেন। এখন যদি সে হঠাৎ বেরিয়েই আবার ঘরে গিয়ে না ঢুকত, হয়তো ডেকে খোঁজ-খবর নিতেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কী করা যায় যখন ভাবছেন, দেখলেন আলো একেবারে তাঁর কাছে এসে পড়েছে। তিনি কিছু বলবার আগেই সে ঢিপ করে তাঁর পায়ের কাছে একটা প্রণাম করল। কারণটা বুঝতে না পারলেও সস্নেহে তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। বললেন, এসো মা, বেঁচে থাকো, সুখী হও।

যিনি প্রতিদিন আসছেন যাচ্ছেন, আজ হঠাৎ তাঁকে এই প্রণাম জানাবার ইচ্ছা তার কেন হল, আলো নিজেই জানে না। কাল থেকে

সমস্ত মনটা যেন ভরপুর হয়ে আছে। হয়তো তার সঙ্গে এই ইচ্ছার কোনো যোগ ছিল। এই মুহূর্তে মনে হল, তাদের পরম সুহৃদ ও দিলীপের পিতৃতুল্য এই শিশুপম বৃদ্ধের মুখে এই মাত্র যে কটি কথা উচ্চারিত হল, সে শুধু মামুলী আশীর্বচন নয়, আজকের দিনে তার কাছে তাদের যেন একটা বিশেষ অর্থ আছে, মূল্য আছে।

নির্মলা এসে দাঁড়াবার পর থেকে চারদিকের সব কিছুই আলোর চোখে নতুন রূপ নিয়েছিল। বাবার মুখের ঐ প্রসন্ন হাসিটি সে কতদিন দেখেনি। যা দেখছে তারই মধ্যে সেই প্রসন্নতার প্রতিফলন। একটা রাত না কাটতেই আবার একটা কালো মেঘ তাদের মাথার উপর ঘনিয়ে উঠছে, একথা সে কেমন করে জানবে?

সকালে উঠে বাবার ঘরে তখনো তার যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

ডাক্তার দাশগুপ্ত তাঁর পরীক্ষা শেষ করে বাইরে এসে দিলীপ এবং আশুবাবুর মুখের দিকে চেয়ে একটু চিন্তান্বিত সুরে বললেন, এরকম তো হবার কথা নয়। এতটা সেটব্যাক্ কী করে হল? হঠাৎ উত্তেজনার কোনো কারণ ঘটেছে কি?

দিলীপ অপরাধীর স্বীকারোক্তির মত বলল, তা একটু ঘটেছে, স্যার।

—ছাট্‌স্ ইট্। কিন্তু তা হলে তো চলবে না। ওঁকে এখান থেকে সরাতে হবে।

দিলীপের দিকে আঙুল তুলে বললেন, you are going to be a doctor. নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, এই পেশেন্টের জন্যে যে দুটো জিনিস নিতান্ত দরকার—absolute rest আর proper and constant nursing—তার কোনোটাই হচ্ছে না। এটা তো একটা রীতিমত বৈঠকখানা। এখানে এ রকম সিরিয়স্ পেশেণ্ট রাখা চলে না।

দিলীপ মাথা নীচু করে ভাবছিল। এবারে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় নেওয়া যায়, স্যর? মেডিক্যাল কলেজে?

—যদি কেবিন পাওয়া যায়। তার চেয়ে ভালো হবে a good, quiet nursing home. বল তো, আমিও চেষ্টা করতে পারি

আশুবাবু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, এর মধ্যে আমাদের বলবার কিছু নেই স্যর। আপনি যা ভাল বুঝবেন, সেইটাই শেষ কথা। তার ব্যবস্থাও আপনাকে করতে হবে।

—বেশ, আমি তাহলে এখনই গিয়ে খোঁজ-খবর করছি। আজকের মধ্যেই যেখানে হোক fix up করে ফেলতে হবে।

সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, দিলীপ, তুমি এক কাজ করো। ঘণ্টা খানেক পরে যেখান থেকে হোক্ আমাকে একটা টেলিফোন করো। তার মধ্যেই কোথাও একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে আশা করছি।

দিলীপ কী একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। দু-একবার ইতস্ততঃ করল। তারপর ডাকল, স্যর……

—বল। ছাত্রের মুখের দিকে তাকালেন ডাক্তার দাশগুপ্ত।

—আমাকে—আমাকে ঘণ্টা দুই সময় দিন, স্যর। তার মধ্যেই আমি এসে পড়বো।

—কেন, কোথায় যাবে তুমি?

—আমি আমার মাকে একবার জিজ্ঞেস করে আসি।

—তোমার মাকে! ডাক্তার দাশগুপ্ত যেন ঠিক বুঝতে পারলেন না। কিন্তু তার চেয়ে অনেক গভীরতর বিস্ময়ের সুর আশুবাবুর—তোমার মা!

—হ্যাঁ, মাষ্টারমশাই। মা এসেছিল। পরে আপনাকে সব বলছি।

ডাক্তারের দিকে ফিরে বলল, মা বলে গেছে, তাঁকে জিজ্ঞেস না করে যেন কোনো কিছু করা না হয়।

—বেশ, but you must be very quick my boy.

—আমি যাবো আর আসবো।

ডাক্তার গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। দিলীপও সেই সঙ্গে নেমে গেল। আশুবাবু ফিরে এসে রোগীর পাশে বসলেন।

এঁদের আলোচনাটা রঘুর কানে গিয়েছিল। সব কথা ধরতে না পারলেও এটুকু বুঝতে অসুবিধা হয়নি, যে বাবুকে অবিলম্বে অন্যত্র

পাঠাবার ব্যবস্থাই স্থির হয়ে গেল। দিলীপের শেষের কথাগুলো সে শুনতে পায়নি। ঠিক ঐ সময়টাতে দরজা খুলবার জন্যে তাকে নীচে যেতে হয়েছিল। আলোকে এখনই এসব কিছু বলবার ইচ্ছা তার ছিল না। কিন্তু তার মুখের ভাব লক্ষ্য করে আলো যখন পীড়াপীড়ি করতে লাগল, ডাক্তারবাবু কী বলে গেলেন তাকে জানাবার জন্যে, তখন চুপ করে থাকা কঠিন হয়ে দাঁড়াল।

খবরটা শুনেই সে বাবার বিছানার পাশে ছুটে গিয়ে ডাকল, বাবা। বিজন তখন আচ্ছন্নের মত পড়ে আছেন। মেয়ের ডাক তাঁর কানে পৌঁছল কিনা বোঝা গেল না। আশুবাবু হাত নেড়ে ডাকাডাকি করতে নিষেধ করলেন। তারপর যদ্দুর সম্ভব নিচু গলায় বললেন, 'ভয় নেই, উনি একটু ঘুমুচ্ছেন।' কিন্তু এ যে ঘুমের চেহারা নয়, ছেলেমানুষ হলেও সেটুকু বুঝবার জ্ঞান তার হয়েছিল। আশুবাবু তাকে ভরসা দিয়ে, নিশ্চিন্ত মনে নিজের কাজে যেতে বললেন। কিন্তু তার মনে হল পা দুটো যেন হঠাৎ অচল হয়ে গেছে। শঙ্কাকুল বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে বাবার মুখের দিকে চেয়ে সেইখানেই সে দাঁড়িয়ে রইল।

সিঁড়ির মুখ থেকে পরিচিত উচ্চকণ্ঠে নিজের নাম কানে যেতেই আলোর যেন হঠাৎ সংবিৎ ফিরে এল।

তাড়াতাড়ি বারান্দায় ছুটে গিয়ে বলল, জ্যাঠামশাই!

বসে পড়ে পায়ে হাত দিতেই বিমান ওর বাহু ধরে তুলে বললেন, থাক থাক। বিজু কেমন আছে?

আলো মুখে কিছু বলতে পারল না, মাথা নেড়ে জানাল, ভালো না। সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। বিমান তার পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিলেন, থাক, কাঁদে না। আর ভাবনা কী? এসে যখন পড়েছি, এবার দুদিনে সব ঠিক হয়ে যাবে। সেই কবে থেকে আসব-আসব করছি। এক ব্যাটা ট্যাঁশ এসেছে নতুন ডি, টি, এস্ হয়ে কিছুতেই ছাড়তে চায় না। কোনোরকমে তিনদিনের জন্যে—কই, সে কোন্ ঘরে?

আলো আঙুল দিয়ে ঘরটা দেখিয়ে দিল। বিমান দরজা থেকে উঁকি মেরে আশুবাবুকে লক্ষ্য করে চোখের ইশারায় জিজ্ঞাসা করলেন—

কে? আলো ফিসফিস করে বলল, মাষ্টারমশাই; সামনের বাড়িতে থাকেন। সব সময়ে আমাদের দেখাশুনো করেন।

ছোট্ট স্যুটকেসটা আলোর হাতে দিয়ে বিমান ঘরে ঢুকলেন এবং আশুবাবুর উদ্দেশে হাত দুটো জড়ো ক'রে বললেন, নমস্কার। আমি বিজনের দাদা। কানপুর থেকে আসছি। ও বুঝি ঘুমুচ্ছে?

আশুবাবু উঠে দাঁড়িয়ে ওঁকে বাইরে যাবার ইঙ্গিত করলেন এবং রেলিং-এর পাশে দাঁড়িয়ে রোগীর বর্তমান অবস্থার একটা মোটামুটি আভাস দিলেন। প্রসঙ্গত, ডাক্তার যে তাঁকে কোনো নার্সিংহোমে নিয়ে যাবার পরামর্শ দিয়েছেন, সে কথাও উল্লেখ করলেন। বিমানও ঐ বিষয়টার উপর জোর দিয়ে বললেন, আমি সেটা আগেই জানি, মনে মনে স্থির করেও এসেছি। আমার একজন বন্ধু ডাক্তার একটি ভালো হোম খুলেছে। এখনি গিয়ে সব ঠিকঠাক করে ফেলছি। ঐ রকম রুগীর দেখাশুনো, সেবা শুশ্রূষা—এখানে সে সব কে করে? ঐ একফোঁটা মেয়ে; ওকে কে দেখে তার ঠিক নেই। ওর ঘাড়ে এত বড় একটা ঝক্কি। ছিঃ ছিঃ। অনেক আগেই আমার আসা উচিত ছিল। কিন্তু পরের গোলামি করি। বুঝতেই তো পাচ্ছেন।

অনেক বেলা হয়ে গিয়েছিল। আশুবাবুর দুবার ডাক এসে গেছে। রোগীকে একা ফেলে উঠতে পারেননি। এবার বিদায় নিয়ে নীচে নামলেন। বিমানও বেরিয়ে পড়বার জন্যে প্রস্তুত হলেন। আলো বলল, এখন বেরোলে খাবেন কখন?

—সে হাঙ্গাম্ ডাইনিং কার-এ চুকিয়ে এসেছি। আয়ার আসছিল কোলকাতায়। কিছুতেই ছাড়ল না। এক পেট খাইয়ে দিলে। তোদের খাওয়া দাওয়া হয়েছে?

আলো জবাব দিল না। বিমান চেঁচিয়ে উঠল সে কি! এখনো খাসনি! ঠাকুর আছে তো?

আলো মাথা নেড়ে জানাল, আছে।

—তাহলে তোর খাবার দিতে বল। আর দেরি করিসনে। বিজন যা খাবার, খেয়েছে?

—কিচ্ছু না; সেই সকাল থেকে একভাবে পড়ে আছেন।

—তাই বলে তুইও না খেয়ে আছিস? তোদের ঐ চাকরটি, কি নাম যেন, ও-ই একটু বসুক রুগীর কাছে। ততক্ষণে তুই যাহোক ছুটো মুখে দিয়ে নে। আমি বেরিয়ে পড়ি।

—কোথায় যাচ্ছেন আপনি?

—বিজুর জন্যে একটা বেড ঠিক করে আসি। আজকের মধ্যে যদি হয়ে যায়, কালই তোকে নিয়ে রওনা হতে পারি। তোর বড়মাকে একটা টেলিগ্রামও করতে হবে।

জ্যাঠামশাই চলে গেলেন। আলো সেইখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। ঠাকুর এসে আরেকবার খেয়ে নেবার তাগিদ দিল, রঘু এসে কত করে বলল, সে নড়ল না, শুধু বলল, তোমরা খেয়ে নাও গে।

ক্ষুধা তৃষ্ণা—সব বোধ তার চলে গিয়েছিল। তারই চোখের উপর দিয়ে বাবাকে ওরা নিয়ে যাবে কোথাকার কোন হাসপাতালে। সেও চলে যাবে কোন্ দূর দেশে। তারপর? একটা অদম্য কান্নার ঢেউ তার বুক পর্যন্ত ঠেলে উঠল। ছুটে গিয়ে নিজের ঘরে বিছানার উপর লুটিয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে বাইরে থেকে রঘুর গলা শোনা গেল, দিদিমণি, বাবু ডাকছেন। আলো ধড়মড় করে উঠে বসল। লুটিয়ে-পড়া আঁচলটা কোনো রকমে কাঁধে তুলে ছুটতে ছুটতে বাবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। কাছে যেতেই বিজন বললেন, মেজদা এসেছে বুঝি?

—হ্যাঁ।

—কোথায় গেল?

—তোমার জন্যে নার্সিং হোম ঠিক করতে।

বলতে গিয়ে ঠোঁট ছুখানা কেঁপে উঠল, গলাটাও মনে হল ধরা ধরা।

বিজন হাতের ইশারায় মেয়েকে আরো কাছে ডেকে নিলেন। কম্পিত হাতখানা ওর মুখে কপালে বুলিয়ে দিয়ে বললেন, তাছাড়া আর উপায় কী বল? তুইও কিছুদিন গিয়ে তোর বড়মার কাছে থাক। আমি একটু ভালো হলেই আবার আনিয়ে নেবো। আর যদি ওখানেই থেকে যেতে হয়—

—বলো না, বাবা তুমি বলো না, আমি শুনতে পারবো না— তড়িৎস্পৃষ্টের মত সহসা তাঁর মুখের উপর হাত চাপা দিয়ে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল। এই আর্তস্বর আলোর মুখে বিজন এর আগে কোনোদিন শোনেননি। মেয়ে তাঁর চিরদিনই চাপা। বড় শান্ত; ছেলেবেলায় যখন কাঁদত, তখনও কেউ তার গলা শুনতে পেত না।

তিনি যে কী করবেন, কী বলবেন ভেবে পেলেন না। ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল নির্মলা, পিছনে দিলীপ। চোখের নিমেষে আলোর বুকের ভিতরটায় কী যে হল, সে জানে না। কিসের এক দুর্নিবার আকর্ষণ যেন তাকে অন্ধবেগে চালিয়ে নির্মলার বুকের উপর নিয়ে ফেলল। দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মত মাথা নেড়ে বলতে লাগল, না, না, আমি যাবো না। আমি কিছুতেই যেতে পারবো না।

নির্মলা তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করল, কী বলছ! কোথায় যেতে পারবে না?

তার কাছ থেকে কোনো জবাব না পেয়ে বিজনের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাবার কথা বলছে?

—কানপুর।

—কানপুর কেন?

—মেজদা এসেছে ওকে নিয়ে যেতে। বৌদি বলে পাঠিয়েছে।

—ও, জামাইবাবু এসেছেন বুঝি?...থেমে থেমে বলল নির্মলা।

কয়েক পলকের তরে একটা চিন্তার ছায়া পড়ল তার মুখের উপর। তারপর আলোর মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, আচ্ছা, সে যাওয়া না যাওয়া আমি দেখবো। এসে যখন পড়েছি—। খোকা, তুই ওকে একটু ও-ঘরে নিয়ে যা তো। যাও মা। আমি এখনি আসছি তোমার কাছে।

মায়ের হুকুম শুনে দিলীপ একেবারে থ। এ কী বলছে মা। তার মাথা কেটে ফেললেও তো লোকজনের সামনে—। তার প্রয়োজন হল না। উপস্থিত বিপদ থেকে আলোই তাকে রক্ষা করল। এতক্ষণে খানিকটা সামলে উঠেছিল এবং হঠাৎ এতখানি অধীর হয়ে পড়েছিল বলে হয়তো লজ্জাও পেয়েছিল মনে মনে। মাথা নীচু করে চোখ মুছতে

মুহূর্তে দ্রুত পায়ে ভিতরের দিকে চলে গেল। দিলীপও যেন আপাততঃ ফাঁড়া কেটে যাওয়ায় সামনের বারান্দায় গিয়ে হাঁফ ছাড়ল।

সব কটা জানালাই খোলা। ঘরের মধ্যেও রীতিমত রোদের তাত বোঝা যাচ্ছিল। নির্মলা একে একে সেগুলো বন্ধ করে দিয়ে খাটের পাশে এসে দাঁড়াল। রোগীর বুকের উপর থেকে গা-ঢাকা চাদরটা এক পাশে সরে গিয়েছিল। তুলে যখন ঠিক করে দিচ্ছিল, বিজন ওর সেই আঙুল কটির উপর হাত রেখে বললেন, এ কদিন আসনি কেন?

নির্মলা হাতটা টেনে নিল না। বলল, এই তো এলাম। কিন্তু আর কথা নয়। যথেষ্ট বকবক করেছেন। এবার একেবারে চুপ।

—আর তো কয়েকটা ঘণ্টা। তারপর বকবক কেন, একটা কথা বলতেও আসব না।

নির্মলা এবার আস্তে আস্তে হাতখানা মুক্ত করে নিল। তারপর কয়েক মুহূর্ত রোগীর মুখের দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ বলে উঠল, আচ্ছা, বলতে পারেন, আপনাদের নার্সিং হোম না কি, সেখানে কী আছে?

এই আকস্মিক অসংলগ্ন প্রশ্নে বিজন প্রথমটা একটু চমকে উঠলেন। তার পর ধীরভাবে বললেন, সেকথা জিজ্ঞেস করছ কেন?

- এমনিই; জানতে ইচ্ছা করে।

—সেখানে আমার মত রুগীর দেখাশুনো করবার লোকজন আছে। আর কী থাকবে?

—কারা তারা?

- নার্স, অ্যাটেণ্ড্যাণ্ট, এইসব।

নির্মলা আবার মুহূর্ত কয়েক কী ভাবল। তারপর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, তারা কি আমার চেয়েও বেশী আপনজন, আমার চেয়েও বেশী দেখাশুনো করবে?

বিজন ব্যানার্জি শূন্য বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। এ কী বলছে নির্মলা! এ কি ওরই মুখের কথা, না তাঁর অসুস্থ মস্তিষ্কের শ্রুতি-বিভ্রম? দুদিন আগেও তো সে এখানে এসে থাকবার একান্ত অনুরোধটুকু প্রত্যাখ্যান করে চলে গেছে। আজ সত্যিই কি এই

অক্ষম অচল একান্ত পর-নির্ভর মরণাপন্ন মানুষটার দীর্ঘ কঠিন পরিচর্যার ভার সে নিজের হাতে তুলে নিতে চায় ?

নির্মলা অন্য দিকে তাকিয়ে ছিল। এবার এদিকে চোখ ফেরাতেই বললেন, তোমার কথা তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, নির্মলা।

— থাক : আপনার আর বুঝে কাজ নেই।

বেশ : তবে তাই হোক। আর বুঝতে চাই না !

গভীর নিশ্বাস ফেলে বিজন আবার চোখ বুজলেন। রোগপাণ্ডুর মুখের উপর একটি আশ্বাসময় পরম শান্তি ভাস্বর হয়ে উঠল।

সামনের বারান্দায় দিলীপের সঙ্গে একটা অচেনা উঁচু গলার কথাবার্তা শুনে নির্মলা একটু বিরক্ত হয়ে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কে রে, খোকা ?

— অ্যাম্বুলান্স্ এসেছে মা

অ্যাম্বুলান্স্ !

— হাঁ, কে একজন বিমান বাঁড়ুজ্জি পাঠিয়েছেন, ওঁকে নিয়ে যাবার জন্যে।

ও, উনি তোর মেসোমশাই, ওঁর দাদা। বলে দে, দরকার হবে না। আর, তিনি যেন এখখুনি বাড়ি চলে আসেন।

খোকা অবাক হয়ে চেয়ে আছে দেখে নির্মলা এবার তাড়া দিয়ে বলল, বুঝতে পারছিস না !

তার মুখ থেকে বিমুগ্ধ স্বরে শুধু একটি মাত্র শব্দ বেরিয়ে এল — মা ! সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে গেল।

তৎক্ষণাৎ চলে যাচ্ছিল। নির্মলা আবার ডেকে ফেরাল 'আর— শোন, বাহাদুরকে বল, ও-বাড়ি থেকে আমার জিনিসপত্তরগুলো নিয়ে আসুক। গোকুল-কাকাও যেন ঐ সঙ্গে আসে।'

দুটো করে সিঁড়ি একসঙ্গে ডিঙিয়ে দিলীপ ছুটতে ছুটতে নীচে নেমে গেল।

সমাপ্ত

STATE CENTRAL LIBRARY
WEST BENGAL
CALCUTTA